সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা

ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য

বি দ্যো দ য় লা ই ব্রে রী প্রা ই ভে ট

ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্যের **'সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা'** প্রাচীন ভারতের প্রজ্ঞা ও মনীষার ঐতিহ্য-আধার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস-কথা।

গ্রন্থখানি কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশমাত্রই পাঠকসাধারণের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সর্বস্তরের পাঠক-পাঠিকার নিকট সবিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তাহার অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ, অল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থখানির চারিটি সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া পঞ্চম সংস্করণের প্রকাশ।

'সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা' সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য: "...সূচীপত্র থেকে বোঝা যাবে সংস্কৃত সাহিত্যের কী এক বিপুল ও বৈচিত্র্যময় সম্ভারের সাথে পাঠকের তিনি (লেখক) পরিচয় করাতে প্রয়াসী হয়েছেন। আর গ্রন্থখানির প্রতি ছত্রে স্বাক্ষর রয়েছে এই প্রয়াসে তাঁর গভীর নিষ্ঠার, পাণ্ডিত্যের দীপ্তির এবং সেই রসবোধের পরিমিতির।..."

প্রকাশভঙ্গির স্বাচ্ছন্দ্যে, ভাষার সাবলীলতায় এবং আলোচ্য বিষয়ের গভীরতায় ও ব্যাপ্তিতে **'সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা'** বাংলা ভাষায় আজও অদ্বিতীয় অতুলনীয়।

সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা

সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা

History of Sanskrit Literature
including those of Pali, Prakrit & Apavramsa

● পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত ●

ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য
ভূতপূর্ব অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯
অফিস : ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ১৯৫৮

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ
অগস্ট ১৯৬১

তৃতীয় সংস্করণ
সেপ্টেম্বর ১৯৬৪

চতুর্থ সংস্করণ
অক্টোবর ১৯৬৭

পঞ্চম সংস্করণ
ফেব্রুয়ারী ১৯৭২

মূল্য ঃ তের টাকা

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক জ্ঞানোদয় প্রেস, ১৭ হায়াৎ খান লেন, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।

যাঁহার স্নেহ ও সদাজাগ্রত দৃষ্টি আমাকে এতদূর লইয়া আসিয়াছে, সংস্কৃত কলেজের সেই অধ্যক্ষ ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রীর প্রীতির উদ্দেশে আমার এই দীন সারস্বত অর্ঘ্য নিবেদন করিলাম।

ভূমিকা

'সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা'র দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। ছাত্র ও অধ্যাপক-গোষ্ঠীর নিকট এই পুস্তকটি যে আদর পাইয়াছে তাহার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। দ্বিতীয় সংস্করণ হইলেও স্থানে স্থানে এত পরিবর্তন করা হইয়াছে যে প্রথম সংস্করণ হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দীর্ঘকাল শয্যাগত না থাকিলে আরও আগে গ্রন্থখানি আত্মপ্রকাশ করিত।

এই গ্রন্থে পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্যের উপর দুইটি পরিশিষ্ট সংযোজিত হইল। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যে ইহাদের স্থান হয়ত বেমানান হইতে পারে, কিন্তু নিঃসংশয়ে ইহাতে গ্রন্থের মূল্য বাড়িয়াছে। পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সম্বন্ধে আমার ব্যুৎপত্তি নাই বলিলেও চলে, অথচ আমার প্রকাশক ও বেশ কয়েকজন অধ্যাপক বন্ধু এ বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ডঃ হেরম্ব চট্টোপাধ্যায় পালি অংশ এবং বিবেকানন্দ কলেজের অধ্যাপক শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাকৃত ও অপভ্রংশ অংশ লিখিয়া দিয়া শুধু আমার গ্রন্থের মর্যাদাই বৃদ্ধি করেন নাই, আমাকেও চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। নিঃসংশয়ে এই বিষয়ে লিখিবার অধিকার তাঁহাদের আছে।

আমার ভাগিনেয়ী কল্যাণীয়া শ্রীশুভ্রশ্রী চৌধুরী এই গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজে আমাকে সাহায্য করিয়াছে, আমার প্রকাশক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমায় খুব উৎসাহও দিয়াছেন, অসুস্থ অবস্থায় আমার পত্নী শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য নিরন্তর পরিচর্যা দ্বারা লিখিবার পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের কথাই মনে করি।

ইহার পূর্ব সংস্করণে বলিয়াছিলাম—

বৈদগ্ধ্যখ্যাতিলোভায় মম নৈবায়মুদ্যমঃ।
কিন্তু নানাকথাজালস্মৃতিসৌকর্যসিদ্ধয়ে॥

এবারও ইহার অধিক কিছু বক্তব্য নাই।

গ্রন্থকার

২১শে আগস্ট ১৯৬১

পঞ্চম সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন

প্রথম প্রকাশের পর অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে পর পর চারি সংস্করণের নিঃশেষ ও পঞ্চম সংস্করণের প্রকাশ 'সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা'র ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তারই নিদর্শন। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও সাধারণ পাঠক-পাঠিকাগণের সহৃদয় সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতাভিন্ন গ্রন্থখানির এইরূপ ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা আদৌ সম্ভবপর হইত না।

বর্তমান সংস্করণে আমরা মুদ্রণ ও অন্যান্য বিষয়ে গ্রন্থখানিকে যথাসম্ভব নির্ভুল ও সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। আশা করি, পূর্ববর্তী সংস্করণগুলির মত বর্তমান এই পঞ্চম সংস্করণও সর্বস্তরের পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট সমাদৃত হইবে। ইতি

ফেব্রুয়ারী ১৯৭২

তৃতীয় সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন

'সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা'র গ্রন্থকার ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য আজ জীবিত থাকিলে প্রকাশকদের পক্ষ হইতে তৃতীয় সংস্করণের এই নিবেদনের হয়ত আদৌ প্রয়োজন হইত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজ আর তিনি আমাদের মধ্যে নাই।

আদ্যোপান্ত পরিমার্জিত হইয়া 'সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা'র পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ যখন প্রকাশিত হয়, তখন বিমানবাবু গুরুতর পীড়ায় শয্যাশায়ী ছিলেন। গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পর কিছুদিনের মধ্যে অকস্মাৎ তিনি অতি অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

অল্পকালের মধ্যে 'সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা'র প্রথম দুইটি সংস্করণের নিঃশেষ এবং তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশ ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ পাঠক-পাঠিকার মধ্যে গ্রন্থখানির সবিশেষ জনপ্রিয়তার নিদর্শন। বিশেষভাবে এখানে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থখানি সম্পর্কে বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপকবৃন্দের অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতার কথা। তাঁহাদের এই সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ না করিতে পারিলে গ্রন্থখানি এরূপ জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারিত বলিয়া আমরা মনে করি না। আশা করি, 'সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা' ভবিষ্যতেও তাঁহাদের সকলের আন্তরিক সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিবে। ইতি

সেপ্টেম্বর ১৯৬৪

দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন

'সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা'র পূর্ববর্তী সংস্করণ নিঃশেষিত হয় অল্পকালের মধ্যে। বর্তমানে বিভিন্ন অধ্যায় আদ্যোপান্ত পরিমার্জিত হইয়া এবং বিভিন্ন অধ্যায়ে বহু নূতন বিষয় সংযোজিত হইয়া যথেষ্ট পরিবর্ধিত আকারে গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পরিবর্ধিত এই দ্বিতীয় সংস্করণে নূতন অনেক উল্লেখযোগ্য সংযোজনের মধ্যে বিশেষ দুইটি সংযোজন—**পালি ঃ ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি** এবং **প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ঃ ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি।**

যথাসাধ্য প্রয়াস ও আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন যাবৎ লেখক অধ্যাপক ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় গুরুতর পীড়ায় শয্যাশায়ী থাকার ফলে গ্রন্থখানি প্রকাশে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল এবং এই সংস্করণে গ্রন্থশেষে নির্ঘন্ট সংযোজিত করা সম্ভব হইল না। আশা করি, সহৃদয় পাঠকসমাজ প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

এই সংস্করণে গ্রন্থখানির কলেবর যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইল বলিয়া গ্রন্থের মূল্যও বৃদ্ধি করিতে হইল।

পরিশেষে, অগণিত পাঠক-পাঠিকা ও শিক্ষার্থিগণের সহিত সর্বান্তঃকরণে আমরা এই গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের আশু রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। ইতি

২৯. ৮. ৬৯

বিষয়-সূচী

বৈদিক সাহিত্য

'বেদ' শব্দ 'বিদ্'-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অর্থভেদে 'বিদ্'-ধাতু চারিটি—জ্ঞানার্থক, লাভার্থক, সত্তার্থক ও বিচারার্থক। সত্তাবাচী বিদ্-ধাতু অকর্মক, আর তিন অর্থে বিদ্-ধাতু সকর্মক। আমরা বলি, জ্ঞানার্থক বিদ্-ধাতু হইতে 'বেদ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং 'বেদ' শব্দের অর্থ হইল 'জ্ঞান'।

'বেদ' শব্দের অর্থ

'বেদ' শব্দ গ্রন্থবিশেষে প্রসিদ্ধ; গ্রন্থ শব্দাত্মক; শব্দ কখনও জ্ঞান হইতে পারে না, জ্ঞানের সাধন হইতে পারে। সেইজন্যই 'বিদ্যতে অনেন' এই অর্থে বিদ্-ধাতুর উত্তর করণে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া 'বেদ' শব্দ নিষ্পন্ন করিতে হয়। অর্থ দাঁড়ায়—'ইহার দ্বারা জানা যায়'। কিন্তু কথা হইল, জ্ঞানার্থক বিদ্-ধাতু হইতেই যে 'বেদ' শব্দ নিষ্পন্ন করিতে হইবে এরূপ কোনও নিয়ামক যখন নাই, তখন অপর তিন অর্থে প্রযুক্ত বিদ্-ধাতুও এক্ষেত্রে সমভাবে গৃহীত হইবার দাবি রাখে। যদি সকর্মক তিনটি বিদ্-ধাতু গ্রহণ করা হয় তবে বলিতে হয়, যাহার দ্বারা কিছু জানা যায়, যাহার দ্বারা কিছু লাভ করা যায় বা যাহার দ্বারা কিছুর বিচার করা যায়, তাহাই 'বেদ'। এই 'কিছু'টি কি? সকর্মক ধাতু গ্রহণ করা হইয়াছে, ঐ 'কিছু'টি কর্ম। এখানে কর্মের কোনও নিয়ামক না থাকায় সকলের অপেক্ষিত এবং সর্বজনসম্মত 'সুখ'কেই কর্মরূপে গ্রহণ করা চলিতে পারে। সেই 'সুখ' পরব্রহ্মস্বরূপ এবং বেদপ্রমাণক। পদার্থকে স্বীকার করিলে তাহার সত্তাকেও মানিতে হয়। সুখকে স্বীকার করিলে তাহা আছে স্বীকার করিতে হয়। যাহা আছে তাহার জ্ঞানও স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানাভিন্ন ও সত্তাভিন্ন পদার্থের বিচারও করা চলিতে পারে এবং তাহা লভ্যও বটে। ফলতঃ, 'বিদ্যতে অনেন ইতি বেদঃ'—ইহার অর্থ দাঁড়ায় "যে শব্দরাশি দ্বারা জ্ঞানাভিন্ন ও সত্তাভিন্ন বেদপ্রমাণক পরব্রহ্মস্বরূপ সুখকে বিচারপূর্বক লাভ করা যায় তাহাই 'বেদ'।" বেদ শুধু পুরুষার্থ 'সুখে'র কথাই বলে নাই, তাহাকে লাভ করার উপায়ও বলিয়াছে, অর্থাৎ পুরুষার্থ-সাধনের কথাও বলিয়াছে। বেদোক্ত যাগাদি হইল সেই পুরুষার্থসাধন। দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগের নাম 'যাগ'।[১] তাই যাগের কথা বলিতে গিয়া অপরিহার্য-রূপে দ্রব্য ও দেবতার কথাও বেদ বলিয়াছে।

প্রাচীন গ্রন্থসমূহে 'বেদ' শব্দ আদ্যুদাত্ত ও অন্তোদাত্ত দুই রকমই ব্যবহৃত হইয়াছে। আদ্যুদাত্ত 'বেদ' শব্দ ঋগ্বেদে প্রথমার একবচনে পনের বার ও তৃতীয়ার একবচনে মাত্র একবার প্রযুক্ত হইয়াছে। অন্তোদাত্ত 'বেদ' শব্দ ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। যজুর্বেদ ও অথর্ববেদে উহার প্রয়োগ আছে। পাণিনিও উঞ্ছাদি (৬।১।১৬০) ও বৃষাদি (৬।১।২০৩) গণে দুইবার 'বেদ' শব্দ ধরিয়াছেন এবং স্বরভেদই ইহার কারণ।* করণ কারকে প্রত্যয় করিলে 'বেদ' শব্দ অন্তোদাত্ত, ভাব বা অধিকরণে প্রত্যয় করিলে 'বেদ' শব্দ আদ্যুদাত্ত হইয়া থাকে।

বেদের দুইটি অংশ—(ক) মন্ত্র ও (খ) ব্রাহ্মণ।[২] মন্ত্রভাগ পদ্যে রচিত। এক শ্রেণীর মন্ত্রে শুধু বিভিন্ন দেবতার স্তব করা হইয়াছে। আর এক শ্রেণীর মন্ত্রে স্বর্গ, আয়ু, ধন, পুত্র প্রভৃতির প্রার্থনা করা হইয়াছে। শৌনক প্রথম শ্রেণীর মন্ত্রগুলিকে বলিয়াছেন 'স্তুতি' (praise) এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্ত্রগুলিকে বলিয়াছেন 'আশীঃ' (prayer)। সকল

বেদের অংশ
(ক) মন্ত্র

১। 'উদ্দিশ্য দেবতাং দ্রব্যত্যাগো যাগোঽভিধীয়তে'।

* ভগবদ্দত্ত, বৈদিক বাঙ্ময় কা ইতিহাস, (প্রথম ভাগ), পৃঃ ১৪০

২। 'মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্'—আপস্তম্ব

প্রার্থনার মধ্যে স্বর্গের প্রার্থনাই সর্বাপেক্ষা কম।[৩] এই দুই শ্রেণীতে মন্ত্ররাশিকে ভাগ করিয়াও শৌনক বলিয়াছেন যে মূলতঃ ইহাদের মধ্যে কোনও ভেদ নাই। কারণ, যে দেবতার স্তব করা হইয়াছে, শেষ পর্যন্ত তাঁহার নিকট কিছু প্রার্থনা করিবার জন্যই তাহা করা হইয়াছে।[৪]

(খ) ব্রাহ্মণ

ব্রাহ্মণভাগ গদ্যে রচিত। 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ 'মন্ত্র'।[৫] বেদের যে অংশে মন্ত্রের ব্যাখ্যা এবং তাহাদের বিভিন্ন যজ্ঞে বিনিয়োগের (application) কথা আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাই 'ব্রাহ্মণ'। ব্রাহ্মণে যজ্ঞ সম্বন্ধে বিধি দেওয়া হইয়াছে। সেই বিধিগুলির প্রাশস্ত্য-প্রতিপাদনের জন্য নানাভাবে তাহাদের প্রশংসা করা হইয়াছে, তদ্বিপরীত বিধিগুলির নিন্দা করা হইয়াছে, কাহারও কোনও বিশেষ কর্মের বা অতীত কোনও বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিয়া বিধিগুলির সমর্থন করা হইয়াছে। যে অংশে বিধি দেওয়া হইয়াছে ব্রাহ্মণের সেই অংশের নাম 'বিধি' (mandatory text), আর যে অংশে বিধির প্রাশস্ত্য প্রতিপাদন করা হইয়াছে তাহার নাম 'অর্থবাদ' (laudatory text)। 'বিধি' অংশই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।[৬] অর্থবাদ অংশ বিধিসমূহের স্তাবক—ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট মাত্র।[৭] এই 'বিধায়ক' ও 'স্তাবক' অংশ লইয়া ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ।[৮] এই অংশদ্বয় যথাক্রমে 'বিধি' ও 'অর্থবাদ' নামে পরিচিত। মন্ত্রভাগ হইল বেদের জ্ঞানকাণ্ড, ব্রাহ্মণভাগ কর্মকাণ্ড। জ্ঞান ও কর্মকে লইয়াই আমাদের বেদ সম্পূর্ণ।

৩। তুলঃ স্তুতিস্তু নাম্না রূপেণ কর্মণা বান্ধবেন চ।
স্বর্গায়ুর্ধনপুত্রাদ্যৈরর্থৈরাশীস্তু কথ্যতে॥
স্তুত্যাশিষৌ তু যাস্বৃক্ষু দৃশ্যেতেঽল্পাস্তু তা ইহ।
তাভ্যশ্চাল্পতরাস্তাঃ স্যুঃ স্বর্গো যাভিস্তু যাচ্যতে॥ —বৃহদ্দেবতা

৪। তুলঃ স্তুবন্তং বেদ সর্বোঽয়মর্থয়ত্যেষ মামিতি।
স্তৌতীত্যর্থং ব্রুবন্তং চ সার্থং মামেষ পশ্যতি॥
স্তুবদ্ভির্বা ব্রুবদ্ভির্বা ঋষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
ভবত্যুভয়মেবোক্তমুভয়ং হ্যর্থতঃ সমম্॥—বৃহদ্দেবতা

৫। 'ব্রাহ্মণ' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে তুলঃ "The title ব্রাহ্মণ may be explained in several ways, either as works written by the *Brahmins* for the sacrificial ceremonies of the *Brahmanas*, or as works relating to the ব্রহ্মন্ priest or as works dealing with ব্রহ্মন্ i.e., prayer or sacrifice in general."—Ghate: *Lectures on Rigveda* (Second Ed., Poona, 1926), p. 34.

দ্রষ্টব্যঃ Muir: *Original Sanskrit Texts, i.*, pp. 240-65 and his article "On the relation of the priests to the other classes of Indian society in the Vedic age", *JRAS*, 1864. Also Haug's Introduction to his ed. of the *Aiareya Brahmana*: Vol. I, p. 4.

৬। তুলঃ 'বিধায়কং বাক্যং ব্রাহ্মণম্'; 'কর্মচোদনা ব্রাহ্মণানি' —যজ্ঞপরিভাষাসূত্র

৭। তুলঃ 'ব্রাহ্মণশেষোঽর্থবাদঃ'—ঐ

তুলঃ "To justify or laud these commandments or to show their potential efficacy the *Brahmanas* generally indulge in giving explanations which, strictly speaking, being not directly concerned with ritual, are irrelevant and unnecessary from the view point of their authors. They are technically known as *arthavada* and only form a supplement to the original portion of the Brahmana-texts (*brahmanasesah*)." — V. C. Bhattacharyya : *Rigveda mantras—their original purpose and later applications* (Thesis approved for the D. Phil. degree of the Cal. University).

৮। 'ব্রাহ্মণং বিধায়কং স্তাবকং চ'—ষড্গুরুশিষ্য

ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির আলোচ্য বিষয়ের পরিচয় দান প্রসঙ্গে শবরস্বামী বৃত্তিকারের বচন

ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে আলোচিত বিষয়াবলী নিম্নানুরূপভাবে পুরাণে বিবৃত হইয়াছে—

হেতুর্হির্তৈঃ স্মৃতো ধাতোর্যন্নিহন্ত্যাদিতস্পর্রৈঃ।
অথবার্থপরিপ্রাপ্তের্হিনোতের্গতিকর্মণঃ॥
তথা নির্বচনং ব্রুয়াদ্বাক্যার্থস্যাবধারণম্।
নিন্দান্তামাহুরাচার্যা যদ্দোষান্নিন্দ্যতে বচঃ॥
প্রপূর্বাচ্ছংসতের্ধাতোঃ প্রশংসা গুণবত্তয়া।
ইদন্বিদমিদন্নেদমিত্যানিশ্চিত্য সংশয়ঃ॥
ইদমেব বিধাতব্যমিত্যয়ং বিধিরুচ্যতে।
অন্যস্যান্যস্য চোক্তত্বাদ্ বুধৈঃ পরকৃতিঃ স্মৃতা॥
যো হ্যত্যন্ততরোক্তশ্চ পুরাকল্পঃ স উচ্যতে।
পুরা বিক্রান্তবাচিত্বাৎ পুরাকল্পস্য কল্পনা॥
মন্ত্রব্রাহ্মণকল্পৈস্তু নিগমৈঃ শুদ্ধবিস্তরৈঃ
অনিশ্চিত্য কৃতামাহুর্ব্যবধারণকল্পনাম্॥
যথা হীদন্তথা তদ্বৈ ইদং বাপি তথৈব তৎ।
ইত্যেষ হ্যুপদেশোঽয়ং দশমো ব্রাহ্মণস্য তু॥
—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ৬৪. ১০৮—১১৪;*

বেদমন্ত্র অপৌরুষেয় অর্থাৎ মানুষের বাগ্‌বুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা উহা রচিত নহে। অনাদিনিধনা নিত্যা বাক্ পরম ব্যোমে ব্রহ্মেই অবস্থান করিতেছিলেন।[৯] সাক্ষাৎ-কৃতধর্মা ঋষিই কেবল তাহা দর্শন করিলেন।[১০] অনন্ত আকৃতি লইয়া ঋষি জানিতে

....

উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—মন্ত্রাশ্চ ব্রাহ্মণং চ বেদঃ। তত্র মন্ত্রলক্ষণ উক্তে পরিশেষলক্ষণত্বাদ্ ব্রাহ্মণমবচনীয়ম্ বৃত্তিকারস্তু শিষ্যহিতার্থং প্রপঞ্চিতবান্—

হেতুর্নির্বচনং নিন্দা প্রশংসা সংশয়ো বিধিঃ।
পরক্রিয়া পুরাকল্পো ব্যবধারণকল্পনা॥
উপমানং দশৈতে তু বিধয়ো ব্রাহ্মণস্য তু।
এতদ্ বৈ সর্ববেদেষু নিয়তং বিধিলক্ষণম্॥—জৈমিনিসূত্র, ২.১.৩৩; শবরের মতে কিন্তু এ লক্ষণও অব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট—এতদপি প্রায়িকম্।—ঐ

দ্রষ্টব্য: "Though their professed object is to teach the sacrifice, they allowed a much larger space to dogmatical, exegetical, mystical and philosophical speculations than to the ceremonial itself."—Ghate : *Lectures on Rigveda* (Second Ed., Poona, 1926), p. 34

"Though the *Brahmanas* represent, no doubt, a most interesting phase in the history of Indian thought, still, judged as literary productions, they are most disappointing. The general impression they produce is one of pedantry and, if I may say so, sometimes of downright absurdity. There is no lack of striking thoughts, of bold expression, of sound reasoning and curious traditions in these collections, but these are only like precious gems set in a base metal. The general character of these works is marked by shallow and insipid grandiloquence, by priestly conceit, and antiquarian pedantry. The decline and degeneration of the simple and pure spirit of the Rigveda is seen everywhere, accompanied by a complete misunderstanding of the old Vedic literature, resulting from the idea that everything else is subsidiary to sacrifice."—*Ibid.*, pp. 36-7

* বায়ুপুরাণ, ৫৯. ১৩৩-১৪০

৯। ঋ. স., ১. ১৬৪. ৪১   ১০। ঐ, ১. ১৬৪. ১৬

জৈমিনীয়-ন্যায়মালা-বিস্তর (১. ১. ২৫, ২৬) বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদনে বলিয়াছে—

চাহিয়াছেন সেই বাক্-এর স্থান,[১১] তাহার জন্য উদগ্র তপশ্চরণ করিয়াছেন এবং শেষে জানিয়াছেন ব্রহ্মাই সেই বাক্-এর পরম স্থান।[১২] সেই বাক্-কে দর্শন করিলেন বলিয়াই তিনি 'ঋষি'[১৩], ঋষিমুখে উক্ত হইল বলিয়াই মন্ত্র 'আর্ষেয়'।

বেদের অপৌরুষেয়ত্ব

উপনিষদ বলিয়াছে বেদমন্ত্র ব্রহ্মের নিঃশ্বসিত[১৪], স্মৃতি বলিয়াছে ব্রহ্মা বেদকর্তা নহেন, বেদস্মর্তা মাত্র। ব্রহ্ম ও বাক্-এর সমান ব্যাপকতা অর্থাৎ যতখানি ব্রহ্ম ততখানি বাক্।[১৫] ইহাদের মধ্যে প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকভাব সম্বন্ধ।[১৬] ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য, বাক্ প্রতিপাদক।

যাস্ক বলিয়াছেন, ঋষিরা হইলেন সাক্ষাৎকৃতধর্মা। তাঁহারা অর্বাক্তন অসাক্ষাৎ-কৃতধর্মাগণকে উপদেশ দ্বারা তাঁহাদের দৃষ্ট মন্ত্রসমূহ দান করিয়াছিলেন। আরও পরবর্তীকালে যাঁহারা, তাঁহাদের মেধা ও স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসার ফলে তাঁহারা বেদ-বেদাঙ্গ রচনা করেন।[১৭] ইহাতে বেদমন্ত্রকালের তিনটি

বেদ ঃ শ্রুতি

সুনির্দিষ্ট স্তরের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যাঁহারা সাক্ষাৎ-কৃতধর্মা, তাঁহারা হইলেন 'ঋষি'। ইঁহাদের ঋষিত্ব সাক্ষাৎ—দর্শনের দ্বারা। ঋষিদের উপদেশে যাঁহারা বেদমন্ত্র প্রাপ্ত হইলেন তাঁহারা হইলেন 'শ্রুতর্ষি'। ইঁহাদের ঋষিত্ব সাক্ষাৎ নহে—শ্রবণ দ্বারা। ইঁহাদের পরবর্তী তৃতীয় স্তরে বেদ-বেদাঙ্গের রচনাকাল। ঋষিকাল হইতে শ্রুতর্ষিকালের এবং শ্রুতর্ষিকাল হইতে বেদ-বেদাঙ্গের রচনাকালের ব্যবধান কত, মানবী শক্তি তাহার নির্ণয়ে একান্ত অক্ষম। এই শ্রুতর্ষিকালেই বেদের নাম হইয়াছিল 'শ্রুতি'। কারণ ঐ কালে শ্রবণ দ্বারা বেদমন্ত্র মানব-মনে বিধৃত ছিল।

ঋষিদৃষ্ট মন্ত্রসমূহ বহুদিন পর্যন্ত অবিভক্ত ছিল। তাহাদের বিভাজনের কোনও প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। ধীরে ধীরে সমাজে যজ্ঞ যখন প্রধান স্থান লাভ করিল, তখনই মন্ত্রসমূহ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িল। যজ্ঞে প্রথম

সংহিতা ঃ ত্রয়ী

দিকে চারিজন ঋত্বিকের প্রয়োজন হইত—হোতা, অধ্বর্যু, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা। হোতা মন্ত্রপাঠ করিয়া দেবতার আবাহন করিতেন, অধ্বর্যু আহূত দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্রপাঠ করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিতেন। উদ্গাতা দেবতার প্রীতির জন্য মন্ত্রে সুরসংযোগ করিয়া গান করিতেন, আর এই তিনজনের কোথাও কোনও ভ্রমপ্রমাদ হইতেছে কি না, ব্রহ্মা তাহাই লক্ষ্য করিতেন।[১৮] এই চারিজন ঋত্বিকের প্রথম তিন-

---

পৌরুষেয়ং ন বা বেদবাক্যং স্যাৎ পৌরুষেয়তা।
কাঠকাদিসমাখ্যানাদ্বাক্যত্বাচ্চান্যবাক্যবদ্ ॥
সমাখ্যাধ্যাপকত্বেন বাক্যত্বং তু পরাহতম্ !
তৎকর্ত্রনুপলম্ভেন স্যাত্ততোঽপৌরুষেয়তা ॥

দ্রষ্টব্য ঃ শতপথ ব্রাহ্মণ, ১০. ৪. ২. ২১-২৩

১১। ঐ, ১. ১৬৪. ৩৪ ১২। ঐ, ১. ১৬৪. ৩৫

১৩। তুল ঃ 'ঋষির্দর্শনাৎ, তদ্যদেনাংস্তপস্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভূ অভ্যানর্ষত্তদৃষীণামৃষিত্বম্' —নিরুক্ত

১৪। বৃ. উ. ২. ৪. ১০

১৫। 'যাবদ্ ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং তাবতী বাক্'—ঋ. স., ১০. ১১৪. ৮

১৬। 'বাগক্ষরয়োঃ প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকভাবঃ সম্বন্ধঃ'—সায়ণ

১৭। তুল ঃ 'সাক্ষাৎকৃতধর্মাণ ঋষয়ো বভূবুঃ। তে অবরেভ্যোঽসাক্ষাৎকৃতধর্মভ্য উপদেশেন মন্ত্রান্ সম্প্রাদুঃ। উপদেশায় গ্লায়ন্তোঽবরে বিল্মগ্রহণায় ইমং গ্রন্থং সমাম্নাসিষুর্বেদং চ বেদাঙ্গানি চ'—নিরুক্ত, ১. ২০. ২

তুল ঃ 'পুরুষবিদ্যাঽনিত্যত্বাৎ কর্মসম্পত্তির্মন্ত্রো বেদে'—নিরুক্ত

১৮। একটি ঋক্মন্ত্রে ইহা বলা হইয়াছে ঃ

ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্ গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্বরীষু।
ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীতে উ ত্বঃ ॥

জনের পাঠ্যমন্ত্রগুলি মন্ত্ররাশির মধ্য হইতে পৃথক করিয়া তিনভাগে সংগৃহীত হইল। এক-একটি সংগ্রহের (compilation) নাম হইল 'সংহিতা'। হোতার পাঠ্যমন্ত্রগুলি যাহাতে সংগৃহীত হইল তাহার নাম হইল ঋক্-সংহিতা (হৌত্রবেদ), অধ্বর্যু—পাঠ্য-মন্ত্রগুলি যাহাতে সংগৃহীত হইল তাহার নাম যজুঃসংহিতা[১৯] (আধ্বর্যববেদ), উদ্গাতার পাঠ্যমন্ত্রগুলি যাহাতে সংগৃহীত হইল তাহার নাম হইল সামসংহিতা (ঔদ্গাত্র বেদ)। বেদমন্ত্ররাশি সংহিতাত্রয়ে বিভক্ত হওয়ার পূর্বে বেদ অখণ্ড ছিল।[২০] সংহিতাত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছে বলিয়াই 'বেদ' তিনটি হয় নাই—এক বেদের তিন সংহিতা হইয়াছে মাত্র। মূল-কাণ্ড-পত্র-পুষ্প-ফলরূপে একই বৃক্ষের বহুত্ব, আবার সমগ্রভাবে বৃক্ষরূপে একত্বেরই ভাবনা করা হইয়া থাকে।

পূর্বোল্লিখিত ঋক্, সাম ও যজুঃ—এই সংহিতাত্রয়ই বেদের মন্ত্রভাগ।[২১] জৈমিনি পূর্বমীমাংসাসূত্রে (১.১) ঋক্, সাম ও যজুর্মন্ত্রসমূহের লক্ষণনির্দেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে নিয়তাক্ষর, পাদবন্ধ ও গায়ত্র্যাদিছন্দোবন্ধ মন্ত্র ঋক্, গীতিযুক্ত ঋক্ 'সাম' এবং ঋক্সামলক্ষণ-ব্যতিরিক্ত মন্ত্রভাগ হইল যজুঃ।[২২] ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৩. ৬. ৪) বলিয়াছেন ঋষিদৃষ্ট সেই অনাদিনিধনা নিত্যা বাক্-এর ইহারা সবই বিকারমাত্র—মিতত্ব, স্বরত্ব ও অমিতত্ব রূপ চিহ্ন দ্বারা সেই বাক্কেই ঋক্, সাম ও যজুঃরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে। উপরিলিখিত ত্রিবিধ লক্ষণ হইতেই বাক্-এর ঋগাদি ত্রিবিধ ভেদ এবং ত্রিবিধ ভেদ হইতেই ঋগাদি সংহিতাত্রয়। মৃণ্ময়িকার ঘটশরাবাদিকে বিবিধ নামে অভিহিত করা হইলেও তাহাদের বস্তুভেদ সিদ্ধ হয় না। সংহিতাত্রয়ে বিভক্ত হইলেও বেদের একত্বের হানি হয় নাই। ঋক্সংহিতার অনেক মন্ত্র যজুঃসংহিতার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং সেই কারণে তাহারা যজুর্মন্ত্র হইয়া যায় নাই। আবার 'দেবো বঃ সবিতোৎপুনাতু। অচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ। বসোঃ সূর্যস্য রশ্মিভিঃ'—এই ঋক্ মন্ত্রটি ঋক্সংহিতায় নাই, কিন্তু যজুঃসংহিতায় আছে (তৈ. সং., ১.১.৫.১)। ঋক্সংহিতায় নাই বলিয়া ইহা ঋক্ নহে, এবং যজুঃসংহিতায় আছে

মন্ত্রলক্ষণ

তুলঃ 'ঋগ্বেদেন হোতা করোতি, যজুর্বেদেন অধ্বর্যুঃ, সামবেদেন উদ্গাতা, সর্বৈর্ব্রহ্মা'—যজ্ঞপরিভাষাসূত্র।

যজ্ঞানুষ্ঠানপদ্ধতি যতই জটিল হইতে লাগিল ঋত্বিকের সংখ্যা ততই অধিক করা হইয়াছিল। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে (২. ১. ২) সাতজন ঋত্বিকেরও নাম পাওয়া যায়—

তবাগ্নে হোত্রং তব পোত্রমৃত্বিয়ং তব নেষ্ট্রং ত্বমগ্নিদৃতায়তঃ।
তব প্রশাস্ত্রং ত্বমধ্বরীয়সী ব্রহ্মা চাসি গৃহপতিশ্চ নো দমে॥

আরও পরবর্তীকালে মুখ্য চারিজন ঋত্বিকের কর্মে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য প্রত্যেকের তিনজন করিয়া সহকারী ঋত্বিকের প্রয়োজন অনুভূত হয়—

হোতা—	(সহকারী)	মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক, গ্রাবস্তুৎ
অধ্বর্যু—	,,	প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা, উন্নেতা
উদ্গাতা—	,,	প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা, সুব্রহ্মণ্য
ব্রহ্মা—	,,	ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, আগ্নীধ্র, পোতা

দ্রষ্টব্য ঃ আশ্বলায়ন শ্রৌ, সূ., ৪. ১

১৯। যচ্ছিষ্টং তু যজুর্বেদে তেন যজ্ঞমথাযুজং
যুজ্ঞানঃ স যজুর্বেদ ইতি শাস্ত্রবিনিশ্চয়ঃ॥—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ৬৫. ২২

২০। বস্তুতঃ ঋগ্বেদে (৮. ১৯. ৫) 'বেদ' শব্দ একবচনেও প্রযুক্ত হইয়াছে।

২১। তৈ. ব্রা., ১. ২. ১. ২৬

২২। 'তেষামৃক্ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা, গীতিষু সামাখ্যা, শেষে যজুঃশব্দ'—জৈমিনি, পূর্বমীমাংসা, ২.১.৩২-৩৪

ঋক্ পাদবন্ধো গীতন্তু সাম গদ্যং যজুর্মন্ত্রঃ।
চতুর্ষ্বপি হি বেদেষু ত্রিধেব বিনিযুজ্যতে॥ —ষড়্গুরুশিষ্য, সর্বানুক্রমণী বৃত্তিভূমিকা

বলিয়া ইহা যজুর্মন্ত্র—ইহা বলিবার উপায় নাই। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ 'সাবিত্রিয়র্চা' পদের দ্বারা ইহাকে ঋক্ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন।[২৩]

মীমাংসাশাস্ত্রে বা অন্য কোথাও অথর্ববেদের পৃথক্ লক্ষণ নির্দিষ্ট হয় নাই। ঋগাদিমন্ত্রের লক্ষণ হইতেই বলা চলে যে যাহা গীতিযুক্ত নহে এবং যাহাতে ঋক্ ও যজুঃ এই দ্বিবিধ মন্ত্রই দৃষ্ট হয় সেই সংহিতাই অথর্বসংহিতা।

অথর্ববেদ

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যদি অথর্বসংহিতা চতুর্থ সংহিতা হয়, তবে বেদকে 'ত্রয়ী' বলা হয় কেন? বেদকে যে 'ত্রয়ী' বলা হয় তাহা সংহিতার সংখ্যানুসারে নহে। মিতত্ব, অমিতত্ব ও স্বরস্বরূপ যে ত্রিবিধ লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া মন্ত্ররাশিকে ঋগাদি ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, বেদমন্ত্রের সেই ত্রিবিধ লক্ষণানুসারেই বেদকে 'ত্রয়ী' বলা হইয়া থাকে। সংহিতা হিসাবে অথর্ববেদ পৃথক্ হইলেও, উহাতে ঋক্, যজুঃ ও সাম ত্রিবিধ মন্ত্রই স্থান পাইল। সেদিক দিয়া এই সংহিতাত্রয়ীর বহির্ভূত নয়।[২৪] কিন্তু মন্ত্রের প্রকৃতি অনুসারে যখন তিন বেদের নাম স্থির হইয়া গেল তখন চতুর্থ বেদের পরিচয় হইল অন্যরূপ—অথর্বা ঋষির সম্পর্কবোধক অথর্ব-বেদ। তাহাদের বিশেষ কোনও লক্ষণ নাই। 'ত্রয়ী' শব্দের অর্থ 'ত্রিবিধলক্ষণান্বিত মন্ত্রসমষ্টি'।[২৫]

মন্ত্র বা সংহিতাভাগের পরিচয় দেওয়া হইল। এই চারিটি সংহিতার প্রত্যেকটির ব্রাহ্মণভাগ আছে। 'বেদ' বলিলে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই বুঝিতে হইবে। কিন্তু 'বৈদিক সাহিত্য' শব্দের ব্যাপকতা আরও বেশী। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের পরে 'উপনিষদ' ও 'আরণ্যক' নামে আরও দুইটি সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। বেদের কর্মকাণ্ডের প্রভাব সমাজে কালক্রমে শিথিল হইয়া পড়িলে উপনিষদ হিন্দুদের নিকট বেদের

বৈদিক সাহিত্য

স্থান অধিকার করে। আরও পরবর্তীকালে এই উপনিষদকেই ভিত্তি করিয়া ভারতভূমিতে হিন্দু মনীষার চরমোৎকর্ষ ষড়্দর্শনরূপে আত্মপ্রকাশ

২৩। তৈ. ব্রা., ৩. ৩. ৪. ৬; ৩. ২. ৫. ২

২৪। 'অথর্ববেদো হি ত্র্যাত্মক এব। অত্র হি ঋচো যজূংষি সামানীতি ত্রীণ্যপি সন্তি'—ন্যায়মঞ্জরী (চৌখম্বা ২৩৫ পৃঃ)।

২৫। তিনটি সংহিতার মধ্যে ঋক্‌সংহিতাই প্রাচীনতম বলিয়া স্বীকৃতি পাইয়াছে। দ্রষ্টব্য: "The Rig Veda is original and historical, the other two Saman and Yajus, are merely liturgical compilation."—Griffith : *Hymns of the Atharva Veda*, Preface, p. 2

"For Indian history, religion, philosophy and civilisation, the Rig Veda is a book of origins. As prophetic of the lines of future development, it may also be called a collection of 'first fruits'."—Griswold : *Religion of the Rig Veda*, p. 57

অথর্ববেদ অপর বেদসমূহের ন্যায় সাধারণ্যে সমান স্বীকৃতি পায় নাই, এইজন্য অনেকে মনে করেন অথর্ববেদ বেশ কিছু পরবর্তীকালে সংকলিত হইয়াছিল—"At a more recent period a fourth Veda was added to them, but it never obtained that degree of sanctity which was allowed to its predecessors."—Goldstucker : *Inspired Writings of Hinduism*, p. 1

মনুও অথর্ববেদের মর্যাদা দেন নাই।। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক হাজরা মন্তব্য করিয়াছেন:

"On the other hand, Manu makes statements which indicate that in his eyes the *Atharva-veda* was never as much a source of Dharma as the other Vedas and that he scarcely looked upon this work as anything more than a book of magic rites. This attitude of Manu towards the *Atharva-veda* raises serious doubt about the sacred and authoritative character of this work, which has been declared by scholars to be later in form, though not always in contents, than the *Rig-veda*. As a matter of fact, there are evidences in the Vedic as well as in the post-Vedic works which indicate that formerly

করিয়াছে। উপনিষদের সমসাময়িক হইল 'আরণ্যক' সাহিত্য। আরও কিছু পরে শ্রৌত যাগযজ্ঞের নিয়মকানুনকে উপজীব্য করিয়া 'কল্পসূত্র' নামে এক শ্রেণীর সাহিত্যের জন্ম হয়। বৈদিক ও বৈদিকোত্তর সাহিত্যের মধ্যে এই সূত্রগুলিই যোগসূত্র। ইহারাও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের ন্যায় যাগযজ্ঞের নিয়মকানুন লইয়াই রচিত। তবে ব্রাহ্মণ ও কল্পসূত্রগুলির মধ্যে পার্থক্য এই যে ব্রাহ্মণগুলি যজ্ঞের কথা বলিতে যাইয়া অনেক অবান্তর কথাও বলিয়াছে। সূত্রগুলি একটিও অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিক কথা তো বলেই নাই, বরং যাহা প্রয়োজন তাহা এত সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিয়াছে, যাহাতে তাহার বক্তব্যও পরিষ্কার হয় নাই। অতিরিক্ত বিশদীকরণ যেমন ব্রাহ্মণ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, অতিরিক্ত মাত্রায় সংক্ষেপীকরণ তেমনি সূত্র সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। অবশ্য, যজ্ঞানুষ্ঠান যখন সমাজে দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করিতেছিল তখন এই সূত্রগুলি বুঝিবার অসুবিধা হয় নাই, কিন্তু পরবর্তীকালে ক্রমশঃই তাহারা দুর্বোধ এবং স্থানে স্থানে অবোধও হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা দুই ভাগে বিভক্ত—শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্র। প্রথমটিতে বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদির এবং দ্বিতীয়টিতে গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবনে অনুষ্ঠেয় সংস্কার-গুলির বিশদ আলোচনা আছে।[২৬] ইহার পর 'বেদাঙ্গ'। ইহারা সংখ্যায় ছয়টি—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ। ইহারা বেদের ছয়টি অংশ, বেদজ্ঞানের পক্ষে ইহারা অপরিহার্য।[২৭] সংহিতার মন্ত্রগুলি যাহাতে অবিকৃত অবস্থায় রক্ষিত হয় তাহার উদ্দেশ্যে একই মন্ত্রের পদগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পাঠ করিয়া 'পদপাঠ' এবং একটি পদকে আর একটি পদের সহিত সুনির্দিষ্ট নিয়মে সংযুক্ত করিয়া আরও

---

the *Atharva-veda* was not looked upon as sacred by the staunch followers of the other three Vedas and that this work had to struggle hard for attaining even a state of partial recognition as the fourth *Veda* in a somewhat limited circle."—Sources of Dharma, *Our Heritage*: Vol. II, Part II, pp. 249-50.

২৬। দ্রষ্টব্য: "The Kalpasutras are important in the history of Vedic literature, because they not only mark a new period of literature and a new purpose in the literary and religious life of India, but they contributed to the gradual extinction of the numerous Brahmanas which to us are, therefore, only known by name. The introduction of a Kalpasutra was the introduction of a new book on liturgy.... In a short time the authors of new Kalpasutras become themselves the founders of new *caranas*, in which the Sutras were considered the most essential portion of the sacred literature, so that the hymns and Brahmanas were either neglected or kept up under the name of the hymns........"—Maxmuller: *Ancient History of Sanskrit Literature*, pp. 186*ff*.

কল্পসূত্রগুলির বিষয়বস্তু এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি অপেক্ষা অধিক প্রচলনের কারণ সম্বন্ধে সায়ণাচার্য বলেন:

'তত্র তাবদ্বিধ্যর্থবাদমন্ত্রাত্মনা ত্রিধা ব্যবস্থিতো বেদরাশিঃ। বিধিবিহিতমর্থবাদ-প্ররোচিতং মন্ত্রেণ স্মৃতম্ অভ্যুদয়কারি ভবতীতি। ততশ্চ চোদিতানাং কর্মণাং সুখাববোধায় ভগবান্ বৌধায়নঃ কল্পম্ কল্পয়ৎ। যতো ব্রাহ্মণানামানন্তং দুরববোধতয়া......অতো ন তৈঃ সুখং কর্মাববোধ ইতি কল্পসূত্রাণীমানি প্রতিনিয়তশাখান্তরান্ অঙ্গীচক্রুঃ পূর্বাচার্যাঃ। কল্পস্য বৈশদ্য-লাঘব-কাৎস্ন্য-প্রকরণ-শুদ্ধ্যাদিভিঃ প্রকর্ষৈর্যুক্তস্য।'—বৌধায়নসূত্রটীকা।

২৭। বেদকে পুরুষাকার কল্পনা করিয়া এই ছয়টি শাস্ত্রকে বেদপুরুষের বিভিন্ন অঙ্গ-রূপে কল্পনা করা হইয়াছে:

ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুঃ নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে॥
শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখ্যং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

আটটি বিকৃতিপাঠের জন্ম হয়। ইহাদের নাম জটাপাঠ, মালাপাঠ, শিখাপাঠ, রেখাপাঠ, ধ্বজপাঠ, দণ্ডপাঠ, রথপাঠ ও ঘনপাঠ। প্রতিটি সংহিতার একখানি করিয়া 'অনুক্রমণী' গ্রন্থ আছে। ঐগুলিতে সেই সেই সংহিতার মন্ত্রগুলির দেবতা, ছন্দ, ঋষি এবং যজ্ঞে বিনিয়োগ লিপিবদ্ধ আছে। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, আরণ্যক, কল্পসূত্র, বেদাঙ্গ, পদপাঠ, অষ্টবিকৃতিপাঠ ও অনুক্রমণী—এতগুলি সাহিত্য লইয়া সুবিশাল বৈদিক সাহিত্যের পটভূমিকা।

ঋক্‌মন্ত্রসমূহ কবে প্রথম দৃষ্ট (রচিত?) হয় এবং তাহার কতদিন পরে প্রথম লিপিবদ্ধ হয় তাহা বলা অসম্ভব। পূর্বে বৈদিক সাহিত্যের যে স্তরবিন্যাস করা হইল তাহাদের একটি স্তর হইতে আর একটি স্তরের মধ্যে কালিক ব্যবধান কত তাহাও নির্ণয় করা কঠিন। Maxmuller বলিয়াছেন, খৃঃ পূঃ ১০০০ শতকের পূর্বেই ঋগ্বেদ রচনা সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আবার Tilak-এর মতে খৃঃ পূঃ ৬০০০ শতক ঋগ্বেদের আবির্ভাবকাল। Jacobi-র মতে খৃঃ পূঃ ৪৫০৪ শতক। Maxmuller বলিয়াছেন, পৃথিবীতে এমন কোনও শক্তি নাই যাহা ঋগ্বেদের কাল সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে পারে।[২৮] Winternitz শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, খৃঃ পূঃ ২০০০ বা ২৫০০ বৎসর পূর্বে বেদ প্রথম রচিত হয় এবং খৃঃ পূঃ ৭৫০-৫০০ বৎসরে বৈদিক সাহিত্যের শেষ স্তর সম্পূর্ণ হইয়া যায়।[২৯]

বেদের কাল

২৮। "Whether the Vedic hymns were composed 1000 or 1500 or 2000 or 3000 years B. C., no power on earth will ever determine." —*Gifford Lectures on Physical Religion*, 1889.

২৯। "We cannot, however, explain the development of the whole of this great literature, if we assume as late a date as round about 1200 or 1500 B. C. as its starting point. We shall probably have to date the beginning of this development about 2000 or 2500 B. C. and the end of it between 750 and 500 B. C."—*History of Indian Literature*: Vol. I, 1927, p. 310.

"Not a single work of the Vedic period can be accurately dated. The facts that the earliest Brahmanas are pre-Buddhistic and their language shows a later stage, have led to the generally held conclusion that 1000 B. C. is a minimum date for the close of the Rigveda-period. On the other hand, there is nothing to tell us when the task of collecting the hymns, not to speak of composing them, into a Samhita started. That such a collection continued for years and years together is an established fact. The very fact that one full hymn and three verses of three other hymns remain undivided by Sakalya in his *padapatha* shows that the formation of the body of the *Rk-Samhita* was continuing even after he ceased to live. From a study of the metres and some sporadical instances of misrepresentation based on the *Rk-pratisakhya*, it has been proved by scholars that throughout this period of formation, the text-tradition of the Rigveda was undergoing a process of steady stabilization which, when complete at a comparatively late date, was put to writing only at a much later period at the hands of the final redactors. We must, therefore, rest content with the moderate estimate that the *Rk-Samhita*, in the form we get it, completes its course of collection and compilation before the other Samhitas come into existence and the tenth *mandala*, being proved with the help of linguistic evidence as being of definitely later origin, falls only towards the end of this course. The attempts of Tilaka and Jacobi in ascribing to the hymns of the *Rk-Samhita* a much more antiquity than what is accepted, only show that any determination of their relative chronology is bound to rest on mere hypothetical considerations that vary not only by decades and centuries but by millen-

বৈদিক মন্ত্ররাশি কতদিন ধরিয়া মানব-শ্রুতিতে বিধৃত ছিল এবং বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে মুখে মুখেই মন্ত্ররাশির কিছু কিছু আঙ্গিক ও বিন্যাসক্রমের পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু উত্তরকালে দেখা গেল, এক শিষ্যধারায় বিধৃত মন্ত্ররাশি হইতে অপর শিষ্যধারায় বিধৃত মন্ত্ররাশি কিছু পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। এই পার্থক্য ভাষাগতও বটে, আবার বিন্যাসক্রমগতও বটে। এই পার্থক্যের জন্যই একই বেদের বিভিন্ন শাখার সৃষ্টি হইল। ঋগ্বেদেরও দুইটি শাখা হইয়া পড়ে—শাকল ও বাষ্কল। এখন ঋগ্বেদ বলিতে শাকল শাখাকেই বুঝিয়া থাকি; বাষ্কল শাখা পাওয়া যায় না। শাকল শাখায় ১০১৭টি সূক্ত আছে। ইহা ছাড়া ৩৬টি খিলসূক্ত এবং অষ্টম মণ্ডলের মাঝামাঝি ১১টি বালখিল্য-সূক্তও স্থান পাইয়াছে। খিলসূক্তগুলি বাষ্কল শাখার অন্তর্গত এবং বালখিল্য-সূক্তগুলি হয়ত 'বালখিল্য' নামক ঋগ্বেদেরই কোনও তৃতীয় শাখার অন্তর্গত ছিল। একটি শাখা হইতে আর একটি শাখার মন্ত্ররাশির পার্থক্য শুধু ভাষা ও বিন্যাসক্রমগতই নহে, ব্যাখ্যাগতও বটে। বস্তুতঃ একই মন্ত্র বিভিন্ন শাখায় বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং সেই সুদূর অতীতেও বিভিন্ন ব্যাখ্যাতৃসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল।[৩০]

শাখা

সমগ্র ঋগ্বেদকে ১০টি মণ্ডলে ভাগ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় হইতে সপ্তম পর্যন্ত ছয়টি মণ্ডলকে 'গোষ্ঠী-মণ্ডল' বলা হয়। কারণ ইহাদের প্রত্যেকটির অন্তর্গত মন্ত্রগুলি এক এক বিশেষ ঋষি-পরিবারেই রচিত হইয়াছিল। এই ছয়টি মণ্ডলের মন্ত্রগুলি যথাক্রমে—গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ ও বশিষ্ঠ —এই ছয়জন ঋষি বা তাঁহাদের বংশধরগণ কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। অষ্টম মণ্ডলকে 'প্রগাথ-মণ্ডল' বলা হয়। কারণ ইহার মন্ত্রগুলি 'প্রগাথ' নামক এক বিশেষ মিশ্র ছন্দে রচিত। এক সময়ে, অনেকে অনুমান করেন, অষ্টম মণ্ডলেই ঋগ্বেদ সম্পূর্ণ হইয়াছিল এবং সেই সময়েই বালখিল্য-সূক্তগুলিকে ঐ শেষ মণ্ডলের সহিতই জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। নবম মণ্ডলের মন্ত্রগুলি পবমান-সোমের উদ্দেশে রচিত। অন্যান্য মণ্ডলগুলিতে পবমান-সোমের উদ্দেশে রচিত যে সকল মন্ত্র ছিল সেইগুলিকে এক সময়ে পৃথক্ করিয়া বাছিয়া লইয়া এই মণ্ডলটির সৃষ্টি হয়। যাগের মধ্যে সোমযাগ হইল প্রধান, এবং নবম মণ্ডলের মন্ত্রগুলি সোমযাগেই প্রযুক্ত হইল। সমগ্র বেদে মন্ত্রগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিলে ঋত্বিকের অসুবিধা হইত। সেই অসুবিধা নিরাকরণের জন্য হয়ত তাঁহারা মন্ত্রগুলিকে বাছিয়া একটি মণ্ডলে পৃথক্-ভাবে সংকলিত করিয়াছিলেন। মণ্ডল হিসাবে নবম মণ্ডল অন্যান্য মণ্ডল অপেক্ষা পরবর্তীকালের। তাই বলিয়া মন্ত্রগুলি পরবর্তীকালের নহে। দশম মণ্ডলের

অঙ্গসজ্জা

niums."—V. C. Bhattacharyya: *Rigveda mantras—their original purpose and later applications*, Chap. I

৩০। তুলঃ "The differences between these Sakhas, however, did not consist—as has been believed—in their various readings of the Sruti alone, it also consisted in considerable variations of their arrangement of the scriptures, in their additions and omissions of texts—as may be seen from still existing Sakhas of the Yajurveda—and, as is stated by MADHUSUDANA, and results from a commentator of Panini in their different interpretations of Vedic texts."—Goldstucker: *Inspired Writings of Hinduism*, p. 74

বেদমন্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যাতৃসম্প্রদায় সম্বন্ধে দ্রষ্টব্যঃ V. C. Bhattacharyya: Traditional schools of Vedic Interpretation, *Our Heritage*: Vol. II, Part I, বিভিন্ন শাখা হওয়ার কারণ সম্বন্ধে পুরাণের মত দ্রষ্টব্যঃ Muir: *Original Sanskrit Texts*: Vol. III, pp. 231-32

মন্ত্রগুলির ভাষা পূর্ববর্তী মন্ত্রগুলির ভাষা হইতে একটু পৃথক এবং ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন যে সর্বাধিক পরবর্তীকালেই এই মণ্ডলটি সংযোজিত হইয়াছিল।[৩১]

ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলির বিন্যাসক্রমে একটি সুপরিকল্পিত নীতি অনুসৃত হইয়াছে। এই নীতির মূলকথা হইল দেবতা, ছন্দ এবং সূক্তগত মন্ত্রগুলির সংখ্যা। প্রত্যেক গোষ্ঠীমণ্ডলে প্রথমেই অগ্নির এবং তাহার অব্যবহিত পরেই ইন্দ্রের সূক্তগুলি স্থান পাইয়াছে। ইন্দ্র ঋগ্বেদের দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলেও, যজ্ঞের দিক দিয়া ইন্দ্রের অপেক্ষা অগ্নির প্রয়োজনই ছিল বেশী। সেই কারণেই অগ্নির সূক্তগুলি প্রথমে স্থান পাইয়াছে। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তবে একথাও বলা যাইতে পারে যে সংহিতার সঙ্কলনকর্তৃগণ যজ্ঞের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই মন্ত্রগুলিকে বিন্যস্ত করিয়াছিলেন।[৩২] ইন্দ্রসূক্তের পর অন্যান্য দেবতার সূক্তগুলিকে এক একটি পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করিয়া যে শ্রেণীতে সূক্তসংখ্যা যত বেশী সেই শ্রেণীর সূক্তগুলিকে সেই অনুসারে পর পর সাজানো হইয়াছে। যখন কয়েকটি শ্রেণীর সূক্তসংখ্যা একই হইয়াছে তখন তাহাদের মধ্যে যাহার প্রথম সূক্তের মন্ত্রসংখ্যা বেশী সেই শ্রেণীর সূক্তগুলিই আগে স্থান পাইয়াছে। যেখানে কতকগুলি দেবতার উদ্দেশ্যে মাত্র একটি করিয়াই সূক্ত আছে সেখানে মন্ত্রসংখ্যা অনুসারে তাহাদিগকে সাজানো হইয়াছে এবং এইগুলি স্থান পাইয়াছে মণ্ডলের সব শেষে। অষ্টম মণ্ডলের অন্তর্গত সূক্তগুলির বিন্যাসক্রমে স্বতন্ত্র নীতি অবলম্বিত হইতে দেখা যায়। সূক্তগুলিকে প্রথমে রচয়িতা ঋষি অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। পরে প্রত্যেক ঋষির সূক্তগুলিকে আবার দেবতা অনুসারে স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে শ্রেণীর প্রথম সূক্তের মন্ত্রসংখ্যা সর্বাধিক সেই শ্রেণী প্রথমে এবং তাহার পর প্রথম সূক্তের মন্ত্রসংখ্যা অনুসারে অন্যান্য শ্রেণীর মন্ত্রগুলি বিন্যস্ত হইয়াছে। অষ্টম মণ্ডলান্তর্গত সূক্তগুলির বিন্যাসক্রমের এই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররীতি এবং তাহাদের বিশেষ ছন্দ হইতে অনুমান করা চলে যে তাহারা শুধু পরবর্তীকালেই সংযোজিত হয় নাই, তাহাদের বিন্যাসকারীও স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন।

মন্ত্রগুলির বিন্যাসরীতি

ঋগ্বেদের ভাষায় কিছু লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। মন্ত্র রচনায় ঋত্বিকসম্প্রদায়ই প্রধান অংশ গ্রহণ করায় মন্ত্রের ভাষায় কৃত্রিমতা পরিলক্ষিত হয়। বাচনভঙ্গীর এ কৃত্রিমতা সত্ত্বেও বলিষ্ঠ ভাবপ্রকাশ কোথাও ব্যাহত হয় নাই। তাহার

৩১। Oldenberg ও Wackernagel এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

Brunnhofer গোষ্ঠী-মণ্ডলসমূহে ঋষিগণের কালিক পৌর্বাপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন : Kaegi : *Life in Ancient India*, pp. 111-2

১ম—গৌতম-গোষ্ঠী : ৪র্থ মণ্ডল (প্রধান ঋষি বামদেব)
২য়—ভরদ্বাজ-গোষ্ঠী : ৬ষ্ঠ মণ্ডল
৩য়—বশিষ্ঠ-গোষ্ঠী : ৭ম মণ্ডল
৪র্থ—অত্রি-গোষ্ঠী : ৫ম মণ্ডল
৫ম—বিশ্বামিত্র-গোষ্ঠী : ৩য় মণ্ডল
৬ষ্ঠ—ভৃগু-গোষ্ঠী :—২য় মণ্ডল (প্রধান ঋষি গৃৎসমদ)
৭ম—অঙ্গিরা-গোষ্ঠী : ১ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম মণ্ডলের অংশবিশেষ।
৮ম—কণ্ব-গোষ্ঠী : ১ম, ৮ম, ও ৯ম মণ্ডলের অংশবিশেষ।

৩২। Goldstucker ইহা স্বীকার করেন না—"The collection of the Rig-veda hymns, as one may *a priori* conclude from their very character, did not admit of any arrangement answering systematically the order of an elaborate ceremonial; the arrangement of the two other Vedas, on the contrary, is entirely adapted to it, and therefore throughout artificial."—*Inspired writings of Hinduism*, p. 99.

কারণ, ঋগ্বেদের ঋষিরা এক-একটি পাদের মধ্যে এক-একটি সম্পূর্ণ ভাবকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে প্রতিটি শব্দকে ভাবোচ্ছল না করিলে ইহা সম্ভব নহে। নিয়মিত পরিসরের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ ভাবকে গাঁথিয়া ফেলিতে বড় কম দক্ষতার প্রয়োজন হইত না এবং এইরূপ রচনা সকল সময়ে সকলের দ্বারা সম্ভবও হইত না। এই কারণেই বোধ হয় অবরকালীন ঋষিগণ প্রাচীনগণের রচিত মন্ত্রাংশ সুবিধামত অনেক সময়ে হুবহু নিজেদের মন্ত্রে জুড়িয়া দিয়াছেন, কষ্ট করিয়া নূতন রচনার ঝামেলা ভোগ করেন নাই। বস্তুতঃ, ঋগ্বেদের যুগে পাদবন্ধ মন্ত্র রচনা করা একটি বিশেষ পেশার মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। 'শ্লোককৃৎ', 'মন্ত্রকৃৎ', 'কারু' প্রভৃতি শব্দ তাহারই পরিচায়ক। মন্ত্র-রচনা পেশা হিসাবে গৃহীত হওয়ায় এক শ্রেণীর লোক এই বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। কিন্তু কবিতা ও কাব্য এক জিনিস নয়। পাতার পর পাতা সাবলীল কবিতা রচিত হইলেই যে তাহা উপাদেয় কাব্য হইবে এরূপ মনে করা চলে না। কাব্য হইল কবি-হৃদয়ের অনুভূতি ও সংবেদনের ছন্দোময় রূপগ্রহ—ভাষার পাখায় ভর করিয়া ভাবের কল্পলোকে পরিপূর্ণ আত্মাবগাহন। পায়ে সূতা বাঁধিয়া পাখীকে আকাশের গায়ে ছাড়িয়া দিয়া তাহার পাখার ঝাপট দেখা চলিতে পারে, কিন্তু উড্ডয়নের বিলাসবিভব নীল আকাশে মুক্তপক্ষ স্বেচ্ছাবিহারী বিহঙ্গকুলেই সম্ভব। কথাটি বিশদভাবে বলা দরকার।

ভাষা ও ভাব

ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর—(ক) স্তুতি ও (খ) প্রার্থনা। প্রথম শ্রেণীর মন্ত্রে দেবতার নাম, রূপ, ক্রিয়ার উল্লেখ করিয়া তাঁহার স্তব করা হইয়াছে, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্ত্রে দেবতার কাছে স্বর্গ, আয়ুঃ, ধন, পুত্র প্রভৃতির কামনা জানানো হইয়াছে।[৩৩] বস্তুতঃ কিন্তু এই দুই শ্রেণীর মন্ত্রের মধ্যে কোনও ভেদ নাই, কারণ যাঁহার স্তব করা হইয়াছে, শেষ পর্যন্ত তাঁহার নিকট কিছু চাহিবার জন্য তাহা করা হইয়াছে।[৩৪] মন্ত্রদর্শনের মূলে হইল ঋষিদের মনের নানারকম অভিপ্রায়।[৩৫] বিভিন্ন অভিপ্রায় দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই ঋষিরা বিভিন্ন মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন; সুতরাং অভিপ্রায়ের বৈবিধ্য অনুসারেই মন্ত্রেরও বিষয়বস্তু বিবিধ হইয়াছে বা বিবিধবিষয়ক মন্ত্র রচিত হইয়াছে।[৩৬] কোনও রাজা কোনও ঋষিকে প্রচুর ধন দান করিয়াছেন। ঋষি সেই রাজার স্তুতি করিয়াছেন, কখনও বা সেই দানের প্রশংসা করিয়াছেন। প্রথম ক্ষেত্রের মন্ত্রগুলি 'নারাশংসী', দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাহা 'দানস্তুতি'। একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের তাগিদে রচিত হওয়ার ফলে রচনার স্বচ্ছন্দতা বহুলাংশে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং সেই কারণেই কাব্যসৌন্দর্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে আসে নাই। তথাপি যেখানে কোনও প্রাকৃতিক শক্তি মন্ত্রের বর্ণনার বিষয়, সেখানে ঋষিরা যে

৩৩। দ্রষ্টব্য ঃ পাদটীকা, ৩ ৩৪। দ্রষ্টব্য ঃ ঐ, ৪

৩৫। তদিধতাংস্তদভিপ্রায়ান্ ঋষীণাং মন্ত্রদৃষ্টিষু।
বিজ্ঞাপয়তি বিজ্ঞানং কর্মাণি বিবিধানি চ ॥—শৌনক;

তুলঃ 'এবমুচ্চাবচৈরভিপ্রায়ৈঃ ঋষীণাং মন্ত্রদৃষ্টয়ো ভবন্তি'—যাস্ক;
পশ্যন্তি তাংস্তানুদ্দিশ্য কামান্ ইহ মহর্ষয়ঃ।
যে যে সূক্তেষু দৃশ্যন্তে তে চ ভেদস্য হেতবঃ—মাধব;
'যৈর্যৈঃ কামৈঃ ঋষিভির্দেবতাশ্চ তুষ্টুয়ন্তে'— ঋগ্বিধান

৩৬। দ্রষ্টব্য ঃ V. C. Bhattacharyya : Classification of Rigveda mantras according to the Brihaddevata of Saunaka, *Our Heritage* : Vol. II, Part II, p. 337

তুলঃ মন্ত্রাঃ প্রাদুর্ভূর্বুর্হি পূর্বমন্বন্তরেষ্বিহ।
পরিতোষাদ্ ভয়াদ্ দুঃখাৎ সুখাচ্ছোকাচ্চ পঞ্চধা ॥—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ৬৪. ৬১

কাব্যসৌন্দর্যের সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহা পৃথিবীর কাব্যের কুলপঞ্জীতে প্রথম স্থান গ্রহণ করিলেও বিস্ময়ের কিছু নাই।[৩৭] উষা, রাত্রি প্রভৃতির সূক্ত ইহার উদাহরণ। আবার এমন সূক্তও আছে যেখানে ঋষিদের অতি উচ্চ শ্রেণীর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। একেশ্বরবাদের সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ অভিব্যক্তিও এই ঋগ্বেদেই।[৩৮]

ঋষি, ছন্দ, দেবতা

বেদমন্ত্র অপৌরুষেয়, অর্থাৎ মানুষের বাগ্‌বুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা উহা রচিত নহে। বেদকে পরব্রহ্মের নিঃশ্বসিত বলা হইয়াছে। চতুর্মুখও বেদকর্তা নহেন, বেদস্মর্তা মাত্র। অনাদিনিধনা দিব্যা বাক্ স্বয়মভু হইতে উৎসৃষ্টা। সেই বাক্ তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছিল। দুর্নিবার আকৃতি লইয়া একদিন কয়েকজন মানুষ জানিতে চাহিল সেই বাক্-এর স্বরূপ—তাহার স্থান।[৩৯] তপঃ আচরণ করিলেন তাঁহারা, তাঁহাদের বোধে প্রতিভাত হইল বাক্-এর স্বরূপ ও স্থান। তাঁহারা জানিলেন যে ব্রহ্মই সে বাক্-এর পরম স্থান।[৪০] ইহাই মন্ত্রদর্শন—যাঁহারা দর্শন করিলেন তাঁহারাই ঋষি।[৪১] যে তত্ত্ব ঋষির দিব্যদৃষ্টিতে উম্ঘাটিত হইল, মন্ত্রের পর মন্ত্র রচনা করিয়া ঋষি সেই তত্ত্বকে প্রচার করিলেন; সেই মন্ত্রসমষ্টির নাম 'সূক্ত'।[৪২] একটি সূক্তে ঋষি যে বিষয়ের সম্বন্ধে বলিয়াছেন সেই বিষয়টিই সেই সূক্তের 'দেবতা'।[৪৩] যে সূক্তে ইন্দ্রের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, সেই সূক্তের দেবতা ইন্দ্র, যে সূক্তে অশ্বের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তাহার দেবতা অশ্ব। যে সূক্তে ঋষি নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, সেই সূক্তের দেবতা ও ঋষি তিনি নিজেই।[৪৪] মন্ত্রের অক্ষর পরিমাণকে বলা হয় ছন্দ।[৪৫] প্রতি সূক্তের ঋষি, ছন্দ ও দেবতা আছে, এবং বেদমন্ত্র

৩৭। তুলঃ "This hymn (*Rv. VII.* 77), addressed to Dawn, is a fair specimen of the original poetry of the Veda. It has no reference to any special sacrifice, it contains no technical expressions, it can hardly be called a hymn, in our sense of the word. It is simply a poem expressing without any effort, without any display of far-fetched thought or brilliant imagery, the feelings of a man who has watched the approach of the Dawn with mingled delight and awe, and who was moved to give utterance to what he felt in measured language."—Maxmuller : *History of Ancient Sanskrit Literature*, p. 553

৩৮। 'মায়া' ও 'রূপ' শব্দ—যাহার উপর পরবর্তীকালের বেদান্তদর্শন প্রতিষ্ঠিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না—ঋগ্বেদে বেদান্তগৃহীত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩৯। 'পৃচ্ছামি বাচঃ পরমং ব্যোম'—ঋ., ১. ১৬৪. ৩৫

৪০। 'ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম'—ঐ

৪১। 'ঋষির্দর্শনাৎ তদ্যদেনাংস্তপস্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু অভ্যানর্ষৎ তদৃষীণামৃষিত্বম্'—যাস্ক; 'যস্য বাক্যং স ঋষিঃ'; তুলঃ 'কবির্যঃ পুত্রঃ স ইমা চিকেত'—ঋ., ১. ১৬৪. ১৬.

৪২। 'সম্পূর্ণমৃষিবাক্যং তু সূক্তমিত্যভিধীয়তে'; শৌনক বলিয়াছেন যে, যাজ্ঞিকগণের মতে তিনটি ঋকের কম হইলে তাহাকে 'সূক্ত' বলা যায় না।—'তৃচাধমং যাজ্ঞিকাঃ সূক্তমাহুঃ' (বৃ. দে., ৮. ৯৯); এই মত অনুসারে ঋ., ১. ৮৯ সূক্ত নহে।

৪৩। 'যা তেন উচ্যতে সা দেবতা'; 'যৎকাম ঋষির্যস্যাং দেবতায়ামার্থপত্যমিচ্ছন্ স্তুতিং প্রযুঙ্‌ক্তে তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রো ভবতি'—যাস্ক।

৪৪। 'তস্মাদাত্মস্তবেষু স্যাৎ য ঋষিঃ সৈব দেবতা'—বৃ. দে., ২. ৮৭; বৃহদ্দেবতায় শৌনক ২৭ জন ব্রহ্মবাদিনীর নাম করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে শেষ ৯ জন স্বরচিত মন্ত্রে নিজেদের কথাই বলিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের রচিত মন্ত্রের তাঁহারাই ঋষি, তাঁহারাই দেবতা।

৪৫। 'যদক্ষরপরিমাণং তচ্ছন্দঃ'।

পাঠ করিবার পূর্বে মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ ও দেবতা জানিতে হইবে। না জানিয়া যিনি পাঠ করেন, তাঁহাকে 'মন্ত্রকন্টক' বলা হয়।[৪৬]

যাস্ক স্থানভেদে তিনজন দেবতার কথা বলিয়াছেন—অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র, সূর্য। অগ্নি হইলেন পৃথিবীস্থানগত, বায়ু বা ইন্দ্র হইলেন অন্তরীক্ষস্থানগত, সূর্য হইলেন দ্যুস্থানগত।[৪৭] অন্যান্য যে সকল দেবতার নাম ঋগ্বেদে পাওয়া যায় তাঁহারা সকলেই এই তিন দেবতারই নামভেদ মাত্র। এক দেবতার যে বহু নাম হয় তাহার কারণ হইল সেই দেবতার কর্মভেদ এবং নামভেদ দেবতার বিভূতির পরিচায়ক।[৪৮] অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্যকে প্রধান দেবতা ধরিয়া শৌনক তাঁহাদের কর্মভেদ অনুসারে বিভিন্ন নামও দিয়াছেন। কর্মভেদে এক অগ্নির ৫টি নাম, ইন্দ্র বা বায়ুর ২৬টি নাম এবং সূর্যের ৭টি নাম আছে।[৪৯] একই ইন্দ্রের বিভিন্ন কর্ম অনুসারে ২৬টি নাম হইয়াছে বলিয়া বৈদিক ঋষিরা ২৬টি পৃথক্ দেবতাকে স্বীকার করেন নাই। ঋগ্বেদে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকের প্রত্যেকটি স্থানে ১১টি করিয়া দেবতার কথাও বলা হইয়াছে।[৫০] ব্রাহ্মণ সাহিত্যে ইহার ফলে তিন দেবতার স্থলে ৩৩ দেবতার উল্লেখ দেখা যায়।[৫১] একটি মন্ত্রে দেবতার সংখ্যা ৩৩৩৯ বলা হইয়াছে।[৫২] এইসব হইতে হঠাৎ মনে হইতে পারে যে ঋগ্বেদের ঋষিরা বুঝি বহু দেবতায় বিশ্বাসী ছিলেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। ঋগ্বেদের ঋষিরা এক ঈশ্বর সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং সমস্ত দেবতাকে সেই একেরই বিভিন্ন প্রকাশরূপে কল্পনা করিয়াছেন। সেই এককে তাঁহারা 'প্রজাপতি', 'হিরণ্যগর্ভ', 'ক', 'পুরুষ' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। বহ্বীশ্বরবাদ ঋগ্বেদের আপাতপ্রতীতি মাত্র। বহু দেবতার উপরে সর্বাধ্যক্ষ এবং পরমব্যোমে স্বমহিমায় সমাসীন একজনের কথা ঋষিরা কখনও বিস্মৃত হন নাই। সেই একজনই হইলেন সমগ্র সৃষ্টির কারণ, তাঁহাতেই সমস্ত সৃষ্টি বিধৃত।[৫৩]

বৈদিক দেবতা

৪৬। তুলঃ অবিদিত্বা ঋষিং ছন্দো দৈবতং যোগমেব চ।
যোঽধ্যাপয়েজ্জপেদ্বাপি পাপীয়ান্ জায়তে তু সঃ॥
ঋষিচ্ছন্দোদৈবতানি ব্রাহ্মণার্থং স্বরাদ্যপি।
অবিদিত্বা প্রযুঞ্জানো মন্ত্রকণ্টক উচ্যতে॥

৪৭। 'তিস্র এব দেবতা...অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো বায়ুর্বা ইন্দ্রো বা অন্তরীক্ষস্থানঃ সূর্যো দ্যুস্থানঃ'—যাস্ক

৪৮। 'তাসামিহ বিভূতির্হি নামানি যদনেকশঃ'—বৃহদ্দেবতা

৪৯। অগ্নেস্তু যানি সুক্তানি পঞ্চ নামানি কারবঃ।
ষড়্‌বিংশতিস্তথেন্দ্রস্য প্রাহুঃ সূর্যস্য সপ্ত চ॥
তেষাং পৃথঙ্‌ নির্বচনমেকৈকস্যেহ কর্মজম্।
উচ্যমানং যথান্যায়ং শৃণুধ্বমখিলং ময়া॥—ঐ

৫০। ঋ. স., ১. ১৩৯. ১১

৫১। 'অষ্টৌ বসবঃ, একাদশ রুদ্রাঃ, দ্বাদশ আদিত্যাঃ, প্রজাপতিশ্চ বষট্‌কারশ্চ'।

৫২। 'ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাঽসপর্যন্'—বা. স., ৩৩, ৭;
ত্রয়শ্চ ত্রিংশতংচৈব ত্রয়স্ত্রিংশত্তথৈব চ।
ত্রয়স্ত্রিংশৎসহস্রাশ্চ দেবাঃ সোমং পিবন্তি বৈ॥—বায়ুপুরাণ, ৫২. ৬৩

৫৩। তুলঃ ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আ বভূব
যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্য অধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্
সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ॥—ঋ., ১০. ১২৯. ৭
হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥—ঋ., ১০. ১২১, ১

ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলির মধ্যে যে শুধু ধর্মের কথাই বলা হইয়াছে এরূপ মনে করিলে ভুল হইবে। মনুষ্যজাতির প্রাচীনতম লিখিত সাহিত্য এই ঋগ্বেদ। যে কোনও কালের ইতিহাস রচনার পক্ষে সেই কালের সাহিত্য অপরিহার্য। মনুষ্যজাতির প্রথম ইতিহাস-রচনায় তাই ঋগ্বেদের দান অসামান্য। তখনকার সামাজিক অবস্থা, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা-প্রণালী, শাসনতন্ত্র, দেশের ভৌগোলিক তথ্য, খাদ্য-পানীয়, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি সর্ব বিষয়ের বহুল তথ্য এই ঋগ্বেদেই পাওয়া যাইবে।[৫৪]

ধর্ম-নিরপেক্ষ (secular) ঋক্‌মন্ত্রগুলিরও ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম চিন্তাধারা ও সভ্যতাকে জানিবার পক্ষে এইগুলি অপরিহার্য। উদাহরণ হিসাবে ঋগ্বেদ ১০.৮৫ সূক্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সূর্যের কন্যা সূর্যার সহিত সোমের বিবাহ ইহার প্রতিপাদ্য। প্রাচীন ভারতে বিবাহ-পদ্ধতি ও তাহাতে বর-বধূর স্থান সম্বন্ধে জানিবার পক্ষে এই সূক্তটি সহায়ক। ঋগ্বেদের যুগে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন করা হইত তাহা ঋগ্বেদের চারিটি সূক্ত (১০. ১৪-১৮) হইতে জানা যায়।

ঋগ্বেদে ধর্ম-নিরপেক্ষ মন্ত্র

ঋগ্বেদে দেবতা সম্বন্ধে Maxmuller-এর আলোচনা নীচে উদ্ধৃত হইল—

"If therefore there must be a name for the religion of the Rig-veda, polytheism would seem at first sight the most appropriate. Polytheism, however, has assumed with us a meaning which renders it totally inapplicable to the Vedic religion.

"Our ideas of polytheism being chiefly derived from Greece and Rome, we understand by it a certain more or less organised system of gods, different in power and rank, and all subordinate to a Supreme God, a Zeus or Zupiter. Th Vedic polytheism differs from the Greek and Roman polytheism....in the same manner as a confederacy of village communities differs from a monarchy."

ঋগ্বেদে দেবতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"No one is first always, no one is last always. Even gods of a decidedly inferior and limited character assume occasionally in the eyes of a devoted poet a supreme place above all other gods. It was necessary therefore, for the purpose of accurate reasoning to have a name, different from polytheism, to signify this worship of single gods, each occupying for a time a supreme position, and I proposed for it the name of Kathenotheism, that is a worship of one God after another, or of Henotheism, the worship of single gods. This shorter name of Henotheism has found more general acceptance, as conveying more definitely the opposition between Monotheism, the worship of one only God, and Henotheism, the worship of single gods."—Maxmuller: *Heritage of India*, pp. 42-3

৫৪। ঋগ্বেদের ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে Maxmuller বলেন—

"In the history of the world the Vedas fill a gap which no literary work in any other language could fill. It carries us back to a time of which we have no records anywhere, and gives us the very words of a generation of men of whom otherwise we could form but the vaguest estimate by means of conjectures and inferences. As long as man continues to take an interest in the history of his race and as long as we collect in libraries and museums the relics of former ages, the first place in that long row of books which contains the records of the Aryan branch of mankind, will belong for ever to the Rig-veda."—*Ancient Sanskrit Literature*, p. 63

এই সম্বন্ধে Griswold বলেন—

"It forms a connecting link between India and the West. For while on the one hand it fulfils itself in the later history and literature of India, on the other hand its roots run deep into the Indo-Iranian and even Indo-European period."—*Religion of the Rigveda*, p. 75

ব্রাহ্মণ সাহিত্যের অর্থবাদ অংশে আমরা আখ্যান ও উপাখ্যানের প্রথম রূপ দেখিতে পাই। আরও পরে 'পুরাণ' নামে তাহা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র স্থান গ্রহণ করিয়াছে। পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির বীজও ঋগ্বেদে। ঋগ্বেদের সংবাদসূক্তগুলির (Dialogue hymns) মধ্যে এই বীজ নিহিত আছে। ঋগ্বেদ ১০.৯৫ সূক্ত উর্বশী ও পুরূরবার কথোপকথন। পৃথিবীর অধিপতি পুরূরবার সহিত স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী চার বৎসর বাস করার পর যখন স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে চলিয়াছেন তখন পুরূরবা ও উর্বশীর মধ্যে যে কথাবার্তা হইয়াছিল তাহাই আঠারোটি মন্ত্রে এখানে পাওয়া যায়। শতপথ-ব্রাহ্মণে (১১.৫.১), হরিবংশে, বিষ্ণুপুরাণে, কথাসরিৎসাগরে এবং শেষপর্যন্ত কালিদাসের বিক্রমোর্বশীতে সেই একই কথা নানাভাবে বলা হইয়াছে। যম ও তাহার ভগ্নী যমীর মধ্যে কথোপকথনকে উপজীব্য করিয়া আর একটি সূক্ত হইল ঋগ্বেদ ১০.১০। এইসব সূক্তগুলির মধ্যে একটি নাট্যরূপ আছে এবং অনেকে মনে করেন যে পরবর্তী কালের নাট্যসাহিত্যের প্রথম বিকাশ এইগুলির মধ্যেই দেখা যায়।

নীতিপ্রতিপাদক কতকগুলি সূক্ত (Didactic hymns) এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। ঋগ্বেদ ১০. ৩৪ সূক্তে জুয়াখেলায় সর্বস্বান্ত জুয়ারীর অনুতপ্ত হৃদয়ের গ্লানি প্রকাশ পাইয়াছে। ঋগ্বেদ ৯. ১১২; ১০. ৭১; ১০. ১১৭ এই শ্রেণীর সূক্তের অন্তর্ভুক্ত।

ঋগ্বেদের কয়েকটি সূক্ত অনেকটা হেঁয়ালী (Riddle) ধরনের। ঋগ্বেদ ৮.২৯ সূক্তে নাম উল্লেখ না করিয়া অনেকগুলি দেবতার বর্ণনা করা হইয়াছে। ঋগ্বেদ ১. ১৬৪ সূক্তে ৫২টি মন্ত্র আছে এবং ইহার প্রতিটি মন্ত্রই রহস্যাবৃত।

সৃষ্টির উদ্ভব ও সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করিয়া যে সমস্ত সূক্ত রচিত হইয়াছে (Cosmogonic hymns) তাহার মধ্যে ১০. ১২৯ সূক্তটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়াও ঋগ্বেদ ১০. ৭২; ১০. ৯০; ১০. ১২১ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

ধনী রাজন্যবর্গের যজ্ঞে ঋত্বিকের কার্য সম্পন্ন করিয়া ঋষিরা প্রচুর ধন দক্ষিণা পাইতেন। ধনী যজমানের দাক্ষিণ্যে তুষ্ট ঋষিবৃন্দ সেই সকল দানের প্রশংসা করিতেন, দাতারও প্রশংসা করিতেন। যে সব সূক্তে মুখ্যতঃ দাতার প্রশংসা পাওয়া যায় সেগুলিকে 'নারাশংসী' এবং যে সকল সূক্তে মুখ্যতঃ দানের প্রশংসা পাওয়া যায় সেগুলিকে 'দান-স্তুতি' বলা হয়। কতকগুলি ঐতিহাসিক নাম ও ঘটনার উল্লেখ থাকায় এইসব সূক্তগুলি ইতিহাসের দিক দিয়াও যথেষ্ট মূল্যবান। ঋগ্বেদ ১০. ১০৭, ও ১০. ১১৭ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

অথর্ববেদ

অথর্ববেদের আদি নাম 'অথর্বাঙ্গিরসবেদ'। ২০ কাণ্ডে, ৭৩১ সূক্তে প্রায় ৬০০০ মন্ত্রে অথর্ববেদ রচিত। মহাভারতের যুগের পূর্ব পর্যন্ত অথর্ববেদকে বেদের মর্যাদা দেওয়া হয় নাই। রাজার পক্ষে এই বেদ অপরিহার্যরূপে বিবেচিত হইয়াছে।[৫৫] এইজন্য ইহার আর এক নাম 'ক্ষাত্রবেদ'।[৫৬] রাজপুরোহিতকে অথর্ববেদজ্ঞ হইতে হইত এবং যে রাজার রাষ্ট্রে অথর্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন তাঁহার রাজ্যে কখনও উপদ্রব হইবে না এইরূপ মনে করা হইত।[৫৭] দুর্ভাগ্যের নিরাকরণ, রোগের প্রতিকার, শত্রুনাশ, কোনও ব্যক্তি বা শক্তির অনুগ্রহলাভ প্রভৃতি যাহা কিছু মানুষের জীবনকে ইহলোকে উপভোগ্য করিয়া তোলে তাহার মন্ত্র

৫৫। দ্রষ্টব্য ঃ যাজ্ঞবল্ক্য (১. ৩১২), গৌতম (১১. ১৫-১৭), মনু (১১. ৩৩);
Bloomfield: *Hymns of the Av.*, Introduction, p. 56

৫৬। দ্রষ্টব্য ঃ Winternitz: *Indian Literature*: Vol. I. p. 130;
Banerjee Sastri: *Asura India*, p. 27

৫৭। যস্য রাজ্ঞো জনপদে অথর্বা শান্তিপারগঃ।
নিবসত্যপি তদ্ রাষ্ট্রং বর্ধতে নিরুপদ্রবম্ ॥

এই অথর্ববেদে পাওয়া যায়। সায়ণ অন্যান্য বেদকে শুধু আমুষ্মিকফলপ্রদ বলিয়াছেন, কিন্তু অথর্ববেদকে ঐহিক ও আমুষ্মিক উভয় ফলপ্রদ বলিয়াছেন।[৫৮] পরবর্তীকালের আয়ুর্বেদ ও তন্ত্রশাস্ত্রের বীজও এই অথর্ববেদেই নিহিত রহিয়াছে। অথর্ববেদের দুইটি শাখা—(ক) পৈপ্পলাদ ও (খ) শৌনকীয়। অথর্ববেদে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিত্র দেওয়া আছে এবং ইহা হইতে যে ভৌগোলিক তথ্য জানা যায়, তাহা হইতে নিঃসংশয়ে বলা চলে যে ইহা ঋগ্বেদের পরবর্তী কালের। এই যুগে আর্যগণ সিন্ধুনদের তীর হইতে আরও পূর্বদিকে গঙ্গা-যমুনার তীর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন।[৫৯] ঋগ্বেদে ব্যাঘ্রের কথা নাই, অথর্ববেদে ব্যাঘ্র সুপরিচিত। বর্ণভেদ ও পুরোহিতসম্প্রদায়ের প্রাধান্য অথর্ববেদের সমাজে আরও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-গণের ধর্ম ও মতবাদের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইয়া তখনকার সমাজের এক বৃহৎ অংশ কিভাবে ও কোন্ পথে নিজেদের বিশ্বাস, ধর্মবোধ ও আচার-ব্যবহারকে গড়িয়া তুলিতেছিল তাহা জানিতে হইলে অথর্ববেদ অপরিহার্য।[৬০]

অথর্ববেদের বিষয়বস্তু অথর্ববেদের নয়টি শাখা—পৈপ্পলাদ, তৌদ, মৌদ, শৌনকীয়, জাজল, জলদ, ব্রহ্মবদ, বেদদর্শ, চারণবৈদ্য। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর অধ্যাপক রোট্ ও আমেরিকার অধ্যাপক হুইট্নি শৌনক শাখার অথর্ববেদ প্রথম প্রকাশ করেন।[৬১] তদবধি অথর্ববেদ বলিতে ঐখানিকেই বুঝাইয়াছে। পৈপ্পলাদ শাখার অথর্ববেদ ব্লুম্‌ফিল্ড্ ও গার্বে কর্তৃক ১৯০১ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল।[৬২] কিন্তু উহা অশুদ্ধ ও অসম্পূর্ণ। সম্প্রতি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য পৈপ্পলাদ শাখার অথর্ববেদের শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ একাধিক পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিয়া বিশ্বব্যাপী আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার সম্পাদনায় শীঘ্রই পৈপ্পলাদ শাখার অথর্ববেদ প্রকাশিত হইবে। তখন অথর্ববেদের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অনেক অজানা তথ্যের বিদ্বজ্জগৎ সন্ধান পাইবেন। তাহার পূর্ব পর্যন্ত শৌনক শাখার অথর্ববেদের বিষয়বস্তুই আমাদের আলোচ্য।

৫৮। ব্যাখ্যায় বেদত্রিতয়মামুষ্মিকফলপ্রদম্।
ঐহিকামুষ্মিকফলং চতুর্থং ব্যাকরিষ্যতে ॥—সায়ণ

৫৯। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের রচনাস্থান সম্বন্ধে Monier Williams বলেন—
"Just as the Mantras are the representatives of the nature-worship of the Rishis which was developed in the Panjab, so the Brahmanas, are the exponents of the ritualism of the Brahmanas, developed when they had settled in North-western Hindusthan."—*Hinduism*, p. 24

৬০। অথর্ববেদের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে Whitney বলিয়াছেন—
"The most prominent characteristic feature of the Atharvan is the multitude of incantations which it contains; these are pronounced either by the person who is himself to be benefited or, more often by the sorcerer for him, and are directed to the procuring of the greatest variety of desirable ends: most frequently, perhaps long life, or recovery from grievous sickness, is the object sought; then a talisman, such as a necklace, is sometimes given or in very numerous cases, some plant endowed with marvellous virtues is to be the immediate external means of the cure; further, the attainment of wealth or power is aimed at, the downfall of enemies, success in love or in play, the removal of petty pests, and so on, even down to the growth of hair on a bald paste."—quoted in Ghate's *Lectures on Rigveda*.

৬১। Max Lindenan ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন হইতে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৬২। *The Kashmirian Atharvaveda, Stuttgart,* 1901

শৌনক শাখার অথর্ববেদে ৭৩১টি সূক্তে প্রায় ছয় হাজার মন্ত্র আছে। ইহা ২০ কাণ্ডে বিভক্ত। শেষ দুই কাণ্ড অনেক পরবর্তীকালের বলিয়াই সাধারণতঃ মনে করা হয়। বিংশ কাণ্ডের প্রায় সমস্ত মন্ত্রই ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত এবং ইহা ছাড়া অথর্ববেদের এক-সপ্তমাংশ মাত্র ঋগ্বেদ হইতে লওয়া হইয়াছে। এক দশম কাণ্ডেই ইহার অর্ধেক পাওয়া যায়। ভাষা ও ছন্দের দিক বিচার করিলে অথর্ববেদের মন্ত্রগুলি ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি অপেক্ষা অর্বাককালীন বলিয়া মনে হয়। তাছাড়া ভৌগোলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তথ্যাবলীও ইহাকে ঋগ্বেদ অপেক্ষা অবরকালীন বলিয়া প্রতিপন্ন করে। ঋগ্বেদের দেবতাগণই অথর্ববেদের মন্ত্রের দেবতা, কিন্তু এখানে তাঁহাদের স্বরূপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাঁহাদের প্রকৃতিযোনিত্ব আর ধরা পড়ে না। এদিক দিয়াও দেবতাগোষ্ঠীর এক বিরাট পরিবর্তন আসিয়া গিয়াছে।

উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ অনুসারে অথর্ববেদের মন্ত্রগুলিকে নিম্নানুরূপ ভাগ করা যায়।

(১) ভৈষজ্য মন্ত্র—জ্বর দূর করিবার জন্য এই মন্ত্রগুলি প্রযুক্ত হয়। এইগুলিতে হয় জ্বরকে সম্বোধন করা হইয়াছে কিংবা যে অসুরগণ জ্বর উৎপন্ন করিয়া মানুষকে নানাভাবে আশ্রয় করে তাহাদিগকে সম্বোধন করা হইয়াছে। অনেক জ্বরের উপসর্গ বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে এবং জ্বরের রাজার নাম দেওয়া হইয়াছে 'তক্মন্'। জ্বর নিরাময়ের পক্ষে বিভিন্ন লতা-গুল্ম ও জলকে ভেষজরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে এবং মন্ত্রে তাহাদের কার্যকরী শক্তির কথাও উল্লিখিত হইয়াছে।

(২) অসুর, পিশাচ ও রাক্ষসেরা জ্বর উৎপাদন করিয়া থাকে এইরূপ বিশ্বাস তখন প্রচলিত ছিল। ইহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া গ্রাম ও নগরকে ইহাদিগের প্রভাবমুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে অনেক মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে।

(৩) আয়ুষ্য মন্ত্র—আয়ু, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন সকলেরই কাম্য। অনেকগুলি গৃহ্য অনুষ্ঠানে এই মন্ত্রগুলি ব্যবহার করা হয়। মানুষ যাহাতে শতবর্ষ বাঁচিতে পারে, সকল প্রকার রোগ হইতে মুক্ত থাকিতে পারে এই মন্ত্রগুলিতে সেই প্রার্থনা দেখা যায়।

(৪) পৌষ্টিক মন্ত্র—সুখ ও সমৃদ্ধি লাভের জন্য এই মন্ত্রগুলির প্রয়োগ করা হয়। কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও গৃহনির্মাণে সকল প্রকার বিঘ্নের নিরসন, আকস্মিক উৎপাতের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ, দস্যু-তস্করের বিতাড়ন প্রভৃতি এই মন্ত্রগুলির বিষয়বস্তু।

(৫) প্রায়শ্চিত্ত মন্ত্র—মানুষ পাপ করে। কখনও জ্ঞাতসারে কখনও অজ্ঞাতসারে। মানুষ ঋণ করিয়া পরিশোধ করে না, সামাজিক বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে। যজ্ঞানুষ্ঠানে ত্রুটি হয়, তাহার জন্যও সে পাপভাগী হয়। জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সর্ববিধ পাপক্ষয়ের কামনা করিয়া এই মন্ত্রগুলি প্রযুক্ত হইত।

(৬) পারিবারিক অশান্তি দূরীকরণের জন্যও কতকগুলি মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। এক পরিবারের বিভিন্ন জনের মধ্যে মনোমালিন্য, কলহ প্রভৃতি যাহা সংসারের শান্তি বিঘ্নিত করে তাহা দূর করিবার উদ্দেশ্যে এই মন্ত্রগুলি রচিত।

(৭) কতকগুলি কামনা—বিশেষ করিয়া তখনকার সমাজে মেয়েরাই করিতেন এবং সেই কামনাপূর্তির জন্য তাঁহারা মন্ত্রপাঠ করিয়া অনুষ্ঠানও করিতেন। এইগুলিকে 'স্ত্রীকর্ম' বলা হয়। মনোমত পতিলাভ, সুখপ্রসব, পুত্রলাভ, গর্ভরক্ষা প্রভৃতি এইসব কামনার অন্তর্গত। অথর্ববেদের চতুর্দশ কাণ্ডে এই মন্ত্র প্রচুর পাওয়া যায়। স্বামীর ক্রোধ বা অভিমান দূর করিবার জন্য, অন্য নারীতে পতির আসক্তি দূর করিবার জন্য, অভীষ্ট পুরুষ বা নারীকে বশে আনিবার জন্য এই শ্রেণীর মন্ত্র পাঠ করিয়া বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হইত।

(৮) অভিচার মন্ত্র—কাহারও উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করার কামনায় বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরের অনিষ্ট সম্পাদন করাই এই মন্ত্রগুলির উদ্দেশ্য।

হইল। ভারতের উত্তর-পশ্চিম ভাগের বাহিরে অথর্ববেদের পৈপ্পলাদ শাখার কোনও দিন কোনও অস্তিত্ব ছিল না, এই মতবাদের ভিত্তি ক্রমশঃই টলিতে লাগিল।

কিন্তু চূড়ান্ত প্রমাণ চাই।

ঠিক এই সময়ে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সংস্কৃত কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে (পৃঃ ২১০) ঘোষণা করিলেন যে ভারত-পরিক্রমাকালে তাঁহারা একটি 'মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার' করিয়াছেন যে সৌরাষ্ট্রে এখনও কয়েক ঘর অথর্ববেদী ব্রাহ্মণ-পরিবার বাস করিতেছেন। এই ঘোষণাও অধ্যাপকের মনে নূতন উদ্যম সৃষ্টি করিল। পূর্বভারতে এককালে অথর্ববেদের পঠন-পাঠন যখন নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে তখন সেখানে অথর্ববেদী ব্রাহ্মণ-পরিবার যে মোটেই নাই, একথা সহজে মানিয়া লইতে তাঁহার মন চাহিল না। আর যদি তাঁহার অনুমানই সত্য হয় তবে কোথাও কোনও পরিবারে লোকচক্ষুর অন্তরালে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত পুরাণ পুঁথিপত্রও হয়ত থাকিতে পারে—এমন ক্ষীণ আশাও তিনি মনে মনে পোষণ করিতে লাগিলেন।

চূড়ান্ত প্রমাণ

পরিক্রমা শুরু হইল।

প্রবীণ বয়সেও অধ্যাপক পরিব্রাজকের বৃত্তি গ্রহণ করিলেন।

বিহার প্রদেশের সিংভূম জেলায় সুবর্ণরেখার উপরে অবস্থিত একটি গ্রাম। গ্রামের নাম গুহিয়াপাল। পদ-পরিক্রমায় জানা গেল প্রায় ষাট ঘর অথর্ববেদী ব্রাহ্মণ-পরিবার সেখানে বাস করেন। অধ্যাপক তাঁহাদের ঘরে ঘরে ক্রিয়াকর্মের পুঁথি দেখিয়া বেড়াইলেন। কত নূতন সূত্র পাইলেন। মেদিনীপুর, কটক, বালেশ্বর, ভুবনেশ্বর, পুরী, ময়ূরভঞ্জ কিছুই বাদ গেল না।

শেষ পর্যন্ত পুরী জেলার বাসুদেবপুর গ্রামে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত পৈপ্পলাদ অথর্ববেদের তালপাতায় লেখা একখানা পুঁথি আবিষ্কৃত হইল। বালেশ্বর জেলার মাকন্দা ও মহান্তিপুরা গ্রামে আরও দুইখানি পুঁথি পাওয়া গেল। প্রায় শতাব্দী কাল পূর্বে কাশ্মীরে প্রাপ্ত পুঁথিখানি অপেক্ষা এই নূতন পুঁথিগুলি অনেক শুদ্ধ এবং মোটামুটি অক্ষত। তিন শত বৎসরের পুরাতন এই পুঁথিতে প্রথম পৃষ্ঠাটি অক্ষত থাকায় পৈপ্পলাদ অথর্ববেদের প্রথম মন্ত্রটি সম্বন্ধে এতদিন যাবৎ যে সকল জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল তাহার চিরতরে অবসান হইল। প্রথম মন্ত্রটি হইল—

শং নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ॥

রাজা বল্লাল সেনের গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট এই মন্ত্রটিকে পৈপ্পলাদ অথর্ববেদের প্রথম মন্ত্র বলিয়া গিয়াছেন, এ বিষয়ে অধ্যাপক পূর্বেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সকল সংশয়ের নিরসন হইল।

এই আবিষ্কারের উপরেই অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য ঘোষণা করিলেন যে কাশ্মীরে দৈবক্রমে পৈপ্পলাদ অথর্ববেদের পুঁথি প্রথম পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া ঐ বেদকে এতদিন ধরিয়া যে 'কাশ্মীরীয়' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে তাহা ভুল। কাশ্মীর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের বাহিরে পূর্ব-ভারতেও পৈপ্পলাদ অথর্ববেদের প্রচলন ছিল, এমন কি উড়িষ্যা এবং বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আজও পর্যন্ত অথর্ববেদী ব্রাহ্মণের বসবাস আছে। 'শং নো দেবীঃ' ইত্যাদি মন্ত্রটি যে পৈপ্পলাদ অথর্ববেদের প্রথম মন্ত্র, তাহা বাঙালীই বলিয়াছে। ব্রহ্মযজ্ঞে ঐ মন্ত্রটি বিহিত হওয়ায় শৌনকীয় অথর্ববেদ অপেক্ষা পৈপ্পলাদ অথর্ববেদের জনপ্রিয়তা ও অধিক প্রচলন প্রমাণিত হয়। শবর, শঙ্করাচার্য প্রভৃতি মনীষিগণ অথর্ববেদ বলিতে পৈপ্পলাদ শাখাকেই বুঝিতেন, এ কথাও অধ্যাপকের অন্যতম ঘোষণা।

বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে চারিজন ঋত্বিকের প্রয়োজন হইত—হোতা, উদ্গাতা,

অধ্বর্যু ও ব্রহ্মা।[৬৪] অধ্বর্যুর কাজ ছিল মন্ত্রপাঠ করিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া। বিভিন্ন যজ্ঞে অধ্বর্যুর পাঠ্য মন্ত্রসমূহকে বলা হয় 'যজুঃ'। যজুর্মন্ত্রগুলির পৃথক সংকলনই যজুর্বেদ। যজ্ঞে ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিকে স্বরসংযোগ করিয়া গান করা হইত। স্বরসংযুক্ত সেই ঋক্‌মন্ত্রগুলিকে বলা হইত 'সাম' এবং সামসমূহের পৃথক সঙ্কলনই সামবেদ।[৬৫] ঋগ্বেদে যত মন্ত্র আছে তাহার মধ্যে মাত্র ৭৫টি বাদে আর সবই সামবেদে পাওয়া যায়।[৬৬]

যজুর্বেদ

ক্লীবলিঙ্গ 'ব্রহ্মন্' শব্দের অর্থ 'মন্ত্র'—বেদমন্ত্র।[৬৭] তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট যাহা তাহাই 'ব্রাহ্মণ'। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বেদমন্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বেদমন্ত্রসমূহের ত্রিবিধ ব্যাখ্যা প্রথম হইতে প্রচলিত—অধিযজ্ঞ, অধিদৈব, অধ্যাত্ম। এই ত্রিবিধ ব্যাখ্যা ছাড়াও মনু 'বেদান্তাভিহিত' ব্যাখ্যার কথা বলিয়া গিয়াছেন।[৬৮] প্রতিটি মন্ত্র যজ্ঞে প্রযুক্ত হইবার জন্যই রচিত হইয়াছে এইরূপ মত একসময়ে বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল। এক শ্রেণীর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এই মত দৃঢ়ভাবে পোষণ করিতেন এবং সেই অনুসারেই বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেন। এই ব্যাখ্যাকেই বলা হয় 'অধিযজ্ঞ' ব্যাখ্যা। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের রচয়িতৃগণ এই অধিযজ্ঞ ব্যাখ্যার সমর্থক হইলেন। প্রতি বেদেরই ব্রাহ্মণগ্রন্থ আছে। ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ—(ক) ঐতরেয় (খ) কৌষীতকি সাঙ্খায়ন; যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ—(ক) শতপথ (খ) তৈত্তিরীয়; সামবেদের ব্রাহ্মণ—(ক) তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ বা পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ বা প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ (খ) ষড়্‌বিংশ (গ) সামবিধান (ঘ) আর্ষেয় (ঙ) দেবতাধ্যায় (চ) মন্ত্রব্রাহ্মণ বা উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ (ছ) সংহিতোপনিষৎ (জ) বংশ ব্রাহ্মণ। সায়ণ[৬৯] সামবেদের এই আটখানি ব্রাহ্মণেরই নাম করিয়াছেন এবং ইহাদের ভাষ্যও প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও জৈমিনীয়, শাট্যায়ন প্রভৃতি সামবেদের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ আছে। সম্ভবতঃ সায়ণ নিজে সামবেদের কৌথুম শাখাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁহার উল্লিখিত আটখানি ব্রাহ্মণ কৌথুম শাখার বলিয়া উহাদেরই উল্লেখ করিয়াছেন। সামবেদের ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ দশ প্রপাঠকে সম্পূর্ণ। প্রথম দুই প্রপাঠকে গৃহ্যকর্মের মন্ত্রগুলির আলোচনা আছে এবং এই অংশের নাম মন্ত্রব্রাহ্মণ বা মন্ত্রপর্ব। বাকী আটটি প্রপাঠক লইয়া ছান্দোগ্যোপনিষদ্। দশ প্রপাঠকে সম্পূর্ণ এই গ্রন্থটিকে উপনিষদ্‌ব্রাহ্মণও বলা হয়।[৭০] অথর্ববেদের ব্রাহ্মণ —গোপথ ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ

৬৪। তুলঃ ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্
গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্করীষু।
ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাম্
যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীতে উ ত্বঃ॥—ঋগ্বেদ, ১০. ৭১. ১১

৬৫। সংহিতা হিসাবে সামসংহিতা নিরর্থক—'গীতির্নার্থবতী লোকে তস্মাৎ সাম নিরর্থকম্'—মাধব

৬৬। দ্রষ্টব্যঃ Macdonell: *History of Sanskrit Literature*, p. 171

৬৭। "The Rishis called their hymns by various names....and they also applied to them the appellation of *Brahma* in numerous passages."—Muir: *OST*; Vol. I, p. 241 (3rd edition)

৬৮। দ্রষ্টব্যঃ V. C. Bhattacharyya: Traditional Schools of Vedic Interpretation, *Our Heritage*: Vol. II. Part I, p. 153

৬৯। অষ্টৌ হি ব্রাহ্মণগ্রন্থাঃ প্রৌঢ়ং ব্রাহ্মণমাদিমম্।
ষড়্‌বিংশাখ্যং দ্বিতীয়ং স্যাৎ ততঃ সামবিধির্ভবেৎ॥
আর্ষেয়ং দৈবতং চৈব মন্ত্রং বোপনিষত্ততঃ।
সংহিতোপনিষদ্ বংশো গ্রন্থা অষ্টাবিতীরিতাঃ॥

৭০। প্রথম দুই প্রপাঠক ছান্দোগ্যব্রাহ্মণ নামে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের সম্পাদনায় কিছুদিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যের বিষয়

ব্রাহ্মণ সাহিত্য একটি বিশাল সাহিত্য। এ পর্যন্ত যাহা যাহা রক্ষিত হইয়াছে তাহা কম না হইলেও ইহা অপেক্ষা আরও অধিক গ্রন্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এরূপ মনে করারও যথেষ্ট কারণ আছে। অধ্যাপক বটকৃষ্ণ ঘোষ তাঁহার Collection of the Fragments of Lost Brahmanas নামক গ্রন্থে যে সকল লুপ্ত ব্রাহ্মণ হইতে অনেক অংশ উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহাদের নাম দেওয়া হইল—(১) আহ্বরক (২) কঙ্কতি (৩) কালববি (৪) চরক (৫) ছাগলেয় (৬) জাবালি (৭) জৈমিনীয় বা তলবকার (৮) পৈঙ্গায়নি (৯) ভাল্লবি (১০) মাষশরাবি (১১) মৈত্রায়নীয় (১২) রৌরুকী (১৩) শাট্যায়ন (১৪) শৈলালি (১৫) শ্বেতাশ্বতর (১৬) হারিদ্রবিক। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে ইতস্ততঃ এই সকল ব্রাহ্মণগুলির নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, অনেক স্থলে ইহাদের উদ্ধৃতিও দেখা যায় কিন্তু গ্রন্থ হিসাবে এই ব্রাহ্মণগুলি পাওয়া যায় না।

প্রাচীন ভারতের ধর্ম, সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে জানিবার পক্ষে সংহিতাগুলি অপেক্ষা ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি অধিকতর সহায়ক। সংহিতার ঋষিরা দেবতার স্তব করিয়াছেন, নিজেদের সুখসমৃদ্ধির জন্য দেবতার প্রসন্নতা অপরিহার্য বলিয়া মনে করিয়াছেন, দেবতাকে সর্বতোভাবে প্রসন্ন করিতে চেষ্টাও করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের ঋষিরা দেবতা অপেক্ষা যজ্ঞানুষ্ঠানকে উচ্চ স্থান দিয়াছেন, যজ্ঞের দ্বারা দেবতাগণকে অভীষ্ট-পূরণে বাধ্য করিয়াছেন। এখানে দেবতার কোনও স্বাধীনতা নাই, তাঁহারা যজ্ঞের অধীন; তাই দেবতার প্রসন্নতা অর্জন করিবার চেষ্টা না করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানকে সর্ববৈকল্যরহিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সংহিতার প্রজাপতি ও বিষ্ণু এখন স্থানভ্রষ্ট, যজ্ঞকেই প্রজাপতি ও বিষ্ণুর আসনে বসানো হইয়াছে। যজ্ঞানুষ্ঠানে কোন্ কাজটি কখন কিভাবে করিতে হইবে, ঋত্বিক কোন্ দিকে কতটুকু দাঁড়াইবেন, কোন্ মন্ত্র কখন্ কেমনভাবে পাঠ করিবেন, তাহার অন্যথাচরণে কী কুফল হইবে ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে নীরস আলোচনা থাকার ফলে ব্রাহ্মণ সাহিত্য সাধারণ পাঠকের মনে কোনও আকর্ষণের সৃষ্টি করিতে পারে না। মন্ত্রপাঠ করিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হইত। সেই মন্ত্রপাঠে একটু ইতর-বিশেষ করিয়া বা আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের অন্যথাচরণ করিয়া ঋত্বিকরা ইচ্ছামত যজমানের কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধন করিতে পারিতেন। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের যজ্ঞধর্ম তাই অবিমিশ্র ধর্ম নয়, তাহাতে মন্ত্রের যাদুশক্তির উপরও প্রচণ্ড আস্থা পোষণ করা হইয়াছে। ধর্মের পটভূমিকায় মন্ত্রের যাদুদণ্ড লইয়া মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের উত্তরসাধকগণ যাদুকর-ঋত্বিকের ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ফলে ব্রাহ্মণ সাহিত্যে নীতিবোধের স্থান নাই। এদিক দিয়া ঈজিপ্টের সহিত বৈদিক ভারতবর্ষের অনেকখানি সাদৃশ্য আছে।[৭১] Winternitz বলিয়াছেন—"The Brahmanas are

---

শঙ্করাচার্য (ব্রহ্মসূত্র ৩.৩.২৫;২৬; ৩৬) ইহার মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগের অংশবিশেষকে 'তাণ্ডিনাং শ্রুতিঃ' বলিয়াছেন। সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় মনে করেন যে কাশিকাতে (৫.১.৬২) উল্লিখিত 'চত্বারিংশ ব্রাহ্মণ' তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণেরই নামান্তর এবং উহা প্রথমে মোট ৪০ প্রপাঠকে সম্পূর্ণ ছিল—পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ (২৫ প্রপাঠক), ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ (৫ প্রপাঠক), ছন্দোগ্যব্রাহ্মণ (১০ প্রপাঠক)।

দ্রষ্টব্য: ত্রয়ী পরিচয়, পৃঃ ১২১, ষড়্গুরুশিষ্যের মতে চত্বারিংশ ব্রাহ্মণ ৪০ অধ্যায়যুক্ত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের নাম।

৭১। তুলঃ একজন ঐতিহাসিক ঈজিপ্ট সম্বন্ধে নিম্নানুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন—"Thus the earliest moral development which we can trace in the ancient East was suddenly arrested, or at least checked, by the detestable devices of a corrupt priesthood eager for gain."—Breasted. *Development*, pp. 296, 308.

a splendid proof of the fact that an enormous amount of religion can be connected with infinitely little morality. Religious acts, sacrifices and ceremonies, are the one and only subject of all these extensive works, but morality is a thing with which these works have nothing to do. On the contrary, sacrificial acts are not only performed in order that the gods may fulfil the very materialistic wishes of the sacrificer, but also very frequently in order to injure an enemy. Indeed the Brahmanas give directions for the priests, how, by means of the sacrifice, they can injure the sacrificer himself by whom they are employed, if for instance he does not give them enough presents. They need only perform the prescribed ceremonies in reverse order, or employ spells at the wrong place, and the fate of the sacrificer is sealed."[৭২]

যজ্ঞে সর্বথা ঋত্বিকেরই প্রাধান্য থাকায় এবং ব্রাহ্মণগণই ঋত্বিকরূপে কার্য করিবার অধিকারী ছিলেন বলিয়া সমাজে অন্যান্য বর্ণের উপর ব্রাহ্মণের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল। ব্রাহ্মণকে হত্যা করাই নরহত্যা বলিয়া মনে করা হইত এবং ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যে বিরোধে ব্রাহ্মণেরই জয় ঘোষণা করা হইত। ক্রমে দেবতার উপরেও ব্রাহ্মণের স্থান দেওয়া হইল। মহাকাব্যেও এমন অনেক আখ্যান ও উপাখ্যান আছে যাহা হইতে জানা যায় যে তপস্যা দ্বারা অনেক ব্রাহ্মণ এমন শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন যে দেবতারাও তাঁহাদের ভয়ে ভীত থাকিতেন। এই দিক দিয়া পরবর্তীকালের বৌদ্ধধর্মের সহিত এই যুগের ধর্মের তুলনা করা চলে এবং অনেকে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের আগমনবার্তা ঘোষিত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন।[৭৩]

বেদের ব্রাহ্মণভাগ তিন ভাগে বিভক্ত—শুদ্ধ ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ। শুদ্ধ ব্রাহ্মণের সংক্ষিপ্ত আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় অংশ আরণ্যক।

আরণ্যক

যদিও ইহাতে কর্মানুষ্ঠানের বিধান দেওয়া আছে, তথাপি মুখ্যতঃ ইহা জ্ঞান ও কর্মের সন্ধিসাধক রূপকবহুল রহস্যবিদ্যা। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ—এই তিনটিতেই কর্ম ও জ্ঞান দুয়েরই উপদেশ দেওয়া আছে। তথাপি ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের বিষয়পার্থক্য সুস্পষ্ট। একটি কর্মাশ্রয়ী, অন্যটি জ্ঞানাশ্রয়ী। আরণ্যক উভয়াশ্রয়ী এবং সেইজন্য ইহার বৈশিষ্ট্য তেমন স্পষ্ট নয়।

বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী সমাবর্তনের পূর্বে অরণ্যে গুরুর নিকট একান্ত নিরালায় আরণ্যক বিদ্যা গ্রহণ করিতেন। অরণ্যে যে বিদ্যা অধীত ও গৃহীত হইত তাহাই আরণ্যক।[৭৪] বৈদিক সংহিতায় 'আরণ্যক' শব্দের প্রয়োগ নাই। ঋগ্বেদে 'অরণ' শব্দ আছে এবং তাহার অর্থ 'দূরদেশ' বা 'বহির্দেশ'। পাণিনির সূত্র অনুসারেও 'আরণ্যক' পদ সিদ্ধ হয়।[৭৫]

প্রাচীনকালে বেদপাঠ ও ব্রতপালন এই দ্বিবিধ কর্ম সমাপ্ত হইলে বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ হইত। এই বেদব্রতের উপদেশ আরণ্যকের অন্যতম বিষয়। ইহাতে যাগানুষ্ঠানের

৭২। Winternitz, *History of Indian Literature*, Vol. I, Part I, p. 181
৭৩। *Ibid*, p. 175
৭৪। ঐতরেয়ব্রাহ্মণেদ্‌প্তি কাণ্ডমারণ্যকাভিধম্‌।
অরণ্য এব পাঠ্যত্বাদারণ্যকমিতীর্যতে।—সায়ণ, ঐতরেয় আরণ্যকের ভাষ্যভূমিকা
৭৫। এই পদটি সিদ্ধ করিবার জন্য কাত্যায়নের বার্তিক—পথ্যধ্যায়ন্যায়বিহারহস্তিষ্বিতি বাচ্যম্‌।

উপদেশ আছে বটে কিন্তু তাহা একান্তই মানস ব্যাপার। হবন অপেক্ষা সেখানে মননেরই প্রাধান্য। গৃহস্থ যখন বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া বনে যাইতেন তখন ব্যয়সাধ্য ও উপকরণবহুল যজ্ঞসম্পাদনে তাঁহার সামর্থ্য থাকিত না। সেই সময়ে বানপ্রস্থী অরণ্যাশ্রমে বসিয়া আরণ্যকের পর্যালোচনায় অধ্যাত্মচর্চায় অগ্রসর হইতেন। ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে উপনিষদের পূর্বে আরণ্যকের স্থান। বিষয়বস্তুর দিক দিয়া বিচার করিলেও দেখা যায় যে ইহা উপনিষদেরই পূর্বরূপ।

ঋগ্বেদের আরণ্যক দুইটি ঐতরেয় ও শাঙ্খায়ন। তৈত্তিরীয় আরণ্যক কৃষ্ণযজুর্বেদের। শুক্লযজুর্বেদের বৃহদারণ্যক 'বৃহদারণ্যকোপনিষদ' নামেও পরিচিত। সামবেদীয় ব্রাহ্মণগুলির কোনও আরণ্যক পাওয়া যায় নাই কিন্তু জৈমিনীয় শাখার উপনিষদ্ ব্রাহ্মণখানি মূলতঃ আরণ্যকধর্মী। অথর্ববেদের গোপথ ব্রাহ্মণেরও কোনও আরণ্যক পাওয়া যায় নাই। মোট কথা, আজ পর্যন্ত যতগুলি ব্রাহ্মণ পাওয়া গিয়াছে, আরণ্যকের সংখ্যা তদপেক্ষা কম, উপনিষদের সংখ্যা অনেক বেশী।

উপনিষদ্

ভারতের ঋষিরা দুর্নিবার আকূতি লইয়া জানিতে চাহিয়াছিলেন মানবের কল্যাণের পথ। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের মধ্যে তাঁহারা শ্রেয়কেই বাছিয়া লইয়াছিলেন। তাহার প্রাপ্তির পথ সম্বন্ধেও চিন্তা করিয়াছিলেন। প্রথম দিকে তাঁহারা যজ্ঞকেই সেই একমাত্র পথ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরেই তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে যজ্ঞ মানুষের কল্যাণ আনে বটে, কিন্তু সে কল্যাণ চিরস্থায়ী নহে। যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে যে পুণ্য অর্জিত হয় তাহাতে স্বর্গলাভ হয় বটে কিন্তু পুণ্যক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া আবার জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে পড়িয়া দুঃখভোগ করিতে হয়।[৭৬] দুঃখসমুদ্র পার হওয়ার পক্ষে যজ্ঞরূপ ভেলা অত্যন্ত অদৃঢ়।[৭৭] মানুষের প্রকৃত ও চিরস্থায়ী কল্যাণ কর্মের দ্বারা হইতে পারে না, জ্ঞানেরই দ্বারা হইতে পারে। ঋষিদের এইরূপ চিন্তা যে সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে তাহার নাম 'উপনিষদ্'।

"উপনিষদেরই অপর নাম বেদান্ত (বেদ-অন্ত)। ইহা বেদের শেষ অর্থাৎ কর্ম ও জ্ঞান-কাণ্ডের মধ্যে শেষ জ্ঞান-কাণ্ডের অন্তর্গত। অথবা কাহারও কাহারও মতে, বেদের শেষ লক্ষ্য বা প্রতিপাদ্য বা শেষ সিদ্ধান্ত ইহাতে সংগৃহীত, সেইজন্য ইহা বেদান্ত।

"উপনিষদকে কেন উপনিষদ্ বলা হয় এ প্রশ্ন সহজেই এখানে উত্থিত হইবে। প্রাচীন আচার্যগণ ইহার ব্যুৎপত্তি, অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই কথা বলেন যে, যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যার নিকটে উপস্থিত হইয়া ('উপ') নিশ্চয়ের সহিত ('নি') ইহার অনুশীলন করেন, ইহা তাঁহাদের সংসারের বীজস্বরূপ অবিদ্যা প্রভৃতিকে বিনাশ করে (' √ সদ্')। এইজন্য ব্রহ্মবিদ্যার নাম উপনিষদ্।

"নবীনগণের চিন্তার ধারা অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন, যেখানে লোকেরা চারিদিকে ('পরি—') বসে ('√সদ্') তাহাকে আমরা বলি পরিষদ'। এইরূপ লোকেরা যেখানে এক সঙ্গে ('সম্—') বসে ('√ সদ্') তাহাকে বলা হয় সংসদ্। ঠিক এইরূপেই শিষ্যেরা গুরুর নিকটে ('উপ') গিয়া যেখানে বসিতেন ('নি— √ সদ্') মূলতঃ সেই ছোট ছোট বৈঠকের নাম ছিল উপনিষদ্। কালক্রমে এই সব উপনিষদে বা বৈঠকে যে বিদ্যার (অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার) আলোচনা হইত তাহারও নাম হইল উপনিষদ্। ইহার পরে যে গ্রন্থে এই বিদ্যা লিপিবদ্ধ হইল তাহাকেও উপনিষদ্ বলা হয়।

৭৬। তুল: তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্তলোকং বিশন্তি ॥

৭৭। তুল: 'প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ...।'

"উপনিষদ্ শব্দের আর একটি অর্থ হইতেছে 'রহস্য'। অতি গম্ভীর ও দুর্গম বলিয়া এই উপনিষদ্ বা ব্রহ্মবিদ্যাকে সাধারণ বিদ্যার ন্যায় নির্বিচারে যেখানে-সেখানে সকলের নিকট প্রকাশ করা হইত না বলিয়া ইহা হইল রহস্য। এইজন্য উপনিষদ্ ও রহস্য এই দুইটি শব্দ একার্থক হইয়া পড়ে।"৭৮ প্রতি বেদের যেমন ব্রাহ্মণ আছে, তেমনি প্রতি বেদের উপনিষদ্‌ও আছে।

পূর্বে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। "এই ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই আলোচনা আছে। ইহার যে অংশে কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই লৌকিক বা আধ্যাত্মিক আলোচনা আছে, তাহাকে আরণ্যক বলা হয়, কেননা ইহা অরণ্যে অর্থাৎ বনে পাঠ করা হইত, কারণ এইসব কথা দুর্বোধ বলিয়া যেখানে-সেখানে যাহাকে-তাহাকে শেখান হইত না, এবং ইহা অধ্যয়ন করিবার জন্য অতি নির্জন স্থান আবশ্যক হইত।"৭৯ আমাদের বহু উপনিষদ্ এই আরণ্যকের অন্তর্গত। কেবল একখানি মাত্র উপনিষদ্ মন্ত্র বা সংহিতার মধ্যে। ইহার নাম ঈশোপনিষদ্। ইহা হইতেছে শুক্ল যজুর্বেদের শেষ (অর্থাৎ ৪০শ) অধ্যায়।"৮০

ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ও ব্রহ্মের ভেদ নাই—ইহাই উপনিষদের মূল কথা। উপনিষদের মর্মবাণী হইল 'তৎ ত্বমসি', অর্থাৎ 'তুমিই সেই'; তোমাতে ও ব্রহ্মতে কোনও ভেদ নাই। ব্রহ্মপ্রাপ্তিই জীবের চরম লক্ষ্য, এবং জ্ঞানের দ্বারাই ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভব।৮১ জীব ও ব্রহ্মের—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ডের এই যে অভেদত্ব—তাহাই ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্বেতকেতুর উপাখ্যানে (ছা. উ., ৬. ১) নিপুণভাবে বলা হইয়াছে। কঠোপনিষদে নচিকেতার উপাখ্যানে নচিকেতার মুখে জিজ্ঞাসু হৃদয়ের তীব্র জ্ঞানলিপ্সার প্রকাশও আমরা দেখিতে পাই। উপনিষদের মতবাদগুলির মধ্যে কর্মফলবাদ (ethical doctrine of Karman) ও জন্মান্তরবাদ (transmigration of souls) অন্যতম। ভারতীয় দর্শনে পরবর্তীকালে এই দুইটি মতবাদ বিশেষ স্থান গ্রহণ করিয়া ভারতীয় দর্শনকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছে। কর্মফলবাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইল নীতিবাদ। তৈত্তিরীয়

৭৮। বিধুশেখর ভট্টাচার্য, উপনিষদ্ (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ), পৃঃ ৭-৮
দ্রষ্টব্য : Goldstucker : *Inspired Writings of Hinduism*, p. 56

৭৯। মূল : অরণ্যাধ্যয়নাদেতদারণ্যকমিতীর্যতে।
অরণ্যে তদধীয়ীতেত্যেবং বাক্যং প্রচক্ষতে ॥—সায়ণ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক

৮০। বিধুশেখর ভট্টাচার্য, উপনিষদ্ (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ), পৃঃ ৭

৮১। প্রধান উপনিষদ্ ১০ খানি—
ঈশ-কেন-কঠ-প্রশ্ন-মুণ্ড-মাণ্ডুক্য-তিত্তিরি।
ঐতরেয়ঞ্চ ছান্দোগ্যং বৃহদারণ্যকং তথা ॥

উপনিষদের শিক্ষা সম্বন্ধে Winternitz-এর মন্তব্য—
"A system of the Upanisad philosophy can only be said to exist in a very restricted sense. For it is not the thoughts of one single philosopher or of one uniform school of philosophers, that might be traced back to one single teacher, which are before us in the Upanisads, but it is the teachings of various men, even of various periods, which are presented in the single sections of the Upanisads."
—*A History of Indian Literature*, Vol. I, pp. 245-46

Deussen এইরূপে উপনিষদের শিক্ষা ব্যক্ত করিয়াছেন—
"The *Brahman*, the power which presents itself to us materialised in all existing things, which creates, sustains, preserves and receives back into itself again all worlds, this eternal infinite divine power is identical with the *Atman*, with that which, after stripping off every thing external, we discover in ourselves as our real most essential being, our individual self, the soul."

উপনিষদে (১.১১) শিষ্যের প্রতি আচার্যের উপদেশে এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৫.২) প্রজাপতির বাক্যে এই নীতিবাদই পরিস্ফুট।

উপনিষদ্গুলির পৌর্বাপর্য

যে বিশাল সাহিত্য 'উপনিষদ্' নাম গ্রহণ করিয়া আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে সবগুলিই একই সময়ে রচিত হয় নাই। ঐতরেয়, কৌষীতকি, বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য ও কেন—এই ছয়টিকে উপনিষদ্ সাহিত্যের প্রথম স্তরে ফেলা যাইতে পারে। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ হইল এইগুলির মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভাষার দিক দিয়া এই উপনিষদ্গুলির সহিত ব্রাহ্মণ সাহিত্যের সাদৃশ্য আছে।

আর একটু পরবর্তীকালে গদ্যে লিখিত একশ্রেণীর উপনিষদ্ রচিত হয়। কঠ, শ্বেতাশ্বতর, মহানারায়ণ, ঈশ, মুণ্ডক ও প্রশ্ন—এই ছয়টিকে এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। মৈত্রায়ণীয় ও মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ও এই সময়ের। মোট এই চতুর্দশখানি উপনিষদ্কে আমরা বৈদিক সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে করিতে পারি। শঙ্করাচার্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে মৈত্রায়ণীয় ও মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ বাদে দ্বাদশখানি উপনিষদের উল্লেখ করিয়াছেন।

ছান্দোগ্য

উপনিষদ্গুলির মধ্যে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক এই দুইখানি শুধু আকারেই বড় নয়, আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্বের দিক দিয়াও প্রয়োজনীয়। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের অংশ। ইহার প্রথম দিকে উপাসনার সমগ্র তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। ওঙ্কারোপাসনা, সামোপাসনা, সূর্যোপাসনা ও প্রাণোপাসনা—এই চতুর্বিধ উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। উপাসনা দ্বিবিধ—ব্রহ্মোপাসনা ও প্রতীকোপাসনা। অনাত্ম বস্তুতে দেবতাবুদ্ধিতে যে উপাসনা তাহা প্রতীকোপাসনা। প্রতীক দ্বিবিধ—যজ্ঞের বহির্ভূত ও যজ্ঞাঙ্গ। যজ্ঞাঙ্গাশ্রিত উপাসনার কথাই ছান্দোগ্যের প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভ হইতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বাবিংশ খণ্ড পর্যন্ত আলোচিত হইয়াছে। পরমাত্মাকে কোনও গুণ বা রূপবিশিষ্টরূপে উপাসনাই ব্রহ্মোপাসনা। ছান্দোগ্যে যেখানে হিরণ্যশ্মশ্রু ও হিরণ্যকেশ পুরুষের সঙ্গে অভিন্ন অক্ষিপুরুষের কথা বলা আছে সেখানে ব্রহ্মোপাসনাই বিহিত হইয়াছে (দ্রঃ ১।৬।৬ ও ১।৭।৫)। উপাসনার দ্বারাই জীব ক্রমশঃ অখণ্ডের উপলব্ধি করিতে পারে।

বৃহদারণ্যক

বাজসনেয় যজুর্বেদের কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখায় শতপথ ব্রাহ্মণের শেষ অংশ বৃহদারণ্যক। এই গ্রন্থ একাধারে আরণ্যক ও উপনিষদ্রূপে গণ্য হয় এবং যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে (৩.১১০) আরণ্যক নামেই উল্লিখিত আছে।[৪২] উপনিষদ্গুলির মধ্যে ইহা আয়তনে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার কাণ্ডসংখ্যা তিনটি—মধুকাণ্ড, যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ড বা মুনিকাণ্ড ও খিলকাণ্ড। মধুকাণ্ডে ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। ইহা আগমপ্রধান ও উপদেশাত্মক। উপনিষদের সমস্ত বক্তব্য এইখানেই বলা হইয়া গিয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডে মধুকাণ্ডে উপস্থাপিত উপদেশগুলির সত্যতা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। খিলকাণ্ডে বৃহদারণ্যকের সমস্ত বক্তব্য সংক্ষেপে গৃহীত হইয়াছে।

সূত্র: শ্রৌত ও গৃহ্য

অতিগম্ভীর বেদমন্ত্রের অর্থাববোধের নিমিত্ত শিক্ষা প্রভৃতি ষড়ঙ্গের সৃষ্টি। ঋগাদি চারি বেদ ও শিক্ষাদি ষড়ঙ্গকে মুণ্ডক উপনিষদে (১।১।৪।৫) 'অপরাবিদ্যা' বলা হইয়াছে। সায়ণ বলিয়াছেন,[৪৩] সাধনভূতধর্মজ্ঞানহেতুত্বাৎ ষড়ঙ্গসাহিত্যানাং কর্মকাণ্ডানামপরবিদ্যাত্বম্। পরমপুরুষার্থভূতব্রহ্মজ্ঞানহেতুত্বাদ্ উপনিষদাং পরবিদ্যাত্বম্ অর্থাৎ ষড়ঙ্গ সহিত বেদের কর্মকাণ্ড

৪২। কৃষ্ণ যজুর্বেদে মৈত্রায়ণীয় (চরক) শাখারও একখানা বৃহদারণ্যক পাওয়া যায়।
৪৩। ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকা

যজ্ঞাঙ্গের হেতু, এইজন্য উহা 'অপরাবিদ্যা' আর উপনিষদ্গুলি পরমপুরুষার্থভূত ব্রহ্ম-জ্ঞানের হেতু, তাই উহা 'পরাবিদ্যা'।

বেদের ষড়ঙ্গের মধ্যে একটি হইতেছে 'কল্প'। ইহাতে যাগপ্রয়োগ সমর্থিত হইয়াছে।[৮৪] কল্পসূত্রগুলির দ্বারা বিষয়বস্তু ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির বিষয়বস্তুও বটেই এবং এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে ব্রাহ্মণের মধ্যেই অনেক অংশ এমনভাবে সূত্রাকারে রচিত যেগুলিকে সূত্র বলিয়া মনে করা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। অথর্বের গোপথ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্যবর্জিত এবং বেশীর ভাগ স্থলেই সূত্রাকারে রচিত। সামবেদের কয়েকখানি ব্রাহ্মণ, বিশেষ করিয়া সামবিধান ব্রাহ্মণ, একেবারেই সূত্রগ্রন্থ। ঐতরেয় আরণ্যকখানি নামে আরণ্যক হইলেও একান্তভাবে সূত্রধর্মী। কর্মকাণ্ড যখন সমাজে বিপুল প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল তখন তাহার বিধিনিষেধগুলি সহজে মানুষের মনে রাখা যায় সেই উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়া এই কল্পসূত্রের সৃষ্টি করে। কল্পসূত্রের যে অংশে শ্রৌতযাগাদি নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার নাম শ্রৌতসূত্র এবং যেখানে গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবনের গৃহ্যানুষ্ঠানগুলি উপদিষ্ট হইয়াছে তাহার নাম গৃহ্যসূত্র। প্রথম অংশে অগ্ন্যাধান, দর্শপূর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, পশুবন্ধ, সোমযাগ প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় অংশে গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহস্থের সকল সংস্কার, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, গৃহনির্মাণ, বাস্তুশোধন, পশুপালন, কৃষি প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। সাহিত্য হিসাবে ইহাদের মূল্য কম হইলেও যজ্ঞধর্ম সম্বন্ধে জানিবার পক্ষে যেমন শ্রৌত সাহিত্য তেমনি প্রাচীন ভারতের প্রতিটি পরিবারের জীবনধারার এবং সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান জানিবার পক্ষে গৃহ্যসূত্রগুলি অপরিহার্য। আরও একটি দিক দিয়া এইগুলির মূল্য আছে। সূত্র সাহিত্যে মন্ত্রগুলির বিনিয়োগের উল্লেখ আছে, অর্থাৎ কখন্ কোন্ অনুষ্ঠানে কোন্ মন্ত্রটির প্রয়োগ করিতে হয় তাহা সূত্রসাহিত্য হইতে জানা যায়। এই বিনিয়োগের সাহায্যে অনেক সময়ে অনেক দুর্বোধ্য মন্ত্রের সঠিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় এবং অনেক বৈদিক শব্দের প্রকৃত অর্থটি বুঝিবারও সুবিধা হইয়া থাকে। গৃহ্যসূত্রগুলির পরিশিষ্টরূপে রচিত হইল 'ধর্মসূত্র'। চারি বর্ণ ও চতুরাশ্রমকে সুনিয়মিত রাখিবার জন্য সমস্ত বিধিনিষেধ ইহার আলোচ্য। ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ও সমাজ কী নিয়মে একসময়ে শাসিত হইয়াছিল এইগুলি হইতে তাহা জানা যায়।

শ্রৌতসূত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইল 'শুল্বসূত্র'। বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইলে বেদি নির্মাণ করিতে হইত। বেদি নির্মাণ করিতে হইলে নিখুঁত মাপজোখ অবলম্বন করিতে হইত। শুল্বসূত্রগুলিতে সেই মাপজোখের কথাটি বলা হইয়াছে এবং জ্যামিতিবিদ্যার প্রথম সূত্রপাত এইখানে।

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের মত প্রতি বেদের প্রতি শাখার সূত্রগ্রন্থও একসময়ে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এখন অবশ্য সব নাই, কেবল কৃষ্ণযজুর্বেদের বৌধায়ন ও আপস্তম্ব শাখার শ্রৌত, গৃহ্য, ধর্ম ও শুল্বসূত্র সব কয়খানিই আছে।

৮৪। কল্প্যতে সমর্থ্যতে যাগপ্রয়োগোঽত্র—সায়ণ, ঐ।

মহাভারত

রামায়ণ ও মহাভারতই প্রথম মহাকাব্য—মানুষের মনে প্রাচীন নৃপতিগণের, লোকোত্তর বীরপুরুষগণের ও দেবতাগণের কাহিনী শুনিবার শাশ্বতী প্রবৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া যুগে যুগে যে সব কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহারই প্রথম সুসম্পূর্ণ সংকলন। এই ধরনের কাহিনী কবে প্রথম রচিত হইয়াছিল, কে প্রথম রচনা করিয়াছিলেন, কাহার জন্য করিয়াছিলেন, কোন্ ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার আজ আর কোনও উপায় নাই। ইহার ধারা অনুসরণ করিয়া মহাকালের যবনিকার ভিতর দিয়া সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে মনুষ্যজাতির প্রথম সাহিত্য ঋগ্বেদেই ইহার বীজ উপ্ত হইয়াছে।

কাব্য সাহিত্যের সূত্রপাত

শৌনক তাঁহার বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলির যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন তাহার মধ্যে সংবাদসূক্ত, আখ্যানসূক্ত, দানস্তুতি এবং নারাশংসী অন্যতম। ঋগ্বেদের এই চারি শ্রেণীর মন্ত্র এবং অথর্ববেদের কুন্তাপসূক্তসমূহ মহাকাব্যের বীজ। সংবাদ-সূক্তগুলি (dialogue hymns) পরবর্তীকালের নাট্যকাব্যের এবং অন্যান্যগুলি মহাকাব্যের আদিরূপ। বিশেষ করিয়া মহাভারত তাহার বহিরঙ্গ গঠনের দিক দিয়া নাটক এবং অন্তরঙ্গ বিষয়বস্তুর দিক দিয়া কাব্য[১]; সুতরাং ঋগ্বেদের উক্ত চারি শ্রেণীর মন্ত্রই মহাকাব্যধারার গোমুখী। ব্রাহ্মণ-সাহিত্যেও আমরা আখ্যান, উপাখ্যান, ইতিহাস, পুরাণ, বাকোবাক্য, গাথা, শ্লোক, নারাশংসী প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের রচনার উল্লেখ পাই।[২] বৈদিক যুগে শ্রৌত ও গৃহ্য অনুষ্ঠানসমূহে এই ধরনের কাহিনী শোনা ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত ছিল, অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রাচীন বীরপুরুষগণের ও দেবগণের কাহিনী শোনা হইত। আরও পরবর্তীকালে দেখা যায়, পরিবারের কোনও ভাবী অমঙ্গলের প্রতিকার-কামনায় পরিবারের সকলে অগ্নির চারিদিকে বসিয়া দেবতা ও প্রাচীন বীরপুরুষগণের কাহিনী শুনিতেছেন। মহাভারতেও দেখা যায় যে রামচন্দ্র, নল প্রভৃতি প্রাচীন নৃপতি-গণের কাহিনী শুনিয়া রাজা দ্যুমৎসেন সান্ত্বনা লাভ করিতেছেন।[৩] মহাভারতে দিব্যকথা[৪], উপাখ্যান[৫] প্রভৃতি এইরূপ কাহিনীর উল্লেখ আছে। বৈদিকযুগের শেষভাগে রচিত সুপর্ণাখ্যান[৬] কদ্রু ও বিনতার প্রাচীন কাহিনী লইয়া রচিত এবং ইহাই মহাকাব্যের প্রথম রূপায়ণ।[৭]

বৈদিক সাহিত্যের শেষ ভাগের রচনায় দেখা যায় যে ইতিহাস ও পুরাণ পাঠ করিলে এবং শ্রবণ করিলে দেবতারা সন্তুষ্ট হন এইরূপ ধারণা সমাজে প্রচলিত ছিল। পুরাণ-সমূহে দেখা যায় যে পুরাণ নকল করিয়া দান করা মহাপুণ্যজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ইতিহাস ও পুরাণকে 'পঞ্চমবেদ' বলা হইয়াছে[৮]। Geldner মনে করেন

১। Hertel মহাভারতকে নাট্য-কাব্য (dramatic poetry) বলিয়া মনে করেন।

২। কোন্ বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন রচনার বিভিন্ন নাম হইয়াছে, তাহা আজও নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই এবং এই সময়ের কোনও জাতীয় রচনাই আমাদের হস্তগত হয় নাই।

৩। মহা., ১. ১৪০, ৭৪; ৩. ২৯৮ ৪। ঐ, ১২.৩৪০, ১২৭

৫। ঐ, ১২. ৩৩৬, ১৬

৬। ঋগ্বেদের খিলসূক্তের অন্তর্গত সুপর্ণাধ্যায় নহে।

৭। মহাভারতের আস্তিকপর্বের মূল হইল এই সুপর্ণাখ্যান।

৮। 'কার্ষ্ণং চ পঞ্চমং বেদং যন্মহাভারতং স্মৃতম্'—ভবিষ্যপুরাণ; 'ইতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্'—ছা. উ. ৭. ১. ২

রামায়ণ ও মহাভারতের পূর্বে 'ইতিহাসবেদ' বা 'পুরাণবেদ' নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থই[৯] ছিল। যদি তাঁহার সে অনুমান সত্য হয় তবে 'সুপর্ণাধ্যায়'র পর সেই গ্রন্থ এবং তাহার পর রামায়ণ ও মহাভারত—এইরূপ একটি সংযুক্ত ধারার কল্পনা করা চলে। উপরিউক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে যদিও রামায়ণ ও মহাভারতকেই আমরা মহাকাব্যরূপে প্রথম পাইয়াছি, তথাপি যে ধরনের রচনা লইয়া মহাকাব্যের সৃষ্টি সেই ধরনের রচনার অভাব কোনও কালেই ছিল না।

রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাকাব্যেরই একটি মূল আখ্যানভাগ আছে। প্রথমটির হইল রাম ও রাবণের যুদ্ধ, দ্বিতীয়টির হইল কৌরব ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধ। যদি মাত্র মূল আখ্যানভাগ লইয়া এই দুই মহাকাব্য রচিত হইত তবে আকারে ইহারা এত বৃহৎ হইত না। মূল আখ্যানভাগ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা ইহাদের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এ কথাও মনে করার কারণ নাই যে রাম-রাবণের ও কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ ছাড়া আর কোনও ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া কোনও কাহিনী রচিত হয় নাই। ভারতবর্ষে আরও রাজা ছিলেন, রাজবংশ ছিল, যুদ্ধবিগ্রহও হইয়াছিল, বীরপুরুষেরও অভাব ছিল না। স্বভাবতঃই মনে জাগে, সে সকল কাহিনী কোথায়? রামায়ণ-মহাভারতের পূর্বে এই ধরনের কোনও কাহিনীকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। তাই হয়ত তাহাদের অনেক কিছু লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তবুও আজ অনেক কিছুই রামায়ণ-মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

মহাকাব্যের জন্ম, পুষ্টি ও প্রকৃতি

পুরাণগুলির কথক যেমন সূত লোমহর্ষণ কিংবা তাঁহার পুত্র সৌতি উগ্রশ্রবা, তেমনি মহাভারতের বক্তাও সূত সঞ্জয়। সঞ্জয়ই সমগ্র মহাভারত ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বলিয়াছেন। তখনকার সমাজে সূত, মাগধ ও বন্দী এই তিন শ্রেণীর লোক ছিল, যাহারা বৃত্তির খাতিরে রাজপরিবারে সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগ পাইত।[১০] ক্ষত্রিয় পিতা ও ব্রাহ্মণী মাতার সন্তান সূতজাতি এবং বৈশ্য পিতা এবং ক্ষত্রিয়া মাতার সন্তান মাগধজাতি। সূত জাতির বৃত্তি ছিল রাজাদের সারথির কার্য করা এবং সেই কারণে স্বচক্ষে যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখার সুযোগও হইত তাঁহাদের। তাঁহারাই মুখে মুখে রাজাদের বীর্য-গাথাসমূহ রচনা করিতেন, রাজবংশের তালিকা মনে রাখিতেন এবং অনেকে অনুমান করেন, 'কুশীলব' নামে এক শ্রেণীর ভ্রাম্যমাণ গায়কের দল স্থান হইতে স্থানান্তরে এই সকল কাহিনী জনগণের মধ্যে প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। রামায়ণ-মহাভারতের পূর্বে মুখে মুখে প্রচলিত সেই কাহিনীগুলি একত্র সংকলন করার কোনও চেষ্টা হয় নাই। যেদিন রাম-রাবণ ও কুরু-পাণ্ডবের কাহিনীকে সাহিত্যরূপ দেওয়ার প্রথম চেষ্টা হইল সেই দিনই অনাদিকাল হইতে আগত অন্যান্য নৃপতিগণের ঐ ধরনের কাহিনী এবং আরও বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের স্মৃতির মণিকোঠায় যা কিছু কাহিনী সঞ্চিত ছিল, সব এক সঙ্গে ভিড় করিয়া এই দুইখানি গ্রন্থে স্থান পাইল; মূল আখ্যানভাগের সহিত এই সব কাহিনীর কতখানি যোগাযোগ ছিল বা আদৌ কিছু ছিল কি না, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে এইটুকু মনে হয় বিভিন্ন সূত বিভিন্ন এবং বিচিত্র বিষয়ে যা কিছু কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন সব এই দুই মহাকাব্যের ধারায় আসিয়া মিশিয়া গিয়াছিল। প্রথম সংকলনে তাহার কত কিছু হয়ত বাদ পড়িয়াছে, সেগুলি হয়ত পরে মনে পড়িয়াছে।

৯। *Vedische Studien* : I, p. 290f; Winternitz ইহা স্বীকার করেন না—"Thus 'Itihasa Veda' is not any particular book, but that branch of learning which consists of legends, stories etc."—*History of Indian Literature*: Vol. I, p. 313. f. n,

১০। এই তিন শ্রেণীর ঠিক কী ধরনের বৃত্তি ছিল তাহা বলা কঠিন। Meyer রাজপুত-গণের মধ্যে ভাট শ্রেণীকে প্রাচীন সূতগণের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

পরে হয়ত আরও অনেক কাহিনী রচিত হইয়াছে এবং তখন তখনই সেগুলিকে ইহাদের মধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে।[১১]

রামায়ণ-মহাভারতের যুগ বলিলে কোনও বিশেষ সময়কে বুঝা যায় না, কারণ কোনও নির্দিষ্টকালে ইহার সংকলন আরম্ভ হইয়া শেষ হইয়া যায় নাই। যে আকারে ইহারা আজ আমাদের নিকট পেঁাছিয়াছে, কালের যাত্রাপথে যুগে যুগে তাহা বিভিন্ন দিক হইতে মেদ সঞ্চয় করিয়া স্বীয় কলেবরকে পুষ্ট করিয়াছে। যত ঘটনা, যত কাহিনী, যত রাজার কথা মহাভারতে আছে, একটি একটি করিয়া সেইগুলির সময় যদি কখনও নির্ধারিত হয় তবে আমরা এইটুকু মাত্র বলিতে পারিব যে প্রথম কাহিনীর জন্মকাল হইতে শেষ কাহিনীর জন্মকাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ কালই মহাভারতের কাল। পৃথিবীর বয়স নির্ধারণ করিতে হইলে একটি একটি করিয়া ভূপৃষ্ঠের স্তরসমূহের বয়স নির্ধারণ করিয়া আমাদের সিদ্ধান্তে পেঁাছিতে হয়, এও তেমনি। সিন্ধু ও গঙ্গা হিমালয়ে উৎপন্ন হইয়া পাহাড়-পর্বত, অরণ্য-প্রান্তর অতিক্রম করিয়া সাগরে আসিয়া পড়ে—পথে কত নদী তাহাদের ধারায় আত্মদান করে—কত বিভিন্ন দিকে কত নামে-রূপে সেই ধারা বহিয়া চলে—কত জিনিসকে আত্মসাৎ করে—কত ভূখণ্ডকে সমৃদ্ধ করে। সিন্ধু-গঙ্গার পরিচয় তাহাদের আসমুদ্রহিমাচল গতিপথের পরিচয়। রামায়ণ-মহাভারতের পরিচয়ও তাহাদের প্রথম হইতে শেষ পরিণতিতে আসার পরিচয়। এই কথা মনে রাখিলে ইলিয়ড্ ও ওডিসির সহিত রামায়ণ-মহাভারতের তুলনা করা যায় না। ইলিয়ড্ ও ওডিসিতে এই পরিণতির ভাব নাই।[১২] অতীত নৃপতিগণের ও বীরপুরুষগণের বীর্যগাথাসমূহ মহাভারতের মূল উপজীব্য হইলেও, কালের গতিপথে নীতি, ধর্ম ও ভক্তিমূলক বিভিন্ন রচনা ইহার মধ্যে এমনভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে এবং মহাকাব্যের যাহা লক্ষণ, বিশেষ করিয়া মহাভারতে তাহার এমনি অভাব যে আজিকার মহাভারত তাহার মহাকাব্যত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে।[১৩]

কেন এমন হইল?

রামায়ণ ও মহাভারতের বর্তমান বিষয়বৈচিত্র্যে ব্রাহ্মণদের প্রভাব অনেকখানি। ভারতবর্ষে সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য ছিল এবং মহাকাব্যের পূর্ব পর্যন্ত যে বৈদিক সাহিত্যের ধারা নামিয়া আসিয়াছিল তাহা ষোলো আনা ব্রাহ্মণ সাহিত্য—

১১। Winternitz বলিয়াছেন—"In any case, our Mahabharata, is not only the heroic poem of the battle of the Bharatas, but at the same time also a reperatory of the whole of the old bard poetry."—*History of Indian Literature*: Vol. I, p. 318

১২। তুলঃ "Although the Hindus like the Greeks have only two great epic poems (the Ramayana and the Mahabharata) yet to compare these vast compositions with the Iliad and the Odyssey is to compare the Indus and the Ganges, rising in the snows of the world's most colossal ranges, swollen by numerous tributaries, spreading into vast shallows of branching into deep divergent channels with the streams of Attica or the mountain torrents of Thessalay." —M. Williams: *Indian Wisdom*, p. 306

তুলনা কোন্ অংশে চলিতে পারে তাহার সম্বন্ধে Winternitz মহাভারতের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন,—"Thus, as in the Iliad and in the Nibelungen-song, the tragedy of a terrible war of annihilation forms the actual subject of the heroic poem, this old heroic poem forms the *nucleus* of the Mahabharata."—*History of Indian Literature*: Vol. I, p. 317

১৩। তুলঃ "Though ancient heroic songs do indeed form the nucleus of both these works, the more devotional Itihasa literature was included in them to so great an extent, and such long poems of a religious-didactic nature were inserted, that the Mahabharata in particular has almost completely lost the character of an epic." —*Ibid*, p. 316

মূলতঃ ধর্ম-সাহিত্য। তাহাতে ক্ষত্রিয়ের বা ব্রাহ্মণেতর জাতির কথাও ছিল না, তাহার সহিত তাহাদের যোগও ছিল না। (পুরাণ-প্রসঙ্গে আমি আলোচনা করিয়াছি যে) তাহা জনগণের সাহিত্যও নহে, তাহাতে জনগণের কথাও নাই। উভয় মহাকাব্যের জনপ্রিয়তা দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ ইহা কবলিত করেন এবং ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য ইহাকেই উপযুক্ত বাহন বলিয়া মনে করেন। পুরাণ যেমন মূলতঃ সূতজাতির সাহিত্য হইয়াও পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল, ইহাদেরও ঠিক সেই অবস্থাই হইয়াছে। যে শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ দ্বারা ইহারা প্রভাবিত হইয়াছিল তাঁহারা ছিলেন রাজসভায় রাজপুরোহিত, রাজাদের সহিত সূতগণের মতই তাঁহাদেরও যোগাযোগ ছিল।[১৪] উভয় ক্ষেত্রেই এই ব্রাহ্মণগণ ছিলেন অশিক্ষিত, ধর্ম বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান ছিল অত্যন্ত কম এবং অসম্পূর্ণ। এই ব্রাহ্মণদের প্রভাবেই উভয় মহাকাব্যে আসিয়া পড়িয়াছে নীতি ও ধর্মের কথা, দেবতার কথা, দর্শন ও ধর্মবিধির কথা। ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রভাবিত হইবার পূর্বে পুরাণের ন্যায় ইহারাও ছিল শুধু ক্ষত্রিয়ের ইতিহাস, জনগণের ইতিহাস। সৌত ও ব্রাহ্মণ্য-রচনা যদি পৃথক করা সম্ভব হয়, তবে যে অসম্বন্ধতা লক্ষিত হয় তাহা দূর হইবে, বর্ণনীয় বিষয়ের সামঞ্জস্য ও ধারাবাহিকতা দৃষ্ট হইবে। যে জনপ্রিয়তার জন্য এই দুই মহাকাব্য ব্রাহ্মণকবলিত হইয়া পড়ে, ঠিক সেই জনপ্রিয়তার জন্যই ভারতবর্ষের তৎকালীন অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়েরও লুব্ধ দৃষ্টি ইহাদের উপর পতিত হয়। শ্রমণ, ভিক্ষু, আরণ্যক, যতি, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় তাঁহাদের স্ব স্ব ধর্মমতের প্রচারের জন্য ধর্মনীতির প্রাশস্ত্য প্রতিপাদনের জন্য এই মহাকাব্যদ্বয়কেই উপযুক্ত বাহন বলিয়া গ্রহণ করেন। যে সব অংশে ত্যাগ, মৈত্রী, অহিংসা, ভূতদয়া, জাগতিক বিষয়ে অনাসক্তি প্রভৃতি গল্পের মধ্য দিয়া নীতি হিসাবে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা এই সকল ধর্মসম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপের ফল এবং অবশ্যই পরবর্তীকালীন। এই দিক দিয়া রামায়ণ ও মহাভারত Bard poetry, Brahmanic poetry ও Ascetic poetry-র সংমিশ্রণ, একই সময়ে একজনের রচনা নহে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির রচনা। রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারত সম্বন্ধে উপরিউক্ত আলোচনা অধিকতর সত্য।[১৫]

মহাকাব্য বীর্য-গাথা (Heroic Poetry)

প্রাচীন ভারতবর্ষে সূতজাতির যে সকল বৃত্তি ছিল তাহার মধ্যে রাজন্যবর্গের বংশ-তালিকা রক্ষা করা একটি। কোন্ রাজবংশে কোন্ কোন্ রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কাহার পর কে রাজা হইয়াছেন, কে কে বীরত্বব্যঞ্জক কোন্ কোন্ কর্ম করিয়াছেন প্রভৃতি সব কিছুই এই বংশতালিকার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। যেখানে কোনও রাজবংশের ধারাবাহিকতা জানা সম্ভব হয় নাই, সেখানেও তাঁহারা নিজেদের খুশিমত সেই বিচ্ছিন্ন অংশকে পূর্ণ করিয়াছেন। একই রাজবংশের তালিকা যখন একাধিক সূত কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছে তখনও ঠিক এই কারণের জন্যই সেগুলির মধ্যে স্থানে স্থানে অমিল আসিয়া গিয়াছে। এই জাতীয় রচনার নাম 'অনুবংশশ্লোক'। এইগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইহাতে চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি কোনও দৈব বা অতিমানুষিক সত্তা হইতেই রাজবংশগুলির উদ্ভব কল্পনা করা হইয়াছে। মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্গত 'সম্ভবপর্বে' ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

১৪। পুরাণ যে শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাঁহারা ছিলেন দেবমন্দিরের পুরোহিত।

১৫। মহাভারতের এই গভীর পরিণতির কথা মনে রাখিয়াই Winternitz বলিয়াছেন—"It is only in a very restricted sense that we may speak of the Mahabharata as an 'epic' and a 'poem'. Indeed, in a certain sense, the Mahabharata is not *one* poetic production at all, but rather a *whole literature*."—*History of Indian Literature*, p. 316

যে অংশে রাজবংশের বা কোনও বিশেষ রাজার বীরত্বকাহিনী স্থান পাইয়াছে, সেগুলিকে বলা হয় 'heroic poetry' (বীর্য-গাথা)।

বেদ হইতে রামায়ণ-মহাভারত পর্যন্ত ভারতীয় আর্যগণের সেই একই জিজ্ঞাসা—জীবনের রহস্য কি? পরিণতি কোথায়? জীবনকে সমৃদ্ধ ও সার্থক করা যায় কী রূপে? ভারতীয় আর্যগণ এই শাশ্বত প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়াছিলেন মননের মধ্য দিয়া। উপলব্ধিতে যে উত্তর পাইয়াছিলেন, যুগে যুগে সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাহাই জাতিকে দান করিয়া গিয়াছেন। সে উপলব্ধি বেদে একভাবে বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণ সাহিত্যে একভাবে বলা হইয়াছে, দর্শনে একভাবে বলা হইয়াছে, রামায়ণ-মহাভারতে আর একভাবে বলা হইয়াছে। যুগের পরিবর্তন হইয়াছে, সাহিত্যেরও রূপ পালটাইয়াছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা সেই একই, উত্তরও সেই একই। বেদাদি শাস্ত্রে যাহা একভাবে বলা হইয়াছে, রামায়ণ-মহাভারতে তাহাই বলা হইয়াছে গল্পের ভিতর দিয়া। ফলে তত্ত্ব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, জাতিধর্ম-বয়স নির্বিশেষে সর্বজনগ্রাহ্য হইয়াছে। এই জন্যই রামায়ণ-মহাভারতকে পঞ্চম বেদ বলা হয়। ভারতীয় ষড়্দর্শনের মূল জিজ্ঞাস্য একই, তথাপি দর্শনগুলির মধ্যে আপাতবিরোধ দৃষ্ট হয়। Thadani মনে করেন যে ষড়্দর্শনের মূল নীতিগুলির উপর ভিত্তি করিয়া সমগ্র মহাভারত গড়িয়া উঠিয়াছে এবং মহাভারতের আখ্যানাংশ ষড়্দর্শনের আপাতবিরোধের রূপক মাত্র।[১৬] একথা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে জাতির পরিচয় তাহার সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার মধ্যে। আর সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয় জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে। সেদিক দিয়া মহাভারত ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার অতুলনীয় আকর। Annie Besant বলিয়াছেন—"The Mahābhārata is the greatest poem in the whole world. There is no other poem so splendid as this, so full of what we want to know, and what it is good for us to study." নীতিগ্রন্থ হিসাবে, দর্শনশাস্ত্র হিসাবে ও ইতিহাস হিসাবে মহাভারত সত্যই মহান ভারতের পরিচয় বহন করিতেছে।[১৭] আনন্দতীর্থের 'মহাভারততাৎপর্যনির্ণয়'[১৮] একখানি অপূর্ব গ্রন্থ। তাঁহার মতে মহাভারতের বীরগণের জীবনকাহিনীর মধ্য দিয়া দর্শনের মূল কথাগুলিই বলা হইয়াছে।

দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার পুত্র ভরত, তাঁহার নাম হইতে 'ভারতবর্ষ' এবং 'মহাভারত'। **দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার উপাখ্যান** এই বীর্য-গাথাগুলির অন্যতম। পরবর্তীকালে কালিদাস এই উপাখ্যানকে অবলম্বন করিয়া 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নামক যে নাটক রচনা করিয়াছেন তাহার সহিত মহাভারতের এই আখ্যানভাগের যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে। দুর্বাসার অভিশাপ, শকুন্তলার আংটি হারান প্রভৃতি ব্যাপার কালিদাসের নিজস্ব উদ্ভাবন—দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে যে চিনিতে পারেন নাই তাহারই কারণ দেখাইবার জন্য। মহাভারতের দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে চিনিয়াছিলেন—না-চেনার ভান করিয়াছিলেন। মহাভারতের যে আখ্যান আমরা পাই তাহার মধ্যে পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত অংশ অনেকখানি। সূতগণ যে মূল আখ্যান রচনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার কথোপকথনের স্থলে উভয়ের মুখ দিয়াই ব্রাহ্মণগণ পতি-পত্নীর সম্পর্ক, মানুষের জীবনে পত্নী ও পুত্রের স্থান, বিবাহবিধি, উত্তরাধিকার-আইন

১৬। N. V. Thadani, *The Mystery of the Mahabharata*: Vol. I, Karachi, 1931

১৭। *The Story of the Great War* (1899), introd. p. 7

১৮। B. Gururajah Rao বাঙ্গালোর হইতে ইহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রভৃতি অনেক কথা প্রচার করিয়াছেন। এই আখ্যানে মূল সৌত-রচনা এবং পরবর্তী ব্রাহ্মণ্যরচনা সহজেই পৃথক্ করা যায়।

রাজা যযাতির উপাখ্যান এই শ্রেণীর একটি।[১৯] দৈত্যরাজের কন্যা শর্মিষ্ঠা দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর অবমাননা করেন। দেবযানী পিতার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত জানান। শুক্রাচার্য দৈত্যরাজকে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত করেন। তখন দৈত্যরাজ শর্মিষ্ঠাকে দেবযানীর দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া গুরুকে শান্ত করেন। কালে রাজা যযাতির সহিত দেবযানীর বিবাহ হয়। দাসী শর্মিষ্ঠা দেবযানীর সহিত যযাতির গৃহে গমন করেন। যযাতি দেবযানীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, শর্মিষ্ঠার সহিত কখনও মিলিত হইবেন না। সে প্রতিজ্ঞা যযাতি পালন করিতে পারিলেন না। দেবযানী পুনরায় সে কথা পিতাকে জানাইলেন। ক্রুদ্ধ শুক্রাচার্য জামাতাকে অভিশাপ দিলেন অকালে জরাগ্রস্ত হইবার। যযাতি সকল পুত্রের নিকট আবেদন জানাইলেন যদি কেহ তাহার যৌবনের বিনিময়ে পিতার জরা গ্রহণ করে। কনিষ্ঠ পুত্র পুরু সম্মত হইল। তাহারই যৌবন গ্রহণ করিয়া যযাতি বিষয় ভোগ করিলেন। শেষে তাঁহার শিক্ষা হইল যে বিষয়ভোগের দ্বারা বিষয়বাসনার নিবৃত্তি হয় না—অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে অগ্নি প্রবলতর হইয়া জ্বলিতে থাকে। ইহাই গল্পের শিক্ষা। মূল সৌত-উপাখ্যান হয়ত এই শিক্ষা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে রচিত হয় নাই। ব্রাহ্মণদের হস্তক্ষেপের ফলে কালক্রমে ইহা শিক্ষামূলক উপাখ্যানেই পর্যবসিত হইয়াছে। শ্রমণ ও ভিক্ষুসম্প্রদায়ও এই গল্পটিকে বিষয়ে অনাসক্তির নীতি প্রচার করিবার কাজে লাগাইয়াছে।

মহাভারতের **নল ও দময়ন্তীর উপাখ্যান**[২০] কাব্যসৌন্দর্যে অদ্বিতীয় এবং একটি অতি প্রাচীন কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া রচিত।[২১] পাণ্ডবদের বনবাসকালে একদিন মহর্ষি বৃহদশ্ব পাণ্ডবদের নিকট উপস্থিত হন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বলিয়া তাঁহার অপেক্ষা অধিক দুর্দশা ভোগ করিয়াছেন এমন কোনও রাজা ছিলেন কি না জানিতে চাহিলে বৃহদশ্ব এই উপাখ্যানটি বলেন। কেমন করিয়া মহারাজ নল ভ্রাতা পুষ্করের নিকট পাশা খেলায় পরাজিত হইয়া সতী-সাধ্বী পত্নী দময়ন্তীর সহিত নির্বাসন বরণ করেন, কেমন করিয়া অন্ধ অবস্থায় বনমধ্যে পত্নীকে পরিত্যাগ করেন এবং কত দুঃখদুর্দশার মধ্য দিয়া সুদীর্ঘকাল বিরহজীবন যাপন করিয়া এই দম্পতি পরস্পরের সহিত মিলিত হন, তাহাই এই উপাখ্যানের বিষয়বস্তু। ইহা প্রাচীন সৌত-রচনার অবিমিশ্র উদাহরণ। ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ইহাতে নাই বলিলেই চলে।

এই শ্রেণীর আর একটি সুবৃহৎ উপাখ্যান—রামোপাখ্যান[২২]। কাব্যসম্পদে ও ভাবমাধুর্যে নলোপাখ্যানের ন্যায় হৃদয়গ্রাহী না হইলেও, অন্যদিক দিয়া ইহার স্বতন্ত্র মূল্য আছে। রামায়ণের বীজ এইখানেই নিহিত। হয় মূল রামায়ণের, নয়তো যে সমস্ত বিক্ষিপ্ত ও মুখে মুখে প্রচারিত সৌত-রচনাবলী হইতে রামায়ণ সংকলিত হইয়াছে, সেইগুলির ইহা একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় মর্মাহত

১৯। ইহা যে এক সময়ে একটি প্রসিদ্ধ স্বতন্ত্র উপাখ্যান ছিল তাহা পতঞ্জলি কর্তৃক (পাণিনি, ৪. ২. ৬০) 'যযাতিক' পদের গঠন শিক্ষা দেওয়া হইতেই প্রমাণিত হয়। 'যযাতিক' শব্দের অর্থ 'যিনি যযাতির উপাখ্যান জানেন'।

২০। মহা., ৩. ৫২-৭৯

২১। শতপথব্রাহ্মণের মহাবীর নড় নৈষধই মহাভারতের নিষধরাজ নল। আখ্যানাংশে শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতার পরিবর্তে ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতার উল্লেখ, ইহার প্রাচীনত্বের পরিচায়ক। ইউরোপের প্রায় সমস্ত ভাষায় এই উপাখ্যান অনূদিত হইয়াছে।

২২। মহা., ৩. ২৭৩-২৯০

যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দান করিবার উদ্দেশ্যে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় এই উপাখ্যান যুধিষ্ঠিরকে শ্রবণ করান।

বীর-জননী **বিদুলার উপাখ্যান**[২৩] প্রাচীন ভারতীয় সৌত-রচনার মূল্যবান উদাহরণ। কুন্তী কৃষ্ণের মাধ্যমে পাণ্ডবদের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহারা যেন বীরের কর্তব্য কখনও বিস্মৃত না হন এবং সেই প্রসংগে কিরূপে বিদুলা তাঁহার পুত্র সঞ্জয়কে কাপুরুষতা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে শত্রুর সম্মুখীন হইবার জন্য উত্তেজিত করিয়াছিলেন তাহারই একটি উদ্দীপনাময়ী বর্ণনা দেন। উহাই এই আখ্যানের বিষয়-বস্তু। মহাভারতের সকল আখ্যানের মধ্যেই ব্রাহ্মণগণ নিজেদের কিছু-না-কিছু বক্তব্য প্রবেশ করাইয়াছেন, কিন্তু এই আখ্যানটি সম্পূর্ণভাবে তাহা হইতে মুক্ত হইয়া আছে।

উল্লিখিত আখ্যানসমূহকে heroic poetry বা বীর্যগাথা বলা হইয়াছে। এই সব আখ্যানের মধ্যে বহু রাজার নাম আছে এবং ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, তাঁহারা সকলে মহাবীর ছিলেন। কিন্তু আখ্যানগুলি তাঁহাদের বীরত্বের জয়গান করিবার উদ্দেশ্য লইয়া রচিত হইয়াছিল, না তাঁহারা বড় বড় যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের প্রচুর দক্ষিণা দিয়াছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের স্তুতি হিসাবেই এই সকল রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বলা কঠিন। যদি নিছক বীরত্বের জয়গান করার উদ্দেশ্যেই এইগুলি রচিত হইয়া থাকে তবে নিঃসংশয়ে ইহা সৌত-সাহিত্য। আর পরের অনুমান যদি সত্য হয় তবে ইহা ব্রাহ্মণ্য-সাহিত্য। ঋগ্বেদেও 'দানস্তুতি' এবং কতক পরিমাণে 'নারাশংসী' শ্রেণীর মন্ত্রগুলি প্রমাণ করে যে রাজারা যে কোনও কারণে যখনই ব্রাহ্মণ-দিগকে দান করিয়াছেন, তখনই ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের স্তুতিগান করিয়া গিয়াছেন। এই সকল রচনার পিছনে নিহিত মূল উদ্দেশ্য কি তাহা যতদিন পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে নির্ণীত না হইতেছে ততদিন পর্যন্ত এইগুলিকে heroic poetry নাম দেওয়া কতখানি সংগত হইবে, তাহা ভাবিবার বিষয়।

উল্লিখিত আখ্যানগুলির মধ্যে **নলোপাখ্যান, রামোপাখ্যান** এবং **বিদুলা পুত্রানুশাসন** আয়তনে এত বৃহৎ এবং ঘটনাবাহুল্যে এত প্রাণবন্ত যে বস্তুতঃ একসময়ে হয়ত ঐগুলি স্বতন্ত্র আখ্যানরূপে প্রচলিত ছিল এবং ইহাদের স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য এক একটিকে লইয়াই স্বতন্ত্র মহাকাব্য রচিত হইতে পারে। এই কারণে Winternitz ইহাদের সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন—"Some of the poems which have found admission in the Mahabharata are of such proportions, and form a complete whole to such an extent that we can speak of them as epics within the epic."[২৪]

ব্রাহ্মণ্য গল্প ও উপাখ্যান

সৌত-সাহিত্যে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব কিভাবে আসিয়াছিল এবং তাহার ফলে মূল সৌত-উপাখ্যানসমূহ কি পরিবর্তিত রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। এইগুলি ছাড়াও কতকগুলি আখ্যান পাওয়া যায়, যেগুলির সহিত কোনকালেই সূতজাতির সম্পর্ক ছিল না এবং সেই কারণেই তাহারা পরবর্তীকালের প্রক্ষিপ্ত অংশ। এইগুলি ব্রাহ্মণদের রচনা। **জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ**[২৫] এইরূপ একটি আখ্যান। জন্মেজয়ের পিতা পরীক্ষিৎ সর্পদষ্ট হইয়া মৃত্যু বরণ করেন। তাহারই প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য জন্মেজয় সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং মন্ত্রশক্তির প্রভাবে

২৩। মহা., ৫.১৩৩-১৩৬ (বিদুলাপুত্রানুশাসন)
২৪। Winternitz: *History of Indian Literature*: Vol. I, p. 387
২৫। মহা., ১. ৩, ১৩-১৫; ১৫, ৩৫

সমস্ত সর্প আসিয়া যজ্ঞাগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করে। ব্রাহ্মণ কর্তৃক উচ্চারিত মন্ত্রসমূহের যাদু-শক্তি প্রতিপন্ন করাই এই আখ্যানের উদ্দেশ্য। তৈত্তিরীয় সংহিতা[২৬] ও শতপথ ব্রাহ্মণের[২৭] **কদ্রু ও বিনতার উপাখ্যান**, বাসুকিকে রজ্জুরূপে এবং মন্দর পর্বতকে মন্থনদণ্ডরূপে গ্রহণ করিয়া **দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন**[২৮] এবং তাহা হইতে চন্দ্র, লক্ষ্মী, সুরা ও অমৃতের উদ্ভব, সর্পবংশ ধ্বংস করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ **রুরুর কাহিনী**[২৯] প্রভৃতি সমস্ত উপাখ্যানই জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের কাহিনীর সহিত কোন-না-কোনও ভাবে যুক্ত। মহাভারতের আস্তিকপর্বও ইহার সহিত যুক্ত। রুরুর পিতা **চ্যবনের কাহিনীও**[৩০] মহাভারতে পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যেও[৩১] চ্যবনের কাহিনী আছে। এই দুই কাহিনীর মধ্যে বিপুল ব্যবধান আছে এবং তাহা ইহাই প্রমাণ করে যে বৈদিক আখ্যানকে ভিত্তি করিয়াও যে সকল কাহিনী মহাভারতে স্থান পাইয়াছে, তাহার মধ্যেও ব্রাহ্মণগণ বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া স্বেচ্ছায় ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছেন। সমস্ত ক্ষেত্রে—প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক সকল সত্তার উপর ব্রাহ্মণগণের অলৌকিকী শক্তির প্রতিষ্ঠা প্রতিপন্ন করাই সেই উদ্দেশ্য। ঋগ্বেদের ইন্দ্র ও অগ্নিকে লইয়া যে সকল আখ্যান মহাভারতে দেখা যায় তাহাতেও ইন্দ্র ও অগ্নিকে তাঁহাদের বৈদিক মর্যাদা দেওয়া হয় নাই, ব্রাহ্মণ্য-শক্তির নিকট তাঁহাদের গৌরব ও ক্ষমতাকে পদে পদে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। বৈদিক **প্লাবন-কাহিনী** (flood-legend) মনু-মৎস্যের উপাখ্যান মহাভারতেও পাওয়া যায়। মহাভারতের উপাখ্যানে মৎস্য নিজেকে ব্রহ্মা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং মনুকে নূতন করিয়া পৃথিবী সৃষ্টি করিতে বলিয়াছেন। দুশ্চর তপস্যার পর মনু পৃথিবী সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের কথা যেখানেই আসিয়াছে, সেখানেই শিব ও বিষ্ণুর উপরে ব্রহ্মাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। **সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যানকে** Winternitz এই শ্রেণীর মধ্যে ফেলিয়াছেন বটে, তবুও স্বীকার করিয়াছেন যে এই উপাখ্যানের মধ্যে ছত্রে-ছত্রে সাবিত্রীর যে রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার সহিত কুন্তী, দ্রৌপদী, বিদুলার যতটা সাদৃশ্য আছে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুমোদিত কোনও সতী-সাধ্বী পতিব্রতা পত্নীর আলেখ্যের সহিত তাহার ততটা সাদৃশ্য নাই। কাব্যসৌন্দর্যে উচ্ছল, ভাবগাম্ভীর্যে প্রাণস্পর্শী এই আখ্যান দৈব ও পুরুষকারের দ্বন্দ্বে, অদৃষ্টের বিরুদ্ধে প্রেম ও নিষ্ঠা, জ্ঞান ও ধর্মের জয়ই ঘোষণা করিয়াছে। Winternitz স্বীকার করিয়াছেন, এই আখ্যানের রচয়িতা যিনিই হউন না কেন—ব্রাহ্মণই হউন বা ক্ষত্রিয়ই হউন—সর্বকালের মহাকবি তিনি।

আবার এমন অনেক কাহিনীও আছে, যাহার মধ্যে ধর্মের পটভূমিকায় চিত্রিত করা হইয়াছে সুরুচির বিরোধী চিত্র—যাহার মধ্যে কাব্যসৌন্দর্য নাই, কবিত্বশক্তির লেশ মাত্র পরিচয়ও যাহাতে পাওয়া যায় না। **ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান**[৩২] এইরূপ একটি। রামায়ণ, পুরাণ, বৌদ্ধজাতক প্রভৃতিতে এ কাহিনী বহুবার, বহুরূপে বলা হইয়াছে। ঋষি লোমশ পাণ্ডবদের সহিত তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। যত তীর্থে তিনি আসিতেছেন, সবগুলির সম্বন্ধেই একটি করিয়া কাহিনী বলিতেছেন। এইখানেই আমরা **অগস্ত্যের সমুদ্রশোষণের কাহিনী** পাই। সমুদ্রের মধ্যে লুক্কায়িত অসুরগণকে বধ করিবার জন্য দেবগণ অগস্ত্যকে অনুরোধ করিলেন সমুদ্রশোষণ করিবার জন্য; অগস্ত্য তাহাই করিলেন। প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করিয়া ব্রাহ্মণ্য-শক্তি যে দৈবী-শক্তিকেও অনুগ্রহ করিতে পারিতেন, তাহাই এই উপাখ্যানের মধ্য দিয়া প্রচার করা হইয়াছে।

২৬। ঐ., ৫. ১. ৬. ১
২৭। ঐ., ৩. ৬. ২
২৮। মহা., ১. ১৭-১৯
২৯। মহা., ১. ৮-১২
৩০। মহা., ৩. ১২২-১২৫
৩১। ঋ., ১. ১১৬. ১০; শ. ব্রা., ৪. ১. ৫
৩২। মহা., ৩. ৮০-১৫৬

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে কেন্দ্র করিয়া বহু উপাখ্যান পাওয়া যায়। এই দুইজনের কলহের মধ্য দিয়া এক সময়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য সমাজে ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্রশক্তির যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল, তাহারই আভাস পাওয়া যায়।

কতকগুলি উপাখ্যান আছে, কাব্যসৌন্দর্যের মাপকাঠিতে যেগুলি একেবারেই মূল্যহীন এবং কেবলমাত্র ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্যই যেগুলির রচনা করা হইয়াছিল। জমির আল বাঁধিবার জন্য গুরু কর্তৃক আদিষ্ট আরুণি যখন কিছুতেই সফল হইলেন না, তখন জলস্রোত রোধ করিয়া নিজেই ভূমির উপর শয়ান রহিলেন। গুরুর আজ্ঞাপালনের জন্য আরুণির সেই অমানুষিক চেষ্টার গল্প তৎকালীন সমাজে ব্রাহ্মণগণের প্রতিপত্তির কথাই ঘোষণা করে। সূর্যতাপে ক্লিষ্ট জমদগ্নি সূর্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া আকাশ হইতে সূর্যকে ভূপাতিত করিতে উদ্যত হইলে কেমন করিয়া সূর্য স্বয়ং আসিয়া জুতা ও ছাতা দিয়া ঋষির ক্রোধ শান্ত করিলেন, সে কাহিনীও ব্রাহ্মণ্য-শক্তিরই জয়গান। মহাভারতের মধ্য দিয়া ব্রাহ্মণগণ যে এক সময়ে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবের কথা প্রচার করিবার সুপরিকল্পিত নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই আখ্যানগুলি তাহাই প্রমাণ করে।

ব্রাহ্মণ্য-রচনা
শ্রমণগণের রচনা
গল্প ও কাহিনী

মহাভারত মূলতঃ তিন শ্রেণীর রচনায় পূর্ণ—সৌত-রচনা (Bard poetry), (Brahmanical myths and legends), যতি, ভিক্ষু বা (Ascetic poetry)। ব্রাহ্মণগণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ধর্মের পটভূমিকায় রচিত দেবগণের কাহিনীর মধ্য দিয়া ব্রাহ্মণ্য-গৌরব ও ব্রাহ্মণ্য-নীতির প্রচার করাই ব্রাহ্মণ্য-রচনার উদ্দেশ্য ছিল। ভিক্ষু, শ্রমণ বা যতিগণের রচনায় এই ধরনের সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে নীতি-বোধ সীমাবদ্ধ ছিল না। এগুলির মধ্য দিয়া জীবে দয়া, বিষয়ে অনাসক্তি, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, অস্তেয়, প্রভৃতি সর্বমানবীয় নীতি ও ধর্মবোধকে জাগ্রত করার চেষ্টা দেখা যায়। সৌত-রচনা হইতে ব্রাহ্মণ্য-রচনা যেমন অনেক পরবর্তীকালের, তেমনি ব্রাহ্মণ্য-রচনারও অনেক পরবর্তীকালের রচনা এই তৃতীয় শ্রেণীর রচনাগুলি। দেবতার কথা এইগুলির মধ্যে নাই। এই ধরনের নীতি বা ধর্মবোধের প্রচার পূর্বে উপনিষদে দেখা গিয়াছে এবং পরে পুরাণ ও বৌদ্ধ সাহিত্যে আবার দেখা গিয়াছে। এই তৃতীয় শ্রেণীর রচনাগুলিকে মোটা-মুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—Fables, Parables ও Moral narratives.

সর্বজ্ঞ, ধর্মপরায়ণ বিদুরের উপদেশাবলীর মধ্যে আমরা Fables-জাতীয় বহু আখ্যান পাইয়াছি। কোনও রাজা লোভের বশে স্বর্ণপ্রসূ পক্ষিসমূহকে হত্যা করেন, ফলে তিনি পক্ষী ও স্বর্ণ দুই-ই হারান। এই গল্পটি বলিয়া বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়াছেন যে, তিনি যেন নিজের স্বার্থের বশে পান্ডবদের সহিত সেইরূপ ব্যবহার না করেন। কতকগুলি পাখী এক ব্যাধের জালে ধরা পড়িয়াছিল। প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সকলে একমত হইয়া এক সঙ্গে জাল লইয়া উড়িয়া গেল। পরে কোনও কারণে তাহাদের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হয় এবং জাল সমেত সমস্ত পাখী আবার ব্যাধের হাতে আসিয়া পড়ে। ঐক্যই যে নিরাপত্তার মূল এবং পারস্পরিক কলহই যে সকলের বিপদ ডাকিয়া আনে তাহাই বিদুর এই গল্পের মধ্য দিয়া শিক্ষা দিয়াছেন।

Parable-জাতীয় কাহিনীও অনেক আছে। **সমুদ্র ও নদীর কথোপকথনের** মধ্য দিয়া প্রচার করা হইতেছে যে, বৃহৎ শক্তির সম্মুখে নতি স্বীকার করিলে বিপদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সমুদ্র একদিন নদীসমূহকে জিজ্ঞাসা করিল যে তাহারা বড় বড় বৃক্ষসমূহকেই নদীস্রোতে বহন করিয়া সমুদ্রে আনিয়া ফেলে, অথচ ছোট ছোট গাছপালাকে আনে না—ইহার কারণ কি? গঙ্গা উত্তর করিল যে, নদীর জলস্রোতকে বড় বড় বৃক্ষগুলি বাধা দেয় বলিয়াই তাহারা উৎপাটিত হয়। আর ছোট ছোট গাছপালা

জলস্রোতের সম্মুখে অবনত হয় বলিয়াই তাহারা উৎপাটিত হয় না; কূপপতিত মানবের গল্পটিও[৩৩] এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেকে মনে করেন, বৌদ্ধগণই সংসারের অসারতা ও ভয়াবহতা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই ইহা সর্বপ্রথম মহাভারতে সন্নিবেশিত করেন।

Fables ও Parables ছাড়াও কতকগুলি নীতিমূলক উপাখ্যান পাওয়া যায়। বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য অনেক ধর্মসম্প্রদায়ই এই শ্রেণীর উপাখ্যানগুলি মহাভারতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। **রাজা শিবির উপাখ্যান** ইহারই একটি। জীবহিতে আত্মত্যাগ মহান ধর্ম—এই নীতিই ইহাতে প্রচার করা হইয়াছে। প্রেম ও মৈত্রী যে শত্রুর প্রতিও দেখান উচিত তাহা প্রচার করিবার জন্য **ব্যাধ ও কপোতের কাহিনীর**[৩৪] অবতারণা করা হইয়াছে। কপোত-কপোতীর গৃহে ব্যাধ আসিয়াছে অতিথি হইয়া। শত্রু হইলেও আজ কপোত-দম্পতিকে অতিথি সৎকার করিতে হইবে। ঘরে ব্যাধকে দিবার মত আহার্য নাই। অনন্যোপায় কপোত অগ্নি জ্বালাইয়া তাহাতে নিজেকে দগ্ধ করিল। তাহা দেখিয়া কপোতীও স্বামীর অনুগমন করিল। এই দৃশ্যে ব্যাধের চৈতন্য হইল। ব্যাধের বৃত্তি ছাড়িয়া সে চিরতরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিল।

জন্মান্তরগত কর্মই যে মানুষের ইহজন্মের সুখ-দুঃখের কারণ তাহা বুঝাইবার জন্যও কয়েকটি আখ্যান দেখা যায়। গৌতমীর পুত্র সর্পদংশনে মৃত্যু বরণ করিল। এক ব্যাধ সর্পটিকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া গৌতমীর নিকট লইয়া আসিল এবং গৌতমীকে জিজ্ঞাসা করিল যে তিনি পুত্রহন্তা সর্পকে কিভাবে বধ করিতে চান। গৌতমী সর্পটিকে হত্যা করিতে রাজী হইলেন না, কারণ তাহাতে তাঁহার পুত্রের জীবন ফিরিবে না। সর্প বলিল যে তাহার কোনও অপরাধই নাই, 'মৃত্যুই' তাঁহার পুত্রের মৃত্যুর জন্য দায়ী। সে 'মৃত্যু'র হাতে ক্রীড়নকমাত্র। 'মৃত্যু' আসিলেন; বলিলেন, তাঁহারও কোনও কর্তৃত্ব নাই, 'মহাকাল'ই এই সব কিছুর মূলে। 'মহাকাল' আসিলেন, বলিলেন, তিনিও কিছু জানেন না, গৌতমীর পুত্রের কর্ম অনুসারেই তিনি তাহার এইরূপ মৃত্যুবিধান করিয়াছেন।

যে নীতি-বোধ দৈনন্দিন জীবনে পতি-পত্নী, পিতা-পুত্র প্রভৃতির মধ্যেও সদা-জাগ্রত থাকা উচিত তাহাও অনেক উপাখ্যানের মধ্য দিয়া প্রচার করা হইয়াছে। 'চিরাকারিন্'-এর উপাখ্যান এই প্রসঙ্গে অতীব চিত্তাকর্ষক। 'চিরাকারিন্' শব্দের অর্থ 'যে সকল কাজই দেরি করিয়া করে'। এক ব্যক্তির 'চিরাকারিন্' নামে এক পুত্র ছিল। সেই ব্যক্তি কোনও সময়ে স্বীয় পত্নীর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে তাহার মাতাকে হত্যা করিবার আদেশ দিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইয়া যান। চিরাকারিন্ চিন্তায় পড়িল। মাতাকে হত্যা করা মহা অপরাধ, আবার পিতার আদেশ লঙ্ঘন করাও অপরাধ। সে ভাবিতে লাগিল তাহার কর্তব্য কি? ভাবিয়াই চলিয়াছে চিরাকারিন্। এমন সময়ে তাহার পিতা ফিরিলেন—রাগ তাঁহার ততক্ষণ পড়িয়া গিয়াছে। পুত্র যে এখনও তাঁহার আদেশ পালন করে নাই, ইহা দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন।

সমগ্র মহাভারতে **নীতি, ধর্ম ও মোক্ষবিষয়ক** আলোচনা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। Didactic section বলিতে এই তিন শ্রেণীর রচনাংশকে বুঝা যায়। 'নীতি' শব্দটির সাধারণ অর্থ ব্যাপক হইলেও মুখ্যতঃ রাজনীতির আলোচনা এই অংশে প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছে। **শান্তিপর্ব** এবং **অনুশাসনপর্ব** এই জাতীয় আলোচনায় পরিপূর্ণ এবং সেইজন্যই পণ্ডিতেরা এই দুইটি

মহাকাব্যে নীতি

পর্বকে মূল মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের মৃত্যুর এখনও ছয় মাস দেরি। এই সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির

৩৩। মহাভারত, ১১.৫

৩৪। মহাভারত, ২২· ১৪৩-১৪৯

ব্যাসের উপস্থিতিতে ভীষ্মের নিকট হইতে নীতি, ধর্ম ও মোক্ষবিষয়ক যে সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহাই শান্তিপর্বের বিষয়বস্তু। শান্তিপর্বের প্রথম অংশে রাজার কর্তব্য, বর্ণাশ্রমধর্ম, মাতাপিতার প্রতি পুত্রের ও আচার্যের প্রতি শিষ্যের কর্তব্য প্রভৃতি এবং দ্বিতীয়ার্ধে আছে দার্শনিক তত্ত্বসমূহের আলোচনা। সাধারণতঃ এই জাতীয় আলোচনায় কাব্যসৌন্দর্যের কোনও অবকাশ নাই, কিন্তু শান্তিপর্বে এমন অনেক স্থান আছে যাহা চিরকালের কাব্যসম্পদরূপে পরিগণিত হইতে পারে। অনুশাসনপর্ব স্মৃতিশাস্ত্রের কথায় পূর্ণ এবং স্মৃতিশাস্ত্রগুলি হইতে ইহার পার্থক্য এই যে ইহার মাঝে মাঝে আছে অতিরঞ্জিত ও অবিশ্বাস্য পৌরাণিক কাহিনী। শান্তিপর্বেরও অনেক পরে অনুশাসনপর্ব মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সমাজের সর্বস্তরের উপর ব্রাহ্মণগণ নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব এই অংশে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পাইয়াছেন, মহাভারতের কুত্রাপি তাহা দেখা যায় না। ইহা ছাড়াও **বনপর্ব, উদ্যোগপর্ব, ভীষ্মপর্ব** এবং **শল্যপর্বেও** এই ধরনের রচনা দেখা যায়।

এই জাতীয় রচনার মধ্যে **ভগবদ্গীতাই** সর্বপ্রধান। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে উভয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কৃষ্ণের সারথ্যে অর্জুনের রথ আসিয়া দাঁড়াইল। কৌরবসৈন্যের পুরোভাগে অর্জুন দেখিলেন পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, জ্ঞাতিভ্রাতা দুর্যোধনাদিকে। আত্মীয় ও গুরুহত্যা করিয়া রাজ্যলাভ করিতে তাঁহার মন চাহিল না। শরীর অবশ হইয়া কাঁপিতে লাগিল, জিহ্বা শুষ্ক হইয়া আসিল, রথের উপর বসিয়া পড়িলেন অর্জুন, হাত হইতে ধনুর্বাণ খসিয়া পড়িল। কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কর্তব্য কি? এই প্রশ্নে কৃষ্ণ অর্জুনকে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল অমূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই গীতার উপজীব্য। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রসমূহে মোক্ষপ্রাপ্তির যে সকল পথ নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহাদের মধ্যে আপাতবিরোধ আছে। গীতা সেই বিরোধের সমাধান করিয়াছে, বিভিন্ন মত ও পথের সমন্বয় সাধন করিয়াছে। জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ—এই তিনের সমন্বয় গীতা। আত্মার অবিনশ্বরত্ব[৩৫], নিষ্কাম কর্মযোগ[৩৬], ঈশ্বরে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ[৩৭]—এই তিনই হইল গীতার মর্মবাণী। কৃষ্ণই একমাত্র ঈশ্বর। সর্বভূতে তিনিই বিরাজমান—এই তত্ত্বই গীতা প্রচার করিয়াছে। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে যে কৃষ্ণ অর্জুনকে এই সুদীর্ঘ উপদেশ দেওয়ার অবসর পাইয়াছিলেন বা সেইরূপ অবস্থায় তাহা দেওয়া স্বাভাবিক ছিল, ইহা মনে হয় না। খুব সম্ভব কৃষ্ণের মূল উপদেশ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছিল এবং পরে তাহাকেই ভিত্তি করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায়-সমন্বিত গীতাকে মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। যাহাই হউক না কেন, গীতার রচয়িতা একাধারে যে কবি ও দার্শনিক দুই-ই ছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। গীতার ভাষার সহিত উপনিষদের ভাষার সাদৃশ্য হইতে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে উপনিষদের যুগে উপনিষদ্ হিসাবেই ইহা রচিত হয়।[৩৮] খৃষ্টাব্দ ৮৮৩ শতকে কাশ্মীররাজ অবন্তীবর্মা মৃত্যুকালে গীতা পাঠ করাইয়া শুনিয়াছিলেন।[৩৯] আরবীয় পর্যটক অল্‌বেরুণিও ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। ইংরাজী ও ল্যাটিন ভাষাতেও ইহার

৩৫। 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥'—গীতা

৩৬। এই নিষ্কাম কর্মযোগকেই গীতায় 'যোগ' বলা হইয়াছে।

৩৭। 'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥' —ঐ

৩৮। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩,১৭) দেবকীর পুত্র কৃষ্ণকে মহর্ষি ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য বলা হইয়াছে। তাঁর যে উপদেশ তাও গীতার উপদেশের মতই। হয়ত তিনিই গীতার রচনাকার।

৩৯। রাজতরঙ্গিণী, ৫,১২৫

অনুবাদ হইয়াছে। বাণভট্ট নবম শতকেও গীতার কথা জানিতেন, সুতরাং ইহাই প্রমাণিত হয় যে তাহারও বহু পূর্বেই ইহার রচনা শেষ হইয়া গিয়াছিল।

শান্তিপর্বের আর একটি অংশের নাম **নারায়ণীয়**[৪০]। ইহা গীতারও অনেক পরে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। নারায়ণকেই ইহা একমাত্র দেবতা বলিয়াছে এবং ইহার রচনাশৈলী পুরাণের মত। ভক্তি ও ঈশ্বরের করুণাই মুক্তিলাভের উপায় ইহাই ইহাতে প্রচার করা হইয়াছে। সাংখ্য ও যোগ মুখ্যতঃ মহাভারতের দার্শনিক মতবাদ হইলেও বেদান্তের মতবাদও আমরা ইহাতে দেখিতে পাই। **সনৎসুজাতীয়**[৪১] নামক অংশ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

হরিবংশ

হরিবংশ বা **হরিবংশপুরাণ** মহাভারতের অংশ এবং ব্যাসই ইহার বক্তা। বিষ্ণুর মহিমা কীর্তনের জন্য নানাপ্রকার আখ্যান, উপাখ্যান এবং স্তব-স্তুতিতে ইহা পূর্ণ। মোট ১৬,৩৭৪টি শ্লোকের সংকলন এই অংশ মহাভারতের পরিশিষ্ট এবং অনেক পরবর্তীকালে রচিত। ইহার শেষ অংশ আবার মূল হরিবংশেরও পরে রচিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথমে শৌনক উগ্রশ্রবাকে অনুরোধ করিলেন, যে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশে শ্রীকৃষ্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য। তাহা হইতেই হরিবংশের সৃষ্টি। প্রথম ও শেষদিকে মহাভারতের প্রশংসা ও মহাভারত পাঠের পুণ্য মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহা তিনটি পর্বে বিভক্ত—(১) হরিবংশপর্ব—পুরাণের মত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কথা; বেণ, পৃথু, ধ্রুব, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র, চন্দ্রবংশ প্রভৃতির উপাখ্যান। (২) বিষ্ণুপর্ব—কৃষ্ণের জীবনেতিহাস। (৩) ভবিষ্যপর্ব—ভবিষ্যৎকালের কথা। ভাষা ও বিষয়বস্তুর দিক হইতে ইহা সম্পূর্ণ পুরাণের ন্যায়। একজনের বা এক সময়ের রচনা বলিয়াও ইহাকে মনে হয় না।

প্রক্ষিপ্ত অংশ

মহাভারতে পাণ্ডবদের সাধু, সত্যনিষ্ঠ, ধর্মপরায়ণ এবং সাহসীরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে এবং কৌরবগণকে হিংসা ও মাৎসর্যপরায়ণ এবং বিশ্বাসঘাতকরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। অথচ বলা হইয়াছে যে কৌরবদের পরাজয়ের মূল কারণ হইল পাণ্ডবদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং অধর্মযুদ্ধ। পাণ্ডবদের সকল দুর্নীতির ফন্দি ও উৎসাহ দিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ, আর সেই কৃষ্ণকেই বলা হইয়াছে বিষ্ণুর অবতার, ধর্মের রক্ষক ও শ্রেষ্ঠ দেবতা। পরস্পরবিরোধী এই উক্তির কারণ কি? Winternitz মনে করেন, এক সময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে এক রাজশক্তির পতন ও তৎস্থানে অন্য রাজশক্তির উত্থানের ঐতিহাসিক ঘটনাই ইহার মূলে। সূতগণ মহাভারত-প্রণয়নে মুখ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৌরবগণের পতনের পর সেই সূতগণই পাণ্ডববংশের আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মূল রচনার মধ্যে এই নূতন রাজশক্তির প্রতি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ রচনা সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। মহাভারতের বক্তা সূত সঞ্জয়। ইনি কৌরব-পক্ষের লোক। তাঁহার বিবরণে স্বাভাবিকভাবেই কৌরববংশের প্রতি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ উক্তি থাকিবে। আবার জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে মহাভারত পঠিত হয়। জন্মেজয় পাণ্ডববংশীয়; সুতরাং সেই সময়ে মহাভারতে পাণ্ডবগণের পক্ষ সমর্থনকল্পেও কিছু কিছু অংশ সন্নিবেশিত হইয়া থাকিবে। এই বিষয়ে কৃষ্ণের চরিত্রগত বৈচিত্র্য বিশেষ লক্ষণীয়। পাণ্ডবসুহৃৎ কৃষ্ণ, বিচক্ষণ রাজনীতিক কৃষ্ণ, দানবঘাতী কৃষ্ণ, গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ, বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ—সকলেই যে এক কৃষ্ণ, এ বিষয়েও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। মূল মহাভারতের কৃষ্ণ যোদ্ধা, মহাবীর, বিচক্ষণ রাজনীতিক, কূটকৌশলী। ভগবানের অবতাররূপে তিনি সেখানে কীর্তিত হন নাই, বরং ছলে, বলে, কৌশলে যুদ্ধজয় করার নীতিতেই তিনি পাণ্ডবগণকেই দীক্ষিত করিয়া-

৪০। মহা., ১২,৩৩৪-৩৫১
৪১। ঐ, ৫. ৪১-৪৬

ছিলেন। কৌরব-রাজবংশের হাত হইতে রাজশক্তি পাণ্ডববংশে হস্তান্তরিত হইলেই পাণ্ডবদের সমস্ত অন্যায়ের সমর্থনকল্পে কৃষ্ণকে দেবতায় রূপান্তরিত করা হইয়াছে।[৪২] বস্তুতঃ, পাণ্ডবসখা কৃষ্ণ ও ভগবদ্‌গীতার কৃষ্ণের চরিত্রগত পার্থক্য এতখানি যে উভয় কৃষ্ণকে একই ব্যক্তি বলিয়া মনে করা কঠিন হইয়া পড়ে।

রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মের ক্ষেত্রে মহাভারতে যে পরিবর্তন দেখা যায়, সেদিক দিয়া বিচার করিলেও সমগ্র মহাভারতকে একই কালের এবং একজনের রচনা বলিয়া মনে করার কোনও কারণ নাই। দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চস্বামীর বিবাহ যখন হইয়াছিল তখন হয়ত সমাজ এইরূপ বিবাহের অনুমোদন করিত। কিন্তু সেই মহাভারতেই দ্রুপদের মুখে আমরা শুনিয়াছি যে এক স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকা ধর্মবিগর্হিত। কাজেই, সামাজিক প্রথা হয় ইতিমধ্যে পরিবর্তিত হইয়াছিল, নতুবা ভারতের যে অঞ্চলে এবং যে জনসমষ্টির মধ্যে ঐ প্রথা সমর্থন লাভ করিয়াছিল মহাভারত সেই গণ্ডী ইতিমধ্যে অতিক্রম করিয়াছে। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীগ্রহণের যে প্রথার নিন্দা দ্রুপদ করিয়াছেন, কয়েকটি অলৌকিক কাহিনী দ্বারা মহাভারত সেই প্রথারই সমর্থন করিয়াছে। এই উপাখ্যানসমূহ অবশ্যই পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত। বিরাটপর্বে উত্তরকে সারথি করিয়া যে অর্জুন ক্ষণেকের মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি পরিচালিত বিশাল কৌরববাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন সেই অর্জুনের কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে কৌরববাহিনীকে পরাজিত করিতে সুদীর্ঘ আঠারো দিন লাগিয়াছিল, উপরন্তু তাঁহাকে অধর্ম ও অন্যায়ের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া ভীষ্মের উপর শরবর্ষণ এবং রথচক্রগ্রাসে বিপন্ন কর্ণের উপর আক্রমণই ইহার প্রমাণ। বিরাটপর্ব অবশ্যই প্রক্ষিপ্ত অংশ। যুদ্ধের শেষে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী সমেত কৌরব রমণীগণ যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শনে আসেন; অথচ অন্যত্র বলা হইয়াছে যে গান্ধারী ব্যাসের কৃপায় এমন শক্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন যে বহুদূরে থাকিয়াও তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন।[৪৩]

পূর্বে বলা হইয়াছে যে মহাভারত মূলতঃ তিন শ্রেণীর রচনায় পূর্ণ—(১) সৌত-রচনা (মূল মহাভারত এতটুকুই), (২) ব্রাহ্মণ্য-রচনা (দেবগণের কাহিনী, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কথা, ধর্মনীতি, রাজনীতি, বর্ণাশ্রমধর্ম, আখ্যান, উপাখ্যান প্রভৃতি) এবং (৩) যতি, শ্রমণ ও ভিক্ষুসম্প্রদায়ের রচনা (অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, অস্তেয়, জগতের অনিত্যতা প্রভৃতির প্রতিপাদক রচনাংশ)। প্রথমটি হইতে দ্বিতীয় অংশ এবং দ্বিতীয় অংশ হইতে তৃতীয় অংশ পরবর্তীকালের; এবং মূল মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত অংশ বলিলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর রচনাদ্বয়কে বুঝায়। হরিবংশ পরবর্তীকালের রচনা এবং ইহার শেষ ভাগ আরও পরের। শান্তিপর্ব, অনুশাসনপর্ব সমগ্র এবং অন্যান্য পর্বের যে সমস্ত অংশে নীতি, ধর্ম ও মোক্ষবিষয়ক আলোচনা রহিয়াছে তাহাও প্রক্ষিপ্ত।

ভাষা, রীতি ও ছন্দের দিক দিয়াও মহাভারতের রচনার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই। প্রাক্‌-মহাকাব্য যুগের সংস্কৃত রচনার ছাপ যেমন বহুস্থানে আছে, তেমনি আবার মহাকাব্যোত্তর যুগের রীতি ও ভাষার হৃদয়গ্রাহিতাও আছে। মহাভারতকে যে আয়তনে আমরা পাইয়াছি তাহা একই ব্যক্তির বা একই কালের যে রচনা নহে

৪২। তুলঃ "It is possible, moreover, that Krisna did not figure at all in the original epic, and was introduced only later, perhaps with the express intention of justifying the actions of the Pandavas, which were shady from the moral point of view, by representing them as inspired by the 'God Krisna."—Winternitz: *History of Indian Literature*, Vol. I, p. 457

Oldenberg এবং Jacobi-ও ইহা সমর্থন করিয়াছেন।

৪৩। "This is certainly a feature which is foreign to the old poem, the clumsy idea of a later pedant."—*Ibid*

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা প্রমাণিত হইবে।[৪৪] মহাভারতের প্রথম দুই অধ্যায়ে আমরা যে বিষয়সূচীর তালিকা পাই তাহার সহিত বর্তমান মহাভারতের বিষয়গত কোনও মিল নাই। অলবেরুণি মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের যে নাম জানিতেন, তাহাও বর্তমান নামগুলির সঙ্গে মেলে না। Holtzmann-এর মতে কৌরব রাজবংশের বীর্য-গাথাই ছিল মূল মহাভারত, বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া পাণ্ডব রাজবংশের অনুকূলে ইহার রচনাংশ পরিমার্জিত হয়, তাহারও পরে ব্রাহ্মণগণ ও বৌদ্ধগণ ইহার অঙ্গসজ্জা করেন। Weber-এর[৪৫] মতে, বর্তমান মহাভারতের যে আয়তন তাহার চার ভাগের এক ভাগ (প্রায় ২০,০০০ শ্লোক) হইল প্রাচীন অংশ এবং ইহারও আবার তিন ভাগের দুই ভাগ হইল মূল মহাভারত; কারণ মহাভারতেই বলা হইয়াছে যে মূল মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা ছিল ৮,৮০০।[৪৬] মহাভারতের মূল উপাখ্যান অষ্টাদশপর্বের অর্ধেকও হইবে না।[৪৭]

Macdonell-এর মতে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের ঐতিহাসিক ঘটনাই মহাভারতের মূল আখ্যানভাগের বীজ। যজুর্বেদে এই দুই পৃথক্ রাজবংশ এক হইয়া গিয়াছে এবং কাঠকসংহিতাতে রাজা ধৃতরাষ্ট্র বৈচিত্রবীর্যের নাম পাওয়া যায়। সুতরাং যে ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া মূল আখ্যানভাগ রচিত হইয়াছিল তাহা খৃঃ পূঃ **দশম শতকের** পরবর্তীকালের হইতে পারে না।

মহাকাব্যের কাল—রচনা-স্তর

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে যে সকল রাজা ও রাজবংশ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের বীরত্বের গাথাসমূহ লোকমুখে চলিয়া আসিতেছিল এবং সাধারণ জনসভায় বা বড় বড় যজ্ঞস্থলে গীত হইত। বহু পরে কবিত্বশক্তির অধিকারী কোনও বিশেষ ব্যক্তি এই সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বীর্যগাথাসমূহকে একটি কাব্যের রূপ দান করেন, এইরূপ অনুমান করা চলিতে পারে। ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে যে এই মূল কাব্যে কৌরবগণকে ন্যায় ও ধর্মের পক্ষপাতী বলিয়া এবং যুদ্ধে পাণ্ডবগণের অসাধুতা ও বিশ্বাসঘাতকতাকেই কৌরবের পতনের কারণ বলিয়া উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। ইহাই ছিল মূল মহাভারত। মহাভারতে দেবগণের মধ্যে ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠত্ব যে যে অংশে ঘোষিত হইয়াছে, তাহাও এই সময়ের রচনা। পালি সাহিত্য হইতে জানা যায় যে, বুদ্ধের সময়েই ব্রহ্মা প্রধান দেবতারূপে পরিগণিত হইতেন। এই দিক দিয়া বিচার করিলে মনে হয়, আমাদের মহাভারত **খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকের** মধ্যেই তাহার মূলরূপ

৪৪। "Thus even what we can term the 'actual epic' as it has come down to us, is certainly not the work of *one* poet. Even this 'nucleus' of the Mahabharata is no longer the old heroic poem; but the latter is *contained* in it, in a much diluted condition." —Winternitz: *History of Indian Literature*, Vol. I, p. 459

৪৫। *Indian Literature*, p. 187-88.

৪৬। মহা., ১.৮১

৪৭। মহাভারতের বোম্বাই সংস্করণে ২,১০৯ অধ্যায় আছে। তাহার মধ্যে প্রায় ১০০০ অধ্যায়ে এই মহাভারতের মূল কাহিনী শেষ হইয়া গিয়াছে।

মহাভারতের বিভিন্ন গঠনস্তর সম্বন্ধে M. Krishnamachariar (*Hist. of Classical Skt. Lit.*, p. 29) বলিয়াছেন—"We have, therefore, three points at which the Mahabharata may actually be said to begin. *First*, from the very beginning of the text as we have it, with the invocation of Nara and Narayana; following the invocation we have conversation with Sauti and the sages of Saunaka's hermitage. *Second*, from the description of the *Sarpa Sattra* (serpent sacrifice) of Janmejaya where commences the Astika Parvan. *Third*, from the commencement of the actual narrative of the history of the Bharata race, where begins the Amsavatarana Parvan."

পরিগ্রহ করিয়াছিল। আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্রের সময়েও 'ভারত' বা 'মহাভারত' নামক কোনও মহাকাব্যের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া জানা যায়। ইহা হইতেও উপরিউক্ত অনুমান সমর্থিত হয়।

তৃতীয় স্তরে দেখা যায়, মূল মহাভারত সূতগণের মুখে মুখে আরও বাড়িয়া গেল—নূতন গাথা, নূতন কাহিনী তাহার অন্তর্ভুক্ত হইল এবং প্রায় ২০,০০০টি শ্লোকের সংকলনে পরিণত হইল। এই স্তরেই কৌরবগণের স্থানে পাণ্ডবগণের অনুকূলে মহাভারতের রচনা রূপ পরিগ্রহ করে এবং ব্রহ্মার সহিত শিব ও বিষ্ণুর মাহাত্ম্যও কীর্তিত হইতে থাকে।[৪৮] মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে জানা যায়, খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকেই শিব ও বিষ্ণু হিন্দুসমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন এবং শৈব ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ই বর্তমান ছিলেন। মহাভারতের এই স্তরের সংকলন খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের পূর্বেই হইয়া গিয়াছিল এইরূপ অনুমান করা চলে।[৪৯]

দার্শনিকপ্রবর কুমারিল (700 A. D.) মহাভারত হইতে বহুল অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। মহাকবি সুবন্ধু ও বাণভট্ট (600-650 A.D.) মহাভারতের কথা জানিতেন। কাদম্বরীতে দেখা যায় যে রানী বিলাসবতী উজ্জয়িনীর মন্দিরে মহাভারত পাঠের সময় স্বয়ং উপস্থিত রহিয়াছেন। যবন ও বৌদ্ধগণের উল্লেখ হইতে ইহাও মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে বৌদ্ধধর্মের প্রচারের পর এবং আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পরও মহাভারত রচিত হইয়া চলিয়াছিল। এইসব তথ্য হইতে Winternitz সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মহাভারতের রচনাকাল সুদীর্ঘ খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতক হইতে খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতক (4th B. C.—4th A.D.) পর্যন্ত। সম্ভবতঃ খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতাব্দীর পরে আর ইহাকে টানিয়া আনা চলে না।

মহাভারতের রচনাকাল সম্বন্ধে আলোচনা করার পর Winternitz তাঁহার আলোচনার মূলসূত্রগুলি যেমন দিয়াছেন নীচে তেমনি দেওয়া হইল :

1. Single myths, legends and poems which are included in the Mahabharata, reach back to the time of the Veda.

2. An epic "Bharata" or "Mahabharata" did not exist in the Vedic period.

3. Many moral narratives and sayings which our Mahabharata contains, belong to the ascetic poetry, which was drawn upon, from the 6th century B. C. onwards, also by Buddhists and Jains.

4. If an epic Mahabharata already existed between the 6th and 4th centuries B. C., then it was but little known in the native land of Buddhism.

৪৮। এই সময়েই পাণ্ডবসখা, কূট রাজনীতিক ও মহাবীর কৃষ্ণকে ভগবান কৃষ্ণে রূপান্তরিত করা হয় ও পাণ্ডবদের অনেক অন্যায় কার্যের সমর্থনকল্পে তাঁহার উপদেশগুলি ভগবানের নির্দেশ বলিয়া ঘোষিত হয়।

৪৯। Macdonell: *Sanskrit Literature*, p. 284-86

দ্রষ্টব্য : তৃতীয় স্তরের পর **চতুর্থ স্তরে** মহাভারতে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব লক্ষিত হয় এবং এই সময়েই ব্রাহ্মণ্য রচনাগুলি (পৌরাণিক আখ্যান, উপাখ্যান, দেবতাদের কাহিনী, বর্ণাশ্রম, নীতি-ধর্ম-মোক্ষবিষয়ক রচনাসমূহ) মহাভারতে স্থানলাভ করে। **পঞ্চম স্তরে** যতি-ভিক্ষু-শ্রমণ সম্প্রদায়ের (Ascetic) রচনা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়া বর্তমান মহাভারতের বিপুল আয়তন সৃষ্টি করিয়াছে।

5. There is no certain testimony for an epic Mahabharata before the 4th century B. C.

6. Between the 4th century B. C. and the 4th century A. D. the transformation of the epic Mahabharata into our present compilation took place, probably gradually.

7. In the 4th century A. D. the work already had, on the whole, its present extent, contents and character.

8. Small alterations and additions still continued to be made, however, even in later centuries.

9. *One* date of the Mahabharata does not exist at all, but the date of every part must be determined on its own account.

রামায়ণ

রামায়ণের রচয়িতা বাল্মীকি। তিনি 'আদিকবি', রামায়ণ 'আদিকাব্য'। বিষ্ণুপুরাণে[৫০] বলা হইয়াছে যে বাল্মীকি ভৃগুর বংশধর এবং বৈবস্বত মন্বন্তরে তিনিই চতুর্বিংশ ব্যাস। অধ্যাত্মরামায়ণে বাল্মীকি নিজের অতীত জীবনেতিহাস নিজেই বলিয়াছেন। ক্রৌঞ্চমিথুনের একটি ব্যাধের শরে আহত হইলে তাঁহার মনে যে করুণাঘন ভাব উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, শ্লোক-ছন্দে তাহাই প্রথম রূপ পরিগ্রহ করে।[৫১] এমতাবস্থায়, তিনি ব্রহ্মার আদেশে রামায়ণ রচনা করেন এবং ইহার নাম দেন 'রামায়ণ', 'সীতাচরিত', 'পৌলস্ত্যবধ'। মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণ আয়তনে ছোট এবং রচনায় পরস্পর-সংবদ্ধতা ও ধারাবাহিকতা মহাভারত অপেক্ষা ইহাতে অনেক বেশী। যে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্যে পরবর্তীকালের সংস্কৃত কাব্যসমূহ সংস্কৃত সাহিত্যে নিজেদের একটি পৃথক্ স্থান করিয়া লইয়াছে তাহার সবগুলির প্রথম সূচনা রামায়ণে। রামায়ণ যুগে যুগে ভারতবাসীর চিন্তা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, পৃথিবীর আর কোনও গ্রন্থ কোনও জাতির জীবনে ততখানি প্রভাব বিস্তার করে নাই। ব্রহ্মা বাল্মীকিকে বলিয়াছিলেন, পৃথিবীতে যতদিন পর্যন্ত পর্বত ও নদীসমূহ বর্তমান থাকিবে ততদিন রামায়ণ জনগণের মধ্যে প্রচারিত থাকিবে।[৫২] ব্রহ্মার সেই আশীর্বাণী সার্থক হইয়াছে। কালিদাস, ভবভূতি, ভাস প্রভৃতি এই রামায়ণকে অবলম্বন করিয়াই কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। খৃষ্টাব্দ একাদশ শতকে তামিল ভাষায় ইহার অনুবাদ হয় এবং তাহার পর হইতে ভারতের প্রায় সর্বত্র স্থানীয় ভাষায় ইহার প্রচার হইয়াছে। বাংলা দেশে 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' ও তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণ 'রামচরিতমানস' আজও জাতির ঘরে ঘরে পঠিত হইতেছে। এমন কোনও কল্পনা নাই, এমন কোনও আদর্শ নাই, এমন কোনও ভাবাভিব্যক্তি নাই যাহা সুললিত ভাষায় রামায়ণে গ্রথিত হয় নাই। পত্নীপ্রাণ পতি হিসাবে, পিতৃভক্ত পুত্র হিসাবে, প্রজানুরঞ্জক শাসক হিসাবে এখনও ভারতবর্ষে কোনও আদর্শ রামচন্দ্রকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। ভ্রাতার আদর্শরূপে লক্ষ্মণ ও ভরতের চরিত্র, সেবকের আদর্শরূপে হনুমানের চরিত্র, সাধ্বী ও পতিগতপ্রাণা

ভূমিকা

৫০। বিষ্ণুপুরাণ, ৩.৩

৫১। মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

৫২। যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবৎ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥

পত্নীরূপে সীতার আদর্শ আজও ভারতবাসীর ধ্রুবতারা। রামায়ণী-কথা আজও পুরাতন হয় নাই। বালক-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী সকলের নিকট আজও তাহা চির-নূতন, চির-উপাদেয়।[৫৩] মহাভারতের মতই প্রথমে ইহা সূতগণ-নিবদ্ধ বীর্যগাথা মাত্র ছিল, মহাভারতের মতই যুগে যুগে বিভিন্ন দিক হইতে মেদ সঞ্চয় করিয়া ইহা কলেবর পুষ্ট করিয়াছে, মহাভারতের কৃষ্ণের মতই রাজপুত্র রামকে পরে বিষ্ণুর অবতাররূপে প্রচার করা হইয়াছে, মহাভারতের মতই মূল রামায়ণে কালে কালে বহু অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। হিন্দু মত অনুসারে সাত কাণ্ড ও পাঁচশত অধ্যায়ে বিভক্ত এই মহাকাব্যে ২৪,০০০টি শ্লোক আছে। বোম্বাই, বাংলা ও পশ্চিম-ভারত—এই তিনটি শাখায় রামায়ণ প্রচলিত।[৫৪] বার্লিন লাইব্রেরীতে রক্ষিত একটি পুঁথিতে রামায়ণের আরও একটি শাখা সংরক্ষিত আছে বলিয়া জানা যায়।[৫৫]

মূল ও পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত অংশ

পণ্ডিতেরা বলেন, সপ্তম কাণ্ডটি যে মূল রামায়ণে পরবর্তীকালে সংযোজিত হইয়াছিল ইহা সংশয়াতীত এবং প্রথম কাণ্ডও যে মূল রামায়ণের অন্তর্গত ছিল না তাহাও তাঁহারা একপ্রকার সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ কাণ্ডের ভাষা ও রচনাশৈলীর সহিত প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডের ভাষা ও রচনাশৈলীর পার্থক্য তাঁহাদিগকে এই সিদ্ধান্তে আসিতে বাধ্য করিয়াছে। তাছাড়া, প্রথম কাণ্ডে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ কাণ্ডের মধ্যে কোথাও তাহার প্রতি কোনও ইঙ্গিত বা তাহার সমর্থন ও উল্লেখ তো পাওয়া যায়ই না, উপরন্তু প্রথম কাণ্ডের কতকগুলি উক্তি পরবর্তী পাঁচটি কাণ্ডের বিরোধী।

আলোচনায় দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ কাণ্ড পর্যন্ত অংশকেই 'মূল রামায়ণ' বলা হইবে। রামচন্দ্র যে বিষ্ণুর অবতার ইহা একমাত্র প্রথম ও সপ্তম কাণ্ড ছাড়া মূল রামায়ণে কোথাও বলা হয় নাই এবং মূল রামায়ণের যে অংশে এইরূপ স্বীকৃতি সমর্থন লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়, তাহাও মূলের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত এইরূপ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন। মূল রামায়ণে বর্ণনীয় বিষয়সমূহ পরস্পরসংলগ্ন হইয়া অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডে এই সংলগ্নতা নাই এবং রচনার মাঝে মাঝে পুরাণের রীতিতে আখ্যান ও উপাখ্যান ইতস্ততঃ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

রামায়ণের পুঁথিসমূহের মধ্যে একখানি পুঁথিতে দুইটি সূচীপত্র পাওয়া গিয়াছে। একখানিতে দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ কাণ্ড পর্যন্ত এবং অপরখানিতে প্রথম ও সপ্তম কাণ্ড পর্যন্ত দেখানো হইয়াছে। মূল রামায়ণ যে এক সময়ে দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ কাণ্ডেই সম্পূর্ণ ছিল, উপরোক্ত প্রমাণগুলির পর এই আবিষ্কার সেই ধারণাকে বদ্ধমূল করিতে সহায়তা করিয়াছে। মনে হয় মূল রামায়ণের রাজপুত্র রামচন্দ্রকে পরবর্তীকালে দেবতা বলিয়া ঘোষণা করিবার সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য লইয়াই প্রথম কাণ্ড রচিত হয়। পৃথিবীর রাজপুত্র রামচন্দ্র যে বিষ্ণুর অবতার হইয়াই আসিয়াছিলেন সেই কথা প্রতিপন্ন

৫৩। তুলঃ "Notwithstanding the wilderness of exaggeration and hyperbole through which the reader of the Indian epics has occasionally to wander, there are in the whole range of the world's literature few more charming poems than the Ramayana."—M. Williams: *Indian Wisdom*, p. 365

৫৪। Macdonell: *Sanskrit Literature*, p. 303
বোম্বাই ও বাংলা সংস্করণের পার্থক্য C. V. Vaidya: *Riddle of the Ramayana*-এর Appendix-এ আলোচনা করিয়াছেন।
রামের জন্মপত্রিকার জন্য দ্রষ্টব্যঃ Weber: On the Ramayana, *Indian Antiquary*, Part I, p. 120

৫৫। Weber's *Catalogue*, 119

করাই প্রথম কাণ্ডের উদ্দেশ্য। রাক্ষসদের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবতাগণ বিষ্ণুর নিকটে গিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু স্বয়ং ইহার প্রতিবিধান করার জন্য রাজা দশরথের পুত্ররূপে জন্মিবার প্রতিশ্রুতি দেন। রামের জন্মের ইতিহাসের এই অলৌকিকত্বের সহিত সংগতি রাখিবার জন্যই সপ্তম কাণ্ড রচনা করিতে হয়। সপ্তম কাণ্ডে রামচন্দ্রের শেষ পরিণামকেও অলৌকিকত্বের বর্ণে চিত্রিত করা হইয়াছে।

ভ্রাম্যমাণ গায়ক ও কথকশ্রেণীর মুখে মুখে এক সময়ে ভারতবর্ষে রামায়ণ গীত হইত এবং শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জনের জন্য ঐ সমস্ত গায়ক ও কথকগণ যে ধরনের বর্ণনায় শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হইত সেই ধরনের বর্ণনাকে নিজেদের খুশিমত অতিরঞ্জিত করিয়া বলিয়া যাইতেন। তখনও রামায়ণ লিখিত হয় নাই এবং লিখিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মূল রামায়ণের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনসাধনে সূতগণই সর্বেসর্বা ছিলেন।[৫৬] লিখিত রূপ গ্রহণ করার পরও যে রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত অংশ প্রবেশ করিয়াছে, বিভিন্ন শাখায় রামায়ণের অস্তিত্বই তাহার প্রমাণ।

Lassen-এর মতে, রামায়ণের গঠনকে চারিটি স্তরে ভাগ করা যায়। **প্রথম স্তরে**, হিমালয় অভিমুখে রামচন্দ্রের নির্বাসন এবং সীতা ও লক্ষ্মণ কর্তৃক তাঁহার অনুগমন—এইটুকুই মাত্র ছিল। **দ্বিতীয় স্তরে**, গোদাবরীতীরকে নির্বাসনস্থান করা হইয়াছে এবং সেখানে আশ্রমস্থ মুনিঋষিগণকে রামচন্দ্র রাক্ষসদের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়াছেন। **তৃতীয় স্তরে**, রামচন্দ্র দাক্ষিণাত্যবাসিগণকে পরাজিত করার চেষ্টা করেন। **চতুর্থ স্তরে**, লঙ্কারাজ রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা।[৫৭]

Weber রামায়ণের কাল নির্ধারণ প্রসঙ্গে যে সকল যুক্তি দিয়াছেন নিম্নে তাহার কয়েকটি দেওয়া হইলঃ

রামায়ণের রচনাকাল

(ক) প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত রামায়ণ রূপক। এই রূপকের রাজ্যে **ঐতিহাসিক সত্যতা** অতি সামান্য এবং তাহা হইল এই যে এক সময়ে আর্য-সভ্যতা দক্ষিণে, বিশেষতঃ Ceylon অভিমুখে, প্রসারলাভ করিয়াছিল।

(খ) রামায়ণে **যবন** শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা যে গ্রীকদেরই বুঝাইয়াছে এমন নিশ্চয় করা যায় না, পরন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতে এক সময়ে যত বৈদেশিক জাতি আক্রমণ করিয়াছিল তাহাদের সকলকেই বুঝাইয়াছে। ইহা হইতে বলা যায়, ভারতবর্ষে গ্রীক আক্রমণের পূর্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল।

(গ) খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে **পাটলিপুত্র** নগরী নির্মিত হয় এবং খৃঃ পূঃ ৩৫০-এ উহা এক বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। রামায়ণে এই প্রসিদ্ধ নগরীর কোনও উল্লেখ নাই। ইহা হইতে এইরূপ অনুমান করা চলে যে পাটলিপুত্র নগরীর প্রতিষ্ঠার পূর্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল।

(ঘ) রামায়ণে কোশলের রাজধানীর নাম 'অযোধ্যা'; বৌদ্ধ ও জৈন যুগে ইহার নাম হইয়াছিল 'সাকেত'। সুতরাং, বৌদ্ধ যুগের বহু পূর্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল।

(ঙ) রামায়ণে মিথিলা ও বিশালা দুইটি পৃথক্ নগরী ছিল। বুদ্ধের সময়ে দুইটি নগরী মিলিয়া একই শাসনতন্ত্রের অধীনে আসিয়াছিল এবং ঐ মিলিত রাজ্যের নাম হইয়াছিল 'বৈশালী'। ইহাও বৌদ্ধ যুগের পূর্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল এইরূপ অনুমানকেই সমর্থন করে।

৫৬। তুলঃ "Probably the Ramayana, like the Mahabharata, only received a more or less definite form when it was written down."—Winternitz: *History of Indian Literature*, Vol. I, p. 497

৫৭। *Indian Antiquary*: III, 102-4

(চ) রামায়ণের চরিত্রগুলি ঐতিহাসিক নহে। Weber মনে করেন যে সীতা মূলতঃ আর্যগণের কৃষির রূপক। রাবণের হাত হইতে সীতাকে উদ্ধারের কাহিনী অনার্যগণের আক্রমণ হইতে আর্যগণের কৃষিভিত্তিক সভ্যতাকে রক্ষার কাহিনী মাত্র।[৫৮]

বস্তুতঃ, রামায়ণের রচনাকাল নির্ধারণ করার প্রশ্নের সহিত মূল ও প্রক্ষিপ্ত অংশের মধ্যে কালের ব্যবধান এবং একটি প্রক্ষিপ্ত অংশ হইতে আর একটি প্রক্ষিপ্ত অংশের কালগত ব্যবধানের প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মূল রামায়ণের প্রধান চরিত্র রামচন্দ্র মানুষ—পৃথিবীর রাজকুমার। প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডে তিনিই দেবতা—একেবারে বিষ্ণুর অবতার। লোকোত্তর বীরত্ব ও মহনীয়তার জন্য মাটির মানুষ কালে দেবত্বে উন্নীত হইতে পারে সত্য, কিন্তু কত দীর্ঘকালে তাহা সম্ভব হয় তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সম্ভব নহে। মহাভারতে রামের উপাখ্যান আছে, তাহার রামও বিষ্ণুর অবতার এবং সেই রামোপাখ্যান রামায়ণেরই সংক্ষিপ্ত রূপমাত্র। সীতার অপহরণ ও রাম-রাবণের যুদ্ধকে অনুকরণ করিয়াই যে দ্রৌপদীর অপহরণ ও কুরুপাণ্ডবদের যুদ্ধের কাহিনী লইয়া মহাভারত রচিত হয় নাই, একথা কে বলিবে? খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতকে যদি আমাদের মহাভারতের রচনা সম্পূর্ণ হইয়া গিয়া থাকে তবে তাহারও দুই-একশত বৎসর পূর্বে রামায়ণের রচনা হইয়া গিয়াছিল, এই সিদ্ধান্ত মোটেই অযৌক্তিক নহে।

রামায়ণে বৌদ্ধ প্রভাব কতখানি কিংবা একেবারেই আছে কি না তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। রামায়ণের যে অংশ সাধারণতঃ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে তাহারই এক স্থানে মাত্র একবার রামের মুখে বুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দশরথের রামচন্দ্র এখানে বুদ্ধকে 'চোর' ও 'নাস্তিক' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

৫৮। 'সীতা' শব্দের অর্থ 'লাঙ্গল-পদ্ধতি' (field-furrow)। ঋগ্বেদেও 'সীতা'র উদ্দেশ্যে অনেকগুলি মন্ত্র আছে। বলরামের এক নাম 'হলভৃৎ' (যিনি হল বহন করেন)। Weber মনে করেন রাম ও বলরাম প্রথমে একই ছিলেন, পরে দুইজনকে পৃথক্ ব্যক্তিরূপে কল্পনা করা হয়। 'সীতা' ও 'হলভৃৎ' এই দুই নামের এইরূপ সাদৃশ্য হইতে Weber অনুমান করিয়াছেন "She accordingly represents Aryan husbandry, which has to be protected by Rama—whom I regard as originally identical with Balaram, 'halabhrit', 'the plough-bearer', though the two were afterwards separated—against the attacks of the predatory aborigines."—*On the Ramayana* (Boyd's translation, *Indian Antiquary*: *I*. 120 *ff*). Jacobi-ও Weber-এর মতকে সমর্থন করিয়াছেন—"Her husband Rama would be no other than Indra, and his conflict with Ravana would represent the *Indra-Vritra* myth of the Rigveda."—*Das Ramayana*, Bonn, 1893

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন যে আর্য-কৃষি যখন দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল তখন 'সীতাকে দক্ষিণে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল' এইরূপ কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া কাব্য রচনা একেবারে অসম্ভব ছিল না। মহাকাব্যের যুগে ইন্দ্র প্রধান দেবতা। সূত্র সাহিত্যে 'সীতা' ইন্দ্রের পত্নী। বৈদিক সাহিত্যে ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়া বৃত্র কর্তৃক নিরুদ্ধ জলরাশির উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন। রামায়ণেও রাম রাবণকে বধ করিয়া রাবণ কর্তৃক অপহৃতা সীতার উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন। রামায়ণের রাম বৈদিক ইন্দ্রেরই ছায়া মাত্র। 'সীতা' যদি মূলতঃ আর্য-কৃষির রূপক হন তবে কৃষির সহিত জলের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে অনুমান করা চলে যে বৈদিক ইন্দ্র-বৃত্র উপাখ্যানই রামায়ণে রাম-রাবণের উপাখ্যানের মধ্যদিয়া মহাকাব্যের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। Jacobi রামায়ণকে বেদের ইন্দ্র-বৃত্র উপাখ্যানের নূতনরূপ বলিয়া অনুমান করিতে যাইয়া আরও কয়েকটি সাদৃশ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। রাবণের পুত্রের নাম 'ইন্দ্রজিৎ', 'ইন্দ্রশত্রু'; বেদে বৃত্রের নাম 'ইন্দ্রশত্রু'; বৃত্রের সহিত যুদ্ধে বেদের ইন্দ্রের প্রধান সহায় মরুদ্‌গণ, রাবণের সহিত যুদ্ধে রামেরও প্রধান সহায় হনুমান (মরুতের পুত্র বলিয়া ইঁহাকে বলা হয় 'মারুতি')। উপরিউক্ত আলোচনাগুলি রামায়ণকে বৈদিক ইন্দ্র-বৃত্রের উপাখ্যানেরই পরবর্তী রূপ বলিয়া অনুমান করার পক্ষে সুদৃঢ় যুক্তি।

মৃত্যুর পর অযোধ্যার রাজসিংহাসন শূন্য হইয়া গেল। কৈকেয়ী ভরতকে মাতুলালয় হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভরত কিছুতেই রাজপদ গ্রহণ করিতে চাহিলেন না, সসৈন্যে রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিতে চলিলেন। কিন্তু রামের কাছে ভরতের সমস্ত অনুনয়ই ব্যর্থ হইল; রাম কিছুতেই সত্য লঙ্ঘন করিয়া অযোধ্যায় ফিরিতে সম্মত হইলেন না। নানা জনে রামকে নানাভাবে বুঝাইতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে একজনের নাম জাবালি। জাবালি রামকে যেভাবে এই সময়ে উপদেশ দিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহাকে ঘোর নাস্তিক বলিয়াই মনে হয় এবং হয়ত সে উপদেশের মধ্যে বৌদ্ধ মতবাদের প্রভাব ধরা পড়ে। Jacobi এই অংশটিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন এবং রামের মুখে বুদ্ধের যে উল্লেখের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে তাহাও রামায়ণের সকল সংস্করণে না থাকায় তাহার উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা চলে না। পূর্বভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রচারের পর এবং বৌদ্ধধর্মের মূল নীতিগুলি প্রতিষ্ঠা লাভ করার পরই রামায়ণের রচনা আরম্ভ হইয়াছিল। কাজেই বৌদ্ধধর্মের প্রভাবকে একেবারে পাশ কাটাইয়া যাওয়া রামায়ণের পক্ষে হয়ত সম্ভব হয় নাই। তাই বলিয়া রামোপাখ্যান মূলতঃ বৌদ্ধ উপাখ্যান এবং রাম ও রামায়ণের মধ্য দিয়া বৌদ্ধধর্মের আদর্শ ও মতবাদই প্রচার করার চেষ্টা করা হইয়াছে—Weber-এর এইরূপ মতবাদ সর্বাংশে গ্রহণ করা যায় না।

রামায়ণে বৌদ্ধ প্রভাব

লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ রচিত হইয়াছে। সাধারণতঃ মনে করা যাইতে পারে যে সাধারণের জন্য যে কাব্য রচিত হয় তাহা সাধারণের ব্যবহৃত ভাষাতেই রচিত হইয়া থাকে। এইদিক দিয়া মনে হয় রামায়ণ যে সময় রচিত হইয়াছিল সে সময়ে জনসাধারণের কথ্যভাষা ছিল সংস্কৃত। সম্রাট অশোকের শিলালেখসমূহে সংস্কৃতের ব্যবহার নাই, পালি-ঘেঁষা আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করা হইয়াছে। বুদ্ধও তাঁহার উপদেশাবলী সংস্কৃতে প্রচার করেন নাই, সাধারণের কথ্যভাষায় প্রচার করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে অশোক ও বুদ্ধের সময় সংস্কৃত কথ্যভাষা ছিল না এবং যে সময়ে সংস্কৃত কথ্যভাষা ছিল যদি সেই সময়েই রামায়ণ রচিত হইয়া থাকে তবে অবশ্যই তাহা প্রাক্-বৌদ্ধযুগে। Jacobi এইরূপ মতই পোষণ করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ মতও সর্বথা যুক্তিপূর্ণ বলিয়া মনে হয় না। সমগ্র ভারতে এক সময়ে সংস্কৃতকে কথ্যভাষারূপে স্বীকার করিয়া লইলেও সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষাসমূহের প্রচলন স্বীকার করিতে কোনও রূপ বাধা নাই। অনেকে এরূপ মতও পোষণ করিয়াছেন যে, মূল রামায়ণ প্রথমে কোনও আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় রচিত হইয়াছিল এবং পরে উহাকে সংস্কৃতে রূপান্তরিত করা হয়। Barth মনে করেন যে মহাকাব্যগুলি প্রথমে প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল। Jacobi অত্যন্ত নিপুণতার সহিত এই মত খণ্ডন করিয়াছেন।

খৃঃ পূঃ শতকে যে সকল লিপি বা শিলালেখসমূহ পাওয়া গিয়াছে সেগুলি আঞ্চলিক ভাষাতেই লিখিত। ইহা হইতে এইটুকুই প্রমাণিত হয় যে তখন সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষারূপে ব্যবহৃত হইত না, কিন্তু তাই বলিয়া সাহিত্যের ভাষা হিসাবে যে প্রচলিত ছিল না ইহা মনে করার কারণ নাই। পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলির সময়েও সংস্কৃত মরিয়া যায় নাই—Bhandarkar তাহা দেখাইয়াছেন। বৌদ্ধগণ সংস্কৃতকে কাব্যে, সাহিত্যে গ্রহণ করিয়াছেন—খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতই তাহার প্রমাণ। সীতার অন্বেষণে লঙ্কায় গমন করিয়া হনুমান রাবণের পুরীতে রাত্রিতে রাবণকে মহিষীগণ পরিবেষ্টিত অবস্থায় নিদ্রিত দেখেন। এই অংশের বর্ণনায় অনেকে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতের অনুকরণ করা হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। যদি তাই হয় তবে বুঝিতে হইবে দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগেও রামায়ণের মধ্যে সংযোজন চলিয়াছে।

বৌদ্ধ ও জৈনগণও রামোপাখ্যানকে নিজেদের মনের মত করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। যে সমস্ত বৌদ্ধ উপাখ্যানের চীনা ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে রামোপাখ্যান তাহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। খৃষ্টাব্দের প্রথম শতকে জৈন সাধু বিমলসূরি প্রাকৃত ভাষায় রচিত তাঁহার পদ্মচরিত নামক কাব্যে জৈন ধর্মের সহিত রামোপাখ্যানের একটি সঙ্গতি বজায় রাখার চেষ্টা করিয়াছেন। খৃষ্টাব্দ ৬ষ্ঠ শতকে সুদূর কাম্বোডিয়াতেও রামায়ণ হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ হিসাবে সুপরিচিত হইয়াছিল।

রামায়ণ ও মহাভারতের পৌর্বাপর্য

রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে কোন্‌টি আগে এবং কোন্‌টি পরে এ বিষয়ের আলোচনা নিছক অনুমানের উপর নির্ভর করে। বাল্মীকি আদি কবি, রামায়ণ আদি কাব্য। বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে অবতার হিসাবেও কৃষ্ণ-অবতারের পূর্বেই রাম-অবতার। সে দিক দিয়া হিন্দুগণ রামায়ণকেই মহাভারতের পূর্বে বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে একটি আপত্তি উঠে যে মূল রামায়ণের প্রধান চরিত্র রামচন্দ্র মানুষ,—সেখানে অবতার বলিয়া তিনি স্বীকৃত হন নাই। সুতরাং মূল রামায়ণকে মহাভারতের পূর্বে বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। রামায়ণে সতীদাহের উল্লেখ নাই। অথচ মহাভারতে উহার উল্লেখ আছে; এই কারণেও অনেকে রামায়ণকে মহাভারতের পূর্ববর্তী বলিয়া মনে করেন। Winternitz-এর মতে মূল রামায়ণের মত মূল মহাভারতেও সতীদাহের কোনও উল্লেখ নাই, যদি থাকে তবে তাহা মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশেই আছে; সুতরাং এ যুক্তির উপরও বিশেষ নির্ভর করা চলে না। Jacobi রামায়ণকেই পূর্ববর্তী বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহার মতে রামায়ণের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াই মহাভারত মহাকাব্যরূপে স্বীকৃত হয়। Winternitz এই মতের বিশেষ বিরোধিতা করিয়াছেন। তাঁহার মতে মহাভারতের বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যেই তাহার প্রাচীনত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। 'যুধিষ্ঠির উবাচ', 'দুর্যোধন উবাচ' ইত্যাদিরূপে বিশেষ বিশেষ চরিত্রের অবতারণা করা কাব্যরীতি নহে। রামায়ণে কোথাও এইভাবে চরিত্রগুলির বক্তব্যের অবতারণা করা হয় নাই, বর্ণনাভঙ্গীর স্বকীয় ছন্দের মধ্যেই চরিত্রগুলি তাহাদের বক্তব্য লইয়া আপনি আসিয়াছে আপনি গিয়াছে। তাহাতে কোথাও বুঝিবার অসুবিধা হয় নাই এবং এ বিষয়ে মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণ পরকালীন কাব্যরীতির কাছাকাছিই পৌঁছিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

যুদ্ধের বর্ণনায় এবং প্রতিস্পর্ধী যোদ্ধৃবৃন্দের পরস্পরের প্রতি তীব্র ঘৃণার প্রকাশের মধ্যেও মহাভারতের ভিতরে একদিন আদিম যুগের আদিম জাতির অসংযত প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ভীম ও দুর্যোধনের আস্ফালনের মধ্যে আমরা যে তীব্র বিদ্বেষ ও জিঘাংসার পরিচয় পাই, রাম-রাবণের কথোপকথনে সেরূপ তীব্র বিদ্বেষ বা জিঘাংসার পরিচয় পাওয়া যায় না। মহাভারতের গান্ধারী বা কুন্তীও যেন খাঁটি ক্ষত্রিয় রমণী, যুদ্ধের সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, রাজনীতিও যাঁহারা একেবারে বুঝেন না এমন নহে। রামায়ণের কৌশল্যা-কৈকেয়ী সে প্রকৃতির সম্রাজ্ঞী নহেন। মহাভারতের দ্রৌপদী পুরাপুরি ক্ষত্রিয় রমণী,—যে ক্রোধে আত্মহারা হইতে জানে, অন্যায়ের প্রতীকার দাবি করিতে চায়, স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগেরও যাহার অন্ত থাকে না। রামায়ণের সীতা তাহা নহে। এই বৈসাদৃশ্যের কারণ সম্পর্কে দুই রকম অনুমান করা চলে। হয় মহাভারত যে যুগের রামায়ণ তাহা অপেক্ষা পরের। রামায়ণের যুগে সভ্যতা মহাভারতের যুগের সভ্যতা অপেক্ষা বেশ খানিকটা আগাইয়া গিয়াছিল; কিংবা মহাভারত পশ্চিম ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির এবং রামায়ণ পূর্ব ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে রচিত। এই দুই মহাকাব্যের রচনার মধ্যে কালিক ব্যবধান কিছু না, শুধু ভারতবর্ষের দুই বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছাপই ইহারা বহন করিতেছে।

রামায়ণের পূর্বকালীনত্ব প্রমাশ করার পক্ষে নিম্নানুরূপ যুক্তি দেখানো যায়। মহাভারতের বনপর্ব, দ্রোণপর্ব ও শান্তিপর্বে এবং হরিবংশে রামোপাখ্যানের সংক্ষেপে উল্লেখ আছে। রামচন্দ্রের পাদস্পর্শের জন্যই শৃঙ্গীবেরপুর পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া মহাভারতে পরিগণিত হইয়াছে। রামায়ণের ঘটনাপরম্পরার মধ্যে বরাবরই একটা অলৌকিক ছাপ পড়িয়া গিয়াছে। বানরসৈন্য দ্বারা সেতুবন্ধন, দশানন রাবণের কল্পনা প্রভৃতি বহু অবিশ্বাস্য ঘটনাকে মানিয়া না লইলে রামায়ণের আখ্যানভাগের সার্থকতা থাকে না। পক্ষান্তরে মহাভারতের সমস্ত চরিত্রগুলিই পুরাপুরি মানুষ। কোথাও অতিশয়োক্তি বা উদ্দাম ও অসংযত কল্পনা করা হয় নাই। ইহা হইতে মনে হয় যে রামায়ণ মহাভারত অপেক্ষা পূর্বকালীন।

বাল্মীকি ও উত্তরকাল

মহাকাব্য রামায়ণে মহর্ষি বাল্মীকি যে স্বকীয় মহতী প্রতিভার তুলিকাস্পর্শে হিন্দু জীবনের বিভিন্ন স্তরের মহান আদর্শের আলেখ্য আঁকিয়া গিয়াছেন, আজ বহু বৎসর পরেও তাহার দীপ্তি ম্লান হয় নাই। তাহা কালজয়ী হইয়াছে। তাঁহার কাব্য যে ভাবিকালের সমস্ত কবিদের উপজীব্য হইবে রামায়ণের এই ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছে (পরং কবীনামাধারম্—বালকাণ্ড. ৪.২০)। মহাভারত, ভাগবত, অধ্যাত্ম রামায়ণ, পদ্মপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থেও সে কাহিনী সাদরে স্থানলাভ করিয়াছে; বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিও রামোপাখ্যানকে একেবারে বাদ দিতে পারে নাই। ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস বাল্মীকির রামায়ণকে অবলম্বন করিয়াই কবিযশঃপ্রার্থী হইয়াছেন এবং তাহা স্বীকারও করিয়াছেন—

অথবা কৃতবাগ্‌দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥ —রঘুবংশ, ১.৪

শুধু তাই নয় বাল্মীকির রামায়ণকে কালিদাস 'কবিপ্রথমপদ্ধতি' (রঘুবংশ, ১৫.৩৩) বলিয়াছেন এবং বাল্মীকিকে বলিয়াছেন 'আদি কবি' (রঘুবংশ, ১৫.৪১)। কালিদাসের অঙ্কিত বহু চিত্র, বহু উপমা, বহু শব্দসম্ভার বাল্মীকির রামায়ণ হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে। অভিজ্ঞানশকুন্তলায় অঙ্গুরীয়ক-ঘটনা রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের অঙ্গুরীয়ক ঘটনা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং কালিদাসের 'মেঘদূত' যাহা পরবর্তী-কালের দূতকাব্যের পথিকৃৎ তাহারও ছায়া সুন্দরকাণ্ডে যেখানে হনুমান রামের নিকট হইতে সীতার নিকট যাইতেছেন এবং যেখানে ভাসমান মেঘকে হনুমানের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের বসন্তবর্ণনা ও কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের বসন্তবর্ণনার সাদৃশ্যও কম নয়। বিক্রমোর্বশী নাটকের চতুর্থ অঙ্কে আমরা সীতাহরণের পর রামচন্দ্রের মানসিক অবস্থার সাদৃশ্য দেখিতে পাই। অশ্বঘোষ এবং ভাসও রামায়ণের দ্বারা কম প্রভাবিত হন নাই। বিমলসূরির জৈন রামায়ণে, রাজশেখরের নাটকে, ভবভূতির উত্তররামচরিতে, ভট্টিকাব্যে, কুমারদাসের জানকী-হরণে, ক্ষেমেন্দ্রের রামায়ণ-মঞ্জরীতে সর্বত্র বাল্মীকির রামায়ণের প্রভাব কিছু-না-কিছু পরিলক্ষিত হয়। আনন্দবর্ধন তাঁহার ধ্বন্যালোকে রামায়ণের প্রতি প্রভূত শ্রদ্ধাই পোষণ করিয়াছেন।

উপসংহার

সাহিত্যই জাতির সত্যিকার পরিচয়। রামায়ণ ভারতীয় আদর্শের পরিচয়। হিন্দু-আদর্শের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই আমরা রামায়ণে। বাল্মীকি রামায়ণ রচনার পূর্বে এমন একটি চরিত্রের সন্ধান করিতেছিলেন যিনি মানুষ হইয়াও সকল আদর্শে মণ্ডিত। তাই তিনি নারদের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন; কারণ, নারদ হয়ত তেমন মানুষের সন্ধান জানিলেও জানিতে পারেন। বলিয়াছিলেন—মহর্ষে ত্বং সমর্থোঽসি জ্ঞাতুমেবংবিধং নরম্। শেষপর্যন্ত রামচন্দ্রের চরিতকথা লইয়াই রামায়ণ রচিত হইল। রামায়ণের প্রধান চরিত্র রামচন্দ্র নিজেকে মানুষ

বলিয়াই মনে করিতেন (আত্মানং মানুষং মন্যে রামং দশরথাত্মজম্) যদিও নিজের অতি-মানুষিক সত্তা তিনি যে কখনও বিস্মৃত হন নাই তাহা তাঁহার উক্তি হইতেই মাঝে মাঝে বুঝা যায়। রামায়ণেই রামায়ণকে কাব্য, গীত, আখ্যান, ইতিহাস প্রভৃতি বলা হইয়াছে। রামায়ণ যাহাই হউক না কেন ইহা যুগে যুগে ভারতীয়গণের জীবন ও বিশ্বাসকে যে ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে, পৃথিবীর আর কোনও সাহিত্য আর কোনও জাতির উপর সে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।[৫৯]

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বাল্মীকি নিজেই বলিয়াছেন যে তিনি প্রচেতার দশম পুত্র এবং দীর্ঘদিন তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। রামায়ণ আরম্ভ হইয়াছে 'তপঃ' শব্দে এবং শেষ হইয়াছে 'প্রবর্ধতাম্' শব্দে। বাল্মীকির জীবনের এই দীর্ঘ তপশ্চরণের সহিত রামায়ণের প্রথম ও শেষ শব্দের কোনও যোগাযোগ থাকিলেও থাকিতে পারে।[৬০] বাল্মীকি নিজেই বলিয়াছেন যে তিনি তাঁহার রচনার নামকরণ করিয়াছিলেন 'রামায়ণ', 'সীতাচরিত্র' কিংবা 'পৌলস্ত্যবধ' (বালকাণ্ড, ৪·৭)। 'রঘুবরচরিত' 'রঘুবংশচরিত' এরূপ নামেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায় (বালকাণ্ড, ২.৪৩ ; ২.৯)। সমস্ত নামের মধ্যে 'রামায়ণ' নামই কালে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে এবং সম্ভবতঃ ইহা রাম-চরিত্রের জনপ্রিয়তারই পরিচায়ক। রাম-চরিত্রকে হিন্দুজাতি এমনই নিজস্ব করিয়া গ্রহণ করিয়াছে যে উহাকে অবলম্বন করিয়া যুগে যুগে মনীষিগণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। প্রায় বেশীর ভাগ পুরাণেই রামোপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতেও রামোপাখ্যান আছে। আনন্দ রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অগ্নিবেশ্য রামায়ণ, সপ্তর্ষি রামায়ণ এবং তুলসী-দাসের রামচরিতমানস হিন্দুর নিকট রাম-চরিত্রের মহনীয়তারই সূচনা করিতেছে।

রামায়ণে বাল্মীকি প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের আদর্শ কী হওয়া উচিত তাহার ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন। রামচন্দ্রের সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে রাজার আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে—

> রক্ষিতা স্বস্য বৃত্তস্য স্বজনস্য চ রক্ষিতা।
> রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্মস্য চ পরন্তপঃ॥—সুন্দর, ৩১.৭

জীবনকে সমৃদ্ধ ও পবিত্র করিতে হইলে মানুষকে যে কয়টি গুণ জীবনে পরিপূর্ণ-ভাবে পালন করিতে হইবে তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

> সত্যং চ ধর্মং চ পরাক্রমং চ ভূতানুকম্পাং প্রিয়বাদিতাং চ।
> দ্বিজাতিদেবাতিথিপূজনং চ পন্থানমাহুস্ত্রিদিবস্য মার্গঃ॥

ধর্মই মানুষের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং অর্থাদি ত্রিবর্গ ধর্মভিত্তিক ও ধর্মবিরোধী হইয়া আপনিই মানুষের করতলগত হয়—

> ধর্মাদর্থঃ প্রভবতি ধর্মাৎপ্রভবতে সুখম্।
> ধর্মেণ লভতে সর্বং ধর্মসারমিদং জগৎ॥—অরণ্য, ৯.৩০

প্রিয়বাক্য সকলেই বলিতে পারে; অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা দুই-ই দুর্লভ—

> সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
> অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥—যুদ্ধ, ১৬.২০

৫৯। তুলঃ "It has become the property of the whole Indian people, and as scarcely any other poem in the entire literature of the world, has influenced the thought and poetry of a great nation for centuries." —Winternitz : *History of Indian Literature*, Vol. I. p. 476

৬০। তুলঃ "In Uttara XC VI. 21 he (i.e. Valmiki) says that he never committed any sin in thought or word or deed (মনসা কর্মণা বাচা ভূতপূর্বং ন কিল্বিষম্). This makes it clear that the story of his sinful early life is apocryphal."—K. S. Ramaswami Sastri ; *Studies in Ramayana*, p. 17

নারীজাতির আদর্শ কী হওয়া উচিত সে সম্বন্ধেও বাল্মীকি অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। কৈকেয়ীর ব্যবহারে বিরক্ত দশরথ একসময়ে নারীজাতির উপর শ্রদ্ধা হারাইয়াছিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি তাঁহার উক্তি সংশোধন করিয়া লন—

ধিগস্তু যোষিতো নাম শঠাঃ স্বার্থপরাঃ সদা।
ন ব্রবীমি স্ত্রিয়ঃ সর্বা ভরতস্যৈব মাতরম্॥—অযোধ্যা, ১২.১০৩

পতি গুণবানই হউন বা নির্গুণই হউন স্ত্রীলোকের তিনিই পরম দেবতা—

ভর্তা তু খলু নারীণাং গুণবান্ নির্গুণোঽপি বা।
ধর্মং বিমৃশমানানাং প্রত্যক্ষং দেবি দৈবতম্॥—অযোধ্যা, ৬২.৮

অযোধ্যাকাণ্ডের শততম অধ্যায়ে রাম ভরতকে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন ভারতের রাজনীতি ও শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত তা আদর্শস্থানীয় হওয়া উচিত।

রামায়ণ ও মহাভারতের **পৌর্বাপর্যের** আলোচনায় একথা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে বর্তমানে যে আকারে এই দুই মহাকাব্য আমাদের নিকট উপস্থিত রহিয়াছে সেই আকারে রামায়ণ নিশ্চয়ই মহাভারতের পূর্বকালীন। কিন্তু কথা হইল যে, মহাভারতেও যেমন যুগে যুগে বিভিন্ন ধরনের রচনা অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে এবং বৌদ্ধগণ, জৈনগণ ও ব্রাহ্মণগণ নিজেদের কথা প্রচার করিবার জন্য কালে কালে নূতন নূতন আখ্যান, উপাখ্যান, নীতিকথা, উপদেশ প্রভৃতি ইহার মধ্যে গ্রথিত করিয়াছেন, রামায়ণের ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। উভয় মহাকাব্যের প্রক্ষিপ্ত অংশগুলির সহিত অনেক স্থানে এমন সাদৃশ্য রহিয়াছে যে একথাও মনে করা চলিতে পারে যে, উভয়ের প্রক্ষিপ্ত অংশসমূহের অনেকখানি একই সময়ে উভয় মহাকাব্যে স্থানলাভ করিয়াছে। আবার আয়তনের দিক দিয়া যখন রামায়ণ মহাভারত হইতে অনেক ছোট তখন এরূপ মনে করিতেও কোনও বাধা নাই যে মহাভারত তাহার শেষ রূপ গ্রহণ করার পূর্বে রামায়ণ তাহার শেষ রূপ গ্রহণ করা সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। এই সব দিক হইতে বিচার করিলে আমরা এই কথাই বলিতে বাধ্য হইব যে মূল রামায়ণ মূল মহাভারতের পূর্বকালীন, উভয় মহাকাব্যের রচনা অনেকদিন ধরিয়া পাশাপাশি চলিয়াছিল এবং মহাভারতের সুদীর্ঘ রচনাকাল শেষ হইবার পূর্বেই রামায়ণের বর্তমান আয়তন সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; অর্থাৎ রামায়ণ বর্তমান আয়তন গ্রহণ করার পরেও অনেকদিন ধরিয়া মহাভারতের রচনার ধারা বহিয়া চলিয়াছে।[৬১] Winternitz বলেন যে বর্তমান রামায়ণ খৃষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতকেই সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ মূল রামায়ণ তাহারও পাঁচ শত বৎসর পূর্বে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে বাল্মীকি কর্তৃক রচিত হয়।[৬২] তিনি আরও অনুমান করেন যে, যে প্রাচীনতম ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া মহাভারত রচিত হইয়াছে তাহা প্রাচীন রামায়ণ অপেক্ষা পূর্বকালীন হইলেও হইতে পারে।[৬৩]

রামায়ণ ও মহাভারতের পৌর্বাপর্য

৬১। "From these facts we conclude that the period of the growth of the Ramayana falls within the longer period of the development of the Mahabharata."—Winternitz: *History of Indian Literature*, Vol. I, p. 505

৬২। *Ibid*, p. 516-17

৬৩। "The older nucleus of the Mahabharata, however, is probably older than the ancient Ramayana."—*Ibid*, p. 516

দ্রষ্টব্য: "Rama of the solar line of Hindu chronology is, however, placed by Brahmins, 867, 102 B. C. between the silver and brazen ages. But he has been variously supposed to have lived, 2022 B. C. Jones, 950 Hamilton, and 1100 Todd, and according to Bently he was one year old in 960, born in 6th April 961; Rama preceded Krishna but as their historians Valmiki and Vyasa, who wrote events they witnessed, were contemporaries, it could not have been many years."
—Balfour's *Cyclopaedia of India*: Vol. III

পুরাণ

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস জানিতে হইলে পুরাণগুলির আলোচনা যে একান্ত অপরিহার্য এবিষয়ে Pargiter-ই সর্বপ্রথম বিংশ শতকের গোড়ার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাহার পূর্বে আমরা ভারতীয়েরাও পুরাণগুলিকে শুধুমাত্র রূপকথার বেশী মূল্য দিতে নারাজ ছিলাম। Pargiter-এর পূর্বে আরও কয়েকজন পণ্ডিত পুরাণসাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন সত্য কিন্তু যে নিছক গল্প এবং ঐতিহাসিক সত্যের সংমিশ্রণে পুরাণগুলি রচিত, সেগুলির মধ্যে কেহই সফলতার সহিত একটা সীমারেখা টানিতে পারেন নাই। Wilson পুরাণসাহিত্যের আলোচনায় আমাদের পথিকৃৎ এবং পুরাণগুলির সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যে সেগুলি "are only pious frauds written in subservience to sectarian imposture." Goldstucker পুরাণগুলি সম্বন্ধে অত্যন্ত হীন ধারণাই পোষণ করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে হিন্দুধর্মের আজ যতখানি অধঃপতন হইয়াছে তাহার জন্য পুরাণগুলিই সম্পূর্ণ দায়ী। "All barriers to religious imposition having broken down since the modern Puranas were received by the masses as the source of their faith, sects have sprung up which not merely endanger religion, but society itself; tenets have been propounded, which are an insult to the human mind; practices have been introduced, which must fill every true Hindu with confusion and shame."[১] ইদানীন্তন কালে পুরাণসাহিত্য সম্বন্ধে সুষ্ঠু ও ধারাবাহিক আলোচনা করিয়াছেন অধ্যাপক হাজরা।[২] পুরাণের ধর্ম গ্রহণ করিয়াই হিন্দুর আজ এই অধঃপতন এবং একমাত্র ঋগ্বেদ-প্রতিপাদিত ধর্মকে গ্রহণ করিলেই হিন্দুধর্মের সমস্ত ক্লেদ দূর হইতে পারে—এইরূপ মত পোষণ করিয়া Goldstucker নিজের অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে পুরাণগুলি বেদমূলক আর ধর্ম কথাটিও হিন্দুরা ইংরাজী 'Religion'-এর অর্থে ব্যবহার করে নাই। হিন্দু-ধর্ম যুগে যুগে তাহার গতিপথে অনেক মত ও বিশ্বাসকে গ্রহণ করিয়াছে, বর্জনও করিয়াছে। সে পথের ইতিহাস বিচিত্র। অন্যান্য ধর্মের মত যে সম্বল লইয়া সে যাত্রা শুরু করিয়াছিল তাহা লইয়াই শেষ করে নাই। আর তা ছাড়া, সবচেয়ে বড় কথা হইল "a living society must have both the power of continuity and power of change."[৩]

'পুরাণ' শব্দের অর্থ

'পুরাণ' শব্দের মূল অর্থ 'প্রাচীন কথা'।[৪] ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ সাহিত্যেও পুরাণের উল্লেখ আছে এবং সেখানে 'ইতিহাসপুরাণ' শব্দের একত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে আখ্যান, উপাখ্যান, পুরাণ, ইতিহাস প্রায় সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'পুরাণ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল 'পুরাকালীন', আর 'ইতিহাস' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল 'এইরূপই ছিল' (ইতি হ

১। *Inspired Writings of Hinduism*, p. 108

২। দ্রষ্টব্য: *Studies in the Puranic Records of Hindu Rites and Customs; Studies in the Upapuranas.*

৩। Radhakrishnan: *Religion and Society*, p. 113

৪। 'পুরাণ' শব্দের অর্থ ও ব্যবহার সম্বন্ধে Goldstucker-এর মন্তব্য:

"The word itself, as designating a class of writings, occurs as early as in the law-books of Manu, though this book itself, as we

আস)। মহাভারতে কোনও ইতিহাস বলিবার সময় ব্যাস তাহাকে পুরাতন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[৫] মনে হয়, 'ইতিহাস' যে কোনও অতীত ঘটনাকেই বুঝাইয়াছে; আর সুদূর অতীতকে বুঝাইবার জন্যই 'পুরাণ' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।[৬] ব্যাস তাঁহার মহাভারতকে সংহিতা, পুরাণ, আখ্যান, উপাখ্যান, কথা, ইতিহাস প্রভৃতি নানা আখ্যা দিয়াছেন। ব্যাসের মনে সম্ভবত প্রতিটি নামের একটি বিশেষ অর্থ ছিল এবং মহাভারতে সব কয়টির বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ইহা বুঝাইবার জন্যই তিনি ইহাকে বিবিধ আখ্যা দিয়াছেন। বৈদিক সাহিত্যে পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি শব্দ সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হইলেও পরবর্তী সাহিত্যে ইহারা বিশেষ ধরনের রচনাকে বুঝাইয়াছে, ইহা নিশ্চিত। মৎস্যপুরাণে বলা হইয়াছে 'বেদবাদিগণ পুরাণসমূহে এই ইতিহাস পাঠ করিয়া থাকেন'।[৭] পুরাণ ও ইতিহাস দুইটি পৃথক জাতীয় রচনা এইরূপ মনে করিলেই কেবল এই ধরনের উক্তি সঙ্গত হয়। বোধ হয়, লোকোত্তর বীরপুরুষগণের কার্যকলাপ ধারাবাহিকভাবে যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে তাহাকে বলা হইত 'ইতিহাস', আর সৃষ্টি, ধর্ম, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির উপর বিক্ষিপ্ত আলোচনাগুলিকে বলা হইত 'পুরাণ'।

বায়ুপুরাণে বলা হইয়াছে যে আখ্যান, উপাখ্যান ও গাথা দ্বারা পুরাণার্থবিশারদ মহর্ষি ব্যাস পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন।[৮] দৃষ্টবিষয়ের কথন—আখ্যান। শ্রুতবিষয়ের কথন—উপাখ্যান। পিতৃপুরুষগণের কথা বা পুরাতন ঘটনা বা কোনও কিছুকে স্মরণে রাখিবার জন্য লোকমুখে প্রচলিত শ্লোকনিবন্ধ অংশ—গাথা। বায়ুপুরাণের এই উক্তি অনুসারে ইতিহাস পুরাণের উপাদান নহে। আখ্যান বা উপাখ্যানও কোনও ইতিহাসের বাহক হইতে পারে, গাথাও কোনও ঐতিহাসিক ঘটনামূলক হওয়া বিচিত্র নহে। সুতরাং, পুরাণ ও ইতিহাসের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ভেদ কোথায় তাহা বলা কঠিন এবং প্রচলিত পুরাণগুলিতে সে ভেদ যে সর্বথা রক্ষিত হইয়াছে এমনও মনে হয় না।[৯]

ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ সাহিত্যে 'পুরাণ' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ নামে কোনও নির্দিষ্ট সাহিত্য তখন বর্তমান ছিল এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। গৌতম-ধর্মসূত্রে বলা হইয়াছে যে রাজা পুরাণের বিধি অনুসারে রাজকার্য পরিচালনা করিবেন।

have seen, may be called recent when compared with the Vedic text. A definition, however, of what such Puranas are does not occur before the beginning of the Christian era, when the lexicographer Amarsinha says, that a Purana is a work which has 'five characteristic marks'. This definition is again explained by the commentators on the glossary of Amarsinha; and the oldest of them did not live earlier than about four hundred years ago."—*Inspired Writings of Hinduism*, p. 107

৫। 'অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্'—মহা. বনপর্ব, ২৫৯, ৩৫

৬। পুরাণ ও ইতিহাসের পার্থক্য সম্বন্ধে Monier Williams বলেন—

"It is true that the latter (ইতিহাস) furnish the raw materials for the composition of the Puranas, but, notwithstanding their relationship, the two classes of works are very different. The Itihasas are the legendary histories of heroic men before they were actually deified, whereas the Puranas are properly the history of the same heroes converted into positive gods, and made to occupy the highest position in the Hindu Pantheon."—*Hinduism*, p. 82

৭। তুলঃ পুরাণেষ্বিতিহাসোঽয়ং পঠ্যতে বেদবাদিভিঃ—মৎস্য, ৫৮, ৪

৮। তুলঃ আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভির্দ্বিজসত্তমা।
পুরাণসংহিতাশ্চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ ॥

৯। এই প্রসঙ্গে Pargiter-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"Purana means any 'old-tale', or 'ancient lore' generally, and Itihasa would seem properly to denote a story of fact in accordance with its derivation ইতি-হ-আস, which rather denotes actual traditional history. But the line between

আপস্তম্বধর্মসূত্রে পুরাণের কয়েকটি শ্লোকও উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই শ্লোকগুলি বর্তমানে প্রচলিত কোনও পুরাণে দেখা যায় না, তবে তাহাদের অনুরূপ শ্লোক পাওয়া যায়।[১০] উল্লিখিত ধর্মসূত্র হইতে ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে এক বিশেষ সাহিত্য তখন বর্তমান ছিল এবং তাহার নাম ছিল 'পুরাণ'। ঐ ধর্মসূত্র দুইখানি খৃঃ পূঃ পঞ্চম বা চতুর্থ শতকের। তাহা হইলে তাহারও কিছু পূর্ব হইতেই পুরাণসাহিত্য বর্তমান ছিল এইরূপ সিদ্ধান্ত করা গেল। Kaegi-র মতে খৃষ্টাব্দ অষ্টম শতক হইতেই বর্তমানে প্রচলিত পুরাণসমূহের রচনাকাল।[১১]

পুরাণসমূহের রচনাকাল

মহাভারত ও পুরাণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। মহাভারত নিজেকে 'পুরাণ' আখ্যা দিয়াছে এবং পুরাণসমূহ যেমন ভাবে আরম্ভ হইয়াছে, মহাভারতও তেমনি ভাবেই আরম্ভ হইয়াছে। মহাভারতে কোনও গল্পের অবতারণা করার পূর্বে বলা হইয়াছে—'পুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে'। মহাভারতের হরিবংশের অনেক স্থান বায়ুপুরাণের অনেক স্থানের সহিত হুবহু মিলিয়া যায়। মহাভারতের ঋষ্যশৃঙ্গ-উপাখ্যানের মূল পদ্মপুরাণে ইহাও Luder-এর অভিমত। মহাভারতের একস্থানে আঠারোখানি মহাপুরাণের নামও দেওয়া হইয়াছে। এই সব হইতে Winternitz মনে করেন যে মহাভারত চূড়ান্তরূপ গ্রহণ করার বহু পূর্ব হইতেই পুরাণসাহিত্য বর্তমান ছিল এবং প্রচলিত পুরাণসমূহের অনেক স্থান মহাভারত অপেক্ষাও প্রাচীন।[১২]

অনেকগুলি পুরাণে কলিযুগের অনেক রাজবংশের নাম দেওয়া আছে। তাহাদের মধ্যে শিশুনাগ, নন্দ, মৌর্য, শুঙ্গ, অন্ধ্র, গুপ্ত প্রভৃতি রাজবংশের এবং বিম্বিসার, অজাতশত্রু, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাজার নাম পাওয়া যায়। পরন্তু খৃষ্টাব্দ সপ্তম

fact and fable was hardly definite and gradually became blurred, especially where the historical sense was lacking and so no clear distinction was made, particularly in brahmanic additions to the Puranas. Hence both words tended to become indefinite."—*Ancient Indian Historical Tradition*, Chap. III, p. 34

১০। যে মূল পুরাণ হইতে ঐ শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করা হইয়াছিল, সেগুলি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং বর্তমান পুরাণগুলি সেগুলিকে ভিত্তি করিয়াই পরবর্তীকালে রচিত হইয়াছে। এই উক্তি অনেকগুলি মূল পুরাণ এবং উপপুরাণ উভয়ের সম্বন্ধেই খাটে। বিশেষ করিয়া ব্রহ্ম, ব্রহ্মবৈবর্ত, গরুড় ও আগ্নেয়পুরাণের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে প্রচলিত ব্রহ্মপুরাণ মূল ব্রহ্মপুরাণ নহে, ইহা অন্ততঃ দশম খৃষ্টাব্দের পূর্বে রচিত হয় নাই (Hazra; *Puranic Records on Hindu Rites and Customs*, pp. 145-47; *Indian Culture*; II, pp. 235-45)। উপপুরাণগুলির মধ্যেও মূল কালিকাপুরাণ, আদিপুরাণ, সৌরপুরাণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঐ নামে যে উপপুরাণগুলি প্রচলিত আছে তাহারা অনেক পরবর্তীকালের (দ্রষ্টব্যঃ Hazra: *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute*; XXII, 1941, pp. 1-23; *Bharatiya Vidya*; VI, 1945, pp. 60-73; New Indian *Antiquary*; VI, pp. 103-11 and 121-29)। এতদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল যে বর্তমানে অগ্নিপুরাণ নামে যাহা প্রচলিত তাহা মূল আগ্নেয়পুরাণ নষ্ট হইয়া গেলে তাহারই স্থান অধিকার করিয়াছিল। সম্প্রতি প্রমাণিত হইয়াছে যে মূল আগ্নেয়পুরাণ নষ্ট হয় নাই; 'বহ্নিপুরাণ' নামে তাহা বর্তমান আছে (দ্রষ্টব্য ঃ Hazra: ***Studies in the*** *Genuine Agneya-Purana alias Vahni-Purana*; *Our Heritage*; Vol. I, Part II, pp. 210-11)

১১। Kaegi: *Life in Ancient India*, p. 17

১২। তুলঃ "From all this it appears that Puranas, as a species of literature existed long before the final redaction of the Mahabharata and that even in the Puranas which have come down to us there is much that is older than our present Mahabharata."—Winternitz: *History of Indian Literature*, Vol. I, p. 521

শতকের পরবর্তী কোনও রাজার নাম পাওয়া যায় না। কাজেই প্রথম দিকের পুরাণগুলি যে খৃষ্টাব্দ সপ্তম শতকের পূর্বে রচিত হইয়া গিয়াছিল এরূপ একটা অনুমান করা চলে।

অনেকে পুরাণগুলিকে আরও পরবর্তীকালের বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এরূপ মনে করার কোনও যুক্তিসংগত কারণ নাই। মহাকবি বাণভট্ট (খৃঃ ৬২৫), দার্শনিক কুমারিল (খৃঃ ৭৫০), শঙ্করাচার্য (খৃঃ নবম শতক) প্রভৃতি সকলেই পুরাণের সহিত পরিচিত ছিলেন। অল্-বেরুণিও (খৃঃ ১০৩০) অষ্টাদশ পুরাণের নাম জানিতেন।

হিন্দুগণের মতে পুরাণসমূহ বেদসমূহের সহিত ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।[১৩] বেদব্যাস বেদসমূহের বিভজনকর্তা, মহাভারতের রচয়িতা, আবার পুরাণসমূহের রচয়িতা। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে স্বয়ং নারায়ণই ব্যাসরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।[১৪] পুরাণের এই দৈবী উৎপত্তির কথা মানিয়া লইলে রচনাকালের কোনও প্রশ্নই উঠে না।

পুরাণসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

আলোচ্য বিষয় অনুসারে পুরাণগুলি নিজেদের পাঁচটি লক্ষণ[১৫] এইরূপ নির্ধারণ করিয়াছে—(১) সর্গ (সৃষ্টি), (২) প্রতিসর্গ (প্রলয়কালে পূর্ব সৃষ্টির ধ্বংসের পর নূতন সৃষ্টির বিকাশ) (৩) বংশ (দেবতা ও ঋষিগণের বংশ বর্ণনা), (৪) মন্বন্তর (মনুগণের শাসনকাল) ও (৫) বংশানুচরিত (নৃপতিগণের বংশের ইতিহাস)। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মতে এই পাঁচটি লক্ষণ শুধু উপপুরাণগুলি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য এবং অষ্টাদশ মহাপুরাণের লক্ষণ হইল দশটি। ভাগবতপুরাণও মহাপুরাণের দশটি লক্ষণের কথাই বলিয়াছেন।

মৎস্যপুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পুরাণের আলোচ্য বিষয়সমূহের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে উপরিউক্ত পাঁচটি লক্ষণ ছাড়াও ভুবনবিস্তর, দানধর্মবিধি, শ্রাদ্ধ-

১৩। কোথাও কোথাও বেদেরও পূর্বে পুরাণের দৈবী উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে ঃ

পুরাণং সর্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
অনন্তরং চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনির্গতাঃ॥—মৎস্য., ৫৩. ৩
পুরা তপশ্চচারোগ্রমমরাণাং পিতামহঃ।
আবির্ভূতাস্ততো বেদাঃ সষড়ঙ্গপদক্রমাঃ॥
ততঃ পুরাণমখিলং সর্বশাস্ত্রময়ং ধ্রুবম্।
নিত্যশব্দময়ং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্॥
নির্গতং ব্রহ্মণো বক্ত্রাত্তস্য ভেদান্নিবোধত॥—স্কান্দ., প্রভাসখণ্ড

তুলঃ "But the latter, the Puranas, have this in common with the three practical Vedas and the Brahmanas—that they are likewise 'inspired', because they are anonymous."—Goldstucker: *Inspired Writings of Hinduism*, p. 105

১৪। তুলঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্।
কোঽন্যো হি ভুবি মৈত্রেয় মহাভারতকৃদ্ ভবেৎ॥—বিষ্ণু

১৫। সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥—বায়ু, ৪. ১০-১১; মৎস্য; ৫৩., ৬৫ প্রভৃতি

Pargiter-এর মতে এই পাঁচটি লক্ষণই প্রাচীন পুরাণগুলির বৈশিষ্ট্য এবং যে সকল পুরাণে ইহার অতিরিক্ত বিষয় আছে সেগুলি পরবর্তীকালের। 'পঞ্চলক্ষণ' সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"This term could not have been coined after the Puranas substantially took their present composition, comprising great quantities of other matters, especially brahmanic doctrine and ritual, dharma

কল্প, বর্ণাশ্রমবিভাগ, ইষ্টাপূর্ত, দেবতাপ্রতিষ্ঠা—এই ছয়টি অধিক লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে।[১৬] বস্তুতঃ এইগুলি ছাড়াও পুরাণের আলোচ্য বিষয়ের গন্ডী আরও বিস্তৃত। ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, শারীরবিদ্যা, ব্যাকরণ, বাস্তুবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, অস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি সর্ববিষয়ই পুরাণগুলিতে আলোচনা করা হইয়াছে।

পুরাণগুলি ত্রিমূর্তিবাদের জন্ম দিয়াছে, অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এই তিনের উপাসনার উপরই পুরাণগুলি জোর দিয়াছে। হিন্দুধর্ম মূলতঃ বৈদিকধর্ম। বেদে বহুদেবতাবাদের অন্তরালে উদাত্তকণ্ঠে একেশ্বরবাদই ঘোষিত হইয়াছে। উপনিষদে সেই একেশ্বরবাদই চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। পুরাণের ত্রিমূর্তিবাদের পিছনেও আছে সেই একেশ্বরবাদ।[১৭] ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তথাপি ত্রিমূর্তিবাদই সেখানে ব্যক্ত।

Winternitz বলেন যে এক এক পুরাণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতার যে কোনও একজনের উপাসনার উপর জোর দিয়াছে এবং তাঁহাকেই অপর দুইজন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। অর্থাৎ, এক এক পুরাণে

of all kinds and the merits of tirthas, which are often explained with emphatic prominence. It belongs to a time before these matters were incorporated into the Puranas. It is therefore ancient characteristics of the earliest Puranas, and shows what their contents were." —*Ancient Indian Historical Tradition*, Chap. III, p. 36. Pargiter-এর মতে ধর্মপুরাণের আলোচ্য নহে (দ্রষ্টব্য : ঐ, পৃঃ ৪৮)। Monier Williams-এর মতে বিষ্ণুপুরাণের সম্বন্ধেই 'পঞ্চলক্ষণ' কথাটি সর্বাপেক্ষা অধিক খাটে (*Hinduism*, p. 84)। Wilson বলেন কতকগুলি পুরাণে ইহা আদৌ অনুসৃত হয় নাই; কতকগুলিতে মাত্র অংশতঃ অনুসৃত হইয়াছে।

১৬। তুল : উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব বংশান্ মন্বন্তরাণি চ।
বংশ্যানুচরিতং চৈব ভুবনস্য চ বিস্তরম্ ॥
দানধর্মবিধিং চৈব শ্রাদ্ধকল্পং চ শাশ্বতম্।
বর্ণাশ্রমবিভাগং চ তথেষ্টাপূর্তসংজ্ঞিতম্ ॥
দেবতানাং প্রতিষ্ঠাদি যচ্চান্যদ্ বিদ্যতে ভুবি।
তৎ সর্বং বিস্তরেণ ত্বং ধর্মং ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥—মৎস্য., ২. ২২-২৪

পূর্বোক্ত পঞ্চলক্ষণ নীতি কোনও পুরাণে অনুসৃত না হওয়ায় Monier Williams মনে করেন যে, "In the Bhagavata Purana, six original collections are especially declared to have been taught by Vyasa to six sages, his pupils, and these six collections may have formed the bases of the present works."—*Hinduism*, p. 83

১৭। তুল : যথাগ্নিরেকো বহুধা সমিধ্যতে বিকারভেদৈরবিকাররূপঃ।
তথা ভবান্ সর্বগতৈকরূপো রূপাণ্যশেষাণ্যনুপুষ্যতীশ ॥—বিষ্ণু., ৫. ১. ৪৪
গৃণন্তি সততং বেদা মামেকং পরমেশ্বরম্—কূর্ম. উপ., ৪, ৬
এনমেকে বদন্ত্যগ্নিং নারায়ণমথাপরে।
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণং ব্রহ্মাণমপরে জগুঃ ॥
ব্রহ্মবিষ্ণ্বগ্নিবরুণাঃ সর্বে দেবাস্তথর্ষয়ঃ।
একস্যৈবাথ রুদ্রস্য ভেদাস্তে পরিকীর্তিতাঃ ॥—ঐ, ৪৪. ৩৭

Also, "While nominally tritheistic—to suit the three developments of Hinduism, the religion of the Puranas is practically polytheistic and yet essentially pantheistic. Underlying their whole teaching may be discerned the one grand doctrine which is generally found at the root of Hindu Theology, whether Vedic or Puranic—pure uncompromising pantheism".—M. Williams: *The Indian Wisdom*

এক এক বিশেষ দেবতাবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাও পুরাণগুলির একটি বৈশিষ্ট্য। অথচ প্রাচীন পুরাণগুলির যে পঞ্চলক্ষণ নির্ধারিত হইয়াছে তাহার মধ্যে এত বড় একটা বৈশিষ্ট্যকে ধরা হয় নাই।[১৮]

পঞ্চলক্ষণের মধ্যে ঐ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ না থাকিলেও পুরাণগুলি নিজেই ঐ বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।[১৯] মৎস্যপুরাণ পুরাণগুলিকে চারিশ্রেণীতে ভাগ করিয়াছে—

(১) রাজস (যাহাতে ব্রহ্মার প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে)—ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন।

পুরাণসমূহের শ্রেণীবিভাগ

(২) সাত্ত্বিক[২০] (যাহাতে বিষ্ণুর প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে)—ভাগবত, নারদীয়, গরুড়, পদ্ম, বরাহ, বিষ্ণু।

(৩) তামস[২১] (যাহাতে শিবের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে)—শিব, লিঙ্গ, স্কন্দ, অগ্নি, মৎস্য, কূর্ম।

(৪) সংকীর্ণ (যাহাতে সরস্বতী ও পিতৃগণের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে)।

পূর্বে পুরাণসমূহের যে পঞ্চলক্ষণের কথা বলা হইয়াছে, প্রচলিত পুরাণগুলির দুই একটি ব্যতীত কোনও পুরাণই তাহা অনুসরণ করে নাই। মৎস্যপুরাণ অন্যান্য পুরাণগুলির বিষয়বস্তু ও শ্লোকসংখ্যা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে তাহাও ঐ নামে প্রচলিত পুরাণগুলির বিষয়বস্তু ও শ্লোকসংখ্যার সঙ্গে মেলে না। ইহা হইতে মনে হয় মূল মহাভারতের ন্যায় এক সময়ে মূল পুরাণও বর্তমান ছিল।[২২] যুগধর্ম অনুসারে সংক্ষিপ্ততর হইয়াছে বলিয়াই হউক বা সেই মূল পুরাণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই

১৮। "What is especially significant of almost all our Puranas, their sectarian character, i.e., their being dedicated to the cult of some god or other, of Vishnu or Siva, is completely ignored by the old definition."—Winternitz: *History of Indian Literature,* Vol. I, p. 522

১৯। দ্রষ্টব্য: সাত্ত্বিকেষু পুরাণেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ।
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ॥
তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ।
সংকীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাং চ নিগদ্যতে॥—মৎস্য., ৫৩. ৬৮-৯

দেবী-ভাগবতেও সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ অনুসারে অষ্টাদশ পুরাণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে (ঐ, কাশী সং, ১. ১. ১৩-৫)। স্কন্দপুরাণেও (বঙ্গবাসী সং, প্রভাসখণ্ড, ১. ২. ৮৭-৮) প্রায় ঐ ভাষাতেই পুরাণসমূহের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে এবং বিশেষভাবে বলা হইয়াছে যে, ১৮ খানির মধ্যে ৪ খানি বিষ্ণুর, ২ খানি ব্রহ্মার, ২ খানি রবির এবং অবশিষ্টগুলি শিবের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছে:

চতুর্ভির্ভগবান্ বিষ্ণুর্দ্বাভ্যাং ব্রহ্মা তথা রবিঃ।
অষ্টাদশপুরাণেষু শেষেষু ভগবান্ শিবঃ॥—ঐ, ৭. ১. ২. ৮৯

পদ্মপুরাণের (আনন্দাশ্রম সং, উত্তরখণ্ড, ২৬৩. ৮১-৫) মতে মৎস্য, কূর্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ ও অগ্নি হইল তামস পুরাণ; বিষ্ণু, নারদীয়, পদ্ম, বরাহ, গরুড়, ভাগবত হইল সাত্ত্বিক পুরাণ এবং ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন হইল রাজস পুরাণ। স্কন্দপুরাণের (শিবরহস্য খণ্ড, ২. ৩০-৫) মতে ১০টি পুরাণে শিবের, ৪টি পুরাণে বিষ্ণুর, ২টি পুরাণে ব্রহ্মার, ১টি পুরাণে অগ্নির এবং ১টি পুরাণে সবিতার মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে।

২০। এইগুলি 'বৈষ্ণব পুরাণ' নামে প্রসিদ্ধ।

২১। এইগুলিকে সাধারণতঃ, 'শৈবপুরাণ' বলা হয়।

২২। M. Williams, *Indian Wisdom*, pp. 492-3

হউক[২৩] মৎস্যপুরাণের উক্তির সহিত প্রচলিত পুরাণগুলির সামঞ্জস্য দেখা যায় না।

প্রাচীন কাল হইতে পরীক্ষিতের রাজ্যলাভ পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস জানিতে হইলে পুরাণগুলিই আমাদের প্রধান অবলম্বন। যে আকারে বর্তমান পুরাণগুলি আমরা পাই সে আকারে তাহাদের সংকলন গুপ্তযুগের পূর্বে হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না। অর্থাৎ পুরাণগুলি যে সকল প্রাচীন ঘটনার কথা বলিয়াছে তাহাদের ঘটনাকাল হইতে পুরাণগুলির সংকলনকালের ব্যবধান অনেক। এই সময়ের মধ্যে মানুষের স্মৃতিতে কোনও ঘটনাই সঠিকভাবে বিধৃত থাকিতে পারে না। যাঁহারা মুখে মুখে সেই প্রাচীন কাহিনীগুলিকে পুরুষানুক্রমে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহাদের মুখে মুখেই সে সব কাহিনী তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই পাল্টাইয়া গিয়াছে। বিচক্ষণ ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া যদি কেহ বিচার করেন তবে পুরাণের এই সকল কাহিনীর মধ্যে ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের যত কথা পাওয়া যাইবে আর কোথাও তাহা পাওয়া যাইবে না। সূত জাতির বিশেষ কার্যই ছিল দেবতা, ঋষি, রাজা ও মহান্ ব্যক্তিগণের বংশাবলী ও কর্ম সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ সংরক্ষণ করা। মূলতঃ ইহাই ছিল পুরাণের প্রথম উপাদান। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম পুরাণখানি যদি পাওয়া সম্ভব হইত তবে আমাদের জিজ্ঞাসা অনেকাংশে চরিতার্থ হইতে পারিত। তথাপি বর্তমান পুরাণগুলিতে রাজবংশের যে ইতিহাস সংরক্ষিত আছে তাহার এক বৃহৎ অংশের ঐতিহাসিক সত্যতা অনস্বীকার্য। Pargiter নিজেই বলিয়াছেন যে পুরাণের অনেক উক্তির সত্যতা বৈদিক উক্তির দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।

পুরাণসমূহের ঐতিহাসিক মূল্য

মহাভারতের যুদ্ধের কাল নির্ণয় করা সম্ভব হইলে প্রাচীন ভারতের অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনার কাল নিরূপণ করা সহজসাধ্য হইত। সপ্তম খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় পুলকেশীর Aihole inscription হইতে জানা যায় যে খৃঃ পূঃ ৩১০২ অব্দে মহাভারতের যুদ্ধ ঘটে। জ্যোতির্বিদ আর্যভট্টের মত অনুসারে ঐ সময়েই কলিযুগের আরম্ভ। আর একটি মত অনুসারে মহাভারতের যুদ্ধের কাল হইল খৃঃ পূঃ ২৪৪৯। মহাভারতে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান ও উল্লেখ হইতেও ভারতযুদ্ধের কালনির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। Pargiter-এর মতে ইহার কাল খৃঃ পূঃ ৯৫০ শতক। পণ্ডিতগণ মোটামুটি খৃঃ পূঃ ১৪০০ শতককেই ভারতযুদ্ধের কাল

২৩। দ্রষ্টব্য ঃ "..a good number of the Puranas, including some of the principal ones, came to be substituted by comparatively late works bearing the same titles. As examples of such replaced works we may name the *Brahma, Brahma-vaivarta, Garuda* and *Agneya-purana in* particular."—Hazra: *Studies in the Genuine Agneya-Purana alias Vahni-Purana*: *Our Heritage*: Vol. I, Part II, p. 209

মৎস্যপুরাণে ভগবান বলিতেছেন, কালধর্মে মানুষ পুরাণ গ্রহণে অক্ষম হইলে আমি যুগে যুগে ব্যাসরূপ ধারণ করিয়া ঐ পুরাণসমূহের সঙ্কলন করিয়া থাকি ঃ

কালেনাগ্রহণং মত্বা পুরাণস্য দ্বিজোত্তমাঃ।
ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে॥

তারপরই বলা হইয়াছে, দেবলোকে যে পুরাণসমূহ শতকোটি শ্লোকে প্রচারিত আছে তাহারই সারার্থ মর্ত্যলোকে অষ্টাদশ পুরাণরূপে প্রচারিত হইয়াছে ঃ

চতুর্লক্ষপ্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা।
তদষ্টাদশধা কৃত্বা ভূর্লোকেঽস্মিন্ প্রভাষ্যতে॥
অদ্যাপ্যমর্ত্যলোকে তু শতকোটিপ্রবিস্তরম্।
তদর্থোঽত্র চতুর্লক্ষঃ সংক্ষেপেন নিবেশিতঃ॥

বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন এবং ইহারই সহিত সঙ্গতি রাখিয়া মনু, যযাতি, মান্ধাতা, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির নিম্নানুরূপ কাল নির্ণয় করিয়াছেন—

মনু	আনুমানিক	খৃঃ পূঃ	৩১০০
যযাতি	"	"	৩০০০—২৭৫০
মান্ধাতা	"	"	২৭৫০—২৫৫০
পরশুরাম	"	"	২৫৫০—২৩৫০
রামচন্দ্র	"	"	২৩৫০—১৯৫০
কৃষ্ণ	"	"	১৯৫০—১৪০০

Pargiter ভিন্ন আর কেহ পুরাণগুলির ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করেন নাই। Pargiter-এর মতে পুরাণগুলি ক্ষাত্রধারার বাহক এবং বৈদিক সাহিত্য অপেক্ষা ইতিহাসের উপাদান পুরাণেই বেশী আছে। অনেকে আবার বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত ঘটনাবলীর ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু পুরাণের ঘটনাগুলির ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে পুরাণোক্ত অনেক ঘটনার ও নামের বৈদিক সাহিত্যে উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে এবং এরূপ ক্ষেত্রে সেই ঘটনা বা নামগুলিকে সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক বলিয়া স্বীকার না করিয়া আর উপায় নাই। যদি তাই হয় তবে কতকগুলি পুরাণোক্ত ঘটনার বা নামের বৈদিক সাহিত্যে উল্লেখ পাওয়া যায় না বলিয়াই তাহাদিগকে একেবারে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় থাকে না, কারণ বৈদিক সাহিত্যই যে ভারতবর্ষের সর্ব অঞ্চলের সব কিছুর কথা হুবহু ধরিয়া রাখিয়াছে এমন মনে করার কোনও কারণ নাই। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি ভারতের যে অঞ্চলে রচিত হইয়াছিল সেই অঞ্চলের রাজা ও রাজবংশের কথা বা উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোনও ঘটনার কথা তাহাতে থাকিতে পারে, তাই বলিয়া সর্বভারতব্যাপী রাজন্যবর্গের বংশতালিকা সেখানে পাওয়া সম্ভব নয়। এদিক দিয়া পুরাণ ও ঋগ্বেদের বিবরণে সর্বদা ঐক্য হওয়া কখনই সম্ভব নয়। রাজা যযাতির কথা পুরাণেও পাওয়া যায়, ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়। অনু, পুরু, যদু, দ্রুহ্যু, তুর্বসুর নামও উভয় স্থলে পাওয়া যায়। তবে পুরাণে যেমন ঐ পাঁচজনকে যযাতির পুত্র বলা হইয়াছে, ঋগ্বেদে সেরূপ কোনও প্রকার সম্পর্কের কোনও ইঙ্গিত দেওয়া হয় নাই। ঋগ্বেদে ও পুরাণে একই ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে অথচ হয়ত তাহার স্থান ও পরিবেশ সম্বন্ধে যে বিবরণ দুই স্থলে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে কোনও মিল নাই। এরূপ ক্ষেত্রে এই অমিলের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা ঠিক নয়, কারণ দীর্ঘকাল পরে পুরাণের যুগে যাঁহারা ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন, তাঁহাদের স্মৃতির স্খলন হওয়াও অসম্ভব নয়, এবং কখনই তাঁহারা সতর্ক ঐতিহাসিক ছিলেন না।[২৪]

সংস্কৃত সাহিত্যে পুরাণসমূহের স্থান এবং ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উপর ইহার প্রভাব

ধারাবাহিকতাই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। ব্যাবিলন, মিশর প্রভৃতি দেশে সুদূর অতীতে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছিল তাহার সহিত আজ আর ঐ দেশের জনগণের কোনও যোগাযোগ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রথম উৎপন্ন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্ম আধুনিক ভারতীয়গণের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মের সহিত এখনও এক অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে আবদ্ধ। এই যোগসূত্রই ভারতীয় সভ্যতার প্রাণ, এই বন্ধনই ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মবাণী। ঋগ্বেদের যুগ হইতে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে

২৪। The Vedic Age (First edition), p. 301

যুগে যুগে যে বিভিন্ন সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে সেই সাহিত্যের মধ্যেও এইরূপ একটি যোগসূত্র আছে—ফুল হইতে ফলে পরিণতির ন্যায় তাহাদের মধ্যেও একটি গভীর পরিণতির ভাব আছে। ভারতবর্ষ ধর্মপ্রধান দেশ। ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি, সমাজ সবকিছুই ধর্মকে ভিত্তি করিয়া উঠিয়াছে। এই ধর্মবোধের, ধর্মবিধির ও ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে যুগধর্মের খাতিরে যে পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে তাহার ধারক ও বাহক হইল ভারতবর্ষের সাহিত্য। সুতরাং ভারতের সাহিত্যই যুগে যুগে ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে রূপদান করিয়াছে।

গল্প শুনিবার আগ্রহ মানবের শাশ্বতী প্রবৃত্তি। উহার আরও একটি দুর্বলতা আছে। উহা অতীতকে ধরিয়া রাখিতে চায়, অতীতের পর্যালোচনায় আনন্দ লাভ করে, অতীতের গৌরবে নিজকে গৌরবান্বিত মনে করে। ভারতবাসীর সম্বন্ধে এই কথা অধিকতর সত্য। এই গল্প যদি আবার লোকোত্তর পুরুষগণের জীবনকে অবলম্বন করিয়া রচিত হয়, তবে তাহার প্রভাব হয় অপরিসীম। পুরাণ সাহিত্যে ভারতবর্ষের জীবনধারার বহুমুখী প্রবাহকে অবলম্বন করিয়া নানাবিধ আখ্যান ও উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। ধর্মে, সমাজে, আচারে-ব্যবহারে, বীর ও মহনীয় পুরুষগণের চরিত্ররূপায়ণে পুরাণ সাহিত্য অনবদ্য। সেই সব পুরাতন কাহিনী ও গল্প পুরাণের যুগে জনসভায় প্রচারিত হইত যাত্রা ও কথকতার ঢঙে। যাঁহারা প্রচার করিতেন, শ্রোতৃবর্গের রুচির অনুগমন করিবার জন্য তাঁহারা অনেক সময়ে কল্পনা মিশ্রিত করিয়া সেই সব কাহিনীকে নূতন রূপ দান করিতেন। এমনি করিয়া অতীত কাহিনীর উপর ভারতীয় জনচিত্তের আসক্তিই শুধু জন্মায় নাই, পুরাণকথকগণ এক সময়ে লোকশিক্ষার ভারও গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দেবালয়ে বা সাধারণের মিলনের স্থানে পুরাণপাঠ করা হইত। পুরাণপাঠ করা, পুরাণ হাতে নকল করা, সে যুগে পুণ্যকর্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। দেবালয়গুলিকে কেন্দ্র করিয়া পুরাণের আলোচনা হইত বলিয়া দেবমন্দির নির্মাণ বা পুরাতন দেবমন্দিরের সংস্কারসাধন তখনকার দিনে মহাপুণ্য বলিয়া মনে করা হইত।[২৫] ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেবমন্দিরের মাহাত্ম্যকীর্তন পুরাণসাহিত্যের এক বিশেষ দান। ধর্মস্থানকে কেন্দ্র করিয়া এবং ধর্মবোধকে অবলম্বন করিয়া সর্বসাধারণের মিলনক্ষেত্রের জন্য এই যুগেই আরম্ভ হইয়াছিল প্রথম প্রস্তুতি।[২৬]

২৫। অগ্নিপুরাণে বলা হইয়াছে, যে বিত্ত দান, ভোগ, কীর্তন বা ধর্মাচরণের জন্য ব্যয়িত হয় না তাহার অধিকারী হইলে লাভ কি? বিষ্ণু প্রভৃতির মন্দির নির্মাণে ব্যয়িত হইলেই অর্থের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার করা হয়। 'দেবমন্দির নির্মাণ করিব' এইরূপ চিন্তা করিলেও সকল পাপ দূরীভূত হয়, নির্মাণ করিলে তো কথাই নাই :

যদা বিত্তং ন দানায়, নোপভোগায় দেহিনাম্।
নাপি কীর্ত্যৈ ন ধর্মার্থং তস্য স্বাম্যেঽথ কো গুণঃ ॥
তস্মাদ্ বিত্তং সমাসাদ্য দৈবাদ্ বা পৌরুষাদথ।
দদ্যাৎ সম্যগ্ দ্বিজাগ্র্যেভ্যঃ কীর্তনানি চ কারয়েৎ ॥
দানেভ্যশ্চাধিকং যস্মাৎ কীর্তনেভ্যো বরং যতঃ।
অতশ্চ কারয়েদ্ধীমান্ বিষ্ণ্বাদের্মন্দিরাদিকম্ ॥—অগ্নি, ৩৮. ২৪-২৭
দেবাগারং করোমীতি মনসা যস্তু চিন্তয়েৎ।
তস্য কায়গতং পাপং তদহ্না হি প্রণশ্যতি ॥
কৃতে তু কিং পুনস্তস্য প্রাসাদে বিধিনৈব তু।
অষ্টেষ্টকাসমাযুক্তং যঃ কুর্যাদ্দেবতালয়ম্ ॥
ন তস্য ফলসম্পত্তির্বক্তুং শক্যেত কেনচিৎ।
অনেনৈবানুমেয়ং হি ফলং প্রাসাদবিস্তরাৎ ॥—ঐ, ৪১. ৩৩-৩৫

২৬। বৈদিক যুগে ধর্মকে উপলক্ষ করিয়া সাধারণের কোনও মিলনস্থান ছিল না, কোনও মন্দিরও ছিল না।

বৈদিক যাগযজ্ঞসমূহ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছিল বলিয়া তাহা সহজসাধ্য বা সর্বজনসাধ্য ছিল না। তাহারই বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ারূপে পুরাণ সাহিত্যেই প্রথম দেখা গেল এক চেতনার বিপ্লব। নদী ও তীর্থস্থান আসিয়া ধীরে ধীরে তাহার স্থান অধিকার করিল। নদীমাহাত্ম্য ও তীর্থমাহাত্ম্য প্রচারিত হইতে লাগিল। দানধর্ম এবং অতিথি-সেবাকে শ্রেষ্ঠ ধর্মাচরণ বলিয়া অভিহিত করা হইল। বৈদিক ধর্ম হইতে পৌরাণিক ধর্মের পরিধির পার্থক্য এই যে দেবমন্দির, নদী, তীর্থ, দান, অতিথি-সেবা—মূলতঃ এই পাঁচটির মাহাত্ম্যকীর্তনে বৈদিক যাগযজ্ঞ অল্প ফলপ্রসূ বলিয়া বিবেচিত হইল।[২৭]

ঋগ্বেদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণের পূর্ব পর্যন্ত বৈদিক সাহিত্যের যে বিশাল ধারা অবাধ গতিতে নামিয়া আসিয়াছিল, তাহাতে অবগাহনের অধিকার জনগণের ছিল না। এই দিক দিয়া বৈদিক ধর্ম বা বৈদিক সাহিত্য জনগণের ধর্ম

তুলঃ "There is no mention of any temple, nor any reference to a public place of worship, and it is clear that the worship was entirely domestic."—Wilson : *Rigveda*. Vol. I. p. xxiii ff

২৭। মৎস্যপুরাণে দেখা যায় যে, বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে বৈদিক যাগযজ্ঞ ছাড়িয়া তীর্থ-পর্যটনেরই উপদেশ দিতেছেন। কারণ, যজ্ঞানুষ্ঠান দরিদ্রের জন্য নহে, তাহাতে এত উপকরণ লাগে যাহা শুধু রাজা এবং ধনী লোকেই সংগ্রহ করিতে পারেন ঃ

ঋষিভিঃ ক্রতবঃ প্রোক্তা দেবৈশ্চাপি যথাক্রমম্।
ন হি শক্যা দরিদ্রেণ যজ্ঞাঃ প্রাপ্তুং মহীপতে॥
বহূপকরণা যজ্ঞা নানাসম্ভারবিস্তরাঃ।
প্রাপ্যন্তে পার্থিবৈরেতৈঃ সমৃদ্ধৈর্বা নরৈঃ কচিৎ॥
যো দরিদ্রৈরপি বিধিঃ শক্যঃ প্রাপ্তুং নরেশ্বর।
তুল্যো যজ্ঞফলৈঃ পুণ্যৈস্তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির॥
ঋষীণাং পরমং গুহ্যমিদং ভরতসত্তম।
তীর্থানুগমনং পুণ্যং যজ্ঞেভ্যোঽপি বিশিষ্যতে॥—মৎস্য, ১১২. ১২-১৫

তাহা ছাড়া যে যজ্ঞ সর্বার্থসাধক, সেই যজ্ঞে অতি সামান্য ত্রুটি হইলেও তাহাই আবার সর্বাধিক অমঙ্গলজনক হইয়া থাকে ঃ

অন্নহীনো দহেদ্ রাষ্ট্রং মন্ত্রহীনস্তু ঋত্বিজঃ।
যষ্টারং দক্ষিণাহীনং নাস্তি যজ্ঞসমো রিপুঃ॥
ন বাহপ্যল্পধনঃ কুর্যাৎ লক্ষহোমং নরঃ কচিৎ।
যস্মাৎ পীড়াকরো নিত্যং যজ্ঞে ভবতি বিগ্রহঃ॥—মৎস্য, ৯৩. ১৭১-৭২

তাহা ছাড়া আরও একটি কারণ ছিল। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে দেখা যায় শ্রুতি ও স্মৃতির পরস্পরবিরোধী বাক্যে জনগণের মনে ধর্মাধর্মবিষয়ে এক সময়ে প্রবল সংশয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, ধর্মবিষয়ে বিভিন্ন মতকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, বৈদিক যজ্ঞের বিপুল প্রভাবে শাস্ত্রার্থ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল (অধ্যায় ৬৪; মৎস্য, ১৫৩. ১৭৭), বহু অনুষ্ঠানে জোর করিয়া বৈদিক মন্ত্রের ব্যবহারও করা হইয়াছিল (অগ্নি, ৩১২.৪; কূর্ম—পূর্ব, ১৫.৮)। বৈদিক যজ্ঞধর্মের স্থানে এই কারণেই পুরাণে অভ্যুদয় হইয়াছে এক নূতন জনধর্মের। গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা প্রভৃতি নদীর—কাশী, প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থের মাহাত্ম্য উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে ঃ

তুলঃ পুষ্করে দুষ্করং গন্তুং পুষ্করে দুষ্করং তপঃ।
দুষ্করং পুষ্করে দানং বস্তুং চৈব সুদুষ্করম্॥
কুরুক্ষেত্রং গমিষ্যামি কুরুক্ষেত্রে বসাম্যহম্।
য এবং সততং ব্রূয়াৎ সোহমলঃ প্রাপ্নুয়াদ্দিবম্॥—অগ্নি, ১০৯. ৮, ১৪

গয়াগমনকে ব্রহ্মজ্ঞানের সমান বলা হইয়াছে। কলিযুগে গঙ্গাকেই একমাত্র আশ্রয় বলা হইয়াছে। গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে জীবন ত্যাগ করিলে পরমা গতি প্রাপ্ত হওয়া যায় বলা হইয়াছে ঃ

যা গতির্যোগযুক্তস্য তত্ত্বজ্ঞস্য মনীষিণঃ।
সা গতিস্ত্যজতঃ প্রাণান্ গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে॥
কৃতে তু নৈমিষং ক্ষেত্রং ত্রেতায়াং পুষ্করং পরম্।
দ্বাপরে তু কুরুক্ষেত্রং কলৌ গঙ্গা বিশিষ্যতে॥—মৎস্য, ১০৬. ২৩. ৫৭

বা সাহিত্য ছিল না। পুরাণই সেই ধর্মকে সর্বজনলভ্য করিল,[২৮] সেই সাহিত্যকে লোকশিক্ষার বাহনরূপে সাধারণের মধ্যে প্রচার করিল। বৈদিক যুগে যে জ্ঞান সাধারণের গোচরীভূত হওয়া নিষিদ্ধ ছিল, পুরাণের মাধ্যমে তাহাই প্রচারিত হইল। পৌরাণিক ব্রাহ্মণগণ বৈদিক ধর্মকে অবজ্ঞা করেন নাই,[২৯] তাহাকেই প্রচার করিয়াছেন, যুগধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে তাহার সংস্কারসাধন করিয়াছেন। হিন্দুর ধর্ম, জ্ঞান ও সংস্কৃতির সাধারণীকরণ হইল পুরাণসমূহের বিশেষ অবদান।

বৈদিক সাহিত্য ছিল ধর্মমূলক। ভারতবাসী ধর্ম ও চিন্তার ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর অগ্রগতি লাভ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় মেলে সেই সাহিত্যে। কিন্তু একটা বিশাল জাতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় শুধু তাহার ধর্ম ও চিন্তার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নহে। জাতির জীবনে আরও দিক আছে। যুগে যুগে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য একটি জাতি

মৎস্যপুরাণ সাড়ে তিন কোটি তীর্থস্থানের কথা বলিয়াছে (১১০·৭)। ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে জাতির মানসী প্রতিক্রিয়া যদি বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের কারণ হয়, (দ্রষ্টব্য : "Buddhism was a protest against the tyranny of Brahmanism and caste."—Monier Williams: *Hinduism*, p. 53) তবে ঐ একই কথা পুরাণ-ধর্ম সম্বন্ধেও সমভাবে সত্য। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের পার্থক্য সম্বন্ধে Monier Williams বলিয়াছেন :

"What then is Buddhism? It is certainly not Brahmanism, yet it arose out of Brahmanism, and from the first had much in common with it. Brahmanism and Buddhism are closely interwoven with each other, yet they are very different from each other. Brahmanism is a religion which may be described as all theology, for it makes God everything and everything God. Buddhism is no religion at all, and certainly no theology, but rather a system of duty, morality and benevolence, without real deity, prayer or priest."—*Ibid*, p. 52

ব্রাহ্মণ্যধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের যে পার্থক্য, পুরাণ-ধর্মেরও ঠিক সেই পার্থক্য নহে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের ন্যায় পুরাণের ধর্ম theology-ও বটে আবার বৌদ্ধধর্মের ন্যায় 'system of duty, morality and benevolence'-ও বটে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের theological character-কে পুরাপুরি অস্বীকার করার জন্যই ভারতভূমিতে বৌদ্ধধর্ম টিঁকিতে পারে নাই, আর সেইটাকে গ্রহণ করার জন্যই পুরাণধর্ম দৃঢ়মূল হইয়াছে। বর্তমানের হিন্দুধর্ম মুখ্যতঃ পুরাণের ধর্ম—"It is creed..which, with further deteriorations, caused by the lapse of centuries, is still the main religion of the masses in India."—Goldstucker: *Inspired Writings of Hinduism*, p. 128

২৮। বৈদিক ধর্মকে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সহজলভ্য করার যে প্রবৃত্তি তৎকালীন সমাজে দেখা গিয়াছিল তাহার ফলেই 'ব্রত' পুরাণ-ধর্মের কাঠামোয় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। দরিদ্রগণও যাহাতে সামর্থ্য অনুসারে ধীরে ধীরে ধর্মাচরণ করিতে পারে তাহার জন্যই ব্রতসমূহের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বিভূতি দ্বাদশীব্রতের প্রসঙ্গে মৎস্য-পুরাণ যাহা বলিয়াছে তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় :

অল্পবিত্তো যথাশক্ত্যা স্তোকং স্তোকং সমাচরেৎ।
যশ্চাপ্যতীব নিঃস্বঃ স্যাৎ ভক্তিমান্ মাধবং প্রতি।
পুণ্যার্চনবিধানেন স কুর্যান্বৎসরন্বয়ম্ ॥—৯৯. ১৭-১৮

২৯। Monier Williams এতদূর পর্যন্ত মনে করেন যে, পুরাণের যে ত্রিমূর্তিবাদ তাহারও ভিত্তি হইতেছে বৈদিক মন্ত্রসমূহ :

"It is probable, indeed, that although the Tri-murti is not named in the Vedic hymns, yet the Veda is the real source of this Triad of personifications, afterwards so conspicuous in Hindu mythology."—Monier Williams: *Hinduism*, p. 17.

কিভাবে কাজ করিয়াছে, কোন্ বিশেষ ক্ষেত্রে কিরূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়া নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিবিধ ক্ষেত্রে জাতির জীবনে কি কি সংঘাত আসিয়াছে এবং তাহার কি প্রতিক্রিয়া হইয়াছে, কাহারা তাহাকে সেই সংঘাতের মধ্যে পরিচালিত করিয়াছে, ধর্মের ক্ষেত্র ছাড়াও জাতি অন্য কোন্ কোন্ দিকে তাহার প্রতিভা নিযুক্ত করিয়াছে, বিরুদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া কিভাবে এক নূতন জাতীয় সত্তার নব-অভ্যুদয় সম্পন্ন হইয়াছে—এই সমস্ত না জানিলে জাতির ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় না। ধর্ম ও চিন্তার ক্ষেত্রের অগ্রগতিতে দান ছিল ব্রাহ্মণের। বৈদিক সাহিত্য ছিল সেই ব্রাহ্মণ্য ধারার ইতিহাস। অন্যান্য বিষয়ে দান ছিল ক্ষত্রিয়ের ও জনগণের। পুরাণ সাহিত্য সেই ক্ষাত্রধারা[৩০] ও জনস্রোতের[৩১] ইতিহাস। এই উভয় ধারার ইতিহাসই ভারতবর্ষের ইতিহাস—ভারতবাসীর ইতিহাস।

বৈদিক যুগের ধর্ম ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। সর্বজনীনতার অভাবহেতু তাহাকে 'হিন্দু ধর্ম' বলা যায় না। হিন্দু ধর্মের প্রথম রূপ পাওয়া যায় পুরাণ সাহিত্যে। ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়া, বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতি হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়া, তাহা দ্বারা নিজের কলেবর পরিপুষ্ট করিয়া ভারতবাসীর ধর্ম যখন সকলকে গ্রহণ করিল, সকলের কথা বলিল, তখনই তাহা হইল 'হিন্দু ধর্ম', 'হিন্দু-ইতিহাস'। তাহার পরিচয় পাইতে হইলে পুরাণ সাহিত্য ছাড়া আর গতি নাই। ভারতের রাজশক্তির কার্যকলাপ ও রাজবংশের উত্থানপতনের ইতিহাস জানিতে হইলেও পুরাণই প্রধান অবলম্বন। পুরাণ সাহিত্যের উদ্ভবকাল সম্বন্ধে যত সন্দেহই থাকুক না কেন, তাহার বিষয়বস্তু যত বিচিত্রই হউক না কেন, এই দিক দিয়া বিচার করিলে প্রথম হইতে

বেদের নাশ পুরাণ চাহে নাই। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলা হইয়াছে যে, বেদ নষ্ট হইলে যজ্ঞ নষ্ট হইবে, যজ্ঞ নষ্ট হইলে দেবতা নষ্ট হইবে, দেবতা নষ্ট হইলে সকলই নষ্ট হইবে ঃ

বেদে নাশমনুপ্রাপ্তে যজ্ঞো নাশং গমিষ্যতি।
যজ্ঞে নষ্টে দেবনাশস্ততঃ সর্বং প্রণশ্যতি।—৬৬.৬

বেদবিরোধী সমস্ত শাস্ত্রকে নিষ্ফল ও তমোনিষ্ঠ বলা হইয়াছে ঃ

যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ।
—কূর্ম, পূর্বভাগ, ২. ৩১; তুল ঃ বায়ু ৬২, ১১০।

৩০। এই দ্বিবিধ ধারা সম্বন্ধে Pargiter-এর মন্তব্য ঃ

"There must have been two great streams of distinct tradition, Ksatriya tradition and brahmanic tradition....If the Brahmans could and did preserve their religious compositions with the most scrupulous care and fidelity, it is absurd to suppose the opposite about Ksatriya tradition when there were men whose business it was to preserve such tradition."

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

"The position now is this—there is a strong presumption in favour of tradition ; if any one contests the tradition, the burden lies on him to show that it is wrong ; and, till he does that, tradition holds the field."—*Ancient Indian Historical Tradition*, Chap. I, pp. 5-6

৩১। Hazra পুরাণসাহিত্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ

"Like a living organism it has undergone changes from time to time with the changes in the social and religious life of the people and has thus been able to preserve to an appreciable degree materials for the study of popular life in ancient and mediaeval India."—*Our Heritage*: Vol. I. Part II, p. 209.

শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্য-মাল্যের মধ্যমণি হইল পুরাণ। ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাসকে, ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবমুক্ত জনগণের ইতিহাসকে সংরক্ষিত করিবার প্রবৃত্তি ও প্রেরণা দুইয়েরই প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় পুরাণ সাহিত্যে।

পুরাণের পর যত সাহিত্য রচিত হইয়াছে, পুরাণের প্রভাব হইতে কেহই মুক্ত নহে। পুরাণের গল্প ভারতবাসী শুনিয়াছিল, নূতন করিয়া নূতন ভাবে তাহা জানিবার জন্য তাহার চিত্ত উন্মুখ হইয়াছিল। কাব্য, নাটক, আখ্যান, আখ্যায়িকা সব কিছুর মধ্য দিয়া সে নূতন করিয়া একই কথা শুনিয়াছে। পুরাণের দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার উপাখ্যান লইয়া কালিদাসকে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটক লিখিয়া যশস্বী হইতে হইয়াছে, উর্বশী ও পুরূরবার কাহিনী লইয়াই তাঁহাকে বিক্রমোর্বশী লিখিতে হইয়াছে। দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার বিরহ-মিলনের মধ্য দিয়া ভারতবাসী প্রেমের গভীর পরিণতি অনুভব করিয়াছে, রাম-সীতার বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া উত্তররামচরিতে আমরা করুণরসের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি উপভোগ করিয়াছি। রাধা-কৃষ্ণের শাশ্বত প্রেম-কাহিনী ছাড়া আর আমাদের নিকট কোনও প্রেম স্বর্গীয় সুষমাসম্ভার লইয়া আসে নাই। দশ-কর্মে, পালে-পার্বণে আমরা বেদ-মন্ত্রের স্থানে নূতন মন্ত্রের ব্যবহার করিয়াছি, নূতন ঢঙে আমাদের সংস্কারসমূহের রূপসজ্জা করিয়াছি,[৩২] সামাজিক আচার-ব্যবহারের মধ্যে নূতন প্রথা-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছি। বেদের অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি অসংখ্য দেবতার স্থলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, রাধা-কৃষ্ণ, হর-পার্বতী প্রভৃতি নূতন দেবদেবীর সৃষ্টি করিয়াছি, নিজের মনের মতন করিয়া তাঁহাদের রূপ কল্পনা করিয়াছি, মন্দিরে মন্দিরে ধাতুময়ী প্রতিমা নির্মাণ করিয়াছি,[৩৩] পুষ্প-দূর্বা-চন্দনে পুরাণের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহাদের পূজা করিয়াছি।[৩৪]

শ্রুতি ও স্মৃতি হিন্দু ধর্মের মূল। পুরাণ শ্রুতি ও স্মৃতির কেবল অনুগমনই করে নাই, অনেক বেশী বলিয়াছে।[৩৫] প্রাচীন স্মৃতির স্থলে নব্য স্মৃতি রচিত হইয়াছে। পুরাণোক্ত আখ্যান, উপাখ্যান ও আচার-ব্যবহারের ভিত্তিতেই তাহাতে হিন্দুর ধর্মানুষ্ঠানের যৌক্তিকতা নির্ণীত হইয়াছে। এমনি করিয়া পুরাণ সাহিত্য হিন্দুর

৩২। তুল: "The Aryans met with religious practices and beliefs among the peoples whom they ruled over or came into lasting contact with, and have assimilated some of them gradually, thus modifying their own religion to a certain extent."—Pargiter: *op. cit.* Chap, I, p. 3

৩৩। পৌত্তলিকতার উদ্ভব পুরাণে। তাহার পূর্বে প্রতিমা পূজা ছিল না। অগ্নি-পুরাণে মাটি, কাঠ, লোহা, রত্ন, প্রস্তর, গন্ধ ও পুষ্প নির্মিত সাত প্রকার প্রতিমার কথা বলা হইয়াছে:

মৃন্ময়ী দারুঘটিতা লোহজা রত্নজা তথা।
শৈলজা গন্ধজা চৈব কৌসুমী সপ্তধা স্মৃতা ॥—অগ্নি, ৪৩. ১১

কোন্ দেবতার প্রতিমার কি রূপ হইবে তাহাও বলা হইয়াছে। বাসুদেবের প্রতিমা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে:

দক্ষিণে তু করে চক্রমধস্তাৎ পদ্মমেব চ।
বামে শঙ্খং গদাঽধস্তাদ্বাসুদেবস্য লক্ষণাৎ ॥—ঐ, ৪৪. ৪৬-৭

৩৪। বৈদিক সাহিত্যে 'পূজা' ছিল না, 'হোম' ছিল। দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দিয়াই বৈদিক যুগে দেবতার উপাসনা করা হইত। 'পূজা' শব্দটিও অনার্য-ভাষাগোষ্ঠী হইতে গৃহীত। দ্রষ্টব্য: Majumdar: *History and Culture of the Indian Peoples*: Vol. 1, p. 160 ff

৩৫। যন্ন দৃষ্টং হি বেদেষু তদ্ দৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজা।
উভয়োর্যন্ন দৃষ্টং হি তৎ পুরাণৈঃ প্রগীয়তে ॥—স্কান্দ, প্রভাসখণ্ড

সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনকে যুগে যুগে গড়িয়া তাহাকে নূতন রূপ দান করিয়াছে এবং তাহার উপাদানকে নিজের মধ্যে কালজয়ী করিয়া বিধৃত রাখিয়াছে।[৩৬]

পুরাণসমূহের সংখ্যা

প্রধান পুরাণগুলির নাম 'মহাপুরাণ'[৩৭] এবং অপ্রধান পুরাণগুলির নাম 'উপপুরাণ'[৩৮]। মৎস্য পুরাণে[৩৯] মহাপুরাণ ও উপপুরাণগুলির নাম ও সংখ্যা, প্রতি পুরাণের শ্লোকসংখ্যা, পুরাণদানের ফল বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। উপপুরাণের সংখ্যাও আঠারো। ইহারা অনেক পরবর্তীকালের। কয়েক স্থানে বেদবাহ্য জৈনধর্মের ও বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ, তন্ত্রসমূহের কথা এবং তন্ত্রপ্রধান দেশসমূহের উল্লেখ হইতে ইহাদের অর্বাক্তনতা পরিস্ফুট হয়।[৪০]

পুরাণসমূহের প্রায় প্রত্যেকটিতেই বলা হইয়াছে যে উহা বেদকেই অনুসরণ করিয়াছে—পুরাণং বেদসম্মতম্। বলা হইয়াছে যে সমস্ত বেদ পুরাণে প্রতিষ্ঠিত।[৪১] অনেক স্থানে বলা হইয়াছে যে, ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যেই বেদব্যাখ্যান সম্পূর্ণ হয়। বেদার্থের ন্যায় পুরাণার্থও নিশ্চল। বেদ অজ্ঞ ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যানভয়ে ভীত

৩৬। তুলঃ "The Puranic literature, which must have originated in the later Vedic period, has, in all ages, been connected with the life of the common people much more intimately than the Vedic. Like a living organism it has undergone changes from time to time with the changes in the social and religious life of the people and has thus been able to preserve to an appreciable degree materials for the study of popular life in ancient and mediæval India."—R. C. Hazra: Studies in the Genuine Agneya-Purana *alias* Vahni-Purana, *Our Heritage*: Vol. I. Part II, p. 209

৩৭। বিষ্ণুপুরাণে অষ্টাদশ মহাপুরাণের নাম ঃ—

আদ্যং সর্বপুরাণানাং পুরাণং ব্রাহ্মমুচ্যতে।
অষ্টাদশপুরাণানি পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে॥
ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবং চ শৈবং ভাগবতং তথা।
অথান্যং নারদীয়ং চ মার্কণ্ডেয়ং চ সপ্তমম্॥
আগ্নেয়মষ্টমং চৈব ভবিষ্যং নবমং তথা।
দশমং ব্রহ্মবৈবর্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতম্॥
বারাহং দ্বাদশং চৈব স্কান্দং চাত্র ত্রয়োদশম্।
চতুর্দশং বামনং চ কৌর্মং পঞ্চদশং স্মৃতম্॥
মাৎস্যং চ গারুড়ং চৈব ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ততঃ পরম্।—বিষ্ণু, ৩৬, ২১-২৪

অলবেরুনিকে বিষ্ণুপুরাণের এই তালিকাই শোনান হইয়াছিল এবং তিনি অষ্টাদশ মহাপুরাণের যে তালিকা দিয়াছেন তাহা ইহার সহিত মিলিয়া যায়।

৩৮। উপপুরাণগুলি সমস্তই অষ্টাদশ পুরাণ হইতে নির্গত হইয়াছে—

অষ্টাদশভ্যস্তু পৃথক্ পুরাণং যৎ প্রদিশ্যতে।
বিজানীধ্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তদেতেভ্যো বিনির্গতম্॥—মৎস্য, ৫৩. ৬৪

৩৯। মৎস্যপুরাণ, ৫৩ অধ্যায়

৪০। বেদত্রয়ীপরিভ্রষ্টাংশ্চকার ধিষণাধিপঃ।
বেদবাহ্যান্ পরিজ্ঞায় হেতুবাদসমন্বিতান্॥
জঘান শক্রো বজ্রেণ সর্বান্ ধর্মবহিষ্কৃতান্॥—মৎস্য, ২৪. ৪৮-৯

৪১। বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ—নারদীয়

হইয়া ইতিহাস ও পুরাণের মধ্যে স্বীয় অর্থকে নিশ্চল করিয়া রাখিয়াছে।[৪২] পুরাণগুলি কোথাও বেদের অবমাননা করে নাই। বৈদিক যাগযজ্ঞের শ্রেয়ঃসাধনতা, বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের লোকশ্রেষ্ঠতা পদে পদে প্রচার করিয়াছে, বেদনিন্দাকে মহাপাতক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে পুরাণগুলি অনেক স্থানে বৈদিকমন্ত্রসমূহের ভাষ্যের কাজ করিয়াছে এবং পুরাণ না থাকিলে বেদের অনেক আখ্যানভাগ আজও আমাদের নিকট দুর্বোধ থাকিয়া যাইত। বেদের অনেক দুর্বোধ মন্ত্রের অর্থ পুরাণের সাহায্যেই উদ্ধার করা যায়। এই দিক দিয়া পুরাণ বেদের পরিপূরক।[৪৩]

বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্মের সাম্য

বৈদিক যুগে যজ্ঞানুষ্ঠানই ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। ব্রাহ্মণসাহিত্যগুলি বেদমন্ত্রের অধিযজ্ঞ ব্যাখ্যায় পূর্ণ এবং ঐ গ্রন্থগুলির রচয়িতৃগণ ধরিয়া লইয়াছিলেন যে যজ্ঞে প্রযুক্ত হইবার জন্যই প্রতিটি বেদমন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। পুরাণগুলিও এই মতেরই সমর্থক। অগ্নিপুরাণের মতে যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্যই ঋক্, যজুঃ ও সাম মন্ত্রসমূহের সৃষ্টি।[৪৪] মৎস্যপুরাণের এক স্থানে[৪৫] শক্র বলিকে বলিতেছেন যে দেবতারা বেদপ্রমাণ বলেই যজ্ঞভাগভুক্ হইয়াছেন। কূর্মপুরাণে (৫৬·২৭) ভারতবর্ষকে যজ্ঞের দেশ বলা হইয়াছে। এই ভারতখণ্ডে যজ্ঞানুষ্ঠান এক সময়ে এমন প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে রাজা বেন যজ্ঞানুষ্ঠান বন্ধ করিয়া দেওয়ার ফলে প্রজাবর্গ তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হয় এবং তাঁহাকে হত্যা করে।[৪৬] ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলা হইয়াছে যে বেদ নষ্ট হইলে যজ্ঞ নষ্ট হইবে, যজ্ঞ নষ্ট হইলে দেবতা নষ্ট হইবে, দেবতা নষ্ট হইলে সবই নষ্ট হইবে।[৪৭] কূর্মপুরাণে বলা হইয়াছে যে কোনও ব্রাহ্মণের বংশে পর পর তিন পুরুষ যদি যজ্ঞানুষ্ঠান না করেন তবে সেই বংশের চতুর্থ পুরুষকে 'দুর্ব্রাহ্মণ' আখ্যা দেওয়া হয়।[৪৮] কাজেই পুরাণ বেদকে বা বৈদিক ধর্মকে অবহেলা করিয়া স্বতন্ত্র ও বেদনিরপেক্ষ মতবাদ প্রচার করিয়াছে একথা কোনও মতেই বলিবার উপায় নাই।

৪২। বেদবন্নিশ্চলং মন্যে পুরাণার্থং দ্বিজোত্তমাঃ।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ ॥
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং চালয়িষ্যতি।
ইতিহাসপুরাণৈস্তু নিশ্চলোঽয়ং কৃতঃ পুরা ॥—স্কান্দ, প্রভাসখণ্ড

এই কথাই অন্যভাবে বলা হইয়াছে ঃ
ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি ॥
—বায়ু, ১. ২০১; মহাভারত, ১. ১. ২৬৭

৪৩। এইজন্যই বলা হইয়াছে, চারি বেদ ও সমস্ত উপনিষদ জানিয়াও যদি কেহ পুরাণজ্ঞ না হন তবে তিনি বিচক্ষণ হইতে পারেন না ঃ
যো বিদ্যাচ্চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজঃ।
ন চেৎ পুরাণং সংবিদ্যান্নৈব স স্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥
—পদ্ম, ৫. ২. ৫০-২; শিব, ৫. ১. ৩৫ প্রভৃতি

৪৪। ঋচো যজূংষি সামানি নির্মমে যজ্ঞসিদ্ধয়ে—অগ্নি, ১৭. ১৩; দ্রঃ বিষ্ণু, ৩. ১৪. ২১

৪৫। যজ্ঞভাগভুজো-দেবা বেদপ্রামাণ্যতোঽসুরাঃ—মৎস্য ২৪৬. ১৪

৪৬। বিষ্ণু, ১.১৩; ব্রহ্মাণ্ড, ৬৮. ১০৭

৪৭। বেদে নাশমনুপ্রাপ্তে যজ্ঞো নাশং গমিষ্যতি। যজ্ঞে নষ্টে দেবনাশস্ততঃ সর্বং প্রণশ্যতি ॥ ৬৬.৬

৪৮। যস্য বেদশ্চ বেদী চ বিচ্ছিদ্যেতে ত্রিপুরুষম্। স বৈ দুর্ব্রাহ্মণো নার্হঃ শ্রাদ্ধাদিষু কদাচন—কূর্ম, উপ। ২১.১৭—এই শ্লোকটিই ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে সায়ণপূর্ব-যুগের বেদভাষ্যকার ভট্ট ভাস্কর তাঁহার বেদভাষ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন (তৈ. স, মহীশূর সং, ২০১, ১০. পৃঃ, ৩১৫)

কিন্তু তথাপি পুরাণের ধর্ম ও বৈদিক ধর্মের মধ্যে মস্ত একটি পার্থক্য রহিয়াছে। বৈদিক যুগের যজ্ঞ পুরাণে আর স্থান পায় নাই। মৎস্যপুরাণে বলা হইয়াছে (১৪৪·১৭) যে কলিযুগে বেদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পুরাণগুলির বহু স্থানে বলা আছে যে যজ্ঞ দ্বাপরের ধর্ম ছিল, কলির ধর্ম হইল দান। ভাগবত সম্প্রদায় কঠোরভাবে বৈদিক যজ্ঞ ধর্মের সমালোচনা করিয়াছেন।[৪৯] যজ্ঞে পশুহত্যার যৌক্তিকতাও স্বীকৃত হয় নাই।[৫০] ধর্মের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট নীতি হিসাবে এই সময়েই 'অহিংসার' আবির্ভাব হয়। জৈন, বৌদ্ধ ও ভাগবত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে এই সময়ে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের ৬৪তম অধ্যায়ে এই সময়ের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার একটি বিশেষ চিত্র পাওয়া যায়।

পার্থক্য

পুরাণসমূহ নিজেদের দৈবী উৎপত্তির কথাই প্রচার করিয়াছে। অনেক পুরাণের মতে ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রথমে পুরাণসমূহ নির্গত হয়, পরে বেদসমূহের আবির্ভাব হয়। মৎস্যপুরাণের মতে প্রথমে বিপুলায়তন একখানি পুরাণ ছিল। কালক্রমে মানুষ তাহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ হওয়ায় ভগবান ব্যাস-রূপ ধরিয়া যুগের প্রয়োজন অনুসারে তাহা সংক্ষিপ্ত করিয়া অষ্টাদশ পুরাণরূপে পৃথিবীতে প্রচার করেন।[৫১] কূর্মপুরাণে বলা হইয়াছে, এ পর্যন্ত ২৮ জন ব্যাস জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং শেষ দ্বাপরে অষ্টাবিংশ ব্যাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিই সত্যবতীর পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। শেষ পুরাণসমূহ তাঁহার দ্বারাই বিভক্ত বা রচিত হয়।[৫২] ইহা হইতে এইটুকু বুঝা যায়, পুরাণের রচনাকাল হইতে যুগে যুগে পুরাণের সংখ্যা ও কলেবরে যুগধর্মের তাগিদে বহু পরিবর্জন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হইয়াছে। গবেষকগণের আলোচনায় ইহা প্রমাণিতও হইয়াছে।[৫৩]

পুরাণসমূহের উৎপত্তি ও সংরক্ষণ

পূর্বে বলা হইয়াছে যে বাহ্মণ্যধারার বাহক ছিল বৈদিক সাহিত্য এবং ক্ষাত্রধারাকে বহন করিয়াছিল পুরাণ সাহিত্য। যে বিশেষ শ্রেণী ক্ষত্রিয়জাতির ইতিহাসকে মনে রাখিয়াছিল তাহারা জাতিতে ছিল 'সূত'। ক্ষত্রিয় পিতা ও ব্রাহ্মণী মাতার সন্তান সূতজাতি বর্নসঙ্কর বিশেষ। মাগধ ও বন্দিন্ নামক আরও দুই শ্রেণীর কথা জানা যায়, কিন্তু এই তিন শ্রেণীর জনগণের বৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য কি ছিল তাহা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয় নাই। Winternitz বলেন যে, সূতজাতি ক্ষত্রিয় রাজাদের সহিত

৪৯। গীতা—৪.৩৩; ৪.৪২; Ray Choudhury: *Early History of the Vaishnava Sect.* (2nd Ed) pp. 6-7

৫০। ব্রহ্মাণ্ড, ৬৩.১২; বিষ্ণু, ৩. ১৮. ১৫

৫১। পুরাণং সর্বশাস্ত্রাণং প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
অনন্তরং চ বক্তেভ্যো বেদাস্তস্য বিনির্গতাঃ ॥
পুরাণমেকমেবাসীত্তদা কল্পান্তরেঽনঘ।
ত্রিবর্গসাধনং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্ ॥
কালেনাগ্রহণং দৃষ্টা পুরাণস্য ততো নৃপ।
ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে ॥
তদষ্টাদশধা কৃত্বা ভূর্লোকেঽস্মিন্ প্রকাশ্যতে।
অদ্যাপি দেবলোকেঽস্মিন্ শতকোটিপ্রবিস্তরম্ ॥—মৎস্য, ৫৩ অধ্যায়

৫২। অষ্টাবিংশে পুনঃ প্রাপ্তে হ্যস্মিন্ বৈ দ্বাপরে দ্বিজা।
পরাশরসুতো ব্যাসঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽভবৎ।
স এব সর্ববেদানাং পুরাণানাং প্রদর্শকঃ।—কূর্ম, পূর্বভাগ, অধ্যায় ৫০

৫৩। ব্রহ্ম, ব্রহ্মবৈবর্ত, গরুড় ও আগ্নেয়পুরাণ ঐ নামের মূল পুরাণগুলির স্থানে পুনর্বার রচিত হইয়াছে এবং মূল কালিকাপুরাণ, আদিপুরাণ ও সৌরপুরাণ একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।—R. C. Hazra: *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute*, XXII, 1941, pp. 1-23; *New Indian Antiquary*: VI, pp. 103-11 and 121-29.

ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল, তাঁহাদের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিত এবং সারথির কার্যও করিত।[৫৪] কাজেই সূতগণের পক্ষে ক্ষত্রিয় রাজাদের কার্যকলাপ ও রাজবংশের ইতিহাস প্রভৃতি জানার সুযোগ ছিল সর্বাধিক। প্রায় প্রত্যেক পুরাণের বক্তাই সূত লোমহর্ষণ কিংবা তাঁহার পুত্র উগ্রশ্রবা। সূত জাতিই যে পুরাণবক্তার স্থান অধিকার করিয়াছিল ইহা তাহাই প্রমাণ করে। এই সূতজাতির সহিত বেদের ও ব্রাহ্মণ্য ধারার কোনও সংযোগ ছিল না এবং পুরাণবক্তৃত্ব তাঁহাদের বৃত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।[৫৫] একথা মনে করা অসম্ভব নয় যে, জনমণ্ডলীতে পুরাণ-পাঠকালে যাহা তাঁহারা জানিতেন তাহার সঙ্গে যাহা জানিতেন না এমন অনেক কথাও জনগণের মনোরঞ্জনের জন্য বলিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের জানা ও অজানা সব কিছু মিলিয়া যাহার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাই পুরাণ নামে আমাদের নিকট চলিয়া আসিয়াছে।

পুরাণ যতদিন সূতজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন পর্যন্ত পুরাণে ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বৈদিক যাগযজ্ঞের কথা, শ্রাদ্ধকল্প, বর্ণাশ্রমবিধি প্রভৃতি স্থান পায় নাই। এইগুলি সম্বন্ধে সূতজাতির কিছু বলিবার অধিকার ছিল না। সূতজাতির নিকট হইতে দেবমন্দিরের পুরোহিত শ্রেণীর হস্তে এক সময়ে পুরাণ প্রচারের ভার চলিয়া যায়। এই পুরোহিতশ্রেণী অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারাই পুরাণের মধ্যে উক্ত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হয়। পুরাণের যে পঞ্চলক্ষণের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে এই বিষয়গুলি পড়ে না। সুতরাং, যে পুরাণে এই বিষয়গুলি যত অধিক পরিমাণে সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা তত পরবর্তীকালের রচনা। এই পুরোহিতগণের হস্তেই পুরাণের ভাষা দুর্বল হইয়াছে, ছন্দশৈথিল্য প্রকট হইয়াছে, ব্যাকরণগত অশুদ্ধি প্রবেশ করিয়াছে এবং বর্ণনীয় বিষয়সমূহ অতিরঞ্জিত হইয়াছে।[৫৬]

বিভিন্ন পুরাণে অষ্টাদশ মহাপুরাণের যে তালিকা দেখা যায় তাহার সবগুলিতে ব্রহ্মপুরাণের সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রহ্মার প্রাধান্য কীর্তিত হওয়ায় ইহাকে রাজস পুরাণের অন্তর্গত করা হইয়াছে। প্রথমেই দেখা যায় যে নৈমিষারণ্যে ঋষিরা সমবেত হইয়াছেন। এমন সময়ে সেখানে উপস্থিত হইলেন সূত লোমহর্ষণ। ঋষিরা তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন, ব্রহ্মাণ্ডের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত সৃষ্টিক্রম তাঁহাদের শুনাইতে হইবে। এইখানেই আরম্ভ হইল সূতের মুখে ব্রহ্মপুরাণের বিবৃতি। একে একে আরম্ভ হইল বিশ্বের উৎপত্তির কথা, দেবগণের উৎপত্তির ইতিহাস, চন্দ্র ও সূর্যবংশীয় রাজাগণের উৎপত্তির

ব্রহ্মপুরাণ

৫৪। "The Sutas were the representatives of the old heroic poetry who lived in the court of the princes and sang to extol them. They also wentforth to battle so as to be able to sing of the heroic deeds of the warriors from their own observation. These court-bards stood closer to the warriors than to the learned Brahmins. They also acted as charioteers of the warriors in their campaigns and took part in their martial life."—Winternitz: *History of Indian Literature*: Vol. II (German Edition)

৫৫। তুল ঃ মদন্বয়ে তু যে সূতাঃ সম্ভূতা বেদবর্জিতাঃ।
তেষাং পুরাণবক্তৃত্বং বৃত্তিরাসীদজাজ্ঞয়া॥—কূর্ম, পূর্বভাগ, অধ্যায় ১৪

৫৬। Pargiter বলেন, যে ব্রাহ্মণগণের অজ্ঞতা, ভুল-ত্রুটি এবং অতিরঞ্জনই পুরাণসমূহকে অনেকখানি মূল্যহীন করিয়া ফেলিয়াছে। পুরাণসমূহের যে যে অংশে ব্রাহ্মণগণের রচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা বাদ দিয়া যদি পুরাণের আলোচনা হয় তবে দেখা যাইবে যে, পুরাণ ক্ষাত্রধারার ইতিহাস এবং আলোচ্য বিষয়ের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাহার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য ও ধারাবাহিকতা দেখা যাইবে—*Ancient Indian Historical Tradition*, Chap. IV, p. 75.

কথা, মনুষ্যজাতির আদিপুরুষ মনু ও তাঁহার বংশধরগণের কাহিনী, পৃথিবীর আকৃতি ও বিভাগ, স্বর্গ ও নরকের বর্ণনা—এই সব কিছু, যা সব পুরাণেরই মোটামুটি আলোচনার বস্তু। ব্রহ্মপুরাণের অনেকখানি অংশ জুড়িয়া আছে তীর্থসমূহের মাহাত্ম্য বর্ণনা। উড়িষ্যার পবিত্র স্থান ও মন্দিরসমূহের বিশদ বিবরণও এখানে দেওয়া আছে। সূর্যোপাসনা, আদিত্যগণের উৎপত্তি, পার্বতীর জন্মবিবরণ, শিবের সহিত তাঁহার বিবাহ এবং এই প্রসঙ্গে শিবের সম্বন্ধে অনেক কাহিনীও এখানে স্থান পাইয়াছে। অনেকগুলি অধ্যায়ে কৃষ্ণের জীবনচরিতও বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শেষদিকে স্থান পাইয়াছে শ্রাদ্ধকল্প, নীতি, বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, স্বর্গ ও নরকের সুখ ও শাস্তির কথা।

ব্রহ্মপুরাণের অতি সামান্য অংশই প্রাচীনত্বের দাবি করিতে পারে। ইহার বেশীর ভাগ অংশই বেশ পরবর্তীকালের রচনা। উড়িষ্যায় শৈবধর্ম খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে প্রবেশলাভ করে নাই এবং বৈষ্ণবধর্ম তাহারও বহু পরে প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং যে বহুল অংশে শিব ও বিষ্ণুর আলোচনা স্থান পাইয়াছে তাহা ঐ সময়ের অবশ্যই অনেক পরে হইবে। ব্রহ্মপুরাণে কোনারকের সূর্যমন্দিরের উল্লেখ দেখা যায়। ঐ সূর্য-মন্দির খৃষ্টাব্দ ১২৪১-এ নির্মিত হইয়াছিল। ইহা হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীরও পরের রচনা ব্রহ্মপুরাণে স্থান পাইয়াছে ইহা মনে হয়।

বিষ্ণুপুরাণ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মূল গ্রন্থ। দার্শনিকপ্রবর রামানুজাচার্য তাঁহার বেদান্তসূত্রের টীকায় এই গ্রন্থটিকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে বৈষ্ণবদের এতবড় একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও বিষ্ণুর উদ্দেশে কোনও যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের বা কোনও বিষ্ণুমন্দিরের উল্লেখ ইহাতে নাই। আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে পুরাণের যে পঞ্চলক্ষণের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে তাহার সবগুলিই এই পুরাণখানিতে আছে যাহা আর কোন পুরাণে দেখা যায় না। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে ইহার বিষয়বস্তুর আলোচনায় একটা ধারাবাহিকতা দেখা যায় এবং ইহা অন্যান্য পুরাণের মত কতকগুলি বিক্ষিপ্ত আলোচ্য বস্তুর সঙ্কলন মাত্র নহে। এইসব হইতে ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে যে, প্রাচীন পুরাণগুলির মধ্যে ইহা একখানি এবং ইহার মূল-রূপ আজ পর্যন্ত অপরিবর্তিত আছে।[৫৭] V. A. Smith মনে করেন মৌর্য রাজ-বংশের (খৃ. পূ. ৩২৬-১৮৫) ইতিহাস জানিবার পক্ষে ইহা একখানি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

বিষ্ণুপুরাণ

মৎস্যপুরাণ পঞ্চলক্ষণ-সমন্বিত আর একখানি প্রাচীন পুরাণ। প্রবল বন্যায় পৃথিবী প্লাবিত হইলে বিষ্ণু মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া নৌকারূঢ় মনুকে উদ্ধার করেন এবং হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গে তাঁহার নৌবন্ধন করিয়া তাঁহাকে প্লাবনের হাত হইতে রক্ষা করেন। এই প্রাচীন কাহিনী হইতেই মৎস্যপুরাণের আরম্ভ। মনু ও মৎস্যের কথোপকথনই এই পুরাণের বিষয়বস্তু। এক স্থানে বেদবাহ্য জৈনধর্মের উল্লেখ[৫৮] এবং অবৈদিক ধর্মসমূহের প্রতি ইঙ্গিত[৫৯] লক্ষিত হওয়ায় মনে হয় যে ইহার কিছু অংশ পরবর্তীকালে মূল পুরাণের সহিত সংযোজিত

মৎস্যপুরাণ

৫৭। "....we are here dealing with a work of the earlier Purana literature, which, on the whole, at least, has been preserved in its original form."—Winternitz: *History of Indian Literature*, p. 545

৫৮। মৎস্য, ২৪. ৪৭

৫৯। বেদত্রয়ীপরিভ্রষ্টাংশ্চকার ধিষণাধিপঃ
বেদবাহ্যান্ পরিজ্ঞায় হেতুবাদসমন্বিতান্।
জঘান শক্রো বজ্রেন সর্বান্ ধর্মবহিষ্কৃতান্ ॥—মৎস্য, ২৪. ৪৮.৪৯

হইয়া পড়িয়াছিল। অন্ধ্ররাজবংশের (খৃ. দ্বিতীয় শতক) ইতিহাসের তথ্যসমূহ জানিবার পক্ষে মৎস্যপুরাণের প্রয়োজনীয়তা Smith কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে।

বায়ুপুরাণ, শৈবপুরাণ বা **শিবপুরাণ** নামেও উল্লিখিত হইয়াছে এবং গ্রন্থে শিবোপাসনার বহুল আলোচনাই ইহার কারণ বলিয়া মনে হয়। মহাভারত ও হরিবংশেও একখানি বায়ুপুরাণের উল্লেখ দেখা যায় এবং হরিবংশের অনেক স্থানের সহিত বায়ুপুরাণের মূল ভাগের আক্ষরিক মিল আছে। মহাকবি বাণভট্ট (খৃ. ৬২৫) বায়ুপুরাণ শ্রবণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন পুরাণসমূহের পঞ্চলক্ষণ ইহাতে অনুসৃত হইয়াছে। খৃ. চতুর্থ শতকের গুপ্তরাজবংশের শাসনকালের অনেক কথাও ইহা হইতে জানা যায়। Winternitz মনে করেন যে বায়ুপুরাণ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্তী হইতে পারে না।[৬০]

বায়ুপুরাণ

ভারতবর্ষে ভাগবতপুরাণ অপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তা অন্য কোনও পুরাণ অর্জন করিতে পারে নাই। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ভাগবত-শাখার অসংখ্য অনুবর্তিগণের নিকট এই গ্রন্থ পরম শ্রদ্ধেয় ও প্রামাণ্য। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ, ইহার উপর বহু টীকাকারগণের টীকা-প্রণয়ন এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তাই প্রকাশ করে। এই প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তার জন্যই পুরাণগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম ভাগবতপুরাণই ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়। বিষ্ণুপুরাণের সহিত ইহার বিষয়বস্তুর প্রভূত মিল আছে, এবং ইহা যে অনেক পরবর্তীকালের রচনা সে বিষয়েও সন্দেহ করিবার মত কিছু নাই। ভাগবতপুরাণকে অবলম্বন করিয়া রচিত **মুক্তাফল** নামক একখানি গ্রন্থের এবং ঐ পুরাণেরই অনুক্রমণী **হরিলীলা** নামক আর একখানি গ্রন্থের রচয়িতা হইলেন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বোপদেব। এই কারণেই বোপদেবকে অনেকে ভাগবতপুরাণের রচয়িতা বলিয়া মনে করেন এবং অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত সেই হিসাবে খৃ. ত্রয়োদশ শতাব্দীকে ইহার রচনাকাল বলিয়া ঘোষিত করিয়াছেন। C. V. Vaidya মনে করেন যে শঙ্করাচার্যের (খৃ. নবম শতাব্দীর প্রারম্ভ) পরে এবং গীতগোবিন্দকার কবি জয়দেবের মধ্যে (খৃ. দ্বাদশ শতক) কোনও সময় ইহার রচনাকাল। Pargiter ইহাকে নবম শতাব্দীর রচিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য বিষয়ের ধারাবাহিকতা, কাব্যাংশে উৎকর্ষ এবং ভাষা, রীতি ও ছন্দের ব্যবহারে পারিপাট্য অন্যান্য পুরাণ হইতে ইহাকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

ভাগবতপুরাণ

'উপ' অর্থে 'অপ্রধান' ধরিয়া লইয়া সাধারণতঃ এই শ্রেণীর রচনাগুলির আজ পর্যন্ত বিশেষ কোনও মূল্য দেওয়া হয় নাই। অথচ বিস্ময়ের কথা এই যে অষ্টাদশ প্রধান পুরাণগুলির তুলনায় ইহাদের মূল্য কম তো নয়ই বরং অনেক দিক দিয়া বেশী। গুপ্ত যুগের পূর্ব হইতে ভারতবর্ষের অনেক কথা এই পুরাণগুলিতে লিপিবদ্ধ আছে যাহা আর কোথাও নাই। মহাভাগবত, কালিকাপুরাণ, দেবী ভাগবত, ধর্মপুরাণ প্রভৃতি কতকগুলি উপপুরাণ পূর্ব ভারতের বিশেষ করিয়া বাংলা ও কামরূপের ধর্মীয় ও সামাজিক ইতিহাস রচনার বহু মূল্যবান ও অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান দেয়। সাধারণতঃ অপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হইলেও ইহাদের সংখ্যা ও বিষয়বস্তু মহাপুরাণগুলির সংখ্যা ও বিষয়বস্তুর তুলনায় মোটেই গৌণ নয়। অনেকে মনে করেন যে এই উপপুরাণগুলির বেশ কয়েকখানা মহাপুরাণগুলি অপেক্ষাও প্রাচীন এবং ইহাদের মধ্যে এমন অনেক তথ্য রহিয়াছে যাহা মহাপুরাণগুলি অপেক্ষা

উপপুরাণ

৬০। "There certainly existed an ancient Purana under this name, and undoubtedly there is still preserved in our text much of this ancient work, which is probably not later than the fifth century. A. D."—Winternitz: *History of Indian Literature*, p. 554

প্রাচীনত্বেরই ইঙ্গিত করে। তাহা ছাড়া অনেক লুপ্ত সংস্কৃত গ্রন্থের পুনরুদ্ধারের পক্ষেও এই উপপুরাণগুলি সহায়ক হইতে পারে। বহু লুপ্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সার সংকলন করায় বা তাহা হইতে অনেক অংশ উদ্ধৃত করায় সেই সব গ্রন্থের মোটামুটি একটা পরিচয় অনেক ক্ষেত্রে আমরা ইহাদের সাহায্যে পাইতে পারি।

'মহাপুরাণ' নামটি অনেক পরবর্তীকালে দেওয়া হইয়াছে। ভাগবত (১২. ৭. ১০ ও ২২) এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (৪. ১৩১. ৭ ও ১০) এই শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তখন হইতেই অষ্টাদশ পুরাণকে বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মহাপুরাণের সংখ্যা অনুসারে উপপুরাণের সংখ্যাও অষ্টাদশের মধ্যেই সীমিত রাখার চেষ্টা করা হইয়াছে যদিও সে চেষ্টা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারা জানিতেন যে উহাদের সংখ্যা আরও বেশী।[৬১] বিভিন্ন স্থানে উপপুরাণগুলির যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্যে মোটেই কোনও মিল নাই।[৬২] সাধারণতঃ খৃষ্টাব্দ ৬৫০-৮০০ উপপুরাণগুলির রচনা-কাল বলিয়া ধরা হইয়া থাকে।

উপপুরাণগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে কূর্মপুরাণ ও পরাশর উপপুরাণে বলা হইয়াছে যে ব্যাসের নিকট অষ্টাদশ মহাপুরাণ শ্রবণ করার পর উগ্রশ্রবা এই উপপুরাণগুলি রচনা করিয়াছিলেন। মৎস্যপুরাণে (৫৩. ৫৯, ৬৩) বলা হইয়াছে অষ্টাদশ মহাপুরাণ হইতে যাহা কিছু পৃথক তাহাই ঐ মহাপুরাণগুলিরই উপভেদমাত্র এবং মহাপুরাণ হইতেই তাহাদের সৃষ্টি। সৌরপুরাণে উপপুরাণগুলিকে 'খিল' বলা হইয়াছে। উপপুরাণগুলি কিন্তু ঠিক নিজেদের এই গৌণতাকে স্বীকার করিয়া লয় নাই এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নিজেদের পুরাণ আখ্যা দিয়াছে, উপপুরাণ আখ্যা দেয় নাই। কোনও মহাপুরাণের সহিত নিজেদের যুক্ত করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতেও চেষ্টা করে নাই।

ইহাদের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে—সৌরপুরাণ বলিয়াছে (৯. ৪-৫) যে ব্রহ্মাদি মহা-পুরাণের যে পঞ্চলক্ষণ উপপুরাণগুলির সম্বন্ধেও সেই পঞ্চলক্ষণই প্রযোজ্য। ভাগবত পু. (১২. ৭. ৯-১০) দশটি লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে—সর্গ, বিসর্গ, বৃত্তি, রক্ষা, অন্তর, বংশ, বংশানুচরিত, সংস্থা, হেতু, অপাশ্রয়। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত উপপুরাণগুলির সম্যক আলোচনা হইলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য আহরণ করা সম্ভব হইতে পারে।

৬১। পদ্ম পুঃ (পাতলখণ্ড) ১১১. ৯৪; কূর্ম, ১.১, ১৬-২০
স্কন্ধ পুঃ (রেবাখণ্ড) ১. ৪৬-৫২ ইত্যাদি। তুলঃ বৃহদ্ধর্ম পুঃ ১. ২৫. ৭;
অন্যাশ্চ সংহিতাঃ সর্বা মারীচ-কাপিলাদয়ঃ।
সর্বত্র ধর্মকথনে তুল্য 'সামর্থ্য' মুচ্যতে॥ (Contd.)

৬২। Hazra তাঁহার *Studies in the Upapuranas* (Vol. I) গ্রন্থে (পৃঃ ৪) এই তালিকা দিয়াছেন।

কালিদাস-পূর্ব যুগ

মহাকাব্য ও পুরাণের যুগ শেষ হইল। এবার সংস্কৃত কাব্যের যুগ। প্রশ্ন হইল, এ যুগের আরম্ভ কবে হইতে, কোথা হইতে? কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত একটিই উত্তর ছিল—কালিদাস হইতে। কাব্য, নাটক, লিরিক্ প্রভৃতি সাহিত্যের যে কোনও ক্ষেত্রেই কালিদাস হাত দিয়াছেন, তাহাতেই সোনা ফলাইয়াছেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলার মত নাটক, রঘুবংশ-কুমারসম্ভবের মত কাব্য, মেঘদূতের মত লিরিক্ ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। পুরাণের পর হইতে কালিদাস পর্যন্ত কালের ব্যবধান কয়েকশত বৎসর তো বটেই। কালিদাস হইতে সংস্কৃত কাব্যের যুগ আরম্ভ হইয়াছে, এই কথা বলার অর্থ হইল পুরাণ সাহিত্যের পর হইতে কালিদাসের কাল পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষা বন্ধ্যা ছিল, ভারতবর্ষে সংস্কৃতে এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া কোনও রচনা হয় নাই এবং যেদিন কালিদাস প্রথম লেখনী গ্রহণ করিলেন সেইদিনই সংস্কৃত সাহিত্য কোনও যাদুদণ্ডের প্রভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করিল। Maxmuller এই কথাই বলিয়াছেন।[১] অনেকে বলিলেন, ভারতবর্ষের উপর এই সময়ের মধ্যে একের পর এক যে সকল বৈদেশিক আক্রমণ হইয়া গিয়াছে তাহাতে সাহিত্য সৃষ্টি করার মত মানসিক অবস্থা জাতির ছিল না। কেহ কেহ বলিলেন যে এই সময়ে প্রাকৃত ভাষায় রচনাই সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং পরে যখন সংস্কৃত রচনা তাহার যাত্রা শুরু করিল তখন প্রাকৃত সাহিত্যের উপরই তাহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল।

কিন্তু সত্যই কি তাই? যদি পুরাণের পর হইতে কালিদাসের কাল পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় কোন প্রকার রচনা না হইয়া থাকে, যদি সংস্কৃত-রচনা-প্রবাহ সত্যই একেবারে শুষ্ক হইয়া যাইবে তবে সেই সংস্কৃত সাহিত্যের সাহারায় রাতারাতি সোনা ফলানো কি করিয়া কালিদাসের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে? এই সংশয় স্বাভাবিক। ইতিহাস স্তব্ধ থাকিতে পারে, লিখিত প্রমাণ-পত্র নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া এত বড় একটা অসম্ভবকে সম্ভব বলিয়াও বুদ্ধি সহজে গ্রহণ করিতে পারে না। বিবুধগণের অনুসন্ধিৎসা, অনলস পরিশ্রম ও অতন্দ্র গবেষণায় এই অন্তর্বর্তীকালের অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। আজ আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, এই সুদীর্ঘকালে সংস্কৃত সাহিত্য মৃত ছিল না। তাহার প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া ছিল না। তাহার প্রমাণ কি?

রামায়ণের প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করিয়াছি যে রামায়ণের মধ্যে স্থানে স্থানে অপূর্ব কাব্যসম্পদ রহিয়াছে। যেখানে এই কাব্যসম্পদ রামায়ণের মধ্যে পরবর্তীকালের প্রক্ষিপ্ত অংশ, সেখানেও সেগুলি কালিদাসের বহুপূর্বে। সুতরাং কালিদাসের হাতে যে সংস্কৃত কাব্য পরম পরিণতি লাভ করিয়াছিল, রামায়ণেই তাহার সূত্রপাত।[২]

বৈয়াকরণ **পাণিনিও জাম্ববতীজয়** নামে একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।[৩] পতঞ্জলি বররুচির রচিত একখানি কাব্যের কথা বলিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে এমন শ্লোক

১। *India: What can it teach us* (1882), pp. 281 *ff.*

২। "Valmiki and those who improved on him, probably in the period 400—200 B. C. are clearly the legitimate ancestors of the court-epic."—Keith

৩। জল্হন তাঁহার **সূক্তি-মুক্তাবলী** নামক গ্রন্থে রাজশেখরের রচনা বলিয়া একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ব্যাকরণের পর পাণিনি এই কাব্যখানি রচনা করেন বলা হইয়াছে। শ্লোকটি এই:

স্বস্তি পাণিনয়ে তস্মৈ যস্য রুদ্রপ্রসাদতঃ।
আদৌ ব্যাকরণং কাব্যমনু জাম্ববতীজয়ম্॥

অনেকে মনে করেন **পাতালবিজয়** নামক আর একখানি কাব্যও পাণিনিরই রচনা। পাণিনি যে কবি ছিলেন সে বিষয়ে Aufrecht-ই সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বা শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে অনেক সংস্কৃত কাব্য রচিত হইয়াছিল।[৪] পিঙ্গল তাঁহার **ছন্দঃসূত্রে** যে বিভিন্ন প্রকার ছন্দের উল্লেখ করিয়াছেন, নামের দিক দিয়া তাহারা কবি-মানসেরই পরিচয় দেয় এবং একথাও মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে তাঁহার সময়ে ঐ সকল ছন্দে কাব্য রচিত হইয়াছিল।

এ পর্যন্ত যে সকল উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে সেগুলিও কালিদাস-পূর্ব যুগে সংস্কৃত-কাব্য-ধারার অস্তিত্বের সাক্ষ্যই বহন করিতেছে। এই সকল লিপি হইতে Buhler প্রমাণ করিয়াছেন যে দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উচ্চাঙ্গের সংস্কৃত কাব্য রচিত হইয়াছিল। মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামণের *Girnara inscription*-এ (খৃষ্টাব্দ ১৫০ শতক) মহাকাব্যের রচনাশৈলী কি ভাবে ধীরে ধীরে পরবর্তী কাব্যের রচনাশৈলীতে রূপায়িত হইতেছে তাহা পরিস্ফুট।[৫] ইহার সমসাময়িক *Nasik inscription of Siri Pulumayi* নামে আর একটি প্রাচীন লিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহার রচয়িতা সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং হয়ত ইহা মূল সংস্কৃত রচনারই প্রাকৃত অনুবাদ মাত্র। পরবর্তী সংস্কৃত কাব্যের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য ইহাতে বিদ্যমান এবং বহুল পরিমাণে অনুপ্রাসেরও ইহাতে প্রয়োগ করা হইয়াছে। এলাহাবাদে প্রাপ্ত একটি লিপিতে **হরিষেণ রচিত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তিও**[৬] (খৃষ্টাব্দ ৩৫০ শতক) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। **তন্ত্রাখ্যায়িকা, বাৎস্যায়নের কামসূত্র, বাণভট্ট কর্তৃক উল্লিখিত**[৭] **ভট্টার-হরিচন্দ্রের গদ্যরচনা, ভাসের নাটকাবলী, অশ্বঘোষের কাব্য, আর্যশূরের রচনাবলী, জাতক ও অবদান সাহিত্য** প্রভৃতি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে যে সংস্কৃত সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে কালিদাস রাতারাতি ভুঁইফোড় হইয়া আবির্ভূত হন নাই, সংস্কৃত সাহিত্যের ধারক ও বাহকরূপে তাঁহারও পথিকৃৎ ছিলেন।[৮] আজ আমরা অশ্বঘোষ ছাড়া কালিদাস-পূর্ব যুগে আর কোনও কবির রচনার উল্লেখ করিতে পারি না, কারণ আর কোন তথ্য-প্রমাণ আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছায় নাই।[৯] কিন্তু কালিদাসের পূর্বে যে সংস্কৃত কাব্য রচিত হইত একথা জোর করিয়া বলিবার মত প্রমাণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কালিদাসের পূর্বে সংস্কৃতে কোনও কাব্য রচিত হয় নাই বলিয়া যে মতবাদ এক সময়ে Maxmuller কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল Lassen, Buhler, Fleet, Kielhorn প্রভৃতি মনীষিগণ তাহা সংশয়াতীতরূপে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। বুদ্ধের জীবনী ও বৌদ্ধ ধর্মের মূল তত্ত্বগুলি প্রচার করিবার জন্য যে অশ্বঘোষকে সংস্কৃত ভাষাকে আশ্রয় করিয়া **বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ** নামক কাব্যদ্বয় রচনা করিতে হইয়াছিল তাহাও কালিদাস-পূর্ব যুগে সংস্কৃত ভাষারই

৪। 'ছন্দোবৎ কবয়ঃ কুর্বন্তি', 'সা হি তস্য ধনক্রীতা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী', 'আ বনান্তাদ্ ওদকান্তাৎ প্রিয়ং পান্থমনুব্রজেৎ' প্রভৃতি।

৫। সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার, অলঙ্কারের প্রয়োগ প্রভৃতি পরবর্তী কাব্য সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ ইহাতে লক্ষিত হয় এবং বলা হইয়াছে যে নরপতি নিজেও গদ্য ও পদ্য রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

৬। Buhler-এর মতে ইহার রচনাকাল খৃষ্টাব্দ ৩৭৫—৩৯০ শতকের মধ্যে এবং D. B. Diskalkar-এর মতে (*Selections from Sanskrit Inscriptions*) খৃষ্টাব্দ ৩৬০ শতক।

৭। পদবন্ধোজ্জ্বলো হারী কৃতবর্ণক্রমস্থিতিঃ।
ভট্টারহরিচন্দ্রস্য গদ্যবন্ধো বিভাব্যতে॥—হর্ষচরিত

৮। কালিদাস নিজে ভাস, সৌমিল্ল, কবিপুত্র প্রভৃতি তাঁহার পূর্ববর্তিগণের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

৯। "It is, therefore, accident only which has preserved Buddhist works like those of Asvaghosa as the earliest specimens of Kavya." —Keith.

জনপ্রিয়তার পরিচায়ক।[১০] পশ্চিমের ক্ষত্রপ জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহারা ভারতের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছিল, সহিত্য, শিল্প ও ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিল, সেইগুলি প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিল। সুতরাং তাহাদের আক্রমণের জন্য ভারতবর্ষের সংস্কৃত সাহিত্য লুপ্ত হইয়াছিল, Maxmuller-এর এই অনুমান সমর্থনযোগ্য নহে। মহাকাল তাহার মৌন ভংগ করিলে আরও অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবে। **অশ্বঘোষ হইতে কালিদাস** পর্যন্ত কালে সংস্কৃত সাহিত্য তাহার গতিপথে সুস্পষ্ট পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, কিন্তু **পতঞ্জলি হইতে অশ্বঘোষ পর্যন্ত** কালে সে চিহ্ন অস্পষ্ট।[১১]

এখন আমরা **অশ্বঘোষ হইতে কালিদাস পর্যন্ত** সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করিব। এই কালটিকে চারভাগে আলোচনা করা হইয়াছে—(ক) বৌদ্ধ গ্রন্থকারগণের রচনা (খ) জাতক ও অবদান সাহিত্য (গ) গল্প-সাহিত্য (ঘ) ভাস ও তাঁহার রচনাবলী।

কালিদাস-পূর্ব যুগের বৌদ্ধ সাহিত্য

কালিদাসের পূর্বে মহাযানপন্থী বৌদ্ধগণ কিছু কিছু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। যে ভাষায় তাঁহারা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহা পালি ভাষা নহে। তাহা অংশত সংস্কৃত মাত্র। Senart ঐ ভাষাকে Mid-Sanskrit বলিয়াছেন এবং Pischel-এর মতে উহাই হইল Gāthā dialect. এই ভাষায় রচিত সাহিত্যকে মোটামুটিভাবে আমরা 'বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য' বলিতে পারি। হীনযানপন্থী বৌদ্ধগণেরও অনেক রচনাকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকে।

এই শ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে হীনযানপন্থী বৌদ্ধগণের **মহাবস্তু** সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থখানির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে লিখিত এবং বিষয়বস্তুও খুব সুবিন্যস্ত নয়। একই উপাখ্যানের পুনরাবৃত্তি বড় বেশী দেখা যায়। তথাপি সুপ্রাচীন ধারার বাহক হিসাবে এবং গল্পের ভান্ডার হিসাবে গ্রন্থখানির মূল্য অস্বীকার করা যায় না। অনেক গল্প পুরাণের গল্পের মত মনে হয়। মূলত হীনযানপন্থিগণের রচনা হইলেও ইহা মহাযানপন্থিগণের রচনার সহিত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বহন করিতেছে। খৃঃ পূঃ ৩য় শতকের পূর্বেই ইহার রচনাকাল বলা যাইতে পারে।

হীনযানগণের মধ্যে সর্বাস্তিবাদী সম্প্রদায়ের আর একখানি গ্রন্থ হইল **ললিতবিস্তর**। মহাযানপন্থী বৌদ্ধগণও ইহাকে অতি পবিত্র গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। গ্রন্থখানিকে একজনের রচনা বলিয়া মনে হয় না। ইহার মধ্যে প্রাচীন ও নবীন অনেক উপাদানই আছে। একারণে ইহাকে বৌদ্ধধর্মের সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া মনে করা

১০। "The fact that a Buddhist poet should, at the commencement of the Christian era, adopt the Sanskrit Kavya-style for the avowed object of conveying the tenets of his faith, hitherto generally recorded in the Vernacular, is itself an indication of its popularity and diffusion; and the relatively perfect form in which the Kavya emerges in his writings presupposes a history behind it."
—Das Gupta & De

১১। "The difficulty of arriving at an exact conclusion regarding the origin and development of the Kavya arises from the fact that all the Kavya literature between Patanjali and Asvaghosa has now disappeared; and we cannot confidently assign any of the Kavyas, which have come down to us, to the period between the 2nd century B. C. and the 1st or 2nd century A. D. We have thus absolutely no knowledge of the formative period of Sanskrit Literature."—*Ibid*

সঙ্গত নয়। অশ্বঘোষ তাঁহার বুদ্ধচরিতের অনেক উপাদান ইহা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। Kern মনে করেন যে ইহার গদ্যাংশ মূল প্রাকৃতের সংস্কৃত অনুবাদ এবং এই অনুবাদ কণিষ্কের সমসাময়িক কালেই করা হইয়াছিল।

আর্যচন্দ্রের একখানি গ্রন্থের নাম **মৈত্রেয়ব্যাকরণ** বা **মৈত্রেয়সমিতি**। গ্রন্থখানি বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্য শারিপুত্রের কথোপকথনকে অবলম্বন করিয়া রচিত। বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থখানির অনুবাদ হইয়াছে।

বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বগণের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া যে সব গ্রন্থ এই সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে **সদ্ধর্মপুণ্ডরীক** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুরাণের ভঙ্গীতে লিখিত এই গ্রন্থখানিতে বিভিন্ন কালের বহু উপাদান প্রবিষ্ট হইয়াছে। খৃষ্টাব্দ ২২৫ হইতে ৩১৬-এর মধ্যে বইখানি চীনভাষায় অনূদিত হয়, সুতরাং মূল গ্রন্থখানির রচনা-কাল খৃষ্টাব্দের পূর্বে হইবে এরূপ অনুমান করা চলিতে পারে। **কারণ্ডব্যূহ, সুখাবতীব্যূহ, অক্ষোভ্যব্যূহ** প্রভৃতি গ্রন্থগুলিও ঐ একই উদ্দেশ্যে রচিত।

বৌদ্ধ দর্শন-সাহিত্য

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক মূল্যবান দার্শনিক গ্রন্থ বৌদ্ধগণের রচিত। এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলির মধ্যে **প্রজ্ঞাপারমিতাগুলি** অন্যতম। খৃষ্টাব্দ ১৭৯তে একখানি প্রজ্ঞাপারমিতা চীনভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। **লঙ্কাবতার, সুবর্ণপ্রভাস, বুদ্ধাবতংসক, দশভূমক** প্রভৃতি গ্রন্থগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মধ্যে নাগার্জুনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাকে কুষাণ-রাজ কণিষ্কের সমসাময়িক বলিয়া মনে করা হয়। তাঁহার **মাধ্যমিককারিকা** চারিশত শ্লোকে রচিত এবং দর্শনশাস্ত্রের একখানি অমূল্য গ্রন্থ। ইহা ছাড়াও **মহাযানবিংশক, প্রজ্ঞাদণ্ড, শূন্যতাসপ্ততি** প্রভৃতি অনেকগুলি মূল্যবান টীকা তাঁহারই রচনা।

আর্যদেব নামে আর একজন বৌদ্ধ গ্রন্থকার ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে **চতুঃশতক** নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। যোগাচার সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মৈত্রেয়নাথ রচিত **অভিসময়ালঙ্কারকারিকা** চীনভাষায় অনূদিত হইয়াছে। মৈত্রেয়নাথের শিষ্য আর্য অসঙ্গ **যোগাচারভূমিশাস্ত্র** রচনা করিয়াছেন। বসুবন্ধু অসঙ্গ নামক আর একজন দার্শনিক সাংখ্য দর্শনের মতবাদ খণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে **অভিধর্মকোষ** ও **পরমার্থসপ্ততি** নামক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মধ্যে দিঙনাগ বিশেষ স্থান অধিকার করেন। সম্ভবত তিনি পঞ্চম খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল **প্রমাণসমুচ্চয়** ও **ন্যায়প্রবেশ**।

অশ্বঘোষ ও তাঁহার রচনাবলী

কালিদাসের পূর্বে সংস্কৃত সাহিত্যে সর্বাধিক প্রথিতযশা বৌদ্ধ গ্রন্থকার অশ্বঘোষ। অশ্বঘোষ **খৃষ্টাব্দ প্রথম শতকের** রাজা কণিষ্কের সমসাময়িক। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে একমাত্র কিংবদন্তী ছাড়া জানিবার আর কোনও উপায় নাই।[১২] তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পরে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। প্রথম দিকে মধ্যভারতের কোথাও বৌদ্ধ ভিক্ষুরূপে তিনি ধর্ম প্রচার করেন এবং পরে কণিষ্কের রাজসভায় পারিষদের স্থান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতার নাম সুবর্ণাক্ষী। 'আচার্য', 'ভদন্ত', 'মহাবাদিন্', 'মহাকবি' প্রভৃতি বিশেষণ তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির নাম দেওয়া হইল।

১২। খৃষ্টাব্দ পঞ্চম শতকের একেবারে প্রথম দিকে কুমারজীব চীনভাষায় অশ্বঘোষের জীবনী সম্বন্ধে প্রচলিত কিংবদন্তীগুলির অনুবাদ করিয়াছেন।

১। **বুদ্ধচরিত**—১৭টি সর্গে বিভক্ত মহাকাব্য। বুদ্ধের জীবনী ও শিক্ষাসমূহই ইহার বিষয়বস্তু। চৈনিক পরিব্রাজক ই-সিং (Yi-tsing) মূল বুদ্ধচরিতকে ২৮টি সর্গে রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের হাতে যে বুদ্ধচরিত আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে ১৭টি সর্গ আছে। প্রথম ১৩টি সর্গ মূল এবং শেষ চারিটি সর্গ পরবর্তীকালে অমৃতানন্দ নামক কোনও কবি রচনা করিয়া মূলের সহিত সংযোজিত করিয়াছেন।

২। **সৌন্দরনন্দ**—১৮টি সর্গে বিভক্ত একখানি মহাকাব্য। বুদ্ধের জীবনী এবং তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ (নামান্তর 'সুন্দর') একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরে কিরূপে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাহাই এই মহাকাব্যের বিষয়বস্তু। প্রথম ছয়টি সর্গে কপিলবাস্তু নগরীর কথা, বুদ্ধ ও নন্দের জন্মবিবরণ, নিজপত্নী সুন্দরীর প্রতি নন্দের আসক্তি, নন্দ কর্তৃক বৌদ্ধ ধর্মগ্রহণ, ধর্মান্তরিত পতির জন্য সুন্দরীর আক্ষেপ প্রভৃতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বাকী অংশ সমস্তই প্রায় বুদ্ধের জীবনী ও বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি ও শিক্ষার কথায় পূর্ণ। এই মহাকাব্যে কবি অশ্বঘোষ অপেক্ষা ধর্মপ্রচারক অশ্বঘোষেরই অধিকতর পরিচয় পাওয়া যায়।

৩। **সারিপুত্তপ্রকরণ**—অশ্বঘোষ রচিত নয় অঙ্কের নাটক। সারিপুত্ত ও মৌদ্গল্যায়ন কর্তৃক বুদ্ধের নিকট বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষাগ্রহণই ইহার বিষয়বস্তু। সারিপুত্ত তাঁহার বন্ধু বিদূষকের নিকট আলোচনা করিলেন বুদ্ধের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করা সম্বন্ধে। বিদূষক এই বলিয়া নিষেধ করিলেন যে ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মণের দীক্ষাগ্রহণ করা অনুচিত। সারিপুত্ত উত্তরে বলিলেন যে নীচ ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত ঔষধও রোগীর পক্ষে হিতকর হইয়া থাকে। তারপর মৌদ্গল্যায়নের সহিত মিলিত হইয়া সারিপুত্ত বুদ্ধের নিকট গমন করেন ও উভয়ে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। নাটকের শেষে বুদ্ধ নবদীক্ষিত শিষ্যদ্বয়ের প্রশংসা করিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। মধ্য এশিয়ায় হাতে-লেখা তালপত্রের পুঁথিতে এই নাটকটি প্রথম পাওয়া যায়। সেই পুঁথিতেই আরও দুইখানি নাটক পাওয়া গিয়াছে যাহা অশ্বঘোষের রচনা বলিয়া নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় নাই।

৪। **বজ্রসূচী**—অশ্বঘোষ রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আর একখানি গ্রন্থ। খৃষ্টাব্দ ৯৭৩—৯৮১ শতকে চীনভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছে। খুব সম্ভব ইহা ধর্মকীর্তির রচিত।

৫। **গণ্ডীস্তোত্রগাথা**—স্রগ্ধরা বৃত্তে ২৯টি শ্লোকে রচিত কবিতা। বৌদ্ধ-বিহারগুলিতে এক শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র রাখা হইত, তাহার নাম 'গণ্ডী'। উহাতে কাষ্ঠ-খণ্ডের দ্বারা আঘাত করিলে যে মনোহর শব্দের সৃষ্টি হইত তাহারই ধর্মগত ব্যাখ্যা করিয়া গণ্ডীর প্রশংসা করা হইয়াছে।

৬। **সূত্রালঙ্কার**—খৃষ্টাব্দ ৪০৫ শতকে কুমারজীব চীনভাষায় ইহার অনুবাদ করেন এবং ইহাকে অশ্বঘোষের রচনা বলিয়া উল্লেখ করেন। Luder মনে করেন ইহা **কুমারলাটের** রচনা এবং তিনি অশ্বঘোষের সমসাময়িক।

এখানে একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে **মাতৃচেতা** নামক আর একজন কবির নাম পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত ১২ খানি গ্রন্থের মধ্যে মাত্র দুইখানি গ্রন্থ, **চতুঃশতকস্তোত্র** ও **সপ্ত-পঞ্চাশতকস্তোত্র** এ পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যে খণ্ডিত আকারে পাওয়া গিয়াছে। প্রথমটিতে চারিশত এবং দ্বিতীয়টিতে দেড়শত শ্লোক আছে। **মহারাজ-কণিকলেখ** নামে আরও একখানি গ্রন্থকে তাঁহার রচিত বলিয়া মনে করা হয়। মাতৃচেতা অশ্বঘোষেরই নামান্তর কি না এ বিষয়েও কেহ কেহ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন।

জাতক ও অবদান সাহিত্য[১৩]

আর্যশূর—ইঁহার রচিত গ্রন্থ **জাতকমালা**।[১৪] পালি জাতকসমূহ ও চর্যাপিটক হইতে সংগৃহীত চৌত্রিশটি কাহিনী সংস্কৃত গদ্য ও পদ্যে অনুবাদ করা হইয়াছে। ধর্মালোচনার মধ্যে মধ্যে দৃষ্টান্ত দিবার জন্যই এই কাহিনীগুলি এক সময়ে একত্র সন্নিবেশিত হয়। অশ্বঘোষের রচনাশৈলীর ছাপ ইহাতে সুস্পষ্ট। অনেকে মনে করেন, হয়ত 'আর্যশূর' অশ্বঘোষেরই নামান্তর। আর্যশূরের আরও অনেক রচনা আছে এবং তাহাদের মধ্যে একটির খৃষ্টাব্দ ৪৩৪ শতকে চীনভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে; সুতরাং মনে হয়, তিনি খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। জাতকমালার অনেক ঘটনা অজন্তার গুহায় প্রাচীরচিত্রে স্থানলাভ করিয়াছে।

জাতকমালার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত অথচ অবদান সাহিত্যের অন্তর্গত আর দুইখানি গ্রন্থ হইল **অবদানশতক** ও **দিব্যাবদান**। বিনয়পিটকের অনেক কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া ইহারা রচিত। প্রথমটিতে 'দীনার' শব্দের উল্লেখ থাকায় ইহাকে খৃষ্টাব্দ প্রথম শতকের রচনা বলিয়া মনে করা হয় এবং দ্বিতীয়টিও ঐ সময়ের পূর্ববর্তী নহে। দিব্যাবদানের সংস্কৃত ভাষা প্রাকৃত ভাষার দ্বারা প্রভাবিত ও অমার্জিত। সাহিত্য হিসাবে ইহার মূল্য কমই, তবে সম্রাট অশোকের সম্বন্ধে কতকগুলি কাহিনীর জন্য ইহার কিছু মূল্য আছে।[১৫]

অবদান সাহিত্যের মূল সুর সম্বন্ধে অধ্যক্ষ গৌরীনাথ শাস্ত্রী বলেনঃ "The word 'avadana' signifies a great religious or moral achievement as well as the history of a great achievement. Such a great act may consist in the sacrifice of one's own life or the founding of an institution for the supply of incense, flowers, gold and jewels to, or the building of, sanctuaries. Avadana stories are designed to inculcate that dark (ignoble) deeds bear dark (ignoble) fruits while white (noble) acts beget white (noble) fruits. Thus they are also tales of 'Karman'."[১৬] অবদান-সাহিত্যের মধ্যে **অবদানশতক** দশটি খণ্ডে বিভক্ত এবং প্রত্যেক খণ্ডের বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র। **কর্মশতক** নামে আরও একখানি এই শ্রেণীর গ্রন্থ শুধু তিব্বতীয় অনুবাদে রক্ষিত আছে। **দিব্যাবদান** মূলতঃ হীনযান বৌদ্ধগণের গ্রন্থ হইলেও ইহাতে মহাযান

১৩। এই উভয় সাহিত্যের পার্থক্য সম্বন্ধে দ্রষ্টব্যঃ "..for the Jataka is nothing more than an Avadana (Pali Apadana) or tale of great deed, the hero of which is Bodhisattva himself. Their matter sometimes coincides, and actual Jataka stories are contained in the Avadana works. The absorbing theme of the Avadanas being the illustration of the fruit of man's action, they have a moral end in view, but the rigour of the Karman-doctrine is palliated by a frank belief in the efficacy of personal devotion to the Buddha or his followers. The tales are sometimes put, as in the Jataka, in the form of narration by the Buddha himself, of a past, present or future incident; and moral exhortations, miracles and exaggerations come in as a matter of course."—Das Gupta & De

১৪। নামান্তর 'বোধিসত্ত্বাবদানমালা'।

১৫। সাহিত্য হিসাবে মূল্যহীন হইলেও এক সময়ে ভারতবর্ষে গল্প বলিবার যে বিশেষ ভঙ্গীটি প্রচলিত ছিল তাহা জানিবার জন্য এই দুই শ্রেণীর সাহিত্য অত্যন্ত মূল্যবান।

১৬। A Concise History of Skt. Lit: (2nd ed.), p. 72

মতের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভাষার কিছু বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তাহা প্রাঞ্জল এবং প্রকৃত কাব্যধর্মী অংশও এই গ্রন্থে বিরল নহে। তৎকালীন ভারতের সামাজিক ইতিহাসের অনেক উপাদান ইহাতে সুরক্ষিত আছে। সম্রাট অশোকের জীবনকে উপজীব্য করিয়া **অশোকাবদান** রচিত হইলেও ইতিহাস হিসাবে ইহা খুব নির্ভরযোগ্য নহে। তৃতীয় খৃষ্টাব্দেই এই গ্রন্থখানি চীনভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। **কল্পদ্রুমাবদানমালা, রত্নাবদানমালা, ব্রতাবদানমালা** প্রভৃতি গ্রন্থগুলি এই শ্রেণীতে পড়ে। একাদশ খৃষ্টাব্দে রচিত ক্ষেমেন্দ্রের **অবদানকল্পলতায়** পরবর্তী কালের রচনারীতি অনুসৃত হইয়াছে।

গল্প-সাহিত্য

জাতক ও অবদান সাহিত্যের মধ্য দিয়া তৎকালে গল্প শুনিবার আগ্রহ ও গল্প বলিবার বিশেষ ভঙ্গীটির পরিচয় আমরা পাই। কিন্তু এই দুইটি সাহিত্যের গল্পগুলির সবই ধর্মের পটভূমিকায় রচিত অর্থাৎ কোনও ধর্মনীতি প্রচার করিবার জন্য বা তাহার দৃষ্টান্ত দিবার জন্যই বৌদ্ধগণ এই ধরনের গল্প প্রচলিত করিয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্গত যে গল্প-সাহিত্য তাহার মধ্য দিয়া সাধারণ নীতিবোধকে জাগ্রত করার চেষ্টা হইয়াছে সত্য কিন্তু ধর্মের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ ছিল না। **পঞ্চতন্ত্র** গল্প-সাহিত্যের একখানি প্রধান ও অমূল্য গ্রন্থ। মিত্রলাভ, মিত্রভেদ, সন্ধিবিগ্রহ, লব্ধপ্রণাশ ও অপরীক্ষিতকারিত্ব—এই পাঁচটি খণ্ডে (বা তন্ত্রে)[১৭] বিভক্ত বলিয়াই ইহার ঐরূপ নাম হইয়াছে। বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে এই গ্রন্থখানির কলেবর পুষ্টিলাভ করিয়াছে এবং মূল পঞ্চতন্ত্র কালিদাস-পূর্ব যুগের রচনা। বিষ্ণুশর্মা নামক কোনও কাল্পনিক ব্যক্তিকে ইহার রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[১৮] **গুণাঢ্য** রচিত **বৃহৎ-কথাও** কালিদাস-পূর্ব যুগের আর একখানি গ্রন্থ। মূল বৃহৎ কথা পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত হইয়াছিল এবং তাহার রচনাকাল এখন মাত্র অনুমানের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাকে খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতকের রচনা বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকে।[১৯]

ভাস

ইংরাজী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যসরকার মহামহোপাধ্যায় T. G. Sastri-র পরিচালনাধীনে সংস্কৃত সাহিত্যের অপ্রকাশিত রচনাসমূহের প্রকাশনার জন্য একটি বিভাগ স্থাপন করেন। শাস্ত্রী মহাশয় সেই সময়ে পুরাতন পুঁথিপত্র সংগ্রহ করিবার জন্য ঘুরিতে ঘুরিতে পদ্মনাভপুরম্-এর নিকট মনলিক্করনাথম নামক স্থানে একখানি তালপাতার পুঁথি আবিষ্কার করেন। মালয়ালম্ হরফে লেখা ঐ পুঁথিতে মোট ১০৫ খানি পাতা ছিল এবং প্রতি পাতায় ১০টি করিয়া লাইন ছিল। ঐ পুঁথিতে দেখা গেল নিম্নলিখিত ১০ খানি নাটক রহিয়াছে—(১) **স্বপ্নবাসবদত্তা**, (২) **প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ**; (৩) **পঞ্চরাত্র**, (৪) **চারুদত্ত**, (৫) **দূতঘটোৎকচ**, (৬) **অবিমারক**, (৭) **বালচরিত**, (৮) **মধ্যমব্যায়োগ**, (৯) **কর্ণভার** ও (১০) **উরুভঙ্গ**।

১৭। তুলঃ সকলার্থশাস্ত্রসারং জগতি সমালোক্য বিষ্ণুশর্মেদম্।
তন্ত্রৈঃ পঞ্চভিরেতচ্চকার সুমনোহরং কাব্যম্॥

১৮। পাটলিপুত্র নগরের অমরশক্তি নামক কোনও নরপতির মূর্খ পুত্রগণের বুদ্ধির উন্মেষসাধন করিবার জন্যই বিষ্ণুশর্মা এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলা হইয়াছে।

১৯। "If it belongs to a period after the Christian era, it is not improbable that the work took shape at about the same time as the lost original of the Panchatantra; and to assign it to the 4th century A. D. would not be an unjust conjecture."—Das Gupta & De, p. 92

ঐ দশটি ছাড়াও আর একখানি অসমাপ্ত রূপক উহাতে পাওয়া যায়। পরে ঐ ধরনের আরও দুইখানি রূপক আবিষ্কৃত হয়। এইরূপে মোট ১৩ খানি রূপকের আবিষ্কার হইল। পরের তিনখানি রূপক হইল (১) **প্রতিমানাটক**, (২) **অভিষেক-নাটক** ও (৩) **দূতবাক্য**।

বিষয়বস্তু অনুসারে নাটকগুলিকে মোটামুটি চারি ভাগে ভাগ করা যায়—

(ক) প্রতিমানাটক, অভিষেকনাটক—রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

(খ) মধ্যমব্যায়োগ, দূতবাক্য, দূতঘটোৎকচ, কর্ণভার, উরুভঙ্গ—মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত একাঙ্ক নাটক।

(গ) বালচরিত—হরিবংশের কৃষ্ণ-উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত।

(ঘ) স্বপ্নবাসবদত্তা, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, অবিমারক, চারুদত্ত—নাট্যকারের কল্পিত এবং প্রাচীন কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

প্রথম তিন শ্রেণীর রচনাগুলি 'নাটক' এবং চতুর্থ শ্রেণীর রচনাগুলি 'প্রকরণ'। এই দিক হইতে রচনাগুলি[২০] মোট দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(ক) নাটক ও (খ) প্রকরণ। নাটকগুলি যিনিই রচনা করুন না কেন, তিনি যে বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও আচার-ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন ইহা বুঝা যায়। পক্ষান্তরে, প্রকরণগুলিতে নাট্যকারের চরিত্রের এই দিকটি ততটা পরিস্ফুট না হইলেও এমন কিছু পাওয়া যায় না যাহা দ্বারা নাট্যকার সম্বন্ধে ইহার বিপরীত কিছু প্রমাণ করা যাইতে পারে। উভয় জাতীয় রচনাতেই গদ্যাংশ অপেক্ষা পদ্যাংশ বেশী, প্রাকৃত খুব কমই ব্যবহার করা হইয়াছে এবং বিদূষকের চরিত্র একটিতেও নাই। **উরুভঙ্গই** হইল সংস্কৃত সাহিত্যে একমাত্র বিয়োগান্ত নাটক।[২১]

এখন প্রশ্ন হইল এই নাটক ও প্রকরণগুলি কাহার রচিত?

বহু আলোচনা, যুক্তি-তর্ক ও গবেষণার পর শাস্ত্রী মহাশয় ঘোষণা করিলেন যে ঐগুলি ভাসের রচিত। কিন্তু ভাসকে এইগুলির রচয়িতা বলিয়া মানিয়া লইবার পক্ষে কতকগুলি প্রাথমিক বাধা দেখা গেল। প্রথমত, কোনও গ্রন্থেই ভাসের নাম উল্লিখিত হয় নাই; দ্বিতীয়ত, এইগুলি হইতে পরবর্তীকালে অনেক স্থলে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু যাঁহারা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাঁহারা কোথা হইতে ঐগুলিকে পাইয়াছেন তাহা বলেন নাই; তৃতীয়ত, যেখানে কোনও উদ্ধৃত শ্লোক ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তা হইতে গৃহীত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, T. G. Sastri কর্তৃক ত্রিবেন্দ্রাম হইতে প্রকাশিত স্বপ্নবাসবদত্তার সংস্করণে সেই শ্লোক দেখা যায় না। ফলে এই নবাবিষ্কৃত নাটকগুলির রচয়িতা যে ভাস সে কথা একদল স্বীকারই করিতে চাহিলেন না।[২২] মোট কথা, ইহা লইয়া বহু বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে এবং ভাসকে

২০। সবগুলিই C. R. Devadhar-এর *Bhasa-natakachakra* or *Plays ascribed to Bhasa* নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। Trivendrum Sanskrit Series-এও ইহার কতকগুলি একত্রে এবং কতকগুলি পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। মল্লিনাথ শাস্ত্রী মাদ্রাজ হইতে নাটকগুলির সার সংক্ষেপ গদ্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

২১। "What is most remarkable, it is the only tragedy in the whole of Sanskrit literature. For in violation of the rule of the Natyasastra Duryodhana passes away—স্বর্গং গচ্ছতি as the stage direction says—in the stage."—Winternitz: *Readership Lecture* delivered at the Cal. Univ. 1923

২২। এই বিষয়ে সর্বপ্রথম সন্দেহ প্রকাশ করেন পণ্ডিত রামাবতার শর্মা। তারপর হীরানন্দ শাস্ত্রী, K. R. Pisharoli প্রভৃতিও তাঁহার সহিত যোগ দেন। L. D. Barnett বলিয়াছেন যে প্রায় ৬ জন নাট্যকার 'স্বপ্নবাসবদত্তা' নামে নাটক লিখিয়াছিলেন এবং নবাবিষ্কৃত 'স্বপ্নবাসবদত্তা' ভাসেরই রচিত ইহা সিদ্ধান্ত করা সমীচীন হইবে না। Barnett-এর এই

এইগুলির রচয়িতা বলিয়া ঘোষণা করার পক্ষে এবং বিপক্ষে বিভিন্ন দিক হইতে এত বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে যে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাই *Bhasa-problem* নামে বিখ্যাত। প্রধানতঃ Sukthankar বলিয়াছেন যে আপাতত যে সকল প্রমাণ আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা হইতে এইগুলি ভাসের রচনা বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে, যদিও ঐ প্রমাণগুলিকে চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

ভাসই যে এই নাটকগুলির রচয়িতা তাহা অনুমান করিবার পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয় কয়টি মানিয়া লইতে হইয়াছে—

(ক) সব নাটকগুলিই একই ব্যক্তির রচিত।

(খ) ভাস একজন প্রথিতযশা কবি ছিলেন এবং এই নাটকগুলিতে যে নাট্য-কৌশলের পরিচয় আমরা পাই তাহা তাঁহার যশের অনুরূপ।

(গ) ভাস কালিদাসের পূর্ববর্তী, কালিদাসের রচনাশৈলী অপেক্ষা এই নাটক-গুলির রচনাশৈলীতে প্রাচীনত্বের ছাপ অধিক এবং কালিদাসের উপরে ভাসের প্রভাব আছে।

সব নাটকগুলিই যে একই ব্যক্তির রচিত তাহা এই নাটকগুলির বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের কতকগুলি সাদৃশ্য হইতে মনে করা চলে। কালিদাস হইতে পরবর্তীকালের নাটকগুলিতে দেখা যায় যে প্রথমেই নান্দী শ্লোক বলিয়া তাহার পর 'নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ' বলা হইয়াছে। কিন্তু এই ১৩ খানি নাটকই আরম্ভ হইয়াছে একেবারে 'নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ' এইরূপভাবে।[২৩] পরবর্তীকালের নাটকে ব্যবহৃত 'প্রস্তাবনা' শব্দের স্থলে এই নাটকগুলিতে 'স্থাপনা' শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে। কালিদাস প্রভৃতি নাট্যকারগণ প্রস্তাবনার মধ্যেই নাটক এবং নাট্যকারের নাম ঘোষণা করিয়াছেন, অথচ এইগুলির 'স্থাপনা'র মধ্যে নাটক বা নাট্যকারের নাম ঘোষিত হয় নাই। প্রতিটি নাটকের শেষ শ্লোকে ভরতবাক্যে একই ধরনের প্রার্থনা দেখা যায়।[২৪]

রচনাংশেও অনেক ক্ষেত্রে হুবহু মিল দেখা যায়। যেমন, 'এবমার্যমিশ্রান্ বিজ্ঞাপয়ামি', 'অয়ে কিং নু খলু ময়ি বিজ্ঞাপনব্যগ্রে শব্দ ইব শ্রূয়তে! অঙ্গ! পশ্যামি' ইত্যাদি অংশ অনেকগুলি নাটকে হুবহু পাওয়া যায়। 'লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি' ইত্যাদি শ্লোকটি[২৫] **বালচরিত ও চারুদত্তের** প্রথম অঙ্কে দেখা যায়। 'কিং বক্ষ্যতীতি হৃদয়ং পরিশঙ্কিতং মে'—**স্বপ্নবাসবদত্তার** ৬ষ্ঠ অঙ্কে ও অভিষেকনাটকের চতুর্থ অঙ্কে দৃষ্ট হয়। একটি শ্লোকের 'ধর্মস্নেহান্তরে ন্যস্তা' এই অংশটুকু **প্রতিমানাটক** ও **অভিষেকনাটক** উভয়ত্র দেখা যায়।[২৬]

উক্তিকে চ্যালেঞ্জ করিয়া ছিলেন Winternitz (*Readership Lecture*) এবং T. G. Sastri-রই পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে Winternitz তাঁহার মত পরিবর্তন করেন (Devadhar প্রকাশিত 'ভাস-নাটক-চক্রে'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

২৩। নান্দী শ্লোক দ্বারা নাটক আরম্ভ করিবার রেওয়াজ প্রচলিত হইবার পূর্বেই এই নাটকগুলি রচিত হইয়াছিল, এইরূপ মনে করা চলে।

২৪। 'ইমাং সাগরপর্যন্তাং হিমবদ্বিন্ধ্যমেখলাম্। মহীমেকাতপত্রাঙ্কাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ।'—শ্লোকটি স্বপ্নবাসবদত্তা, বালচরিত ও দূতবাক্যের ভরতবাক্য এবং ইহাই একটু পরিবর্তিত আকারে প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, অবিমারক, অভিষেকনাটক ও পঞ্চরাত্রের ভরতবাক্য হইয়াছে। প্রতিমানাটকের ভরতবাক্য হইতেছে—'যথা রামশ্চ জানক্যা বন্ধুভিশ্চ সমাগতঃ। তথা লক্ষ্ম্যা সমাযুক্তো রাজা ভূমিং প্রশাস্তু নঃ'। দ্বিবিধ ভরতবাক্যেই যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে।

২৫। শ্লোকটি এই: লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ।
অসৎপুরুষসেবেব দৃষ্টির্বিফলতাং গতা॥

২৬। এই সাদৃশ্যগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে Winternitz যাহা বলিয়াছেন তাহার কিছু কিছু উদ্ধৃত করা গেল: "It may be taken for granted that Pratijnayou-

নাট্যকৌশলের দিক দিয়াও দেখা যায় যে নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম নাটকগুলি লঙ্ঘন করিয়াছে। রঙ্গমঞ্চে দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ। অভিষেকনাটকে রঙ্গমঞ্চেই বালির মৃত্যু, রঙ্গমঞ্চেই যুদ্ধ, হত্যা প্রভৃতি দৃশ্যের অবতারণা পরবর্তীকালের কোনও নাটকে দেখা যায় না। ঘটনার দ্রুততার জন্য নাট্যকার খুব বেশী 'নিষ্ক্রম্য প্রবিশ্য' ব্যবহার করিয়াছেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি ইহাই সূচিত করে যে ইহারা সকলেই একই নাট্যকার কর্তৃক রচিত।

রচনাশৈলী, ঘটনাবিন্যাসের পারিপাট্য, ভাষার গাম্ভীর্য ও প্রকাশনপটুতা, শব্দ-চয়ন, ভাবসমৃদ্ধি প্রভৃতি গুণে এই নাটকগুলি সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ এবং এইগুলির রচয়িতা যিনিই হউন, নাট্যকাররূপে তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা যে কোনও প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারের কাম্য। ভাসও একজন প্রথিতযশা নাট্যকার ছিলেন। বাণভট্ট বলিয়াছেন যে সূত্রধারের দ্বারা আরম্ভ করিয়া বহু চরিত্রের সমাবেশে নাটক রচনা করিয়া ভাস যশোলাভ করিয়াছেন।[২৭] দণ্ডী বলিয়াছেন, নাটকের মধ্য দিয়া ভাস তাঁহার অসীম শক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং নাটকের মধ্য দিয়াই তাঁহার যশ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।[২৮] জয়দেব ভাসকে সরস্বতীর হাস্যের সহিত তুলনা করিয়াছেন।[২৯] এই সকল প্রশংসাসূচক উক্তি হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে ভাস যশস্বী নাট্যকার ছিলেন এবং এই নবাবিষ্কৃত ১৩ খানি নাটক তাঁহার রচিত বলিয়া মানিয়া লইলে ঐ যশ বিন্দুমাত্র ম্লান হয় না।

ভাস নিঃসংশয়ে কালিদাসের পূর্ববর্তী। কালিদাস ভাসের উল্লেখ করিয়াছেন[৩০] এবং নিজের কাব্যকে 'নূতন' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।[৩১] কালিদাসের নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষা অপেক্ষা ভাসের প্রাকৃতে প্রাচীনত্বের ছাপ বেশী। ভাসের সংস্কৃত সকল ক্ষেত্রে ব্যাকরণসম্মত হয় নাই এবং অনেকটা এপিক্ সংস্কৃতের প্রভাব উহাতে লক্ষণীয়।[৩২] ভাস ও কালিদাসের নাটকের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা

gandharayana and Svapnavasavadatta have the same author. They not only treat episodes of the same Udayana story, but the one is presupposed by the other...The two Rama dramas show many literal agreements, that it cannot be doubted that they are works of the same author...In the Dutavakya and in the Valacarita the weapons of Krishna appear on the stage in a similar manner...certain words or phrases occur in all or several of them...in some small details, as the names of persons of secondary importance, several of the plays agree with one another......In several of the plays we find a predilection for certain descriptions, such as is generally found in works of one and the same poet."—*Some Problems of Indian Literature*, pp. 117-19

২৭। সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ।
সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব ॥—হর্ষচরিত।

২৮। সুবিভক্তমুখাদ্যঙ্গৈর্ব্যক্তলক্ষণবৃত্তিভিঃ।
পরেতোঽপি স্থিতো ভাসঃ শরীরৈরিব নাটকৈঃ ॥—অবন্তীসুন্দরীকথা।

২৯। ভাসো হাসঃ—প্রসন্নরাঘব।

৩০। প্রথিতযশসাং ভাসসৌমিলকবিপুত্রাদীনাম্—মালবিকাগ্নিমিত্র।

৩১। রাণমিপুত্যেব ন সাধু সর্বং ন চাপি কাব্যম্ নবমিত্যবদ্যম্ ॥

৩২। "Some of the agreements between these plays are at the same time proofs of high antiquity. This applies especially of the language and above all to the *Prakrit* of the plays. It has been proved by Dr. V. Leshy, Dr. V. S. Sukthankar and by Dr. W. Printz, that the Prakrit in all these plays is more archaic than that of the classical plays, that it has preserved forms of the 'Old Prakrit' which we find in the frag-

যায় যে ভাসের গদ্য রচনা কালিদাসের গদ্য রচনা অপেক্ষা অধিকতর সুসংহত হইয়াও যাথার্থ্যব্যঞ্জক। সংস্কৃত ভাষাকে কোনও বিশেষ ভাবের বাহনরূপে নিযুক্ত করিবার যে ক্ষমতা তাহা ভাসের পক্ষে সহজাত—তাহা লাভ করিবার জন্য ভাসকে চেষ্টা করিতে হয় নাই। পক্ষান্তরে, কালিদাসকে যেন তাহা আয়ত্ত করিতে হইয়াছে। ভাসের গদ্য রচনায় জীবন্ত ভাষার যে স্বাচ্ছন্দ্য পরিলক্ষিত হয়, কালিদাসের রচনায় তাহা দেখা যায় না।

Winternitz বলেন যে কালিদাসের নাটকে রাজসভার যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা ভাসের নাটকে রাজসভার চিত্র সরল ও অনাড়ম্বর। উদয়ন পরিজনবর্গ না লইয়াই মঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছেন। কালিদাসের নাটকে রাজার সৈন্যবাহিনীদের মধ্যে যবনীদের স্থান আছে। ভাসের নাটকে তাহা নাই।

কালিদাস শুধু ভাসকে পূর্ববর্তী বলিয়া উল্লেখই করেন নাই, ভাস কর্তৃক নিঃসংশয়ে প্রভাবিতও হইয়াছেন।[৩৩]

রাজশেখর একটি শ্লোকে বলিয়াছেন যে ভাসের নাটকচক্র সমালোচনার অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে একমাত্র স্বপ্নবাসবদত্তাই অদগ্ধ ছিল।[৩৪] এই শ্লোক হইতে দুইটি তথ্য আমরা জানিতে পারি—(১) ভাস কর্তৃক রচিত একাধিক নাটক ছিল এবং (২) তাহাদের মধ্যে স্বপ্নবাসবদত্তা বিবুধগণের নিকট সর্বাধিক প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। T. G. Sastri-র আবিষ্কৃত ১৩ খানি নাটকের মধ্যে 'স্বপ্নবাসবদত্তা' আছে এবং এই 'স্বপ্নবাসবদত্তা'কে যদি ভাস রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে অন্যগুলিকেও ভাস রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

ments of Buddhist dramas of Asvaghosa and his time. As regards the Sanskrit all the plays share a number of solecisms, ungrammatical forms. Some of these are such as we also find in epic Sanskrit and this may account for their occurrence in the dramas of the first group." —Winternitz: *Some Problems of Indian Literature*, pp. 119-20.

৩৩। তুলঃ (ক) যস্যাং ন প্রিয়মণ্ডনাপি মহিষী দেবস্য মন্দোদরী।
স্নেহাল্লুম্পতি পল্লবান্ ন চ পুনর্বীজন্তি যস্যাং ভয়াৎ॥
বীজন্তো মলয়ানিলা অপি করৈরস্পৃষ্টবালদ্রুমাঃ॥
সেয়ং শত্রুরিপোরশোকবনিকা ভগ্নেতি বিজ্ঞাপ্যতাম্॥
—অভিষেকনাটক, ৫ম অঙ্ক

এবং পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপাতেষু যা।
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্॥
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যাঃ ভবত্যুৎসবঃ।
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥
—শকুন্তলা, ৪র্থ অঙ্ক

(খ) হৃদয়েনেহ তত্রাঙ্গৈর্দ্বিধাভূতেব গচ্ছতি।
যথা নভসি তোয়ে চ চন্দ্রলেখা দ্বিধাকৃতা॥ —বালচরিত, ১ম অঙ্ক

এবং গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥ —শকুন্তলা

(গ) বিশ্রব্ধং হরিণাশ্চরন্ত্যচকিতা দেশাগতপ্রত্যয়াঃ
—স্বপ্নবাসবদত্তা, ১ম অঙ্ক

এবং বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগাঃ। —শকুন্তলা, ১ম অঙ্ক

(ঘ) কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্ —শকুন্তলা, ১ম অঙ্ক

এবং সব্বসোহনীয়ং সুরুবং নাম। —প্রতিমানাটক, ১ম অঙ্ক

৩৪। ভাসনাটকচক্রেঽপি চ্ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্।
স্বপ্নবাসবদত্তস্য দাহকোঽভূন্ন পাবকঃ॥

নবাবিষ্কৃত নাটকগুলি ভাসেরই রচিত এইরূপ পূর্ব হইতে ধরিয়া লইয়াই আমরা তাঁহার অনুকূলে উপরিউক্ত আলোচনার প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং যে প্রমাণগুলি দেওয়া হইয়াছে তাহা আমাদের অনুমানকে প্রমাণ করিবার পক্ষে খুব দুর্বল নাও হইতে পারে। তথাপি এগুলি পরোক্ষ প্রমাণ। ইহার বিপক্ষে কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ভাসকেই নবলব্ধ নাটকগুলির রচয়িতা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।[৩৫] এবং ইহার পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলে তবে এই সিদ্ধান্তকে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিব।

অনেকে মনে করেন যে এক সময়ে ভাসের নাটকাবলী অগ্নিদগ্ধ হইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, রাজশেখরের 'ভাসনাটকচক্রেঽপি' শ্লোকটি সেই ইতিবৃত্তের স্মারক।

ভাসের আবির্ভাবকাল

ভাসের রচনাকাল লইয়া বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। খৃঃ পূঃ ৫ম শতক হইতে খৃষ্টাব্দ ১১ শতক পর্যন্ত প্রায় ১৬০০ বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে কোন্ সময়ে ফেলা যাইবে তাহা লইয়া বিবুধমহলে বিভিন্ন মত দেখা গিয়াছে।[৩৬] ভাস নিঃসংশয়ে কালিদাসের পূর্ববর্তী। তাঁহার রচনাভঙ্গী ও ভাষা কালিদাসের রচনাভঙ্গী ও ভাষার যতটা কাছাকাছি, অশ্বঘোষের রচনাভঙ্গী ও ভাষার ততটা কাছাকাছি নহে—এইরূপ Winternitz মনে করেন।[৩৭] যদি তাই হয় এবং ভাসকেই যদি আমরা এই ১৩ খানি নাটকের রচয়িতা বলিয়া ধরিয়া লই, তবে কালিদাস হইতে এক শত বৎসর পূর্বে খৃঃ পূঃ ৩য় শতকে তাঁহাকে ফেলা চলে। T. G. Sastri

৩৫। ভাসকে এই নাটকগুলির রচয়িতা বলিয়া ঘোষণা করার পূর্বে T. G. Sastri যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন, R. Vasudevasharma সেইগুলির নিম্নানুরূপ সারসংক্ষেপ করিয়াছেন।

(1) That there is in these plays dicernible a distinct departure from the rules of dramaturgy as laid down by Bharata in making his stage manager enter after the 'nandi' or the benedictory invocatory song, in the non-mention of the name of the author, in calling the prologue a 'sthapana' and not a 'prastavana', in representing death, sleep and fight on the stage and in closing without a Bharatavakya propounded by one of the characters, all leading to the inference that these plays belonged to Pre-Bharatan days.

(2) That Bhatta Bana, Bhamaha, Vamana and other ancient rhetoricians have referred to him in unmistakable terms as a poet of ancient renown.

(3) That Kautilya quoted him, thus fixing him up to the pre-Kautilyan age.

(4) That Bhasa uses un-Paninian archaic forms, arguing a pre-Paninian date.

(5) That he was a Puranamuni according to Kalidasa and Jonaraja.

(6) And that by virtue of his writings being characterised by an intensity of rasa and by a marvellously exquisite flow of language, he was comparable to Valmiki and Vyasa and so was possibly contemporaneous with them.

—*Hindu, Feb.* 1957

৩৬। দ্রষ্টব্যঃ Sukthankar: *JBRAS*, 1922, p. 33

৩৭। "In language and style the dramas are nearer to Kalidasa than to Asvaghosa...I do not believe that he preceded Kalidasa by more than a hundred years."—*Some Problems of Indian Literature*, pp. 123-24

বলেন যে দণ্ডী, ভামহ ও বামন ভাস হইতে অনেক উদ্ধৃতি দিয়াছেন। ভামহ গুণাঢ্যের পূর্ববর্তী এবং ভাসকে তাঁহারও পূর্ববর্তী স্বীকার করিতে হইলে কিছুতেই তাঁহার আবির্ভাবকাল খৃঃ পূঃ ৩য় বা ২য় শতকের পরে বলা চলে না।[৩৮] T. G. Sastri পাণিনিরও পূর্বে ভাসের আবির্ভাবকাল বলিয়াছেন। কিন্তু Winternitz তাহা স্বীকার করেন না। Jayaswal-এর মতে ভাস ছিলেন কাণ্ববংশীয় রাজা নারায়ণের সমসাময়িক। অশ্বঘোষ ও কালিদাসের মধ্যবর্তী সময়ে দ্বিতীয় কোনও নাট্যকারের নাম জানা থাকিলে হয়ত Bhasa problem-এর সমাধান করা বা Bhasa-এর রচনাকাল নির্ণয় করা সহজ হইত। যতদিন পর্যন্ত জানা না যায়, ততদিন পর্যন্ত ধরিয়া লইতেই হইবে যে প্রাপ্ত নাটকগুলি অশ্বঘোষ ও কালিদাসের অন্তর্বর্তী সময়ের এবং ভাসই তাহাদের রচয়িতা। খৃষ্টাব্দ তৃতীয় শতকের শেষ ভাগে বা চতুর্থ শতকের একেবারে প্রথম দিকে যদি কালিদাসের আবির্ভাবকাল হয় এবং অশ্বঘোষ যদি কণিষ্কের (খৃষ্টাব্দ ১ম শতকে) সমসাময়িক হন, তবে অবশ্যই ভাসকে খৃষ্টাব্দ ২য় শতকে ফেলা অসঙ্গত হইবে না।

ভাসের নাটক পরিচয়

১। **স্বপ্নবাসবদত্তা**—বৎসরাজ উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ দৈবজ্ঞের নিকট হইতে জানিতে পারিলেন যে নরপতি দর্শকের ভগিনী পদ্মাবতীর সহিত উদয়নের বিবাহ হইবে এবং দর্শকের সাহায্যে উদয়ন তাঁহার হৃতরাজ্য উদ্ধার করিবেন। পদ্মাবতীর সহিত উদয়নের মিলন ঘটাইবার জন্য যৌগন্ধরায়ণ কি কৌশল অবলম্বন করিলেন এবং শেষ পর্যন্ত কিরূপে উদয়ন ও পদ্মাবতীর মিলন হইল তাহাই এই ছয় অঙ্কের নাটকে দেখানো হইয়াছে।

২। **প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ**—বৎসরাজ উদয়ন মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন। রাজা প্রদ্যোতের আদেশে তাঁহার লোকজন একটি নকল হস্তী নির্মাণ করিয়া উদয়নের পথে রাখিয়াছিল। বীণাবাদনে পটু উদয়ন বীণা বাজাইয়া হস্তীকে বশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় প্রদ্যোতের লোকজন আসিয়া উদয়নকে বন্দী করে ও প্রদ্যোতের হাতে সমর্পণ করে। প্রদ্যোত বীণা কাড়িয়া লইয়া কন্যা বাসবদত্তাকে দিলেন। ক্রমে উদয়ন ও বাসবদত্তার মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হইল। উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ প্রদ্যোতের কবল হইতে উদয়ন ও বাসবদত্তাকে জোর করিয়া কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। পরে প্রদ্যোত নিজেই উদয়ন ও বাসবদত্তাকে উদয়নের রাজ্যে পাঠাইয়া দেন। উক্ত আখ্যানকে অবলম্বন করিয়া এই চারি অঙ্কের নাটিকাখানি রচিত হইয়াছে।

৩। **চারুদত্ত**—বণিক চারুদত্ত গণিকা বসন্তসেনার প্রতি আসক্ত হন। ঘটনাক্রমে বসন্তসেনাকে কোনও কারণে চারুদত্তের গৃহে আশ্রয় লইতে হয় এবং সেই সময়ে চারুদত্তের নিকট তিনি তাঁহার অলঙ্কারাদি গচ্ছিত রাখেন। দৈবক্রমে ঐ অলঙ্কারসমূহ চারুদত্তের নিকট হইতে অপহৃত হয়। তাহার পরিবর্তে চারুদত্ত বসন্তসেনাকে তাঁহার পত্নীর কণ্ঠহার সমর্পণ করেন। বসন্তসেনা চারুদত্তের নিকট থাকিয়া যান। এইখানেই নাটকখানি চারিটি অঙ্কে সমাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

৪। **প্রতিমানাটক**—রামের বনবাস ও দশরথের মৃত্যু। ভরত প্রতিমাগৃহ হইতে পিতার মৃত্যুর কথা এবং রামের নির্বাসনের কথা জানিতে পারিলেন। বনে গিয়া ভরত

৩৮। "Bhamaha's date being thus earlier than Gunadhya goes back to the first century preceding to the Christian era. The author of our natakas deserving of course a date much earlier than that of Bhamaha must necessarily be placed not later than the 3rd or the 2nd century B. C."

রামচন্দ্রের পাদুকা আনিয়া তাহার অভিষেক করিলেন। তারপর সীতাহরণ, রাম ও রাবণের যুদ্ধ, রাবণের পরাজয় ও সীতাকে উদ্ধার করিয়া রামচন্দ্রের রাজ্যে প্রত্যাবর্তন, ইহাই হইল এই নাটকের বিষয়বস্তু।

৫। **বালচরিত**—কৃষ্ণের জন্ম ও তাঁহার অলৌকিক কার্যাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ কর্তৃক কংস-বধ ও উগ্রসেনের অভিষেক দেখানো হইয়াছে। ইহা একটি পাঁচ অঙ্কের নাটক।

৬। **ঊরুভঙ্গ**—গদাযুদ্ধে ভীম কর্তৃক দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী কর্তৃক দুর্যোধনকে দেখিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা। শেষ অঙ্কে পাণ্ডববংশ সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা। রঙ্গমঞ্চে দুর্যোধনের মৃত্যু। এই নাটকের নামান্তর **গদাযুদ্ধম্**।

৭। **পঞ্চরাত্র**—দ্বাদশ বৎসর বনবাসে কাটাইয়া পাণ্ডবরা ত্রয়োদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসে কাটাইতেছেন। দ্রোণ অনুমান করিয়াছিলেন সম্ভবতঃ কুরু-পাণ্ডবের মহাযুদ্ধ আসন্ন। উভয় ভ্রাতৃগণকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টার অন্ত ছিল না। দ্রোণের উপদেশে দুর্যোধন যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন এবং যজ্ঞশেষে দ্রোণকে গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলেন। দ্রোণ দুর্যোধনের নিকট অর্ধেক রাজ্য প্রার্থনা করিলেন। দুর্যোধন এই শর্তে তাহাই দিতে রাজী হইলেন যে দ্রোণ পাঁচ রাত্রির মধ্যে পাণ্ডবদের সংবাদ আনিয়া দিবেন। শেষ পর্যন্ত ভীষ্ম ও দ্রোণের চেষ্টায় পাণ্ডবদের সন্ধান পাওয়া গেল এবং অর্ধরাজ্য তাঁহাদিগকে সমর্পণ করা হইল। ইহাই হইল এই নাটকের বিষয়বস্তু।

৮। **দূতবাক্য**—ইহা একখানি একাঙ্ক নাটক। পাণ্ডবদের দূত হইয়া কৃষ্ণ আসিলেন দুর্যোধনের সভায়। প্রহরী দুর্যোধনকে সংবাদ দিল 'পুরুষোত্তম আসিয়াছেন'। দুর্যোধন প্রহরীকে আদেশ দিলেন 'পুরুষোত্তম' শব্দের স্থলে 'কংস-ভৃত্য দামোদর' বলিবার জন্য। কৃষ্ণের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোধন দৈবাৎ সিংহাসন হইতে পড়িয়া গেলেন। সকলের কাছেই ইহা দুর্লক্ষণ বলিয়া মনে হইল। কৃষ্ণ উপবেশন করিলেন। একটি চিত্রের প্রতি কৃষ্ণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল—দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণের চিত্র। কৃষ্ণ পাণ্ডবদের প্রাপ্য রাজ্যাংশের দাবি করিলেন। দুর্যোধন দিতে রাজী হইলেন না। বলপ্রয়োগে কৃষ্ণকে বন্দী করিবার চেষ্টা করা হইলে কৃষ্ণ বিশ্বরূপ প্রদর্শন করান। ধৃতরাষ্ট্র আসিয়া কৃষ্ণের পদতলে পড়িয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন।

৯। **মধ্যমব্যায়োগ**—ঘটোৎকচ ও তাঁহার জননী নরমাংস ভক্ষণ করিবার জন্য এক ব্রাহ্মণ পরিবারকে ধৃত করেন। বহু আলোচনার পর স্থির হইল যে, ঐ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণপত্নী তাঁহাদের মধ্যম পুত্রকেই ঘটোৎকচের হাতে সমর্পণ করিবেন। ঘটোৎকচের অত্যাচার হইতে ঐ ব্রাহ্মণ পরিবারকে রক্ষা করিবার জন্য ভীম আগাইয়া আসিলেন এবং ঘটোৎকচের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। যুদ্ধের মাঝে পিতাপুত্র উভয়কে চিনিতে পারিলেন এবং ব্রাহ্মণের ঐ মধ্যম পুত্র রক্ষা পাইল।

১০। **কর্ণভার**—কর্ণ যুদ্ধে যাইতেছেন। অর্জুন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ইন্দ্র আসিয়া কর্ণের নিকট দান প্রার্থনা করিলেন। কর্ণ প্রতিশ্রুতি দিলেন, ব্রাহ্মণ যাহা চাহিবেন তাহাই দিবেন। ব্রাহ্মণ চাহিলেন কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডল; পরিবর্তে ইন্দ্র কর্ণকে পাঠাইয়া দিলেন অপ্রতিহত 'শক্তি' নামক অস্ত্র।

১১। **দূত-ঘটোৎকচ**—অন্যায় যুদ্ধে কৌরবগণ অভিমন্যুকে বধ করিলেন। গান্ধারী এবং ধৃতরাষ্ট্রও এই অন্যায় যুদ্ধের তীব্র নিন্দা করিলেন। পাণ্ডবপক্ষের দূত হইয়া ঘটোৎকচ আসিল কৌরবসভায় শান্তির প্রস্তাব লইয়া, কিন্তু কৌরবগণ কর্তৃক

ঘটোৎকচ অপমানিত হইলেন। ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন ঘটোৎকচ—প্রতিশোধ তিনি লইবেনই। ধৃতরাষ্ট্র আসিয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন।

১২। **অভিষেকনাটক**—রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড ও যুদ্ধকাণ্ডকে অবলম্বন করিয়া রচিত। বালির সহিত রামের যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া সীতার অগ্নিপরীক্ষা পর্যন্ত নাটকের বিষয়বস্তু।

১৩। **অবি-মারক**—ঋষি দীর্ঘতপার অভিশাপে সৌবীররাজ বিষ্ণুসেন এক বৎসরের জন্য চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। এই সময়ে কুন্তীভোজ নগরে বাসকালে অবি নামক এক অসুরকে তিনি হত্যা করেন এবং 'অবি-মারক' নাম প্রাপ্ত হন। একদিন তিনি মাতুল-দুহিতা কুরঙ্গীকে হস্তীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। কুরঙ্গীর পিতা কুন্তীভোজ অবি-মারকের পরিচয় জানিতেন না। তাঁহার হস্তে কুরঙ্গীকে সমর্পণ করিবার ঠিক করিয়া যখন শুনিলেন যে অবি-মারক নীচজাতি, তখন কুন্তীভোজ পিছাইয়া আসিলেন। ইতোমধ্যে কুরঙ্গী ও অবি-মারকের প্রণয় বাড়িয়া গেল। ধাত্রীর সহায়তায় কুরঙ্গীর কক্ষে অবি-মারকের গোপন মিলনও হইল। কক্ষ হইতে নির্গত হইয়া অবি-মারক কোনও উপায় না দেখিয়া পর্বত হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। হঠাৎ এক বিদ্যাধরের সহিত অবি-মারকের সাক্ষাৎ হইল এবং বিদ্যাধর তাঁহাকে একটি অঙ্গুরী দিলেন যাহার সাহায্যে অবি-মারক প্রতিরাত্রে তাঁহার সঙ্গ পাইতে পারিবেন। ইতোমধ্যে কুন্তীভোজ তাঁহার অন্য এক ভাগিনেয়ের সহিত কুরঙ্গীর বিবাহ দিবার স্থির করেন। শেষ পর্যন্ত নারদের মধ্যস্থতায় অবি-মারকের সহিতই প্রকাশ্যভাবে কুরঙ্গীর বিবাহ সম্পন্ন হইল।

কালিদাসের কাল

একটি প্রচলিত শ্লোকে[১] কালিদাসকে বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের এক রত্ন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। Fergusson এই শ্লোকটিকে ভিত্তি করিয়া এক নূতন মত প্রচার করিলেন। তিনি বলিলেন, এই শ্লোকে উল্লিখিত বিক্রমাদিত্য হইলেন উজ্জয়িনীরাজ হর্ষ-বিক্রমাদিত্য। খৃষ্টাব্দ ৫৪৪ শতকে ভারতবর্ষ হইতে শক জাতিকে বিতাড়িত করিয়া তাহারও ৬০০ বৎসর পূর্ব হইতে, অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৫৬ অব্দ হইতে তিনি নিজের নামে বিক্রমাব্দের প্রতিষ্ঠা করেন। Fergusson-এর এই অনুমানকে সম্বল করিয়া Maxmuller তাঁহার নূতন মতবাদ প্রচার করিলেন। তাঁহার মতে ভারতে একের পর এক বৈদেশিক জাতির আক্রমণ হওয়ার জন্য ভারতবর্ষে খৃষ্টের পর প্রথম কয়েক শত বৎসরে সংস্কৃতে কোনও সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই এবং খৃষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতকে উজ্জয়িনীরাজ হর্ষ-বিক্রমাদিত্যের আমলে কালিদাসের হাতে সংস্কৃতে কাব্য রচনার নূতন অভ্যুদয় আরম্ভ হইল। Maxmuller-এর এই মতই theory of renaissance নামে বিখ্যাত।[২]

Maxmuller অন্য ভাবেও তাঁহার এই renaissance theory-কে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মেঘদূতের একটি শ্লোকে[৩] উল্লিখিত 'দিঙ্‌নাগ' ও 'নিচুল' শব্দ দুইটি Maxmuller-এর মতে কালিদাসের সমসাময়িক দুইজন বৌদ্ধ পণ্ডিতের নাম। দিঙ্‌নাগ ছিলেন আসঙ্গের শিষ্য এবং খৃষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতকের লোক; সুতরাং কালিদাসও খৃষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতকের।[৪] দিঙ্‌নাগ নিজে বৌদ্ধ ছিলেন এবং কালিদাসের কঠোর সমালোচক ছিলেন। Keith মনে করেন যে প্রতিপক্ষের প্রতি ঐরূপ ইঙ্গিত করা কালিদাসের পক্ষে কখনই সম্ভব নয় এবং শ্লোকোক্ত দিঙ্‌নাগ শব্দ যদি বৌদ্ধ দার্শনিক দিঙ্‌নাগকে বুঝাইয়াও থাকে, তাহা হইলেও দিঙ্‌নাগ খৃষ্টাব্দ ৪০০-এর পরবর্তী ছিলেন এইরূপ মনে করার কোনও কারণ নাই।[৫]

১। শ্লোকটি এই :
ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥
কালিদাসের রচনা বলিয়া অভিহিত **জ্যোতির্বিদাভরণ** নামক একখানি জ্যোতিষ গ্রন্থে এই শ্লোকটি পাওয়া যায়।—*JBRAS.* VI., p. 25

২। Maxmuller-এর মূল কথা হইতেছে এইরূপ :
"The Indians did not show any literary activity during the first and second centuries of our era, in consequence of the inroads of the different foreign races...." এবং "...that the period of the bloom of artificial poetry is to be placed in the middle of the sixth century of the Christ."—*India: What can it teach us?*

৩। অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিং স্বিদিত্যুন্মুখীভিঃ।
দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ॥
স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খম্।
দিঙ্‌নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্॥—মেঘদূত, ১.১৪

৪। P. V. Kane, Bhandarkar প্রভৃতিও খৃষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতককেই কালিদাসের আবির্ভাবকাল বলিয়া মনে করেন।

৫। তুল: "The first argument is invalidated by the grave improbability of the tasteless reference in the Meghaduta and even if it were real Dignaga's date need not be later than 400."—Keith

Kirle এবং Mandassor-এ প্রাপ্ত লিপিগুলি হইতে Fleet সার্থকভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে Fergusson-এর অনুমান সর্বৈব ভ্রান্ত এবং ইহা প্রমাণিত হইবার পর Maxmuller-এর renaissance theory-ও ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। Buhler[৬] অন্যান্য লিপির সাহায্যে Fleet-এর ঐ সিদ্ধান্তকেই আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে খৃষ্টাব্দ ৩৫০ হইতে ৫৫০ পর্যন্ত সংস্কৃত রচনাসমূহে যে কাব্যশৈলী অনুসৃত হইত তাহার সংশয়াতীত প্রমাণ পাওয়া যায়।[৭] Macdonell-ও Fergusson-এর অনুমানকে নির্মমভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে বিক্রমাব্দ খৃষ্টাব্দ ৫৪৪-এ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, উহারও প্রায় একশত বৎসরের অধিক পূর্ব হইতে মালবাব্দ নামে উহা চলিয়া আসিতেছিল এবং খৃষ্টাব্দ প্রায় ৮০০ হইতে উহার নাম 'বিক্রমাব্দ' হয়। তাছাড়া, খৃষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতকের মধ্য ভাগে পশ্চিম ভারত হইতে শকদিগকেও বিতাড়িত করা হয় নাই, কারণ ভারতের ঐ অঞ্চল একশত বৎসরেরও অধিক পূর্বে গুপ্ত সম্রাটগণকে অধিকার করিয়াছিলেন। খৃষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে পশ্চিম ভারত হইতে হূণগণকে বিতাড়িত করা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু যিনি তাহা করিয়াছিলেন তিনি বিক্রমাদিত্য নহেন, যশোধর্মন্ বিষ্ণুবর্ধন।[৮]

দ্বিতীয় পুলকেশীর Aihole inscription কালিদাসের নামের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছে।[৯] খৃষ্টাব্দ ৬৩৪-এ এই লিপি রচিত। খৃষ্টাব্দ ৪৭২-এ রচিত Mandassor

৬। Buhler-এর প্রবন্ধ V. S. Ghate কর্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে।—*Indian Antiquary*, XLII pp. 29 & 137

৭। তুলঃ তিনি বলেনঃ "His first proposition, that *the Indians did not show any literary activity during the first and second centuries of our era, in consequence of the inroads of the different foreign races*, is contradicted by the clear proof provided by the Prasasti of the Sudarsana lake and the Nasik inscription....A second proposition which Professor Maxmuller in addition to other scholars Advocates—*that the period of the bloom of artificial poetry is to be placed in the middle of sixth century A. D. of the Christ*—is contradicted by the testimony of the Allahabad Prasasti of Harishena, of other compositions of the Gupta period and of the Mandassor Prasasti."

৮। "The epigraphical researches of Mr. Fleet have destroyed Fergusson's hypothesis. From these researches it results the Vikrama Era of 57 B. C. far from having been founded in 544 A. D. had already been in use for more than a century previously under the name of Malava Era (which came to be called the Vikrama Era about 800 A. D.). It further appears that, no Saka (Scythians) could have been driven out of Western India in the middle of the sixth century, because that country had already been conquered by the Guptas more than a hundred years before. Lastly it turns out that though other foreign conquerors, the Hunas, were actually expelled from Western India in the first half of the sixth century, they were driven out, not by a Vikramaditya, but by a king named Yasodharman Vishnuvardhana."—*Sanskrit Literature*, p. 323

৯। লিপিটি এইঃ

যেনাযোজিনবেশ্ম স্থিরমর্থবিধৌ বিবেকিনা জিনবেশ্ম।
বিজয়তাং রবিকীর্তিঃ কবিতাশ্রিতকালিদাসভারবিকীর্তিঃ॥

inscription-এর কয়েকটি শ্লোকের সহিত কালিদাসের মেঘদূত ও ঋতুসংহারের কয়েকটি শ্লোকের অপূর্ব মিল রহিয়াছে।[১০] ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে কালিদাস পঞ্চম শতকেরও পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

কালিদাস নিঃসংশয়ে ভাস ও অশ্বঘোষের পরবর্তীকালের। কালিদাসের নাটকের প্রাকৃত ভাষাও ভাস এবং অশ্বঘোষের প্রাকৃত ভাষা অপেক্ষা পরবর্তীকালীন। কালিদাস গ্রীক শব্দ 'জামিত্র' ব্যবহার করিয়াছেন। এই সব দিক বিবেচনা করিলে গুপ্ত যুগের পূর্বে তাঁহার আবির্ভাব কিছুতেই সম্ভব নহে। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং Keith মনে করেন যে ইঁহার সভাতেই কালিদাস নবরত্নের এক রত্ন ছিলেন। তিনি আরও মনে করেন যে হয়ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্তের জন্মকে লক্ষ্য করিয়াই কালিদাস 'কুমারসম্ভব' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কুমারগুপ্তের সময়েই (খৃষ্টাব্দ ৪১৩-৪৫৫) গুপ্ত সাম্রাজ্য শান্তি ও সমৃদ্ধির চরম শিখরে উঠিয়াছিল এবং কালিদাসের রচনায় সর্বত্র এই জাতীয় সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের প্রভাব ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান। কুমারগুপ্তের অব্যবহিত পরেই (৪৬৫-৪৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) হূণজাতি ভারতবর্ষের উপর অত্যাচার চালাইয়াছে। সে সময়ে নিশ্চয়ই কালিদাস বাঁচিয়া ছিলেন না, কাব্য রচনা করা তো দূরের কথা। দেশ ও জাতির সেই চরম সঙ্কট ও দুর্দশার দিনে কালিদাসের কাব্যের ন্যায় কাব্য রচিত হওয়া সম্ভব নহে। কালিদাস নিশ্চয়ই হূণ-আক্রমণের পূর্বে তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন এবং হূণ-আক্রমণের কাল হইতে (৪৬৫-৪৭০ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার কালের দূরত্ব কিছু বেশী হওয়াও বিচিত্র নহে। এই সকল তথ্য হইতে Keith সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতকই হইল কালিদাসের কাল।[১১]

খৃষ্টাব্দ ৮ম ও ৯ম শতকেই আমরা অন্ততঃ তিনজন কালিদাসের অস্তিত্বের কথা জানিতে পারি।[১২] কালিদাসের রচনাকাল লইয়া বিভিন্ন মনীষী এত বিভিন্ন যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন এবং এত বিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে সবগুলি যদি মানিতে হয় তবে কোন্ কালিদাসের কোন্ গ্রন্থ তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমাদের সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্য এই যে কালিদাস তাঁহার কোনও রচনায় কোথাও নিজের সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট উল্লেখ করা তো দূরের কথা, নিজের জন্মস্থান ও কালের প্রতি কোনরূপ ইঙ্গিতও রাখিয়া যান নাই এবং ইহারই জন্য আজ ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকারের ইতিবৃত্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।[১৩]

১০। Apte, Kielhorn প্রভৃতি ইহা প্রমাণ করার চেষ্টা করিয়াছেন।

১১। তুলঃ "Kalidasa then lived before A. D. 472, and probably at a considerable distance, so that to place him about A. D. 400 seems completely justified."—Keith: *History of Sanskrit Literature.*

১২। তুলঃ (১) একোঽপি জীয়তে হন্ত কালিদাসো ন কেনচিৎ।
শৃঙ্গারে ললিতোদ্গারে কালিদাসত্রয়ী কিমু॥
—রাজশেখর, সূক্তি-মুক্তাবলী
(২) হালেনোত্তমপূজয়া কবিবৃষঃ শ্রীপালিতো লালিতঃ।
খ্যাতিং কামপি কালিদাসকবয়ো নীতাঃ শকারাতিনা॥
—অভিনন্দ, রামচরিত

১৩। কালিদাসের কাল সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে S. K. De যে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য।

"Let it suffice to say that since Kalidasa is mentioned as a poet of great reputation in the Aihole inscription of 634 A. D. and since he probably knows Asvaghosa's works and shows a much more

কালিদাসের জীবনী সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন, কারণ নিজের সম্বন্ধে তিনি কুত্রাপি কিছুই বলিয়া যান নাই। ফলে তাঁহার জীবনেতিহাসকে কেন্দ্র করিয়া নানারূপ কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে যাহার সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করা একরূপ অসম্ভব।[১৪] ভারতের কোন্ প্রদেশ তাঁহার জন্মস্থান ছিল তাহাও নির্ধারণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোনও দুইজনই একমত হইতে পারেন নাই।[১৫] রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি ভারতের বিভিন্ন অংশের, বিভিন্ন দৃশ্যের মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা হইতে কোনও একটি অঞ্চলের সহিত তাঁহাকে যুক্ত করা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলিরও রচনাকালের পৌর্বাপর্য নির্ণয় করা কঠিন, কারণ এইগুলিতে কোনও একটি বিশিষ্ট প্রতিভার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত গভীর পরিণতির স্বাক্ষর দেখা যায় না। কালিদাসের প্রতিভার প্রথম ও শেষ সৃষ্টির মধ্যে উৎকর্ষের এমন তারতম্য নাই যাহা হইতে একটি আগের এবং একটি পরের বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।[১৬]

জীবনী ও রচনা

প্রতিটি গ্রন্থই রচনাশৈলী, চিত্ররূপায়ণ ও বিষয় সমৃদ্ধিতে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত।[১৭]

---

developed form and sense of style (a position which, however, has not gone unchallenged), the limits of his time are broadly fixed between the 2nd and the 6th century A. D. Since his works reveal the author as a man of culture and urbanity, a leisured artist probably enjoying, as the legends say, royal patronage under a Vikramaditya, it is not unnatural to associate him with Chandragupta II (c. 380-413 A. D.), who had the style of Vikramaditya and whose times were those of prosperity and power."

Apte, তাঁহার *Date of Kalidasa* গ্রন্থে কালিদাসের কাল সম্বন্ধে কতকগুলি মতের বিশদ সমালোচনা করিয়াছেন।

১৪। বল্লালের 'ভোজ-প্রবন্ধে' কালিদাস সম্বন্ধে এইরূপ কতকগুলি কাহিনী আছে। এই প্রসঙ্গে Grierson-এর *Traditions about Kalidasa* (*JASB*, XLVII, April) দ্রষ্টব্য।

১৫। Haraprasad Sastri-র মতে (*Kalidasa, His Home*) মালবের অন্তর্গত দশপুর কালিদাসের জন্মস্থান, A. C. Chatterjee-র মতে (*Kalidasa, His Poetry and Mind*) হইল উজ্জয়িনী, Bhau Daji-র মতে কাশ্মীর এবং Majumdar-র মতে (*Home of Kalidasa*) বিদর্ভ। দণ্ডীর অবন্তীসুন্দরীকথায় একটি শ্লোক শেষোক্ত মতকেই সমর্থন করে। শ্লোকটি এই ঃ

লিপ্তা মধুদ্রবেণাসন্ যস্য নির্বিবশা গিরঃ।
তেনেদং বর্ত্ম বৈদর্ভং কালিদাসেন শোধিতম্॥

Keith বলেন ঃ

".......his evident affection for Ujjayini suggests that he spent much of his time there under Chandragupta's favour."

১৬। একমাত্র ঋতুসংহারে এই তারতম্য ধরা পড়ে বলিয়াই ঋতুসংহারকে অনেকে কালিদাসের রচনা বলিয়া স্বীকার করেন না।

১৭। দে এই সম্বন্ধে সুন্দর মন্তব্য করিয়াছেন ঃ

"...they hardly show his poetic genius growing and settling itself in a gradual grasp of power. Very few poets have shown a greater lack of ordered development. Each of his works, including his dramas, has its distinctive characteristics in matter and manner ; it is hardly a question of younger or older, better or worse, but of difference of character and quality, of conception and execution."

কালিদাসের সমসাময়িক বা অব্যবহিত পরবর্তী কয়েকজন কবির রচনাও কালিদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে, এরূপ মনে করাও অসংগত নহে। এখনও প্রায় কুড়িখানি গ্রন্থ[১৮] আছে যাহার রচয়িতা কালিদাস না অপর কেহ, এ সংশয়ের নিরসন হয় নাই।[১৯] ঐগুলির মধ্যে চারি সর্গে বিভক্ত **জলোদয়** নামে একখানি যমক কাব্য এবং কুড়িটি শ্লোকে রচিত **রাক্ষস-কাব্য** যে কালিদাসের রচিত নহে তাহা আজ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। অনেকে বলেন যে **পুষ্পবাণবিলাস** নামে যে কাব্যখানি কালিদাসের রচিত বলিয়া মনে করা হয় তাহা অর্কবভট্টের রচনা। কালিদাসের সমসাময়িক কালের অন্ততঃ একখানি কাব্য আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যাহার রচয়িতা সম্বন্ধে আমরা সংশয়হীন। ইহা প্রবরসেন কর্তৃক প্রাকৃতে রচিত ও ১৫ সর্গে বিভক্ত **সেতুবন্ধ** বা **রাবণবধ**। খুব সম্ভব খৃষ্টাব্দ ৫ম শতকে প্রবরসেন কাশ্মীরের রাজা ছিলেন।[২০]

কিংবদন্তী অনুসারে কালিদাস সিংহলের রাজা কুমারদাসের অতিথি থাকিবার সময় এক লোভী বারবনিতার হাতে নিহত হন।[২১] রামায়ণের কাহিনী লইয়া রচিত কুড়ি সর্গে বিভক্ত **জানকীহরণ** কাব্য এই কুমারদাসের[২২] রচনা। এই কাব্যের প্রতি ছত্রে কালিদাসের রচনার প্রভাব দেখা যায় এবং মনে হয়, হয়ত বা কালিদাসকে অনুকরণ করিয়াই

১৮। শৃঙ্গারতিলক, দুর্ঘটকাব্যচিত্রকা, দুষ্করমালা, চিদ্‌গগনচন্দ্রিকা, ভ্রমরাষ্টক, শ্রুতবোধ। Aufrecht (*Catalogus Catalogorum* 1.99) এই বইগুলিও কালিদাসের রচিত বলিয়াছেন—অম্বাস্তব, কালীস্তোত্র, লঘুস্তব, বিদ্বদ্‌বিনোদকাব্য, বৃন্দাবনকাব্য, শৃঙ্গারসার, গঙ্গাষ্টক, মঙ্গলাষ্টক, চণ্ডিকা-দণ্ডকস্তোত্র।

১৯। P. Hari Chand বলেন ঃ

"Six works are by universal consent considered the authentic productions of the great poet: the three dramas *Sakuntala*, *Vikramorvasi* and *Malavikagnimitra*, the two epics *Raghuvamsa* and *Kumarasambhava* and the lyric *Meghaduta*."

২০। কিংবদন্তী আছে যে কাশ্মীররাজ প্রবরসেন বিতস্তা নদীর উপর দিয়া সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন। সেই ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য তাঁহার অনুরোধে কালিদাসই এই কাব্য রচনা করেন। বাণ হর্ষচরিতে ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন ঃ

কীর্তিঃ প্রবরসেনস্য প্রয়াতা কুমুদোজ্জ্বলা।
সাগরস্য পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা॥

Bhau Daji-র মতে কাশ্মীরের কবি মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস একই ব্যক্তি এবং মাতৃগুপ্তের জীবনে যে পত্নী-বিরহ ঘটিয়াছিল মেঘদূতের মধ্যে সেই চিত্রই প্রতিফলিত। রাজতরঙ্গিণীর ২৫২ শ্লোক (যাহা মাতৃগুপ্ত-রচিত বলিয়া কথিত) এবং মেঘদূতের ১১৩ শ্লোকের সাদৃশ্য দেখাইয়াও তিনি তাঁহার মত প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন।

২১। গল্পটি এই ঃ

সিংহলরাজ কুমারদাসের এক সুন্দরী গণিকা ছিল। এক সময়ে কুমারদাস তাঁহার নিকট যাইয়া 'কমলে কমলোৎপত্তিঃ শ্রূয়তে ন চ দৃশ্যতে' এই পদ্যাংশটি লিখিয়া দেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে যদি ঐ গণিকা ইহার অপরার্ধ পূরণ করিতে পারে তবে তিনি তাহাকে প্রচুর পুরস্কার দিবেন। কালিদাস এই সময়ে কুমারদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সিংহলে গিয়াছিলেন এবং যে প্রাসাদে ঐ গণিকা অবস্থান করিত সেই প্রাসাদেই তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। অসমাপ্ত শ্লোক দেখিয়া কালিদাস উহার নীচে লিখিয়া দিলেন—'বালে তব মুখাম্ভোজে দৃষ্টমিন্দীবরদ্বয়ম্'। পুরস্কারের লোভে সেই গণিকা কালিদাসকে হত্যা করিয়া তাঁহার মৃতদেহ লুকাইয়া ফেলে এবং রাজার নিকট পুরস্কার চায়। কুমারদাস বুঝিয়াছিলেন যে ঐ অংশ গণিকার রচিত নহে এবং শেষ পর্যন্ত তাহাকে দিয়া অপরাধ স্বীকার করাইয়াছিলেন। বন্ধুর প্রাণ-বিয়োগে ক্রুদ্ধ ও মর্মাহত কুমারদাস কালিদাসের চিতায় সেই গণিকাকে সমর্পণ করেন।

২২। কুমার, কুমারদত্ত, কুমারভট্ট, ভট্ট কুমার প্রভৃতি অনেক নাম পাওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই এক ব্যক্তি কি না বলা কঠিন। জানকীহরণের শেষ চার সর্গে কবি নিজের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে তাঁহার পিতার নাম কুমারমণি এবং যেদিন তাঁহার পিতা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন সেইদিনই তাঁহার জন্ম হয়। মেঘ ও অগ্রবোধি নামক তাঁহার

এই কাব্য রচিত হইয়াছিল।[২৩] ইহার চতুর্থ সর্গে যে ঋতুবর্ণনা পাওয়া যায়, কালিদাসের ঋতুসংহারের প্রভাব তাহাতে পরিস্ফুট।

ছয়টি সর্গে, ১৪৪টি শ্লোকে, বিভিন্ন ছন্দে রচিত ঋতুসংহার কালিদাসের রচনা কি না এ বিষয়ে অনেকে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তি হইল, (ক) সমস্ত অলঙ্কারশাস্ত্রে কোনও অলঙ্কারের উদাহরণ দেখাইবার জন্য কোনও আলঙ্কারিক ঋতুসংহার হইতে কোনও শ্লোক উদ্ধৃত করেন নাই। (খ) মল্লিনাথ কালিদাসের অন্য গ্রন্থের টীকা করিলেও ঋতুসংহারের টীকা রচনা করেন নাই। (গ) ইহার ভাষা অত্যন্ত সহজ এবং কালিদাসের অন্যান্য গ্রন্থের ভাষার মত নহে। (ঘ) বৎসরের আরম্ভ বসন্ত ঋতু হইতে, অথচ গ্রীষ্ম-বর্ণনা দিয়া ঋতুসংহারের আরম্ভ হইয়াছে। বৎসভট্টি Mandasoor লিপিতে ঋতুসংহারের দুইটি শ্লোকের অনুকরণ করিয়াছেন একথা সত্য হইলেও তাহাতে বড় জোর ঋতুসংহারের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করা চলে, কিন্তু উহা কালিদাসের রচিত ইহা প্রমাণিত হয় না। Keith কিন্তু এইরূপ যুক্তির প্রবল প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে কোনও কবির প্রথম বয়সের রচনা ও পরিণত বয়সের রচনার মধ্যে পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক এবং ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনাতেও এই পার্থক্য লক্ষিত হয়। মল্লিনাথ যে ইহার টীকা রচনা করেন নাই তাহার কারণ এই যে ঋতুসংহারের ভাষা এত সহজ ও প্রাঞ্জল যে মল্লিনাথের মত সুপণ্ডিত টীকাকারের টীকা মূল গ্রন্থ হইতেও অধিক দুর্বোধ্য না হইয়া পারিত না। মল্লিনাথ ইহা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই ইহার টীকা প্রণয়ন করেন নাই। গ্রীষ্ম-বর্ণনা দিয়া আরম্ভ হওয়াতেও কোনও অসঙ্গতি প্রকাশ পায় নাই, কারণ কালিদাস কাব্য রচনা করিতেছিলেন, পঞ্জিকার পারম্পর্যরক্ষা তাঁহাকে মানিতেই হইবে এইরূপ দায় বা বাধ্যবাধকতা তাঁহার ছিল না। Keith দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে যদি ঋতুসংহারকে কালিদাসের রচনাবলী হইতে বাদ দেওয়া হয় তবে মহাকবি কালিদাসের যশ অনেকখানি ম্লান হইয়া পড়িবে।[২৪] ইহাকে শুধু ঋতুবর্ণনা মাত্র মনে করিলে ভুল হইবে। একটি ঋতুর আবির্ভাবের সহিত প্রকৃতিতে এবং মানুষের মনোরাজ্যে যে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়, পতি-পত্নী, প্রণয়ী-প্রণয়িনীর মানসলোকে প্রতিটি ঋতু তাহার আগমনীর সুরে যে অপূর্ব ভাববৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে, তাহাই কবির বক্তব্য। সেইখানেই ঋতুসংহারের কাব্যসৌন্দর্য। শকুন্তলায় ও মেঘদূতের মধ্যে আমরা যে কালিদাসকে পাই সে কালিদাসের পরিচয় ঋতুসংহারে মেলে না সত্য, কিন্তু ইহাও অত্যধিক সত্য যে ঋতুসংহারে কালিদাস যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহা যে কোনও মহাকবির কাম্য এবং কালিদাসের উত্তরজীবনে সেই শক্তি সমানভাবে বর্তমান থাকিলে কালিদাস যাহা হইয়াছিলেন তাহা অপেক্ষাও বড় হইতে পারিতেন।

মন্দাক্রান্তা ছন্দে লেখা কালিদাসের আর একটি লিরিক মেঘদূত। অলকাধিপতি কুবেরের ভৃত্য কোন যক্ষ কর্তব্যে শৈথিল্য প্রকাশ করার জন্য কুবেরের আদেশে

মাতৃগুপ্তের তাঁহাকে রাজ্যপ্রদান করেন। মহাবংশে যে উপাখ্যান উল্লিখিত আছে তাহার সহিত গ্রন্থের কাহিনীর বিবরণে মিল নাই। জানকীহরণের কবি ও সিংহলের রাজা একই ব্যক্তি নহেন এবং কবি কুমারদাস কালিদাসের পরবর্তীকালের।

২৩। জহ্লণ তাঁহার সূক্তিমুক্তাবলীতে রাজশেখরের রচিত বলিয়া একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। রঘুবংশের পর রাম-রাবণের উপাখ্যান লইয়া রচিত জানকীহরণই যে শ্রেষ্ঠ কাব্য ইহাই শ্লোকটির প্রতিপাদ্য :

জানকীহরণং কর্তুং রঘুবংশে স্থিতে সতি।
কবিঃ কুমারদাসশ্চ রাবণশ্চ যদি ক্ষমঃ॥

২৪। "In point of fact, the *Ritusamhara* is far from unworthy of Kalidasa, and if the poem is denied him, his reputation would suffer real loss."—Keith : *History of Sanskrit Literature*.

এক যক্ষের কথা কৈলাস হইতে রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত হয়। আষাঢ়ের আকাশে মেঘ দেখিয়া তাহার মনে জাগিয়া ওঠে প্রিয়ার বিরহ ব্যথা সাংঘাতিক ভাবে। প্রকৃতি-কুশল ও বার্তা বহন করিবার জন্য মেঘ-দূতরূপে নিযুক্ত হইয়া অলকার দিকে যাত্রা করে। পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ—দুই খণ্ডে বিভক্ত মেঘদূত রামগিরি হইতে অলকা পর্যন্ত সমস্ত পথের সুন্দর বর্ণনায় পূর্ণ। কাব্যখানার জন্য ইহার বহু টীকা ও বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং দেশে-বিদেশে মেঘদূতের অনুকরণও কম দেখা যায়।[২৫] মেঘদূতের অনুকরণে পর পর বহু কাব্য রচিত হইতে থাকে।[২৬] কালিদাস খুব সম্ভব রামায়ণ হইতে মেঘদূতের কল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, সীতার নিকট রামচন্দ্রের হনুমানের অনুকরণ করিয়া পত্নীর নিকট যক্ষের বার্তাবাহকরূপে মেঘকে দূত করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন।[২৭] প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবর্ণনা, বর্ষার চিত্র এবং বিরহী মনস্তত্ত্বকে উদ্দেশ্য করিয়া যে গীতি রসে ভরা কবিতাগুলি রচিত হইয়াছে তাহার দিক দিয়া বিচার করিলে কালিদাসের সকল কাব্যের মধ্যে ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

আর একখানি কাব্য **কুমারসম্ভব**। তারকাসুরের অত্যাচারে জর্জরিত দেবগণ ব্রহ্মদেবের নিকট গমন করিয়া প্রার্থনা জানায় এমন একজন সেনাপতির সৃষ্টি করিবার জন্য যিনি তারকাসুরের কবল হইতে দেবগণকে রক্ষা করিতে পারেন। দেবতাদের প্রার্থনা মহাদেব প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। ফলে হিমালয়ের কন্যারূপে পার্বতীর জন্ম, হিমালয়ে মহাদেবের তপস্যা এবং শেষ পর্যন্ত পার্বতীর সহিত মহাদেবের মিলন এবং দেবসেনাপতি কার্তিকেয়র জন্ম—ইহাই হইল কাব্যের বিষয়বস্তু। ১৭টি সর্গে বিভক্ত[২৮] এই কাব্যের প্রথম সাতটি সর্গ নিশ্চয়ই (মতান্তরে অষ্টম সর্গও) কালিদাসের রচনা। মল্লিনাথ ও অরুণগিরিনাথ এই অংশ পর্যন্তই টীকা করিয়াছেন এবং আলংকারিকগণও এই অংশ হইতেই তাঁহাদের গ্রন্থে উদ্ধৃতি দিয়াছেন। পরবর্তী সর্গগুলি যে কালিদাসের রচনা নয় তাহা তাহাদের ভাষা এবং রচনাভঙ্গীই প্রমাণ করে।[২৯] কালিদাস হর-পার্বতীর মিলন দেখাইয়াই

২৫। বল্লভদেব ১১১, দক্ষিণাবর্তনাথ ও পূর্ণসরস্বতী ১১০, মল্লিনাথ ১১৮, ঈশ্বরচন্দ্রের সংস্করণে ১১৭ ও নির্ণয়সাগর সংস্করণে ১২১টি শ্লোক দৃষ্ট হয়।

২৬। সপ্তদশ শতকে রুদ্রমূর্তি বাচস্পতি রচনা করেন এবং নিজেকে দ্বিতীয় কালিদাস মনে করেন। ইহার বিষয়বস্তু, ছন্দ ও ভাষার অনুকরণ করিয়া পিকদূত, হংসদূত, চন্দ্রদূত প্রভৃতি কাব্য রচিত হয়। জৈন কবিদিগের হাতে এই দূতকাব্য ধর্মের পরিপুষ্টিসাধনে রচিত হইতে থাকে। মেঘদূতের শ্লোকগুলির অনুকরণে আরও পাদপূরণরূপে কাব্যাদি, ইত্যাদি প্রভৃতি রচিত হইয়াছে। মোট কথা, কালিদাসের মেঘদূতের পরে দূতকাব্য নামক এক শ্রেণীর কাব্য ধারার সৃষ্টি হইতে থাকে।

২৭। কাব্যবিষয়ক-কাহিনীর একটি কাহিনী হইতে গৃহীত। M. Krishnamachariar বলেন:

"The source of the theme is now discovered to be the story of Asadhakrishna Ekadasi. Yogini Mahatmyam... This is mentioned by K. Lakshmana Somayajin in *Udayanapatrika*, II, p. 174."—*History of Classical Sanskrit Literature*, p. 360, f. n.

২৮। Griffith বলেন:

"The birth of the War God was either left unfinished or time has robbed us of the conclusion. The latter is the more probable supposition, tradition informing us that the poem originally consisted of 22 cantos."

শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের মতে অষ্টম হইতে সপ্তদশ সর্গ পর্যন্তই কালিদাসের রচনা (চতুর্থ ওরিয়েন্টাল কন্‌ফারেন্স-এ পঠিত তাঁহার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

২৯। R. V. Krishanamacharyya উভয় অংশের ভাষা ও রচনাভঙ্গীর তুলনামূলক সমালোচনা করিয়াছেন।

কাব্য শেষ করিয়াছিলেন। 'কুমারসম্ভব' (অর্থ, কুমার বা কার্তিকেয়র জন্ম)[৩০] নামের সার্থকতা দেখাইবার জন্যই হয়ত পরবর্তী কোনও কবি শেষ পর্যন্ত কার্তিকেয়র জন্ম এবং অধিকন্তু তৎকর্তৃক তারকাসুরের বিনাশসাধন পর্যন্ত ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন। অনেকে বলেন অষ্টম সর্গে হর-পার্বতীর যে মিলনের চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে তাহা হিন্দুরুচিবিরুদ্ধ এবং ইহা কালিদাসের দ্বারা কখনও সম্ভব হয় নাই।[৩১] কালিদাস যে কেন কুমারসম্ভব অসমাপ্ত রাখিলেন তাহা অনুমান করা কঠিন। রঘুবংশ নিঃসংশয়ে কুমারসম্ভবের পরে রচিত হইয়াছিল, সুতরাং কালিদাসের মৃত্যুই ইহার অসমাপ্তির কারণ এইরূপ মনে করা চলে না। আবার এমনও হইতে পারে যে 'কুমারসম্ভব' নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি সাতটি সর্গের অধিক রচনা করা প্রয়োজন বলিয়াই মনে করেন নাই। হর-পার্বতীর মিলনের মধ্য দিয়াই কুমারের জন্ম সূচিত হইল ইহা মনে করিয়া মূল সাতটি সর্গে কুমারসম্ভব সম্পূর্ণ করিয়া ফেলা কালিদাসের পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না। যদি এই অনুমান ঠিক হয় তবে কালিদাস রচিত কুমারসম্ভব সম্পূর্ণই আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তারকাসুরের চরিত্র-চিত্রণে রামায়ণে বর্ণিত বর্ণনার প্রভাব দেখা যায়। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে রাজকুমার সিদ্ধার্থের নগরপ্রবেশের বর্ণনার সহিত কুমারসম্ভবে হর-পার্বতীর আগমনে সুরনারীদের বর্ণনার সাদৃশ্য দেখা যায়।[৩২]

৩০। M. Krishnamachariar বলেন যে রামায়ণের বালকাণ্ডের একটি শ্লোক "এষ তে রাম গঙ্গায়াঃ বিস্তারোঽভিহিতো ময়া। কুমারসম্ভবশ্চৈব ধন্যঃ পুণ্যস্তথৈব চ॥"—(৩৭.৩২) হইতে কালিদাস তাঁহার কাব্যের ঐ নামটি গ্রহণ করেন।—*History of Classical Sanskrit Literature*, p. 114

৩১। নারায়ণ পণ্ডিত তাঁহার 'বিবরণ' নামক টীকায় এই আপত্তির খণ্ডন করিয়াছেন। অষ্টম সর্গ যে রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া এক সময়ে কঠোরভাবে সমালোচিত হইয়াছিল তাহা আনন্দবর্ধনের উক্তি হইতে জানা যায়।

তুল: It is unbelievable that Kalidasa abruptly left off his work; possibly he brought it to a proper conclusion; but it is idle to speculate as to why the first seven or eight cantos only survived. The fact remains that the authenticity of the present sequel has not been proved."—Das Gupta & De

৩২। রঘুবংশে অজ ও ইন্দুমতীর নগরপ্রবেশের বর্ণনায়ও বুদ্ধচরিতের এই প্রভাব লক্ষণীয়। অশ্বঘোষ ও কালিদাসের রচনার সাদৃশ্য সম্বন্ধে S. P. Pandit, Nandargikar, Haraprosad Sastri, Kshetresh Chandra Chattopadhyay প্রভৃতি পণ্ডিতগণ আলোচনা করিয়াছেন। নীচে এই সাদৃশ্য দেখানোর জন্য উদ্ধৃতি দেওয়া হইল:

কালিদাস	অশ্বঘোষ
পরস্পরেণ স্পৃহণীয়শোভম্ ন চেদিমং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ। অস্মিন্ দ্বয়ে রূপবিধানযত্নঃ পত্যুঃ প্রজানাং বিতথোঽভবিষ্যৎ॥ —রঘুবংশ, ৭.১৪	তাং সুন্দরীং চেন্ন লভেত নন্দঃ সা বা নিষেবেত ন তং নতভ্রূঃ দ্বন্দ্বং ধ্রুবং তদ্বিকলং ন শোভে— তান্যোন্যহীনাবিব রাত্রিচন্দ্রৌ —সৌন্দরনন্দ, ৪.৭
কস্যৈকান্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা। নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ॥ —মেঘদূত, ২.৪৮	অতোঽপি নৈকান্তসুখোঽস্তি কশ্চি- ন্নৈকান্তদুঃখঃ পুরুষঃ পৃথিব্যাম্॥ —বুদ্ধচরিত, ১১.৪৩
বাতা ববুঃ সৌখ্যকরাঃ প্রসেদু— রাশা বিধূমো হুতভুগ্ দিদীপে। জলান্যভূবন্ বিমলানি তত্রোৎ— সবেঽন্তরিক্ষং প্রসসাদ সদ্যঃ॥ —কুমারসম্ভব, ১১.৩৭	বাতা ববুঃ স্পর্শসুখং মনোজ্ঞা দিব্যানি বাসাংস্যবপাতয়ন্ত্যঃ। সূর্যঃ স এবাভ্যধিকং চকাশে জজ্বাল সৌম্যার্চিরনীরিতোঽগ্নি॥ —বুদ্ধচরিত, ১৩.৭৩

১৯টি সর্গে বিভক্ত কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া স্বীকৃত[৩৩] রঘুবংশ দিলীপ হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকজন রঘুবংশীয় নরপতির[৩৪] কাহিনীতে পূর্ণ। রঘুবংশীয় নরপতিগণের যে ক্রম ইহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে রামায়ণে উল্লিখিত নৃপতিগণের তালিকার সহিত তাহার মিল নাই, বরং বিষ্ণুপুরাণ ও বায়ুপুরাণের তালিকার সহিত তাহার মিল দেখা যায়।[৩৫] প্রাচীন কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও কালিদাস এই কাব্যের সর্বাংশে তাঁহার স্বকীয়তার ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন এবং ঘটনাবৈচিত্র্যের জন্য রঘুবংশের প্রতিটি সর্গ আমাদের মধ্যে নূতন নূতন আগ্রহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। বর্ণনীয় বিষয়কে সম্প্রসারিত করিবার এবং সংহত করিবার দ্বৈধী শক্তির দ্বৈতলীলা কালিদাসের লেখনীতে এই কাব্যে প্রকট হইয়াছে। একটি সম্পূর্ণ সর্গে রামচন্দ্রের কৈশোরলীলা বর্ণনা করিয়াই কালিদাস পরবর্তী সর্গে শ্লোক-ছন্দে সমগ্র রামায়ণের ঘনীভূত রূপ উপস্থাপিত করিয়াছেন। কাব্যের প্রথম অংশে রঘুই প্রধান চরিত্র, পার্শ্বচরিত্ররূপে দিলীপ ও অজ; দ্বিতীয় অংশে প্রধান চরিত্র রাম, পার্শ্বচরিত্র দশরথ ও কুশ। শেষ দুইটি সর্গে যে নৃপতিগণের উল্লেখ আছে তাঁহারা আমাদের নিকট অপ্রসিদ্ধ এবং অগ্নিবর্ণই রাজবংশের ধারায় উল্লিখিত শেষ নরপতি।[৩৬]

কালিদাসের রচিত পঞ্চাঙ্ক নাটক **মালবিকাগ্নিমিত্র** বিদিশারাজ অগ্নিমিত্রের অন্তঃপুরের ষড়যন্ত্রের কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া রচিত। অপূর্বসুন্দরী মালবিকা রাজ-অন্তঃপুরের পরিচারিকা। রানী সকল সময়েই মালবিকাকে অগ্নিমিত্রের চোখের আড়ালে রাখিবার চেষ্টা করেন—মালবিকার অসাধারণ সৌন্দর্যকে তিনি ভয় করেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মালবিকা আসলে রাজকন্যা, দস্যুহস্তে পড়িয়া ঘটনাচক্রে বিদিশা-রাজের অন্তঃপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। মিলনের যেটুকু বাধা ছিল কাটিয়া গেল। অগ্নিমিত্র ও মালবিকা মিলিত হইলেন।

কালিদাস আরম্ভেই নাটকটিকে নূতন বলিয়াছেন। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন যে কালিদাসের ইহাই প্রথম নাটক। কিন্তু এ অনুমান সর্বথা নির্ভরযোগ্য নয়। ইহা বিনয়ের অভিব্যক্তিও হইতে পারে। অভিজ্ঞান-শকুন্তলাতেও এই বিনয় দেখা গিয়াছে।[৩৭]

৩৩। রঘুবংশের প্রচলিত ৪০টি টীকা এই কাব্যের প্রসিদ্ধির পরিচায়ক।

৩৪। রঘুবংশের উল্লিখিত নরপতিদের নাম—দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ, রাম, কুশ, অতিথি, নিষধ, নল, নাভ, পুণ্ডরীক, ক্ষেমধন্বা, দেবানীক, অহিমন্যু, পারিযাত্র, শীল, উন্নাভ, বজ্রঘোষ, শংখণ, ব্যুষিতাশ্ব, বিশ্বসহ, হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, ব্রহ্মিষ্ঠ, পুত্র, পুষ্য, ধ্রুবসন্ধি, সুদর্শন, অগ্নিবর্ণ। এই নরপতিগণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে শ্রীযুত ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *Date of Kalidasa* (Allahabad University Studies) আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে শুঙ্গবংশীয় নরপতি দেবভূমিই রঘুবংশের অগ্নিবর্ণ।

৩৫। ইহা হইতে S. P. Pandit অনুমান করেন ঃ

"..that Kalidasa has not adopted the Ramayana as the basis of Raghuvamsa. It also appears probably that the author of the Raghuvamsa and of the Vayu Purana had a common source to draw their materials upon which is now beyond the hope of recovery."

৩৬। পুরাণে অগ্নিবর্ণের পরও ঐ বংশে ২৭ জন নরপতির নাম পাওয়া যায়। রঘুবংশ অতর্কিতভাবে অগ্নিবর্ণে আসিয়া শেষ হইল কেন তাহার কারণ এখনও আমাদের নিকট অজ্ঞাত। C. Kunhan Raja এতদূর পর্যন্ত বলিয়াছেন যে দশরথ হইতে আরম্ভ করিয়া রঘুবংশের দ্বিতীয় অংশ কালিদাস রচিত মূল রঘুবংশ নহে। —*Annals of Oriental Research*, University of Madras, Vol. V, Part II

৩৭। তুলঃ "...নবেন নাটকেনোপস্থাতব্যমস্মাভিঃ";

এবং

আ পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥

অথচ অভিজ্ঞান-শকুন্তলাকে কেহই কালিদাসের প্রথম রচনা বলিবেন না। অনেকে মনে করেন, কালিদাস ইচ্ছা করিয়াই তৎকালীন রাজ-অন্তঃপুরের জীবনকে ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই এই নাটক রচনা করিয়াছেন।[৩৮] নাটকটির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে বিদূষকের চরিত্র ইহাতে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং নাটকের পরিণতি সম্পাদনে বিদূষক ইহাতে যতখানি অংশ গ্রহণ করিয়াছে, কালিদাসের অন্য কোনও নাটকে তাহা করে নাই।[৩৯]

কালিদাস রচিত আর একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক **বিক্রমোর্বশী**। রাজা পুরূরবার সহিত অপ্সরা উর্বশীর প্রণয়ের কাহিনী ঋগ্বেদের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। মহাকাব্য ও পুরাণের যুগেও বিভিন্নরূপে এই কাহিনী প্রচলিত হইয়াছে। পুরূরবা অসুরগণের হাত হইতে উর্বশীর উদ্ধারসাধন করেন এবং তাঁহার প্রতি আসক্ত হন। ইন্দ্রের আহ্বানে উর্বশীকে স্বর্গে যাইতে হয় এবং এই বিচ্ছেদে পুরূরবা মর্মাহত হইয়া পড়েন। স্বর্গে **লক্ষ্মীস্বয়ংবর** নাটকের অভিনয়ে উর্বশীকে লক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয় করিতে হইল। পুরূরবার চিন্তায় মগ্ন তাঁহার মন, অভিনয়কালে উর্বশী 'পুরুষোত্তম' স্থলে বলিয়া ফেলিলেন 'পুরূরবা'। ভরতের অভিশাপে উর্বশীকে পৃথিবীতে নামিয়া আসিতে হয় এবং ইন্দ্রের কৃপায় তাঁহার অভিশাপ এইটুকুই মাত্র লঘু হইল যে, পুরূরবার ঔরসে সন্তানের জন্মদান করিয়া এক বৎসর পরে উর্বশী আবার স্বর্গে আসিতে পারিবেন। শেষ দিকে কণ্বের আশ্রমে উর্বশীর লতারূপ গ্রহণ, পুরূরবার প্রেমোন্মত্ততা এবং উর্বশীর পূর্বাবস্থাপ্রাপ্তি নাটকের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় অংশ। পুত্র আয়ুর জন্মের পর উর্বশীর স্বর্গে প্রত্যাগমনের দিন আসিয়া পড়িল। দৈত্যগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পুরূরবা ইন্দ্রকে যে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহার পুরস্কারস্বরূপ ইন্দ্র উর্বশীকে পুরূরবার সহিত থাকিতে অনুমতি দিলেন। চতুর্থ অংশে উর্বশীর বিরহে প্রেমোন্মত্ত পুরূরবার মর্মস্পর্শী বিলাপের যে কাব্যরূপ কালিদাস দিয়াছেন তাহা পৃথিবীর যে কোনও সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

নাট্যকৌশল ও কাব্যসম্পদের অপূর্ব সমন্বয় দৃষ্ট হয় কালিদাসের সাত অঙ্কের নাটক **অভিজ্ঞানশকুন্তলম্**-এ। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার বহুল প্রচারিত কাহিনীকে অবলম্বন

৩৮। "A conventional dramatisation of harem intrigue in the court of king Agnimitra of Vidisa, probably of the Sunga dynasty." —Macdonell: *Sanskrit Literature*, 330: দ্রষ্টব্য: K. R. Pisharoti: *Journal of the Annamalai Univ.*, *II*

৩৯। নাটকটি সম্বন্ধে S. N. Das Gupta ও S. K. De-র সমালোচনা উদ্ধৃত করা হইল: The *Malavika* is not a love-drama of the type of the Svapnavasavadatta, to which it has a superficial resemblance, but which possesses a far more serious interest. It is a light-hearted comedy of court-life in five acts, in which love is a pretty game, and in which the hero need not be of heroic proportion, nor the heroine anything but a charming and attractive maiden. ..The former is a care-free and courteous gentleman, on whom the burden of kingly responsibility sits but tightly, who is no longer young but no less ardent, who is an ideal Daksina Nayaka possessing a great capacity for falling in and out of love; while the latter is a faintly drawn *ingenue* with nothing but good looks and willingness to be loved by the incorrigible king-lover. ..The characterisation is sharp and clear, and the expression polished, elegant and even dainty...Judged by its own standard, there is nothing immature, clumsy or turgid in the drama."

করিয়া রচিত হইলেও কালিদাস ইহাতে নিজস্ব প্রতিভার স্পষ্ট স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন এবং কালিদাস যদি আর কোনও কাব্য বা নাটক রচনা নাও করিতেন, তবুও এই একখানি নাটকই তাঁহাকে একাধারে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকাররূপে যশোমণ্ডিত করিয়া রাখিত।[৪০] বিশেষ করিয়া চতুর্থ অঙ্কে আমরা প্রকৃতির কবি কালিদাসের পূর্ণ পরিচয় পাই। সেখানে কবি প্রকৃতির রূপ বর্ণনায় এবং প্রকৃতিকে প্রকৃতি রাখিয়া মানুষের সমধর্মীরূপে চিত্রিত করিয়া মানুষেরই সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার করিয়াছেন। প্রকৃতি সেখানে অনসূয়া-প্রিয়ম্বদার মতই একটি স্বতন্ত্র চরিত্র যাহা শকুন্তলার সুখ-দুঃখকে সমানভাবে হৃদয় দিয়া গ্রহণ করে। চতুর্থ অঙ্কই শ্রেষ্ঠ অঙ্ক এই কথা বলার তাৎপর্য এই যে সেখানে কালিদাস কবিরূপে স্বমহিমায় সমাসীন। নাটকীয় ধারার উৎকর্ষ-বিচারে কিন্তু পঞ্চম অঙ্কই শ্রেষ্ঠ। কুশলী নাট্যকাররূপে কালিদাসের পরিচয় সেখানেই পাওয়া যায়। তৃতীয় ও পঞ্চম অঙ্কের মধ্যে মাত্র শকুন্তলার বিদায়কে কেন্দ্র করিয়া একটি পূর্ণ অঙ্ক না দিলেও নাটকের পরিণতি সম্পাদনে কিছুমাত্র ইতরবিশেষ হইত না। চতুর্থ অঙ্কটির জন্য অভিজ্ঞান-শকুন্তলায় শাশ্বত মানবচিত্তের নিকট একটি শাশ্বতী বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া কালিদাস যে এক কালজয়ী আবেদন করিয়াছেন, দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেম-কাহিনী ভুলিয়া গেলেও সেই আবেদন চির উপভোগ্য হইয়া থাকিবে। কন্যার পতিগৃহে যাইবার সময়ে তাহার আবাল্য পরিচিত আত্মীয়, সঙ্গী ও পরিবেশের সহিত অন্তরের যোগসূত্র ছিন্ন হওয়ার যে শাশ্বত বেদনা, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া মানুষ ও প্রকৃতির যে অন্তরঙ্গতার চিত্র কালিদাস অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অনবদ্য। নাটকের নায়ক-নায়িকাকে মুখোমুখী দাঁড় করাইয়া, উভয়কে সত্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, উভয়ের নিকট উভয়কে দুর্বোধ্য করিয়া উভয়ের মধ্যে যে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি কালিদাস করিয়াছেন, তাহাই নাটকের চরম মুহূর্ত। নাট্যকার কালিদাসের পূর্ণ পরিচয় পঞ্চম অঙ্কে। মহাভারতের আদি পর্ব ও পদ্মপুরাণ হইতে হয়ত কালিদাস নাটকীয় আখ্যানভাগ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তলা কালিদাসের কমকল্পনার অপরা সৃষ্টি। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রণয়-কাহিনী বর্ণনাই কালিদাসের উদ্দেশ্য নয়। তপস্যা, সংযম ও নিষ্ঠা না থাকিলে যে দেহনিষ্ঠ কাম দেহাতীত প্রেমে পরিণত হইতে পারে না, তাহাই কালিদাস এই নাটকে প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন।[৪১]

৪০। তুলঃ (১) কাব্যেষু নাটকং রম্যং তত্র রম্যা শকুন্তলা।
তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কঃ যত্র যাতি শকুন্তলা॥
(২) কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্।
তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কঃ তত্র শ্লোকচতুষ্টয়ম্॥

৪১। "Contrasted with Kalidasa's own Malavikagnimitra and Vikramorvasiya, the sorrow of the hero and heroine in this drama is far more human, far more genuine, and love is no longer a light-hearted passion in an elegant surrounding, nor an explosive emotion ending in madness, but a deep and steadfast enthusiasm, or rather a progressive emotional experience, which results in an abiding spiritual feeling."—Das Gupta & De

"মেঘদূতে যেমন পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে—পূর্বমেঘে পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্যে পর্যটন করিয়া উত্তরমেঘে অলকাপুরীর নিত্যসৌন্দর্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়, তেমনি শকুন্তলায় একটি পূর্বমিলন ও একটি উত্তরমিলন আছে। প্রথম-অঙ্কবর্তী সেই মর্ত্যের চঞ্চল সৌন্দর্যময় বিচিত্র পূর্বমিলন হইতে স্বর্গতপোবনে শাশ্বত আনন্দময় উত্তরমিলনে যাত্রাই অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক।"—রবীন্দ্রনাথ ঃ প্রাচীন সাহিত্য।

নাট্যশাস্ত্রের উৎপত্তি ও তাহার উপর গ্রীক প্রভাব

নাট্যশাস্ত্রে[১] নাট্য-সাহিত্যের জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যান আছে—সৃষ্টির পর ইন্দ্র ব্রহ্মার নিকট আবেদন জানাইলেন চক্ষু-কর্ণের আনন্দবিধায়ক একখানি পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করিবার জন্য। চারিখানি বেদ পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল; তাহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই জাতি-ত্রয়েরই মাত্র অধিকার ছিল, শূদ্রের কোনও অধিকার ছিল না। ইন্দ্র চাহিলেন, নবসৃষ্ট এই পঞ্চম বেদে শূদ্রেরও অধিকার থাকিবে। ইন্দ্রের আবেদন ব্যর্থ হইল না। ব্রহ্মা ঋগ্বেদ হইতে বাণী, সামবেদ হইতে গীতি, যজুর্বেদ হইতে অভিনয় এবং অথর্ববেদ হইতে অনুভূতি ও রস গ্রহণ করিয়া একখানি পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করিলেন। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ব্রহ্মার আদেশে এক নাট্যশালা নির্মাণ করিলেন। ভরত ও তাঁহার একশত শিষ্যের তত্ত্বাবধানে সেই নাট্যশালায় প্রথম নাটক অভিনীত হইল—নাটকের বিষয়বস্তু ছিল দেবগণের পরাভব। নহুষ ইন্দ্রপদ লাভ করিলে তাঁহার ইচ্ছা হইল স্বর্গের ঐ নাট্যবেদ পৃথিবীতেও প্রচার লাভ করুক। ভরতের সন্তান-গণই পৃথিবীতে প্রেরিত হইলেন, এবং তাঁহাদের হইতে সমাজে নাট্যশাস্ত্রবিশারদ এক বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি হইল। তদবধি ঐ শ্রেণীর কার্যই হইল ইতিহাসের মধ্য দিয়া জনগণকে শিক্ষাদানের জন্য নাট্যবেদের প্রচার করা।

নাট্যশাস্ত্রের সৃষ্টি সম্বন্ধে উপাখ্যান

ঋগ্বেদে অনেকগুলি সূক্ত আছে যেগুলিকে 'সংবাদ-সূক্ত' বা dialogue humns[২] বলা হয়। খুব কম করিয়াও এই শ্রেণীর সূক্তের সংখ্যা কুড়িটি। যম-যমী (ঋ. স., ১০. ১০), পুরূরবা-উর্বশী (ঋ. স., ১০,৯৫), পণি-সরমা (ঋ. স., ১০. ১০৮), প্রভৃতি কথোপকথনাত্মক সূক্তগুলির এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।[৩] সংহিতোত্তর কালে ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিকে কোন-না-কোনও শ্রৌত অনুষ্ঠানে বিনিযুক্ত করার যে একটা প্রবল প্রচেষ্টা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার হাত হইতে এই সংবাদ-সূক্তগুলিও নিষ্কৃতি পায় নাই। ফল এই হইয়াছে যে এই সংবাদ-সূক্তগুলিই যে নাট্য সাহিত্যের প্রথম রূপ এই মূল্যবান তথ্যটি পরবর্তী যজ্ঞসাহিত্যে (ritual literature) কাহারও কাছে ধরা পড়ে নাই।[৪]

বেদের সংবাদ-সূক্ত নাট্য সাহিত্যের প্রথম রূপ

ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের সময়েই যে স্ত্রী ও পুরুষগণ উত্তম পোশাকে সজ্জিত হইয়া নাচ-গান করিতেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সামবেদের সময়ে যে সমাজ সঙ্গীত-শাস্ত্রে অনেক অগ্রসর হইয়াছিল সে কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। Keith-এর মতে সংবাদ-সূক্তগুলিতেই নাট্য-সাহিত্যের প্রথম বীজ উপ্ত হয়। Hertel এই বিষয়ে Keith-এর সহিত সম্পূর্ণ একমত, এমন কি তিনি **সুপর্ণাধ্যায়** নামক একখানি পরবর্তী বৈদিক গ্রন্থকে পরিপূর্ণ নাটকের মূল্যই দিয়াছেন। ঋগ্বেদের সংবাদ-

১। নাট্যশাস্ত্র, ১. ১-২৫; Keith-এর মতে নাট্যশাস্ত্র তৃতীয় খৃষ্টাব্দের পূর্বে নহে এবং এই উপাখ্যানটিও সমসাময়িক।

২। Keith: *JRAS*, 1911, pp. 981 *ff*.

৩। শৌনক তাঁহার বৃহদ্দেবতায় ৯ জন ব্রহ্মবাদিনীর নাম করিয়াছেন, যাঁহারা ঋষি ও দেবতাগণের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন—'ঋষিভির্দেবতাভিশ্চ সমূদে মধ্যমো গণঃ'।

৪। We must, therefore, admit that we have in these dialogues remnant of a style of poetry which died out in the Vedic period."—**Keith: *Sanskrit Drama*, p. 15**

সূক্তগুলিকে পরবর্তীকালে যজ্ঞশাস্ত্রকারগণ যজ্ঞের কাঠামোয় খাপ খাওয়াইতে গিয়া শুধু ঐগুলির প্রতি অবিচারই করেন নাই, অজ্ঞাতসারে নাট্য-সাহিত্যের অগ্রগতির পথে প্রবল বাধারও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যদি তাঁহারা ঐগুলির যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করিয়া জোর করিয়া উহাদিগকে যজ্ঞে বিনিযুক্ত না করিতেন তবে সূক্ত-সাহিত্যের মধ্যেই হয়ত পরিপূর্ণ নাটক আমরা দেখিতে পাইতাম।

বেদের কর্মকাণ্ডে নাটকের বীজ

বৈদিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত কতকগুলি অনুষ্ঠানে নাটকীয় আচরণ দেখা যায়। পাশ্চাত্ত্য বিবুধগণের অনেকে এই আচরণগুলিকে 'ritual drama' নামে অভিহিত করিয়াছেন। সোমযাগে সোমবিক্রয়ীর নিকট হইতে সোম ক্রয় করিয়া তাহাকে মূল্য না দিয়া ক্রেতা চলিয়া আসিতেন এবং সোমবিক্রয়ীকে প্রহার করিতেন। এইরূপ করা অনুষ্ঠানের অঙ্গ বলিয়াই বিবেচিত হইত। অবশ্যই এইরূপ অনুষ্ঠানে সোমক্রেতা ও সোমবিক্রেতার ভূমিকায় দুইজনকে অনুরূপ অভিনয় করিতে হইত। মহাব্রত[৫] নামক অনুষ্ঠানবিশেষে একখণ্ড চর্ম লইয়া শ্বেতকায় বৈশ্য ও কৃষ্ণকায় শূদ্রের মধ্যে বিবাদ এবং শেষ পর্যন্ত বৈশ্য কর্তৃক ঐ চর্মখণ্ডের অধিকারলাভও একটি নাটকীয় ঘটনার চরিত্ররূপায়ণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।[৬]

রামায়ণ ও মহাভারতে নাট্য-সাহিত্য

যজুর্বেদে প্রায় প্রত্যেক বৃত্তিজীবীর উল্লেখ আছে, কিন্তু নটের উল্লেখ নাই। অবশ্য 'শৈলূষ'[৭] শব্দটি পাওয়া যায় এবং নট শব্দের সমার্থকরূপেই সেখানে উহা ব্যবহৃত হইয়াছে। সমগ্র মহাভারত সূত এবং তৎশিষ্যসমূহের কথোপকথনের আকারে রচিত এবং মহাভারতে 'নট' শব্দের উল্লেখ আছে; কিন্তু 'অভিনেতা' অর্থেই যে নট শব্দ সেখানে ব্যবহৃত হইয়াছে এরূপ মনে করার কোনও সংগত কারণ নাই। **হরিবংশে** দেখা যায় যে এক শ্রেণীর লোক রামোপাখ্যানকে নাট্যরূপ দান করিয়াছে। হরিবংশ অন্ততঃ দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দের, কাজেই ইহার পূর্বে নাটকের অস্তিত্ব প্রমাণ করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। **রামায়ণ** হইতেও এই বিষয়ে কোনও সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তথাপি একথা সত্য যে, অন্তর্বর্তীকালীন সাহিত্যে রামায়ণের ও মহাভারতের প্রভাব অপরিসীম। ভবভূতি তাঁহার উত্তররামচরিতে ইহা স্বীকার করিয়াছেন এবং ভাসের নাটকচক্র হইতেও এই সত্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। নাটকের অভিনয়ে যে সকল পাত্রপাত্রী অংশ গ্রহণ করেন তাঁহাদের 'কুশীলব' বলা হয়। বিশ্বামিত্র রামের পুত্র কুশ ও লবকে রামায়ণ শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নাম হইতেই 'কুশীলব' শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে।[৮]

Hillebrandt ও Konow উভয়ে প্রথম এই মত প্রকাশ করেন যে ধর্ম বা ধর্মানুষ্ঠানের সহিত নাট্য-সাহিত্যের উৎপত্তি জড়িত এরূপ মনে করা ভুল। ধর্ম-

---

৫। দ্রষ্টব্যঃ কাঠক সংহিতা, ৩৪. ৫; পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, ৫. ৫. ১৪; আপস্তম্বশ্রৌত সূত্র, ২১. ১৯. ৯—১২

৬। "It is impossible without ignoring the obvious nature of the rite, not to see in it a mimic contest to gain the Sun, the power of lights the Aryan, striving against the darkness, the Sudra."—Keith: *Sanskrit Drama*, p. 24

৭। বা. স., ৩০, ৪.; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩. ৪. ২

৮। কেহ কেহ বলেন 'কু (মন্দ) শীল (আচরণ)' হইতে 'কুশীলব' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। Keith মনে করেন যে মূলতঃ ইহা রামপুত্র কুশ ও লবের নাম হইতেই উদ্ভূত কিন্তু হয়ত কখনও যাঁহারা অভিনয় করিতেন তাঁহাদের চারিত্রিক অবনতির প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যই ঐরূপভাবে শব্দটিকে ব্যুৎপন্ন করার প্রয়াস দেখা যায়।

সাহিত্য বা ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে নাটকের বীজ বর্তমান আছে এটুকু তাঁহারা স্বীকার করেন, কিন্তু নাট্যাংশটুকু ধর্মের ক্ষেত্রে আগন্তুক মাত্র, উহার প্রকৃত উৎস নিহিত রহিয়াছে মানুষের জীবনযাত্রার বাস্তব দিকে। Hillebrandt-এর মতে রসবোধ ও আনন্দানুভূতি হইতেছে মানুষের জীবনের আদিম প্রবৃত্তি এবং নাট্য-সাহিত্য সেই প্রবৃত্তি হইতেই উদ্ভূত। বস্তুতঃ প্রথমেই নাট্যশাস্ত্রে নাট্য-সাহিত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে উপাখ্যানের কথা বলা হইয়াছে তাহাও Hillebrandt-এর মতকেই সমর্থন করে। Keith মনে করেন যে সংস্কৃত নাটকের বিদূষক চরিত্রটি বৈদিক সাহিত্যে পূর্বেই ছায়াপাত করিয়াছে এবং ইহাকে একেবারে ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা চলে না। Hillebrandt নিজেও অন্যত্র বলিয়াছেন যে ভারতীয় নাটকের বিদূষকের চরিত্রের অনুরূপ চরিত্র যাহা পাশ্চাত্ত্য নাটকে দেখা যায়, তাহার উৎপত্তিও ধর্মানুষ্ঠানের সহিতই জড়িত। সুতরাং, পরোক্ষভাবে Hillebrandt Keith-এর মতকেই সমর্থন করিয়াছেন। নাটকের উৎপত্তির সহিত যে ধর্ম বা অনুষ্ঠানের কোনও যোগ নাই তাহা প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া Konow যাত্রাগুলিকে তাঁহার স্বপক্ষে প্রমাণ-রূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে মূলতঃ যাত্রাগুলি কৃষ্ণ-উপাসনার সহিতই জড়িত। Pischel-এর মতে পুতুল নাচ (puppet-play) এবং Luder-এর মতে ছায়ানৃত্য (shadow play) (?) সংস্কৃত নাটকের আদিম রূপ।

নাটকের উৎপত্তি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে

Weber-ই প্রথম বলেন যে ভারতবর্ষ গ্রীসের সংস্পর্শে আসার পর হইতেই ভারতের নাট্য-সাহিত্য পরিণতি লাভ করিতে থাকে। পঞ্জাব, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলের নৃপতিবৃন্দ তাঁহাদের সহিত গ্রীক সংস্কৃতি ও গ্রীক সৈন্য লইয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের রাজসভায় গ্রীক নাটকের অভিনয়ও হইত। ইহা হইতেই গ্রীক প্রভাব ধীরে ধীরে ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যে সংক্রামিত হয়। বস্তুতঃ ইহার পূর্বে ভারতীয় সাহিত্যে নাট্য-সাহিত্যের যতটুকু উপাদান লক্ষিত হয় তাহা এত অল্প এবং এমন বিক্ষিপ্ত যে তাহাকে ভিত্তি করিয়া সংস্কৃত নাটক গড়িয়া উঠিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন। Weber যে পরিমাণে সংস্কৃত নাটকের উপর গ্রীক প্রভাব আছে বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, ততটা সমর্থনযোগ্য না হইলেও কিছুটা প্রভাব যে পড়িয়াছিল তাহা অনস্বীকার্য। Weber-এর মতকে অভ্রান্ত ধরিয়া লইয়া বিভিন্ন তথ্যের সাহায্যে Brandes ইহার সারবত্তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। Pischel বলবান যুক্তির সাহায্যে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে Berlin-এ অনুষ্ঠিত Congress of Orientalists-এ Weber-এর এই মত খণ্ডন করেন। ইহার কিছু পরেই Brandes-এর পূর্ব-সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া Windisch আরও অধিক দূর অগ্রসর হন এবং আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর সহিত ভারতবর্ষের যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলেই যে সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছিল তাহা ঘোষণা করেন। Windisch-এর মতের প্রবলতম বিরোধী ছিলেন Levy, কিন্তু তিনিও ভারতের উপর গ্রীক প্রভাবকে একেবারে স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। বস্তুতঃ ভারতবর্ষে গ্রীক আধিপত্যের সময়েই সংস্কৃত নাটকের জন্ম হয় এবং খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর মধ্য ভাগে Menander-এর শাসনকালেই গ্রীক প্রভাব ভারতের উপর পরিপূর্ণভাবে অনুভূত হয়। অশ্বঘোষের রচনাবলী খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে কণিষ্কের রাজত্বকালে রচিত। Levy উক্ত রচনাবলী হইতে দেখাইয়াছেন যে গ্রীক প্রভাব বৌদ্ধ ধর্মের মূল সুরের উপরও অনেকখানি ছাপ রাখিয়া গিয়াছে।

সংস্কৃত নাটকে গ্রীক প্রভাব

ভারতে অবস্থানকালে গ্রীক নৃপতিবৃন্দ যে গ্রীক নাটকের অভিনয় করাইতেন সে সম্বন্ধে তথ্য অল্প হইলেও নির্ভরযোগ্য। আলেকজাণ্ডার নিজেও অত্যন্ত অভিনয়-প্রিয় ছিলেন এবং বিজয়োল্লাসের মাঝে মাঝে অভিনয়ের দ্বারাই চিত্তবিনোদন করিতেন। গ্রীস হইতে অনেক কুশলী শিল্পী আলেকজাণ্ডারের সহিত ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং এক Ekbatana-তেই অন্ততঃপক্ষে তিন হাজার শিল্পী অবস্থান করিতেন বলিয়া জানা যায়। আলেকজাণ্ডার ভারতের যতটুকু অংশ অধিকার করিয়াছিলেন, সেই অধিকৃত অঞ্চলের সর্বত্র গ্রীক নাটক অভিনীত হইত।[৯] আলেকজান্দ্রিয়া নগরী তখন গ্রীক শিক্ষার এক বিশিষ্ট কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল এবং উজ্জয়িনী ও আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যে বাণিজ্যিক যোগসূত্রও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

'যবনী' ও 'যবনিকা'

Weber যখন সংস্কৃত নাটকে গ্রীক প্রভাব সম্বন্ধে সর্বপ্রথম তাঁহার মত প্রকাশ করেন তখন সংস্কৃত নাটকে 'যবনী' ও 'যবনিকা' এই দুইটি শব্দের ব্যবহারকেই তিনি গ্রীক প্রভাবের প্রধান প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। অভিনয়মঞ্চের পশ্চাদ্‌ভাগে, প্রসাধন-কক্ষ ও মঞ্চের মধ্যস্থলে প্রলম্বিত পর্দাই 'যবনিকা'। Keith মনে করেন যে 'যবনিকা' শব্দ যে গ্রীক-সম্বন্ধীয় কোনও বস্তুকেই বুঝাইয়াছে এরূপ মনে করার কোনও সঙ্গত কারণ নাই—ইজিপ্‌ট, সিরিয়া, ব্যাকট্রিয়া প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোনও দ্রব্যকেই উহা বুঝাইতে পারে।[১০] তাছাড়া, গ্রীক নাটকের অভিনয়ে মঞ্চের পশ্চাদ্‌ভাগে এরূপ কোনও পর্দা ব্যবহার করিবার রীতি ছিল বলিয়াও জানা যায় না। সংস্কৃত নাটকে যে সকল স্থলে রাজাকে যবনীপরিবৃত অবস্থায় চিত্রিত করা হইয়াছে তাহা হইতে অনেকে মনে করেন যে ইহাও গ্রীক প্রভাবেরই স্মারক এবং 'যবনী' শব্দ গ্রীক রমণীগণকেই বুঝাইয়াছে। গ্রীক নাটকে কিন্তু কোনও রাজাকে যুবতীজন-পরিবেষ্টিত করা হয় নাই। Keith-এর মতে সংস্কৃত নাটকে ঐরূপ ব্যবহার হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে ভারতের রাজন্যবর্গ গ্রীক সুন্দরীগণের পক্ষপাতী ছিলেন এবং গ্রীক বণিকরাও উচ্চ লাভের আশায় বাণিজ্যের অন্যতম পণ্য হিসাবে অনেক গ্রীক যুবতীকে ভারতীয় রাজন্যবর্গের নিকট উপঢৌকন দিতেও প্রস্তুত থাকিতেন।

গ্রীক ও সংস্কৃত নাটকের সাদৃশ্য

নাটকীয় ঘটনা সংস্থানের দিক দিয়া এই উভয় নাটকের মধ্যে বহুল ও চিত্তাকর্ষক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কোনও অজ্ঞাতকুলশীলা যুবতীর প্রতি কোনও রাজার আসক্তি, মিলনের পথে বহু বাধা, বিচিত্র ও বিবিধ ঘটনার মধ্য দিয়া শেষ পর্যন্ত উক্ত যুবতীর সত্যকার পরিচয় প্রকাশ প্রভৃতি আখ্যানগত সাদৃশ্য তুচ্ছ করিবার নয়। পরিচয় উদ্‌ঘাটনের মাধ্যম হিসাবে উভয় নাটকেই কোনও বিশেষ দ্রব্য বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছে। অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্‌-এ শকুন্তলার অঙ্গুরীয়ক, বিক্রমোর্বশীতে সঙ্গমমণি এবং পুরূরবার পুত্র

৯। We need not doubt......the existence of performance of Greek dramas throughout the Provinces which formed the Empire of Alexander; the scepticism of Professor Levy in this regard is clearly inadmissible.—Keith : *Sanskrit Drama*, p. 59

১০। "The word primarily is an adjective meaning Ionian, the Greeks with whom India first came into contact. But it was not confined to what was Greek in the strict sense of the word; it applies to anything connected with Hellenized Persian Empire, Egypt, Syria, Bactria, and it, therefore, cannot be rigidly limited to what is Greek......Nor in fact was there any curtain in the case of Greek drama, so far as is known, for which it could be borrowed."—Keith : *Sanskrit Drama*, p. 61

আয়ু কর্তৃক ব্যবহৃত শর, রত্নাবলীর কণ্ঠহার, মালতীমাধবের মাল্য, মুদ্রারাক্ষসের মুদ্রা প্রভৃতির ব্যবহার সংস্কৃত নাটকের উপর গ্রীক নাটকের প্রভাবকেই সূচিত করে। মালবিকাগ্নিমিত্রের তস্করাপহৃতা মালবিকা এবং রত্নাবলীতে অর্ণবনির্মজ্জিতা রত্নাবলীর উদ্ধারসাধন আমাদিগকে *Rudens* নাটকের নায়িকার কথাই মনে করাইয়া দেয়।

এই সকল সাদৃশ্যকে উপেক্ষা না করিলে সংস্কৃত নাটকের উপর গ্রীক প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। আমরা বলিতে পারি, সাদৃশ্য সকল সময়েই ঋণের প্রমাণ নহে। এই ধরনের সাদৃশ্যের জন্য ভারতবর্ষকে গ্রীসের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে এরূপ মনে না করিলেও চলে। রাজবাড়িতে ছদ্মবেশে কোনও যুবতীর অবস্থানের চিত্র আমাদের মহাভারতে অজ্ঞাত নহে। দ্রৌপদী বিরাট-রাজমহিষী সুদেষ্ণার অন্তঃপুরে ছদ্মবেশে দাসীবৃত্তি করিয়া কাল কাটাইয়াছেন, বিরাটরাজ পাছে দ্রৌপদীর প্রতি আসক্ত হন সে আশঙ্কাও সুদেষ্ণার ছিল, কীচক দ্রৌপদীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষীও হইয়াছিল। পরিচয় উদ্‌ঘাটনের জন্য যে বিশেষ কোনও চিহ্নের ব্যবহার-পদ্ধতি তাহাও রামায়ণে দেখা গিয়াছে। রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হইবার সময়ে সীতা তাঁহার গাত্রাভরণ মাটিতে ফেলিতে ফেলিতেই গিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার অন্বেষণ করা রামের পক্ষে সহজসাধ্য হয়; রাম কর্তৃক প্রেরিত হনুমান সীতার সম্মুখে রামের ব্যবহৃত অঙ্গুরীয়কই উপস্থাপিত করিয়াছিল নিজের পরিচয়দানের জন্য।

গ্রীক ও সংস্কৃত নাটকের চরিত্রচিত্রণে যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। সংস্কৃত নাটকে যেখানে রাজা পরিণীতা পত্নী ছাড়াও দ্বিতীয়া যুবতীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং মহিষী রাজার সহিত নূতন প্রণয়িনীর মিলনে বাধার সৃষ্টি করিতেছেন, সেখানেও গ্রীক নাটকের সহিত যদি কিছু সাদৃশ্য থাকে তবে তাহাও যে ভারতবর্ষ গ্রীসের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে এরূপ মনে করা যুক্তিযুক্ত নহে। যে যুগে বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল, সে যুগে রাজ-অন্তঃপুরে রাজার পক্ষে অন্য প্রণয়িনীতে আসক্ত হওয়ার ঘটনা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আবার, এইরূপ ঘটনাসংস্থান নাট্যকারকেও চরিত্রসৃষ্টি ও চরিত্ররূপায়ণের সুযোগ দেয়, সুতরাং ইহা নাট্যকারের স্বকীয় উদ্ভাবনও হইতে পারে। সংস্কৃত নাটকের বিট, বিদূষক, শ-কার, সূত্রধর ও তৎসহকারী চরিত্রের অনুরূপ চরিত্র গ্রীক নাটকে পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু এ সাদৃশ্যও গ্রীসের নিকট ভারতের ঋণ প্রতিপন্ন করার পক্ষে যথেষ্ট নহে।[১১]

মোটামুটি এইটুকু বলা যাইতে পারে যে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পর হইতেই ভারতবর্ষ গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে, আলেকজান্দ্রিয়ার সহিত বাণিজ্যিক যোগসূত্রের ফলে এই উভয় সংস্কৃতির মধ্যে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগও স্থাপিত হয়। এরূপ অবস্থায় একের উপর অন্যের প্রভাব পড়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে, বরং স্বাভাবিকই। এরূপ প্রভাব কোনও সভ্যতা ও সংস্কৃতির জীবনীশক্তি ও গতিমত্তারই পরিচায়ক। দান ও গ্রহণ দু-ই জীবনের লক্ষণ; যে প্রভাবিত করে এবং যে প্রভাবিত হয়, তাহারা উভয়েই বাঁচিয়া আছে বুঝিতে হইবে। ইহার জন্য ভারতবর্ষ গ্রীসের নিকট কিছু ঋণ করিয়াছে এরূপ বলিলে ভূতার্থব্যাহৃতি হয় না। ভারতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য হইল অপরের জিনিস গ্রহণ করিয়া তাহাকে নিজের মৌলিকত্বের দ্বারা নূতন

১১। "The Vita is, indeed, more closely akin to the parasite than to any other character of the Greek or Roman comedy, but the parasite is lacking in the refinement and culture of his Indian counterpart, who is clearly drawn from life, the witty and accomplished companion who is paid to amuse his patron, but whose dependence does not make him the object of insolence and bad jokes."—Keith : *Sanskrit Drama*, p. 65.

রূপ দিয়া একান্ত নিজস্ব করিয়া লওয়া। ইহাকে ঋণ বলিলে তাহা ইহার অপব্যাখ্যা মাত্র। যদি গ্রীক প্রভাব কিছু পড়িয়াই থাকে—এবং পড়াই স্বাভাবিক—তবে ভারতের স্বভাবধর্ম তাহাকে কোনও অংশেই গ্রীক থাকিতে দেয় নাই, তাহাকে একান্তভাবে ভারতীয় করিয়াই তুলিয়াছে।

দৃশ্যকাব্য ঃ পরিচয়

কালিদাসোত্তর যুগে শ্রব্য-কাব্যের ক্ষেত্রে আমাদিগকে যে দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, দৃশ্যকাব্যের ক্ষেত্রেও সেই দুর্ভাগ্যই বর্তমান। তবে, কাব্যের ক্ষেত্রে অমরু ও ভর্তৃহরি ছাড়া কেহই যেমন মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেন নাই, নাটকের ক্ষেত্রে তাহা নয়। উল্লেখযোগ্য নাটকের সংখ্যা আশানুরূপ না হইলেও বিষয়-বৈচিত্র্যে, রচনাশৈলীর মৌলিকতায়, চরিত্র-রূপায়ণে ও চরিত্র-নির্বাচনে এই সময়ে প্রত্যেকখানি নাটক গতানুগতিকতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে একটি নিজস্বতার ছাপ রাখিয়া গিয়াছে।

কালিদাসের পূর্বে নাট্যকার হিসাবে ভাসের ও তাঁহার নাটকচক্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। কালিদাস-পূর্ব যুগে অশ্বঘোষের **শারিপুত্তপ্রকরণ**[১২]ও উল্লেখযোগ্য। বিনয়পিটকে উল্লিখিত শারিপুত্ত ও তাঁহার সুহৃৎ মৌদ্‌গল্যায়নের কাহিনী অবলম্বনে ইহা রচিত। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে Luder এই নাটকখানি আবিষ্কার করেন। যে পুঁথিতে এই নাটকখানি পাওয়া যায় তাহাতে আরও একখানি নাটক ছিল। ছিন্নাবস্থার জন্য তাহার নাম জানা যায় না। এইটুকু মাত্র বলা যাইতে পারে যে কীর্তি, ধৃতি ও বুদ্ধিকে নাটকীয় চরিত্ররূপে গ্রহণ করিয়া উহা রচিত হইয়াছিল। দুইখানি নাটকই প্রথম খৃষ্টাব্দে রচিত।

শূদ্রক[১৩]-এর রচিত **মৃচ্ছকটিক** হইতে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যায়। তিনি ব্রাহ্মণ এবং অশ্মক দেশের অধিবাসী ছিলেন। বাল্যকালে স্বাতী নামক রাজকুমারের সহিত তিনি লালিত-পালিত হইয়াছিলেন এবং খেলার সময়ে স্বাতীর সহিত কোনও কারণে তাঁহার কলহ হয়। সেই কলহ হইতে যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় পরিণত বয়সেও তাহা দূর হয় নাই। ভানুদত্ত নামে শূদ্রকের এক বন্ধু ছিলেন। এক সময়ে সংঘালিকা নামে এক বৌদ্ধ ভিক্ষু তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত শূদ্রকই তাঁহাকে হত্যা করিয়া পলায়ন করেন। পরবর্তীকালে শূদ্রক উজ্জয়িনী অধিকার করিয়া তাহার রাজা হন, কিন্তু বাল্যকালের কথা স্মরণ করিয়া রাজা স্বাতীর জীবননাশ করেন নাই।

কথাসরিৎসাগর-এ বলা হইয়াছে যে শূদ্রক শোভাবতীর রাজা ছিলেন এবং এক ব্রাহ্মণ নিজের জীবনের বিনিময়ে তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। বেতালপঞ্চবিংশতির মতে তিনি ছিলেন বর্ধমানের রাজা, কাদম্বরীর মতে বিদিশার। তাঁহাকে চকোরের রাজকুমার চন্দ্রকেতুর শত্রু বলা হইয়াছে। রাজশেখরের হর্ষচরিতে কাব্যমীমাংসায় সাতবাহন-সাহসাঙ্কের সহিত তাঁহার নামের উল্লেখ আছে। রাজতরঙ্গিণী তাঁহাকে রাজা বিক্রমাদিত্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী রাজা বলিয়াছে। বামন (অষ্টম খৃষ্টাব্দ) শূদ্রকের একখানি রচনার উল্লেখ করিয়াছেন। বীরচরিত, শূদ্রকচরিত, শূদ্রককথা প্রভৃতি গ্রন্থ শূদ্রক সম্বন্ধে রচিত।

স্কন্দপুরাণে শূদ্রককে অন্ধ্রবংশীয় নরপতি বলা হইয়াছে। Pargiter-এর মতে অন্ধ্রবংশীয় নরপতিগণের রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ২৩৫-২৩০ অব্দ। পুরাণে অন্ধ্রবংশীয়

১২। নামান্তর **শারদ্বতীপ্রকরণ**
১৩। নামান্তর **ইন্দ্রাণীগুপ্ত**

নরপতিগণের নামের তালিকায় সপ্তবিংশতিতম নরপতি 'স্বাতী' না হইলেও 'শিবস্বাতী'। হর্ষচরিত, কাদম্বরী, রাজতরঙ্গিণীতে শূদ্রক সম্বন্ধে বিভিন্ন মত হইতে এইটুকু মনে করা চলিতে পারে যে ঐ গ্রন্থের সময়েই শূদ্রক সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানা ছিল না। ইহা হইতে তাঁহার প্রাচীনত্বই সূচিত হয়।[১৪] Sten Konow মনে করেন আভীররাজ শিবদত্তই শূদ্রক (২৫০ খৃষ্টাব্দ)। মৃচ্ছকটিকের নবম অংশে তৎকালে প্রচলিত যে বিচারপদ্ধতির চিত্র পাওয়া যায়, ষষ্ঠ ও সপ্তম খৃষ্টাব্দের স্মৃতি গ্রন্থসমূহে সেইরূপ বিচারপদ্ধতি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা হইতে Jolly শূদ্রককে ষষ্ঠ বা সপ্তম খৃষ্টাব্দের বলিয়া মনে করেন। মৃচ্ছকটিকের চতুর্থ অঙ্কে জ্যোতিষসম্বন্ধীয় যে তথ্য পাওয়া যায় তাহা হইতে Jacobi সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে উহা ৪র্থ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রচিত হইতে পারে না। শ-কার, বিট, গণিকা বসন্তসেনার যে সামাজিক মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে তাহা বাৎস্যায়নের কামসূত্রের যুগের কথাই মনে করাইয়া দেয়। একথা মনে করিলে অন্যায় হইবে না যে শূদ্রক খৃঃ পূঃ ২য় বা ১ম শতকের কোনও সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বড় জোর, তাঁহাকে খৃষ্টাব্দের প্রথম শতকে টানিয়া আনা যাইতে পারে, তাহার পর কিছুতেই নহে।[১৫]

মৃচ্ছকটিক দশটি অঙ্কে রচিত নাটক—ব্রাহ্মণ চারুদত্ত ও গণিকা বসন্তসেনার প্রণয়-কাহিনী। বসন্তসেনা চারুদত্তকে ভালবাসিতেন। রাজা পালকের শ্যালক শ-কার বসন্তসেনার প্রণয়প্রার্থী, কিন্তু বসন্তসেনা তাঁহাকে আমল দেন না। শ-কার একদিন বসন্তসেনাকে আঘাত করে এবং বসন্তসেনা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া যান। শ-কার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য চারুদত্তকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করে। বিচারে চারুদত্তের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়। ইতিমধ্যে বসন্তসেনা সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইয়া চারুদত্তকে রক্ষা করিবার জন্য বিচারকক্ষে প্রবেশ করেন। এদিকে রাজ্যে এক বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। আর্যক উজ্জয়িনী অধিকার করিয়া পালককে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং নিজেকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। এই আর্যককে এক সময়ে চারুদত্ত কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। চারুদত্তের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আর্যক চারুদত্তকে নিজের প্রধান কর্মচারীর পদে নিযুক্ত করেন।[১৬]

১৪। "Puranas give a list of 32 kings of whom the last that bore a name ending in Svati, was Sivasvati, the 27th king of the line. Sivasvati was the earliest bearing the appellation after Hala, who was first in the line. Hala, alias Satavahana, inaugurated the Katantra School of grammar. ..If Satavahana Hala, the 18th in the Andhra line of kings, lived according to Pargiter about the beginning of the 1st century A. D., it is likely that Sudraka who thought it fit to ridicule Katantra grammar was a contemporary of king Svati of Andhra dynasty; that King was Sivasvati who ruled about 81 A. D. Sivasvati ruled for 28 years. On this consideration Sudraka may be assigned to the end of the 1st century A. D." M. Krishnamachariar: *Classical Sanskrit Literature*, pp. 574-5

১৫। Pischel শূদ্রককে দণ্ডীর সমসাময়িক বলিয়াছেন এবং দণ্ডীকেই মৃচ্ছকটিকের প্রকৃত রচয়িতা বলিয়াছেন।—*Introduction to Sringaratilaka.* Macdonell, Pischel-এর মতকে সমর্থন করিয়া ৬ষ্ঠ শতাব্দীকেই শূদ্রকের কাল বলিয়াছেন।—*Sanskrit Literature*, p.—316. K. C. Mehandal-এর মতেও শূদ্রক হইলেন ৬ষ্ঠ শতাব্দীর।—*Date of Sudraka's Mrcchakatika*

১৬। Jayaswal, Bhandarkar, Gune মৃচ্ছকটিকের ঐতিহাসিকত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে উজ্জয়িনীরাজ প্রদ্যোতের দুই পুত্র গোপালক ও পালক

একথা অনস্বীকার্য যে শূদ্রক মৃচ্ছকটিকে নাটক রচনার গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করিয়া এক নূতন ধারার প্রবর্তন করেন। তাঁহার পূর্বে নাটকীয় চরিত্রে রাজ-রাজড়ার বা বিত্তশালী পরিবারের কাহিনীই স্থান পাইত। সমাজের সর্বস্তরের কথা বলিয়া, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্য হইতে বিভিন্ন ধরনের চরিত্র নির্বাচন করিয়া নাটকীয় চরিত্রে একটা ব্যাপকতার সৃষ্টি করিয়া শূদ্রক নিশ্চয়ই সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। ভাস-কালিদাস-ভবভূতির নাটকে আমরা যেন নিজেদের দেখিতে পাই না, কল্পনা ও আদর্শের রঙীন পরিবেশে সেখানকার আবহাওয়া ভাল লাগিলেও তাহা আমাদের ঘরের কথা নহে। শূদ্রকই উপরতলা হইতে নীচের তলায় নাটকীয় চরিত্রগণকে নামাইয়া আনিলেন। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেম বা রাম-সীতার প্রেমকে আমরা শ্রদ্ধা করি, কিন্তু চারুদত্ত ও বসন্তসেনার প্রেমে আমরা জীবনের আরও একটি দিকের সন্ধান পাই। সমাজ যে শুধু রাজা ও রাজকুমারকে লইয়াই নহে, কল্পনা ও আদর্শ ছাড়াও জীবনের যে একটি বাস্তব দিক আছে, বহুমুখীনতা ও বৈচিত্র্যই যে মানব-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই পরম সত্যের প্রতি শূদ্রকই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।[১৭]

১৯২২ খৃষ্টাব্দে চারিখানি ভাণ (একাঙ্ক নাটিকা) **চতুর্ভাণী** নাম দিয়া প্রকাশিত হয়। ইহাদের নাম—(ক) **উভয়াভিসারিকা** (খ) **পদ্মপ্রাভৃতক** (গ) **ধূর্ত-বিট-সংবাদ** ও (ঘ) **পাদ-তাড়িতক** এবং ইহারা যথাক্রমে **বররুচি, শূদ্রক, ঈশ্বরদত্ত** ও **শ্যামিলকের** রচিত। একটি প্রচলিত শ্লোকে এই চারিটিকে কালিদাসেরও পূর্ববর্তী রচনা বলা হইয়াছে।[১৮] Bhandarkar-এর মতে ১৮৮-১৯০ খৃঃ ঈশ্বরদত্তের কাল। W. Thomas-এর মতে উভয়াভিসারিকা অন্ততঃ কনৌজাধিপতি হর্ষবর্ধনের সময়ের রচনা।[১৯] কেহ কেহ মনে করেন, এইগুলি ১০ম খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে রচিত হইয়াছিল।[২০] বিষয়-বৈচিত্র্য, সরলতা, হাস্যকর ও ব্যঙ্গের প্রাচুর্যে ভাণগুলির প্রতিটি

এবং কন্যা বাসবদত্তা। গোপালক স্বেচ্ছায় রাজ্যত্যাগ করিয়াছিলেন। সেকারণ পালকই অভিষিক্ত হন। গোপালকের এক পুত্র ছিল। আর্যকই সেই পুত্র, যিনি পরে সম্ভবতঃ উদয়নের সাহায্যে রাজশক্তি অধিকার করেন।

১৭। তুলঃ The Mrcchakatika is in many respects the most human of all the Sanskrit plays. There is something strikingly Shakespearian in the skilful drawing of characters, the energy and life of the large number of personages in the play, and in the directness and clearness of the plot itself....The chief value of the Mrcchakatika, aside from its interest as a drama, lies in the graphic picture it presents of a very interesting phase of everyday life in ancient India. The elaborate description of the heroine's palace in the fourth act gives us a glimps of what was considered luxury in those days. The name 'Clay Cart' is taken from an episode in the sixth act, which leads to the finding of heroine's jewels in the terra cotta cart of the hero's little son and to their use as circumstantial evidence in a trial."—Wilson.

১৮। তুলঃ বররুচিরীশ্বরদত্তঃ শ্যামিলকঃ শূদ্রকশ্চ চত্বারঃ।
এতে ভাণান্ বভণুঃ কা শক্তিঃ কালিদাসস্য॥

১৯। *Centenary Supplement to JRAS*, সুকুমার সেন উভয়াভিসারিকার ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন—*Cal, Review*, 1926

২০। "A comparative study of these Bhanas with the latter specimens, in the light of the prescriptions of the dramaturgists, would also show a method and manner, which would justify the general inference that these Bhanas, as a group, should be assigned to a period later than that of Bharata's Natya Sastra, but much

চরিত্র স্বতন্ত্র ও প্রাণবন্ত। কোলাহলমুখরিত রাজধানীর জনগণের সর্বস্তরের চরিত্রকে সন্নিবেশিত করিয়া একটি ব্যাপক সমাজচিত্র এইগুলিতে অঙ্কিত হইয়াছে। পদ্ম-প্রাভৃতকের রচয়িতা শূদ্রকেরই যে মৃচ্ছকটিক রচনা করা সম্ভব ইহা উভয় গ্রন্থের সাদৃশ্য হইতেই প্রমাণিত হয়।

প্রভাকরবর্ধন ও যশোবতীর পুত্র **হর্ষবর্ধন** শীলাদিত্য ৬০৬-৬৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থানীশ্বর ও কনৌজের রাজা ছিলেন। **রত্নাবলী, নাগানন্দ ও প্রিয়দর্শিকা** নামক তিনখানি নাটকের তিনিই রচয়িতা। হর্ষই ইহাদের রচয়িতা কি না এ বিষয়ে এক সময়ে মতভেদ ছিল এবং বিভিন্ন পক্ষ হইতে বিভিন্ন যুক্তিতর্কের অবতারণাও করা হইয়াছিল। মম্মটের কাব্যপ্রকাশের একটি উক্তি হইতে[২১] অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন যে বাণ বা ধাবক নামে কোনও নাট্যকার এইগুলি রচনা করিয়া অর্থের বিনিময়ে হর্ষবর্ধনের নামে প্রচলিত করেন। পরবর্তীকালে বহু প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া গিয়াছে যাহা নিঃসংশয়ে হর্ষকেই এই তিনখানির রচয়িতা বলিয়া প্রমাণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

রাজা হর্ষবর্ধনের কবিত্বশক্তির খ্যাতিও ছিল। বাণ হর্ষচরিতে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। I-tsing-এর বিবরণ হইতে জানা যায় যে হর্ষবর্ধন বোধিসত্ত্ব জীমূত-বাহনের কাহিনীকে কবিতায় রূপ দিয়াছিলেন। সোড্‌ঢল তাঁহার উদয়সুন্দরী কাব্যে হর্ষবর্ধনকে 'কবীন্দ্র' বলিয়াছেন।[২২] দামোদরগুপ্ত (৯ম খৃঃ) তাঁহার কুট্টনিমতে রত্নাবলীকে হর্ষেরই রচিত বলিয়াছেন।[২৩] I-tsing (৭ম খৃঃ) নাগানন্দকে হর্ষের রচিত বলিয়াছেন। যাঁহার রচনাশক্তি বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক এত প্রশংসিত হইয়াছে তিনি অর্থের বিনিময়ে অপরের লিখিত নাটক নিজের নামে চালাইয়াছেন ইহা মনে করা অযৌক্তিক ও অশোভন। তিনখানি নাটকই যে একই ব্যক্তির রচিত সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। বিষয়বস্তু, ঘটনা ও পরিবেশ, ভাব ও ভাষার সাদৃশ্য, নাট্যকারের প্রশংসাসূচক শ্লোক ইত্যাদি প্রমাণিত করিয়াছে যে তিনখানি নাটকই একই নাট্যকারের রচনা।[২৪]

রাজা উদয়নের সহিত রানী বাসবদত্তার পরিচারিকা সাগরিকার প্রণয়-কাহিনী অবলম্বনে চার অঙ্কে রচিত নাটক **রত্নাবলী**। সিংহলরাজকুমারী রত্নাবলী জাহাজ-ডুবির ফলে উদয়নের রাজসভায় আনীতা হন এবং সাগরিকা নাম গ্রহণ করিয়া সেখানে অবস্থান করেন। উদয়ন সাগরিকার প্রতি আসক্ত হন। বহু বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া শেষ পর্যন্ত সাগরিকার আসল পরিচয় প্রকাশ পায় এবং উদয়নের সহিত তাঁহার মিলন হয়।[২৫]

earlier than that of the standard work of Dhananjaya (end of the 10th century)."—Das Gupta & De, p. 250

পদ্মপ্রাভৃতকের একটি শ্লোক হেমচন্দ্র উদ্ধৃত করিয়াছেনঃ

মূলাদপি মধ্যাদপি বিটপাদপ্যঙ্কুরাদশোকস্য
পিশুনস্থামিব রহস্যং সমন্ততো নিষ্কসতি পুষ্পম ॥—কাব্যানুশাসন

ধূর্ত-বিট-সংবাদের রচয়িতা ঈশ্বরদত্তকে অনেকে আভীর-রাজ শিবদত্তের পুত্র ঈশ্বরসেন (২৩৬-৩৯ খৃঃ) বলিয়া মনে করিয়াছেন, কিন্তু ইহা প্রমাণিত হয় নাই।

২১। 'শ্রীহর্ষাদের্বাণা (ধাবকা) দীনামিব ধনম্'

২২। উদয়সুন্দরী, ১৫০

২৩। 'উদয়নগান্তরিতমিয়ং প্রাচী সূচয়তি দিঙ্ নিশানাথম্' এই অংশটুকু দামোদরগুপ্ত রত্নাবলী হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

২৪। Jackson এই তিনখানি নাটকের সাদৃশ্য-প্রতিবাদক অংশসমূহের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।

২৫। দ্রষ্টব্যঃ "The plot is unconnected with mythology, but is based on a historical or epic traditions, which recurs in a somewhat

প্রিয়দর্শিকাও চারি অঙ্কে রচিত নাটক। অংগরাজ দৃঢ়বর্মা রাজা উদয়নের সহিত কন্যা প্রিয়দর্শিকার বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়া কন্যাকে উদয়নের নিকট লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইতোমধ্যে কলিংগরাজ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া বন্দী করিলেন; ঘটনাচক্রে উদয়নের সেনাপতির সহায়তায় প্রিয়দর্শিকা উদয়নের অন্তঃপুরে আসেন এবং আরণ্যকা নাম লইয়া সেখানে বাস করিতে থাকেন। উদয়ন ও আরণ্যকার প্রণয় জন্মে। রানী বাসবদত্তা ইহা বুঝিতে পারিয়া আরণ্যকাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। শীঘ্রই প্রকাশ পায় যে আরণ্যকা বাসবদত্তারই মাতুল কন্যা—অংগরাজদুহিতা। শেষে উদয়ন ও আরণ্যকার মিলন হয়। রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকার মধ্যে ঘটনাবিন্যাসে, নাটকীয় আখ্যান-ভাগের পরিণতি সম্পাদনে ও চরিত্র-রূপায়ণে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।[২৬]

নাগানন্দ একখানি পঞ্চাংক নাটক। কথাসরিৎসাগরের দ্বাদশ তরংগে বিদ্যাধররাজ জীমূতবাহনের যে অপূর্ব আত্মত্যাগের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, তাহাই ইহার বিষয়বস্তু। বিশ্বপ্রেমে উদ্বুদ্ধ জীমূতবাহন রাজ্য ত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী পিতামাতার সেবা করিবার জন্য বনে আসেন। মলয়পর্বতে গন্ধর্বরাজ-দুহিতার সহিত তাহার প্রণয় জন্মে। একদিন তিনি শুনিতে পান যে নাগরাজ গরুড়ের সহিত সন্ধি করিয়া সন্ধির শর্ত অনুসারে প্রতিদিন একটি করিয়া সর্পকে গরুড়ের আহারের জন্য বধ্যশিলায় প্রেরণ করিতেছেন। জীমূতবাহন স্থির করিলেন সেইদিন যে সর্পটি আসিবে, তিনি তাহার প্রাণ রক্ষা করিবেন। হইলও তাহাই। গরুড় সর্পভ্রমে জীমূতবাহনকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। পরে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইলে জীমূতবাহন অহিংসা সম্বন্ধে গরুড়কে উপদেশ দেন। গৌরী আবির্ভূতা হইয়া জীমূতবাহনকে নূতন দেহ দান করিলেন।

রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা হইতে নাগানন্দ স্বতন্ত্র। ইহা পুরাপুরি না হইলেও অনেকটা বৌদ্ধ রচনার ছাপ বহন করিতেছে। নান্দীশ্লোকে বুদ্ধের উল্লেখ করা হইয়াছে অথচ শেষ ভাগে জীমূতবাহনকে নবদেহ দান করিবার জন্য গৌরীর অবতারণা করা হইয়াছে।[২৭] নাটকখানিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—প্রথম তিন অংক ও শেষ দুই অংক। বস্তুতঃ, প্রথম তিন অংকেই যদি নাটকটির শেষ হইয়া যাইত তবে কোন-

....

different form in Somadeva's Kathasaritsagara. As concerned with the second marriage of the king, it forms a sequel to the popular love-story of Vasavadatta. It is impossible to say whether the poet modified the main outlines of traditional story, but the character of a magician who conjures up a vision of the gods and a conflagration as his invention, as well as the incidents which are entirely of a domestic nature."—Macdonell: *Sanskrit Literature*, p. 362

২৬। "The only original feature of the *Priyadarsika* is the effective introduction of a play within a play (Garbhanika) as an integral part of the action, and its interruption (as in *Hamlet*) brought on by its vivid reality. But barring this interesting episode, the *Priyadarsika*, by the side of the *Ratnavali* which is undoubtedly the better play in every respect, is almost superfluous for having hardly any striking incident, character or idea which does not possess its counterpart in its twin-play."—Das Gupta & De, p. 258

২৭। বস্তুতঃ বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি বিশ্বপ্রেম প্রচার করার জন্যই ইহা রচিত হইয়াছিল এরূপ মনে করার কোনও কারণ নাই। গরুড় হিন্দু দেবতা, বিশ্বপ্রেম বৌদ্ধ ধর্মের বহু পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছে। হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুদর্শনে বিশ্বপ্রেম বা অহিংসা নূতন নহে।

রূপ অসঙ্গতি বোধ হইত না। প্রথম তিন অঙ্কের জীমূতবাহন ও শেষ দুই অঙ্কের জীমূতবাহনের মধ্যে কোনও যোগাযোগ আছে বলিয়া মনে হয় না।

হর্ষবর্ধন শক্তিশালী নাট্যকার। তাঁহার তিনখানি নাটকের মধ্যে রত্নাবলীই সর্বাধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে। রাজ-অন্তঃপুরের সেই পুরাতন প্রণয়-কাহিনী লইয়াই রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা রচিত, তথাপি ইহারা চিত্তাকর্ষক। রত্নাবলী পাঠ করিয়া প্রিয়দর্শিকা পাঠ করিলেও পাঠক-মন ক্লান্তি বোধ করে না। কালিদাসের নাটকেও রাজ-অন্তঃপুরের গোপন প্রণয় স্থান পাইয়াছে সত্য, কিন্তু উহাকেই মুখ্য নাটকীয় বিষয়ের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া নাট্যধারায় একটি স্বাতন্ত্র্যের ছাপ হর্ষই রাখিয়া গেলেন।[২৮]

মুদ্রারাক্ষস-এর রচয়িতা **বিশাখাদত্ত** নিজের সম্বন্ধে সামান্যই বলিয়া গিয়াছেন এবং ঐ সামান্যই সব। তিনি মহারাজ পৃথুর[২৯] পুত্র এবং সামন্ত বটেশ্বরদত্তের পৌত্র। বিশাখাদত্তের কালনির্ণয়ে তাঁহার নাটকের ভরতবাক্যকে[৩০] কেন্দ্র করিয়া বহু আলোচনা হইয়াছে। ভরতবাক্যে রাজা চন্দ্রগুপ্তের উল্লেখ আছে। অনেকগুলি পুঁথিতে অবন্তী-বর্মা, রন্তিবর্মা ও দন্তিবর্মা নামও পাওয়া যায়।[৩১] অনেকের মতে উল্লিখিত চন্দ্রগুপ্ত হইলেন কালিদাসের নামের সহিত জড়িত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৭৫-৪১৩ খৃঃ অঃ)। একজন পল্লব-নরপতি দন্তিবর্মার নাম জানা যায় (৭৭৯-৮৩০ খৃঃ অঃ)।[৩২] দুইজন অবন্তীবর্মার কথাও জানা যায়। একজন মৌখরীরাজ অবন্তীবর্মা (৭ম খৃঃ অঃ) যাঁহার পুত্র গ্রহবর্মার সহিত হর্ষের ভগিনী রাজ্যশ্রীর বিবাহ হইয়াছিল; আর একজন কাশ্মীর-রাজ অবন্তীবর্মা যিনি ৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ভরতবাক্য হইতে জানা যায় যে সেই সময়ে ম্লেচ্ছগণ রাজ্যে উপদ্রবের সৃষ্টি করিয়াছিল। Wilson মনে করেন 'ম্লেচ্ছ' শব্দ পট্টন-রাজগণকে বুঝাইয়াছে এবং নাটকে জৈন জীবসিদ্ধির প্রতি যে 'ক্ষপণক' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহাও ভারত হইতে বৌদ্ধ ধর্মের তিরোধানের পরবর্তীকালের প্রতিই ইঙ্গিত করে। ইহা হইতে তিনি ১১শ বা ১২শ খৃষ্টাব্দকেই মুদ্রারাক্ষস নাটকের রচনাকাল বলিয়া মনে করেন। Telang-এর মতে ৮ম খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে যে সকল মুসলমান আক্রমণ হইয়াছিল তাহাকেই ম্লেচ্ছগণের উদ্বেগ বলা হইয়াছে। 'ক্ষপণক' শব্দ যে বৌদ্ধগণকেই বুঝাইয়াছে এরূপও তিনি মনে করেন না। ভরতবাক্যে 'পার্থিবোঽবন্তীবর্মা' পাঠ গ্রহণ করিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে ৭ম খৃষ্টাব্দে মৌখরীরাজ অবন্তীবর্মার সময়ে নাটকটি রচিত।[৩৩]

২৮। "If Kalidasa supplied the pattern, Harsa has undoubtedly improved upon it in his own way, and succeeded in establishing the comedy of court-intrigue as a distinct type in Sanskrit drama"—Das Gupta & De, p. 261.

২৯। নামান্তর **ভাস্করদত্ত**; Wilson-এর মতে ইনিই আজমীরের চৌহান সর্দার পৃথু রায়।

৩০। ভরতবাক্য এই ঃ

বারাহীমাত্মযোনেস্তনুমবনবিধাবাস্থিতস্যানুরূপাম্।
যস্য প্রাগ্ দন্তকোটিপ্রলয়পরিগতা শিশ্রিয়ে ভূতধাত্রী॥
ম্লেচ্ছৈরুদ্বেজ্যমানা ভুজযুগমধুনা সংশ্রিতা রাজমূর্তেঃ
স শ্রীমদ্বন্ধুভৃত্যশ্চিরমবতু মহীং পার্থিবশ্চন্দ্রগুপ্ত॥

৩১। পাঠান্তর 'পার্থিবোঽবন্তিবর্মা', 'পার্থিবো রন্তিবর্মা' বা 'পার্থিবো দন্তিবর্মা'।

৩২। দ্রষ্টব্য ঃ C. J. Dubrauil: *Ancient History of the Deccan*, p. 74; Fleet: *Carnatic Dynasties*, p. 32

৩৩। Macdonell, (*Sanskrit Literature*, p. 365) Telang-কে সমর্থন করিয়াছেন। Smith (*History of India*)-এর মতে ইহার রচনাকাল ১০০০ খৃষ্টাব্দ।

নাটকে বর্ণিত ঘটনার স্থান হইল কুসুমপুর বা পাটলিপুত্র। নাটকে প্রদত্ত ভৌগোলিক তথ্য পাটলিপুত্রের সমৃদ্ধির যুগই সূচিত করে। ফা-হিয়ান তাঁহার বিবরণে পাটলিপুত্রকে মগধের রাজধানী বলিয়াছেন, কিন্তু পরবর্তীকালে হিউয়েন সাঙ পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষই দেখিয়াছিলেন। গ্রন্থের শেষ অঙ্কে বৌদ্ধধর্ম ও ধর্মীয় নীতির সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইয়াছে তাহা হইতে তৎকালে বৌদ্ধ ধর্ম যে চরম উন্নতিলাভ করিয়াছিল তাহা বোঝা যায়। এই সব দিক হইতে ৫ম খৃষ্টাব্দকে ইহার রচনাকাল বলা যাইতে পারে।[৩৪]

মুদ্রারাক্ষস সপ্তাঙ্ক নাটক। নন্দবংশের বিশ্বাসভাজন মন্ত্রী রাক্ষস। তাঁহার উপর মৌর্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্যের অসীম আস্থা। চাণক্য চাহেন রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের প্রয়োজনে লাগাইতে। তাহার জন্য চাণক্যের চেষ্টার ত্রুটি নাই। কূটনীতি, ছল, কৌশল, সাম-দান-ভেদ-দণ্ড প্রভৃতি যত উপায় চাণক্যের জানা ছিল চাণক্য তাহা প্রয়োগ করিলেন। রাক্ষসও বুদ্ধি ও চাতুর্যে কম নহেন। চাণক্যের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিবার জন্য তাঁহারও পাল্টা চাতুরী চলিতে লাগিল। দুই রাজনীতিক ধুরন্ধরের সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত চাণক্যই জয়লাভ করিলেন।[৩৫]

বিশাখদত্ত নাটক রচনার ক্ষেত্রে এক নূতন ধারার প্রবর্তন করিয়াছেন। গতানুগতিক প্রণয়কাহিনীকে উপেক্ষা করিয়া মুদ্রারাক্ষস পাঠকরুচির দরবারে যে উপহারের ডালি ধরিয়া দিল তাহা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। প্রণয়ের নামগন্ধ না রাখিয়া স্ত্রীচরিত্র-বর্জিত[৩৬] করিয়া, নায়িকাবিহীন নাটকও যে রচিত হইতে পারে তাহা পাঠকগণ সেই সর্বপ্রথম দেখিলেন। নিঃসংশয়ে ইহা নাট্যকারেরও দুঃসাহস। রাজনীতির জটিলতাকে বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করিয়া মুদ্রারাক্ষস রচিত হইয়াছে এবং যে ঘটনার সমাবেশে এই জটিলতার সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাই পাঠকচিত্তের সর্বাপেক্ষা বড় আকর্ষণ। একটি চরিত্রকে আর একটি চরিত্রের প্রতিযোগিরূপে চিত্রিত করিয়া বিশাখদত্ত উভয়েরই স্বাতন্ত্র্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এবং এই বিষয়ে অতি অপ্রধান চরিত্রগুলিও তাঁহার মনোযোগ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। চাণক্যের প্রতিযোগী রাক্ষস, চন্দ্রগুপ্তের প্রতিযোগী মলয়কেতু। আবার অন্যদিকে চাণক্যের গুপ্তচর ভাগুরায়ণ ও সিদ্ধার্থক এবং রাক্ষসের গুপ্তচর বিরাধগুপ্ত ও শকটদাস। ভালমন্দের মিশ্রণে সৃষ্ট চরিত্রগুলি জীবন্ত।[৩৭]

৩৪। দ্রষ্টব্য: M. Krishnamachariar: *History of Classical Sanskrit Literature*, p. 606;

"In view of these difficulties, the problem must still be regarded as unsolved; but there is nothing to prevent Visakhadatta from belonging to the older group of dramatists who succeeded Kalidasa, either as a younger contemporary or at some period anterior to the 9th century A.D."—Das Gupta & De, p. 264

৩৫। তুলঃ রাক্ষসেন সমং মৈত্রী রাজ্যে চারোপিতা বয়ম্।
নন্দাশ্চোন্মূলিতাঃ সর্বে কিং কর্তব্যমতঃ প্রিয়ম্ ॥—মুদ্রারাক্ষস

Speyer তাঁহার *Studies about the Kathasaritsagar*-এ (পৃঃ ৫৪) বলিয়াছেন যে গুণাঢ্যের বৃহৎকথা হইতে মুদ্রারাক্ষসের আখ্যানভাগ গ্রহণ করা হইয়াছে।

৩৬। মুদ্রারাক্ষসে একটি মাত্র স্ত্রী-চরিত্র আছে এবং সেখানেও প্রণয়ের বিন্দুমাত্র সংশ্রব নাই।

৩৭। "We do not indeed find in him the poetic imagination and artistic vigilance of Kalidasa, the dainty and delicate manner of Harsa, the humour, pathos and kindliness of Sudraka, the fire and energy of Bhatta Narayana or the earnest and fearful tenderness of Bhavabhuti; but there can be no doubt that his style and diction suit his subject, and, in all essentials, he is no meaner artist. ...The

বল্লভদেব তাঁহার সুভাষিতাবলীতে বিশাখদত্তের রচিত বলিয়া দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। মুদ্রারাক্ষসে ঐ শ্লোক দুইটি পাওয়া যায় না।

শাণ্ডিল্যগোত্রী **ভট্টনারায়ণ**[৩৮] ছয় অঙ্কে **বেণীসংহার** নাটক রচনা করেন। বঙ্গাধিপ আদিশূরের[৩৯] আমন্ত্রণে কনৌজ হইতে যে কয়জন ব্রাহ্মণ বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন, ভট্টনারায়ণ তাঁহাদের একজন, এইরূপ কিংবদন্তী আছে। দণ্ডী তাঁহার অবন্তীসুন্দরী-কথায় নারায়ণ নামে একজন লেখকের তিনটি রচনার কথা বলিয়াছেন।[৪০] বামন কাব্যালঙ্কারে[৪১] এবং আনন্দবর্ধন ধ্বন্যালোকে[৪২] বেণীসংহারের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; সুতরাং ভট্টনারায়ণ অবশ্যই ৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী হইবেন। M. Krishnamachariar বলেন[৪৩] যে ধর্মকীর্তি রচিত রূপাবতার নামক একখানি গ্রন্থের টীকায় বলা হইয়াছে যে বাণভট্টের অনুরোধে ভট্টনারায়ণ এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহার নিকট বৌদ্ধ দর্শন শিক্ষা করিয়া ধর্মকীর্তিকে পরাজিত করেন। রূপাবতার, ধর্মকীর্তি ও ভট্টনারায়ণ উভয়েরই রচিত। সুতরাং ভট্টনারায়ণ ৭ম খৃষ্টাব্দেরই হইবেন।[৪৪]

মহাভারতের সভাপর্বে দুর্যোধনের সভামধ্যে দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ দেখিয়া ভীম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে দুঃশাসনের রক্তলিপ্ত হস্ত দ্বারা তিনি দ্রৌপদীর বেণী বন্ধন করিয়া দিবেন। এই উপাখ্যান লইয়াই বেণীসংহার[৪৫] রচিত এবং নামকরণেই তাহা সূচিত হইয়াছে। বীর-রসাত্মক এই নাটকে ভট্টনারায়ণ নাটক রচনার ক্ষেত্রে একটি নূতন রীতির প্রবর্তন করিয়াছেন।[৪৬] ওজস্বী ভাষায়[৪৭] তিনি নাটক রচনা

---

only serious defect is that the drama lacks grandeur, with a grand subject; it also lacks pity, with enough scope for real pathos."—Das Dupta & De, pp. 270-71

৩৮। নামান্তর, **নারায়ণ, মৃগরাজ, মৃগরাজলক্ষণ**। নিশার একটি সুন্দর বর্ণনা দেওয়ার জন্য তাঁহাকে নিশানারায়ণও বলা হইত।—সূক্তিমুক্তাবলী, জল্হণ

৩৯। আদিশূরের কাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আবুল ফজলের মতে আদিশূর বল্লালসেনের অধস্তন ত্রয়োবিংশতিতম নরপতি। Weber-এর মতে ৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দ আদিশূরের কাল।

৪০। তুলঃ ব্যাপ্তুং পদত্রয়েণাপি যঃ শক্তো ভুবনত্রয়ম্।
তস্য কাব্যত্রয়ব্যাপ্তৌ চিত্রং নারায়ণস্য কিম্॥

৪১। কাব্যালঙ্কার, ৪. ৩.২৮-এ উদ্ধৃত বেণীসংহার, ৫,২৬

৪২। ধ্বন্যালোক, ২, ১০-এ উদ্ধৃত বেণীসংহার, ১. ২১; ৩.৩১

৪৩। *Classical Sanskrit Literature*, p. 612

৪৪। Levy (Gaekwad Oriental Series, XXXIII) বলিয়াছেন যে দশম খৃষ্টাব্দে পূর্ব জাভার শাসনকর্তা শ্রীধর্মবংশ তেগুহ অনন্তবিক্রমদেব তত্রত্য ভাষায় মহাভারতের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে Kern উহা হইতে আদি পর্বের খানিকটা অংশ প্রকাশ করেন এবং তাহাতে বেণীসংহারের নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখা যায়ঃ

জয়তি সনাভির্জগতাং স্বনাভিরন্ধ্রোদ্ভবজগদ্বীজঃ
দামোদরো নিজোদরগহ্বরনিক্ষিপ্তজগদণ্ডঃ॥

ইহা হইতে Levy সিদ্ধান্ত করেন যে ৯ম/১০ম শতকে ইন্দোনেশীয়ার সহিত বঙ্গদেশের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র বর্তমান ছিল এবং বেণীসংহারের কথাও তত্রত্য অধিবাসিগণ জানিতেন।

৪৫। নামান্তর, **বেণীসংবরণ**

৪৬। তুলঃ "The *Veni-Samhara* is one of the earliest and best examples in Sanskrit of the peculiar kind of half-poetical and half-dramatic composition which may be called the declamatory drama; and it shares all the merits and defects of this class of work. The defects are perhaps more patent, but they should not obscure the merits, which made the work so entertaining to the Sanskrit Theorists."—Das Gupta & De, p. 276

করিয়াছেন। নাট্যাংশ অপেক্ষা কাব্যাংশের উৎকর্ষসাধন করার দিকেই কবির মনোযোগ অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল। সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে ভট্টনারায়ণকে প্রথম শ্রেণীর কবিও বলা চলে না, প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারও বলা চলে না। শুধু এইটুকু বলা চলে যে তাঁহার বেণীসংহার দৃশ্যকাব্যের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র।

ভবভূতি নিজের কথা তাঁহার রচনায় কিছু কিছু বলিয়াছেন[৪৮] কিন্তু নিজের কালের কোনও তথ্য আমাদিগকে দিয়া যান নাই। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহার বংশের উপাধি ছিল 'উদুম্বর'। তাঁহার পিতা ভট্টগোপাল বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং ভবভূতি যে নিজেও বেদজ্ঞ ছিলেন[৪৯] তাহার পরিচয় তাঁহার রচনায় ইতস্ততঃ পাওয়া যায়। সাংখ্য ও যোগ দর্শন সম্বন্ধেও তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল।[৫০]

ভবভূতি কোনও দিন কোনও নরপতির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন কি না সে কথা বলিয়া যান নাই। অথচ রাজদরবারের রীতি-নীতির সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল বুঝা যায়। তাঁহার রচনা যে এক সময়ে সমালোচকগণের প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছিল সে ইঙ্গিতও ভবভূতি দিয়াছেন যখন তিনি বলিয়াছেন যে কাব্য ও নারী—এই দুইয়ের সাধুতা সম্বন্ধে দুর্জনেরা সতত সন্দিহান।[৫১] অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে যাঁহারা তাঁহার কাব্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন তাঁহাদের জন্য তাঁহার কাব্য নহে। নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথিবীতে তাঁহার সমরুচিসম্পন্ন কেহ জন্মিবেনই যিনি তাঁহার রচনায় তৃপ্তি পাইবেন।[৫২] নিজের শক্তির উপর যে তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা

৪৭। তুলঃ পাণ্ডববংশ ধ্বংস করিবার জন্য অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা ঃ

যো যঃ শস্ত্রং বিভর্তি স্বভুজগুরুমদাৎ পাণ্ডবীনাং চমূনাম্
যো যঃ পাঞ্চালগোত্রে শিশুরধিকবয়া গর্ভশয্যাং গতো বা।
যো যস্তৎকর্মসাক্ষী চরতি ময়ি রণে যশ্চ যশ্চ প্রতীপঃ
ক্রোধান্ধস্তস্য তস্য স্বয়মপি জগতামন্তকস্যান্তকোঽহম্ ॥

ভীমকর্তৃক দুঃশাসনের রক্তলিপ্ত হস্ত দ্বারা দ্রৌপদীর বেণীবন্ধন করিবার প্রতিজ্ঞা ঃ

চঞ্চদ্ভুজভ্রমিতচণ্ডগদাভিঘাতসংচূর্ণিতোরুযুগলস্য সুযোধনস্য।
স্ত্যানাবনদ্ধঘনশোণিতশোণপাণিরুত্তংসয়িষ্যতি কচাংস্তব দেবি ভীমঃ ॥

৪৮। মালতীমাধবের Colophon-এ কোথাও 'কুমারিলশিষ্যকৃতে মালতীমাধবে', কোথাও 'শ্রীমদ্ভবভূতিবিরচিতে মালতীমাধবে' কোথাও বা 'শ্রীমদুম্বেকাচার্যবিরচিতে মালতীমাধবে' বলা হইয়াছে। মাধবের শংকরবিজয় নামক গ্রন্থে উম্বেককে মণ্ডনমিশ্র এবং বিশ্বরূপ নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন ভবভূতি, মণ্ডনমিশ্র, সুরেশ্বর, বিশ্বরূপ ও উম্বেক একই ব্যক্তি। Bhandarkar, Belvalkar প্রভৃতি ভবভূতির জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে বেশী তথ্য পাওয়া যায় মহাবীরচরিতে। তাঁহার জন্মস্থান সম্বন্ধে Bhandarkar বলেনঃ

"Somewhere near Chanda in the Nagpur territories where there are still many families of Mahrati Desastha Brahmins of the Black Yajurveda with Apastamba for their sutras."

৪৯। দ্রষ্টব্যঃ Keith: *Bhavabhuti and the Vedas, JRAS*, 1914. p. 729

৫০। Belvalkar মনে করেন ভবভূতি উত্তররামচরিতের অভিনয়ে বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয়ও করিয়াছিলেন।

৫১। তুলঃ যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ—উত্তররামচরিত

৫২। তুলঃ যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাম্
জানন্তু তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী ॥—উত্তররামচরিত

ছিল তাহা প্রমাণিত হয় যখন তিনি বলিয়াছেন যে বাগ্‌দেবী যেমন ব্রহ্মার অনুবর্তন করেন তেমনি তাঁহারও অনুবর্তন করিয়াছেন।[৫৩]

রাজশেখর সর্বপ্রথম তাঁহার বালরামায়ণে ভবভূতির উল্লেখ করিয়াছেন।[৫৪] ভবভূতির রচনাংশ সর্বপ্রথম উদ্ধৃত হইয়াছে বামনের কাব্যালঙ্কারে।[৫৫] ভবভূতির উপর কালিদাসের প্রভাব নিঃসংশয়ে পড়িয়াছে। প্রেমকাতর মাধব যখন মালতীর অনুসন্ধানে রত, কিংবা মেঘকে দৌত্যে নিযুক্ত করিয়া মালতীর নিকট প্রেরণ করিতে উদ্যত তখন তাহাতে কালিদাসের পুরূরবা ও যক্ষের প্রভাবই দেখা যায়। কল্‌হণের মতে কনৌজেশ্বর যশোবর্মন্ ভবভূতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ভবভূতি ও বাক্‌পতি উভয়েই তাঁহার সভাকবি ছিলেন।[৫৬] কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য কর্তৃক[৫৭] (৬৯৯-৭৩৫ খৃঃ অঃ) যশোবর্মন্[৫৮] পরাভূত হন। বাক্‌পতিরাজ তাঁহার গৌড়বহে যশোবর্মনের প্রশংসা করিয়াছেন এবং ভবভূতির নিকট নিজের ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। গৌড়বহের রচনাকাল ধরা হয় ৭৩৬ খৃষ্টাব্দ; তখনও ললিতাদিত্যের নিকট যশোবর্মনের পরাজয় ঘটে নাই। কাজেই ভবভূতিকে ৭ম খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে বা ৮ম খৃষ্টাব্দেব প্রথম ভাগে ফেলা চলে।

ভবভূতির রচিত নাটক তিনখানি—(ক) **মালতীমাধব** (খ) **মহাবীরচরিত** (গ) **উত্তর-রামচরিত**। মহাবীরচরিতে ও উত্তররামচরিতে যথাক্রমে রামচন্দ্রের পূর্ব ও উত্তরজীবন বর্ণিত হইয়াছে। গতানুগতিক প্রণয়-কাহিনী হইল মালতীমাধবের বিষয়বস্তু। উজ্জয়িনীরাজের মন্ত্রীর কন্যা মালতী মাধব নামে নগরীর এক শিক্ষার্থীর প্রণয়াসক্তা। মাধবও অন্য রাজ্যের মন্ত্রীর পুত্র। ⁄ রাজার ইচ্ছা, তাঁহারই এক প্রিয়পাত্রের সহিত মালতীর বিবাহ হয়। মাধবের বন্ধু মকরন্দ কি কৌশলে রাজার ইচ্ছার পথে বাধার সৃষ্টি করেন এবং শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুনীদের সাহায্যে মালতী ও মাধব কিরূপে মিলিত হন তাহাই এই নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। এই নাটকটিও দশ অঙ্কে রচিত।

মহাবীরচরিত ও উত্তররামচরিত দুইটিই সপ্তাঙ্ক নাটক। প্রথমটিতে রামের জীবনের পূর্ব ভাগ, দ্বিতীয়টিতে সীতা বিসর্জনের পর হইতে আরম্ভ করিয়া লব-কুশের জন্ম এবং শেষ পর্যন্ত রাম ও সীতার মিলন দেখানো হইয়াছে। মহাবীরচরিতের ৬ষ্ঠ ও ৭ম অঙ্ক বহুদিন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত ছিল এবং সুব্রহ্মণ্য নামক কোনও এক ব্যক্তি নিজে রচনা করিয়া এই অংশ পূর্ণ করিয়াছিলেন। ভবভূতির রচনা পরে আবিষ্কৃত হয়।

মালতীমাধবে মালতী ও মাধবের প্রণয়-কাহিনীর সহিত পাশাপাশি চলিয়াছে মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার প্রণয়-কাহিনী। অপূর্ব কৌশলে ভবভূতি এই উভয় কাহিনীকে গ্রথিত করিয়াছেন। মাধব ও মালতীই যথাক্রমে নায়ক ও নায়িকা। কিন্তু এই মুখ্য কাহিনী নিতান্তই ম্লান হইয়া পড়িয়াছে মকরন্দ-মদয়ন্তিকার গৌণ কাহিনীর পাশে। মকরন্দের পাশে মাধব ও মদয়ন্তিকার পাশে মালতী যেন একান্তই বেমানান। মুখ্য আখ্যানাংশের নায়ক-নায়িকা গৌণ আখ্যানাংশের প্রধান চরিত্র দুইটির দ্বারা রাহুগ্রস্ত। ইহা নাটকের

৫৩। তুলঃ যং ব্রহ্মাণমিয়ং দেবী বাগ্‌বশ্যেবানুবর্ততে—ঐ

৫৪। বালরামায়ণ, ১.১৬; ভবভূতিকে এখানে বাল্মীকির অবতার বলা হইয়াছে।

৫৫। কাব্যালঙ্কার, ১. ২. ১২; ৪. ৩. ৬

৫৬। তুলঃ কবির্বাক্‌পতিরাজশ্রীভবভূত্যাদিসেবিতঃ।
জিতো যযৌ যশোবর্মা তদ্‌গুণস্তুতিবন্দিতাম্ ॥
—রাজতরঙ্গিণী, ৪. ১৪৪

৫৭। Cunningham, Buhler ও Maxmuller-এর মতে ললিতাদিত্য ৭২৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

৫৮। Lassen-এর মতে যশোবর্মার রাজত্বকাল ৬৯৫-৭৩০ খৃষ্টাব্দ এবং রমেশচন্দ্র দত্তের মতে ৭০০-৭৫০ খৃষ্টাব্দ।

বড় ত্রুটি। অষ্টম অঙ্কেই নাটকখানি প্রকৃত শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার পরে নাটকটিকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সংযম ও সংগতির অভাবও মাঝে মাঝে ধরা পড়ে। নায়ক ও নায়িকা স্বকীয়তাবর্জিত। ভবভূতির যে ত্রুটি এই নাটকে লক্ষিত হয়, মহাবীরচরিতে তাহা ভবভূতি অতিক্রম করিয়াছেন এবং সেখানে ভবভূতি অধিকতর কৌশলী নাট্যকার। আর উত্তররামচরিতের ভবভূতি নাট্যকার হিসাবে সম্পূর্ণ। কালিদাসের রচনায় যেমন রচয়িতার দক্ষতার ইতরবিশেষ লক্ষিত হয় না বলিয়া রচনাগুলির পৌর্বাপর্যনির্ণয় করা কঠিন, ভবভূতির ক্ষেত্রে তাহা নহে। মালতী-মাধব—মহাবীরচরিত—উত্তররামচরিত—এই ক্রমে ভবভূতির প্রতিভা ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছে।

কালিদাসের পরেই নাট্যকার হিসাবে ভবভূতির নাম আগে মনে আসে। প্রকৃতির রুদ্র ও কমনীয় রূপের বর্ণনায় ভবভূতি সমান দক্ষতা দেখাইয়াছেন, মানুষের মনের গহনে প্রবেশ করিয়া কোমল বৃত্তিগুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপ ও রেখার বর্ণনা এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। ভবভূতির সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি এই যে পাঠকের মনকে তিনি কখনও হালকা রসের বৈচিত্র্যের আস্বাদ দেন নাই। মাঝে মাঝে সমাসবদ্ধ সুদীর্ঘ বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন, যাহার ফলে মন ও চক্ষু হঠাৎ বাধা পায়। কালিদাসের উপমা বস্তুগত—অর্থাৎ একটি বস্তুর সহিত আর একটি বস্তুর তুলনা; ভবভূতির উপমা বস্তু ও ভাবনিষ্ঠ—অর্থাৎ একটি বস্তুর সহিত আর একটি ভাবের তুলনা। এই দিক দিয়া Shelly-র রচনার সহিত ভবভূতির রচনার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। বিশেষ করিয়া উত্তররামচরিতে ঘটনা-বৈচিত্র্যের অভাব বড় বেশী অনুভূত হয়। প্রথম অঙ্কে বর্ণিত ঘটনা হইতে দ্বিতীয় অঙ্কে বর্ণিত ঘটনার মধ্যে স্থান ও কালের ব্যবধান খুব বেশী হওয়ায় অসম্ভবতার বোধ জন্মায়। করুণরস-চিত্রণে ভবভূতি নিঃসংশয়ে কালিদাসকে অতিক্রম করিয়াছেন। ভবভূতি অনেক বলিতে পারেন, কালিদাস না বলিয়াই বলার কাজ সারিয়া লন।[৫৯]

দুর্দুক ও শীলাবতীর পুত্র **রাজশেখর** খুব সম্ভব মহারাষ্ট্রের অধিবাসী ছিলেন। তিনি নিজে বলিয়াছেন যে তিনি রাজা মহেন্দ্রপালের গুরু ছিলেন এবং মহেন্দ্রপালের পুত্র মহীপাল তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মহীপালের রাজত্বকাল ১০ম খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগ। ভবভূতিকে রাজশেখর বাল্মীকির অবতার বলিয়াছেন এবং বাক্‌পতিরাজ, উদ্‌ভট ও আনন্দবর্ধনের সম্বন্ধেও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। বালরামায়ণে তিনি নিজে বলিয়াছেন যে তাঁহার রচিত ছয়খানি গ্রন্থ আছে। তাঁহার চারিখানি নাটক পাওয়া যায়—(ক) **বালরামায়ণ** (খ) **বালভারত** (গ) **বিদ্ধশালভঞ্জিকম্** (ঘ) **কর্পূরমঞ্জরী**। রাজশেখর নিজেকে বাল্মীকি মেণ্ঠ ও ভবভূতির অবতার বলিয়াছেন।[৬০]

প্রাকৃতে চার অঙ্কে রচিত **কর্পূরমঞ্জরীতে** রাজা চন্দ্রপালের সহিত এক রাজকুমারীর প্রণয়-কাহিনী, রানীর ক্রোধ, প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর গোপন সাক্ষাৎ ও শেষ পর্যন্ত মিলনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। রাজশেখরের পৃষ্ঠপোষক নরপতির মহিষী অবন্তীর চিত্তবিনোদনের জন্যই নাটকটি রচিত হইয়াছিল।

৫৯। দ্রষ্টব্য: T. Suryanarayana Rao: *Bhavabhuti and His Masterly Genius* (Poona) Belvalkar's *Introduction to Uttararama-charita*

৬০। বভূব বল্মীকভবঃ কবিঃ পুরা ততঃ প্রপেদে ভুবি ভর্তৃমেণ্ঠতাম্।
স্থিত পুনর্যো ভবভূতিরেখয়া স বর্ততে সম্প্রতি রাজশেখরঃ॥

কালিদাসোত্তর যুগ ঃ কবি ও কাব্য

কালিদাসের পর হইতে মাঘ ও ভবভূতি পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্য বিভিন্ন জাতীয় রচনায় নিঃসংশয়ে সমৃদ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু দুঃখের কথা এই যে মহাকাল আজ তাহার অনেকগুলিই আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। প্রাক্‌কালিদাসীয় যুগের বহু রচনা যেমন বিলুপ্ত হইয়াছে, কালিদাসোত্তর যুগের বহু রচনাও তেমনি বিলুপ্ত।[১] যে গল্প-সাহিত্য পঞ্চতন্ত্রে ও গুণাঢ্যের বৃহৎকথায় চরম পরিণতি লাভ করিয়াছিল, অমরু-ভর্তৃহরি-বাণ-ময়ূরের শতক-কাব্যসমূহে যে বিশেষ রচনার ধারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, বাণ-সুবন্ধু-দণ্ডীর রচনায় গদ্য-সাহিত্যের যে পরাকাষ্ঠা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই, তাহাদের ধারার উৎস অনুসন্ধান করিবার মত কোনও রচনা আজ আর আমাদের হাতে নাই। হাল-বিরচিত সপ্তশতীতে প্রাকৃত সাহিত্য যে প্রণয়-কাব্যের জন্ম দিয়াছে তাহার পথিকৃৎ কাহারা এবং কোন্ কোন্ গ্রন্থ, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রণয়-কাব্য প্রাকৃত প্রণয়-কাব্যের সহিত কতখানি যুক্ত বা তাহার দ্বারা কতখানি প্রভাবিত, তাহা আজ নিঃসংশয়ে নির্ণয় করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দৃশ্যকাব্যের ক্ষেত্রেও ভাস-কালিদাসের পর হর্ষ-বিশাখাদত্ত-শূদ্রকের নাটক ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছু আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছায় নাই। শ্রব্য-কাব্যের ক্ষেত্রেও ঐ একই বিপত্তি। ভারবি-ভট্টি-কুমারদাস-মাঘ ছাড়া কালিদাসোত্তর যুগের উল্লেখযোগ্য মহাকবি নাই।

লিরিক্ কাব্য

ইংরাজীতে 'লিরিক্' বলিতে যে জাতীয় রচনাকে বুঝায়, সংস্কৃত সাহিত্যে সেই জাতীয় রচনা নাই বলিলেই চলে। সংস্কৃত লিরিক্ সাহিত্যের ব্যাপকতা আরও বেশী। দেহনিষ্ঠ প্রেমই সংস্কৃত লিরিক্ সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য নহে। হিন্দুগণ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ পুরুষার্থকে স্বীকার করিয়াছেন। হিন্দু-সাহিত্যও এই চতুর্বর্গের কীর্তন করিয়াছে। ফলে সংস্কৃতে ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র ও মোক্ষ-শাস্ত্রের কোনও দিন অভাব হয় নাই। সকলে মুমুক্ষু নয়, তাই সাধারণের জন্য পুরুষার্থ ত্রিবর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম। মানুষের জীবন এই ত্রিবর্গের সুসমঞ্জস অনুশীলনেই পরিপূর্ণতা লাভ করে।[২] হিন্দু ঋষিগণ ত্রিবর্গের অনুশীলনে অর্থ ও কামকে সকল সময়ে ধর্মাবিরুদ্ধ করিয়া অনুশীলন করিয়াছেন। অর্থ ও কাম ধর্মাবিরুদ্ধ হইলেই কল্যাণজনক হয়, ইহাই তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। দেহনিষ্ঠ ভোগবাসনাকে নিছক

১। তুলঃ "If the poetical predecessors of Kalidasa have all disappeared, leaving his finished achievement in poetry to stand by itself, this is still more the case with his successors."—Das Gupta & De: *History of Sanskrit Literature*, Vol. I, p. 156

২। মনুও তাহাই বলিয়াছেন ঃ

ধর্মার্থাবুচ্যতে শ্রেয়ঃ কামার্থৌ ধর্ম এব চ।
অর্থ এবেহ বা শ্রেয়স্ত্রিবর্গ ইতি তু স্থিতিঃ॥—মনু., ২. ২২৪

তুলঃ 'ধর্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যা যো হ্যেকসক্তঃ স জনো জঘন্যঃ'। বাৎস্যায়ন তাঁহার কামশাস্ত্রের প্রথমে ধর্ম, অর্থ ও কামকে প্রণাম জানাইয়াছেন, ঐ তিনটির যাঁহারা কামনা করেন তাঁহাদিগকেও প্রণাম জানাইয়াছেন, যাঁহারা মুমুক্ষু তাঁহাদের প্রণাম জানাইয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা সকল কামনার অতীত তাঁহাদের তিনি অসংখ্য প্রণাম জানাইয়াছেন ঃ

নমো ধর্মার্থকামেভ্যস্তৎকামেভ্যো নমো নমঃ।
ত্রিবর্গমোক্ষকামেভ্যোঽকামেভ্যস্ত্বমিতং নমঃ॥

রক্তমাংসের লোলুপতার সীমা ছাড়াইয়া তদূর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কাম্যের সহিত কামনা-কারীর তাদাত্ম্যবোধ যখন ধর্মের নাভিপথে আবর্তিত হয় তখনই তাহার নাম হয় 'প্রেম'। জলরাশির তলদেশে পঙ্কে উৎপন্ন মৃণালমূলে পঙ্ক ও আবিল জলরাশির বন্ধন ভেদ করিয়া উপরে আসিয়া শতদল বিস্তার করতঃ পূর্ণ সৌন্দর্যে যখন নিজেকে সূর্যের অভিমুখে মেলিয়া ধরে, তখনই তাহা হয় পূজার সামগ্রী। কাম ও প্রেমের এই পার্থক্য হিন্দুরা কখনও বিস্মৃত হন নাই। ধর্মাবিরুদ্ধ কামের তাঁহারা অনুশীলন করিয়াছেন, পরব্রহ্মের বিভূতিরূপে তাহার কল্পনা করিয়াছেন,[৩] সে শুধু প্রেমে পৌঁছাইয়া দিতে পারে বলিয়াই।[৪] আত্মজন্যা ইচ্ছা কাম, কাম্যজন্যা ইচ্ছা প্রেম। কামে ভোগে তৃপ্তি, প্রেমে ত্যাগে শান্তি। কাম দিয়া আরম্ভ না করিলে প্রেমের স্তরে উন্নীত হওয়া যায় না। মূলকে অবহেলা করিলে পত্র-পুষ্প-ফলের সুষমামণ্ডিত বৃক্ষের শোভা আসিবে কোথা হইতে? কিন্তু মূল লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য; লক্ষ্যপ্রাপ্তির পথে লইয়া যায় বলিয়াই তাহার প্রয়োজন, সে অপরিহার্য ও উপাস্য। মৃত্তিকা-প্রোথিত মূল বিশেষ বিকাশক্রমে বৃক্ষ-সম্পদের সৃষ্টি করে, ধর্মভিত্তিক কাম বিশেষ নীতি অবলম্বন করিয়াই প্রেমে উত্তীর্ণ হয়। ত্যাগ-তিতিক্ষা-ধৈর্য-সংযম-বৈরাগ্যের শীতল বারিতে সিঞ্চিত না হইলে কামমূল প্রেমমহীরুহে পরিণত হয় না। কাম ও প্রেমের মধ্যে এই যে গভীর পরিণতির ভাব তাহার মধ্যে তাই ধর্ম, শৃঙ্গার, নীতি, বৈরাগ্য সব কিছুই অতি স্বাভাবিকভাবে আসিয়া পড়িয়াছে। সংস্কৃত লিরিক্ সাহিত্যে এই সবগুলিই আসিয়া এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে তাহাকে ইংরাজীর 'Love-Poetry' মনে করিলে ভুল করা হইবে।[৫]

ঋগ্বেদের যম-যমীর বা উর্বশী-পুরূরবার সংবাদ-সূক্তে আমরা নিছক কামের দাবদাহের উগ্র আত্মপ্রকাশ দেখিয়াছি। আবার রাজা রথবীতির কন্যার প্রতি যুবক শ্যাবাশ্বের আসক্তি যে মহিমময় পবিত্র প্রেমে পরিণত হইয়াছিল তাহারই শক্তিতে মন্ত্ররাজি তাঁহার সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইয়া যুবক শ্যাবাশ্বকে কি করিয়া মহর্ষি শ্যাবাশ্বে পরিণত করিয়াছিল, তাহাও দেখিয়াছি। অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দে লিরিক্ জাতীয় রচনার প্রথম আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে কালিদাসের মেঘদূত ও ঋতুসংহার, আরও পরবর্তীকালে জয়দেবের গীতগোবিন্দ এই শ্রেণীর পূর্ণাঙ্গ রূপ। পরবর্তীকালে ভক্তিমূলক ও ধর্মমূলক লিরিক্ও রচিত হইয়াছে।

৩। তুলঃ ধর্মাবিরুদ্ধকামোঽস্মি ভূতেষু ভরতর্ষভ ॥—গীতা

৪। হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গীতে কামের এই স্থান অনেক সময়ে উপেক্ষিত হয়।

তুলঃ "But the Sanskrit poets being thwarted in dealing with free passionate love as the chief theme of a glorious Kavya gave indulgence to the repressed sex-motives in gross descriptions of physical beauty and purely carnal side of love both in long-drawn Kavyas and also lyrics. It is for this reason that the genius of Sanskrit writers in their realism of life has found a much better expression in small pictures of lyric poems than in long-drawn epics. The repressed motive probably also explains why we so often find carnal and gross aspects of human love so passionately portrayed."—Das Gupta & De : *History of Sanskrit Literature*, Vol. I, Introd., p. XXXVIII

৫। "Although common sense and poetics would like to distinguish between love and religious devotion, or love and wordly wisdom, it is curious that in the actual poetic of Sanskrit, the three aspects of human thought and activity betray to inter-mingle."—*Ibid*, p. 367

ভর্তৃহরির শতকগুলি, বাণ-ময়ূরের কাব্য, কতকগুলি বৌদ্ধ রচনা এই পর্যায়ে পড়ে। প্রেমাস্পদকে কেন্দ্র করিয়া প্রেমিক-হৃদয়ের ভাবাবেগ যখন স্বাভাবিক ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া ভাষায় রূপলাভ করে তখন তাহার মধ্যে আমরা রচনার পারিপাট্য দেখিতে না পাইলেও প্রেমিক-হৃদয়কে স্বরূপে প্রত্যক্ষ করি। প্রথম দিকের লিরিক্ রচনায় ভাবের এই সহজ ও স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তি অতি প্রত্যক্ষ। পরবর্তীকালের লিরিক্ কবিগণ—ছন্দ, বিষয়বস্তু ও ভাবের অনুকরণ করিতে গিয়া তাঁহাদের কাব্যে এই হৃদয়াবেগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। অনেক ক্ষেত্রে মনে হয় যেন ভাব অপেক্ষা রচনা-পারিপাট্যের প্রতিই তাঁহাদের দৃষ্টি অধিক নিবদ্ধ ছিল।

কালিদাসের মেঘদূত বা জয়দেবের গীতগোবিন্দ প্রণয়-কাব্য বটে, তথাপি অবিমিশ্র প্রেম ইহাদের বিষয়ীভূত নহে। অবিমিশ্র প্রেমকে বিষয়ীভূত করিয়া প্রাকৃত ভাষায় হালের সপ্তশতীর মত সংস্কৃত সাহিত্যে বোধ হয় **অমরুশতকই** প্রথম কাব্য। কিংবদন্তী আছে মণ্ডনমিশ্রের পত্নী ভারতীর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত শঙ্করাচার্য রতিশাস্ত্রবিষয়ক প্রশ্নের উত্তরদানে অসমর্থ হইয়া অমরু (ক) নামক এক রাজার মৃতদেহ আশ্রয় করিয়া রাজার অন্তঃপুরে রানীদের সহিত বহুদিন যাপন করিয়া রতি সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ করেন তাহাই শতশ্লোকে লিপিবদ্ধ হইয়া 'অমরুশতক' বা 'অমরুকশতক' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।[৬] ইহার চারিটি আঞ্চলিক সংস্করণে শ্লোকসংখ্যা ৯৬ হইতে ১১৫টি পর্যন্ত দেখা যায় এবং মাত্র ৫১টি শ্লোক ঐ চারিটি আঞ্চলিক সংস্করণের সাধারণ অংশ। কোন্‌গুলি এবং কতগুলি মূল অমরুশতকের অঙ্গীভূত তাহা নির্ণয় করা কঠিন। খৃষ্টাব্দ অষ্টম শতকে বামন ইহা হইতে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন অথচ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন নাই। খৃষ্টাব্দ ৮৫০-এ আনন্দবর্ধন অমরুকে প্রথিতযশা কবিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। খুব সম্ভব, **খৃষ্টাব্দ সপ্তম শতকের শেষভাগে** ইহা রচিত হয়।[৭]

ভর্তৃহরির রচিত **শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক** ও **বৈরাগ্যশতক** এই শ্রেণীর অন্তর্গত। বৌদ্ধ পরিব্রাজক I-tsing একজন বৈয়াকরণ ভর্তৃহরির মৃত্যুর কথা বলিয়া গিয়াছেন[৮] এবং তাঁহার রচনা হইতে একটি শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা হইতে Maxmuller মনে করেন[৯] যে **বাক্যপদীয়** নামক ব্যাকরণগ্রন্থের রচয়িতা ভর্তৃহরিই ঐ শতকত্রয়ের রচয়িতা। এই ভর্তৃহরিই যে ভট্টিকাব্যের রচয়িতা এমন মতও অনেকে পোষণ করেন। অমরু ও ভর্তৃহরি উভয়েই প্রেমকে উপজীব্য করিয়া তাঁহাদের কাব্য রচনা করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক। অমরুর নিকট প্রেম জীবনের বৃহত্তর সত্তা হইতে অসংশ্লিষ্ট, প্রেমেই প্রেমের পরিচয়। প্রেম নিজেতেই নিজে বিকশিত ও স্বয়ংপূর্ণ। ভর্তৃহরি জীবনের বাস্তবতাকে সম্পূর্ণ মনে রাখিয়াই প্রেমকে দেখিয়াছেন, প্রেমের মধুরতা অপেক্ষা জীবনের রূক্ষতা তাঁহার কাছে কম সত্য নহে।

৬। C. V. K. Iyer : *Sankaracaryya*, p. 45

৭। দ্রষ্টব্য : Macdonell : *Sanskrit Literature*, p. 342

তুল : "In Sanskrit sentimental poetry, Amaru should be regarded as the herald of a new development, of which the result is best seen in the remarkable fineness, richness of expression and delicacy of thought and feeling of the love-poems of later Satakas, of the numerous anthologies, and even of the poetical drama."—Das Gupta & De : *History of Sanskrit Literature*, Vol. I, p. 160

৮। *Records of Buddhist Religion*, p. 178; Belvalkar: *Systems of Sanskrit Grammar*, p. 40

৯। *India*, p. 347

অমরুর রচনা কাব্য হিসাবে উচ্চস্তরের, ভর্তৃহরির রচনায় ভাবের গভীরতা ও অকৃত্রিমতা বেশী।[১০]

নীলাম্বর সোমযাজীর পুত্র **গোবর্ধনের আর্যাসপ্তশতী** সাতশত শ্লোকে রচিত আর একখানি গ্রন্থ। প্রেমকে বিষয় করিয়া আর্যা ছন্দে হালের সপ্তশতীর অনুকরণে গোবর্ধন এই কাব্য রচনা করেন। তিনি জয়দেবের সমসাময়িক এবং বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের সভাকবি। একটি শ্লোকে কবি দর্পের সহিত বলিয়াছেন যে প্রেমকে অবলম্বন করিয়া এই ধরনের কাব্য প্রাকৃতেই প্রচলিত ছিল এবং তিনিই প্রথম সংস্কৃতে ইহার প্রবর্তন করিলেন। আর একটি শ্লোকে তিনি তাঁহার পৃষ্ঠপোষককে 'সেনকুলতিলক'[১১] এবং 'সকলকলাপারঙ্গম' বলিয়াছেন। ইনিই বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেন।[১২] ইহা একাদশ খৃষ্টাব্দে রচিত।

এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে **জয়দেবের গীতগোবিন্দ** কালিদাসের মেঘদূতের পরেই উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভোজদেব ও বামাদেবীর পুত্র জয়দেব পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার অন্তর্গত অজয় নদের তীরবর্তী কেন্দুবিল্ব[১৩] নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

জয়দেবের পত্নীর নাম পদ্মাবতী। গীতগোবিন্দ রচনায় পত্নীর দান জয়দেব সশ্রদ্ধভাবে স্বীকার করিয়াছেন।[১৪] এইরূপ কিংবদন্তী আছে, জগন্নাথধামে যখন জয়দেব এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট ছিলেন তখন এক ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার একমাত্র কন্যা পদ্মাবতীকে জয়দেবের নিকট রাখিয়া যান। জয়দেব বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। ১১২০ খৃষ্টাব্দে স্বগ্রামে জয়দেব দেহরক্ষা করেন। আজিও সেখানে প্রতি বৎসর পৌষ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে তাঁহার মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে।[১৫]

ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের অনুকরণে দ্বাদশ সর্গে এবং গায়ত্রীর চতুর্বিংশ অক্ষরের অনুকরণে চতুর্বিংশ অষ্টাপদীতে রাধা-কৃষ্ণের শাশ্বত প্রেমলীলাকে উপজীব্য করিয়া গীতগোবিন্দ রচিত হইয়াছে। অনেকে গীতগোবিন্দে পরম দার্শনিক তত্ত্বের সন্ধান

১০। "....it differs from the work of Bhartrihari in that, while Bhartrihari deals rather with general aspects of love and women as factors in life, Amaru paints the relation of lovers, and takes, no thought of other aspects of life!"—Keith: *History of Sanskrit Literature*, p. 184

১১। সকলকলাঃ কল্পয়িতুং প্রভুঃ প্রবন্ধস্য কুমুদবন্ধোশ্চ
সেনকুলতিলকভূপতিরেকো রাকাপ্রদোষশ্চ॥

১২। টীকাকারের মতে ইনি কাশ্মীররাজ প্রবরসেন।

Grierson-এর মতে আর্যাসপ্তশতীর অনুকরণে হিন্দী কবি বিহারীলাল হিন্দী ভাষায় 'সত্‌সই' কাব্য রচনা করেন এবং বিহারীলালের সত্‌সইকে অনুসরণ করিয়া পরমানন্দ শৃঙ্গারসপ্তশতিকা রচনা করিয়াছেন।

১৩। ভক্তমাল নামক গ্রন্থে পুরীর তিন্দুবিল্বকে জয়দেবের জন্মস্থান বলা হইয়াছে। লক্ষ্মীধর নামক একজন টীকাকারের মতে জয়দেবের জন্মস্থান গুজরাট এবং অনেকের মতে মিথিলা।

প্রচলিত বিশ্বাস, বিদ্যাপতিই জয়দেবরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের গয়া-লিপি ১১৭৬ খৃষ্টাব্দের।

১৪। তুল :

বাগ্‌দেবতাচরিতচিত্রিতচিত্তসদ্মা পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী।
শ্রীবাসুদেবরতিকেলিকথাসমেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্‌॥

১৫। দীনেশচন্দ্র সেন : **বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস**

পাইয়াছেন।[১৬] Macdonell ইহাকে 'lyrical drama' বলিয়াছেন।[১৭] Jones-এর অনুবাদ পড়িয়া Goethe ইহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং নিজে ইহার অনুবাদ করার ইচ্ছাও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

জয়দেবের সহিত গোবর্ধন, শরণ, উমাপতি, ধোয়ী কবিরাজও লক্ষ্মণসেনের সভা-কবি ছিলেন।[১৮] ধোয়ী বিরচিত **পবনদূত** কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে রচিত। জানা যায়, **সত্যভামা-কৃষ্ণ-সংবাদ** নামে আরও একখানি কাব্য তিনি রচনা করিয়াছিলেন।

কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের সভাকবি **দামোদরগুপ্ত** রচিত **কুট্টনীমত** কাব্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত।[১৯] মালতী নাম্নী কাশীর এক পরমাসুন্দরী বারবনিতা বিকরালা

১৬। "There are four aspects in which the Gita Govindam or Ashtapadi may be viewed (1) Literary (2) Devotional (3) Musical (4) Mystical. The mystical nature is hinted both in the beginning and end of the work but a full exposition is given in the middle. Radha is not a woman but a thing representing the materialism, and the whole is a gradual story of the pilgrimage of the soul up to the path of glory."—C. R. Srinivasa Iyengar.

১৭। "...a lyrical drama, which though dating from the twelfth century is the earliest literary specimen of a primitive type of play that still survives in Bengal and must have preceded the regular dramas. The poem contains no dialogue in the proper sense, for its three characters only engage in a kind of lyrical monologue, of which one of the other two is supposed to be as auditor, sometimes even no one at all."—*Sanskrit Literature*, p. 344

"The form of the poem is extremely original, and has led to the belief that we have in the poem a little pastoral drama, as Jones called it, or a lyric drama, as Lassen styled it, or a refined Yatra, as Von Schroeder preferred to term it. Pischel and Levi, on the other hand, placed it in the category between song and drama, on the ground *inter alia* that it is already removed from the Yatra type of dramatic performance by the fact that the transition verses are put in definite form and not left to improvisation, but Pischel also styles it a melodrama."—Keith : *History of Sanskrit Literature*, p. 191

'গীতগোবিন্দ' সম্বন্ধে Winternitz-এর মন্তব্যও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ

"At the first glance it might seem as if, in the love lyric of the Indians in contrast to the love songs of other nations, the sensual element out-weighed all else. It is true that it is very prominent in Indian love songs, often all too prominent for the Western taste.... And yet not infrequently we find true and deep sentiment and inward feeling in the erotic as well as in the religious lyric. Moreover, a deep feeling for Nature is genuine and unaffected in the Indian Lyric as in Indian poetry in general."—*History of Indian Literature*, Vol. III

১৮। গীতগোবিন্দে জয়দেব ইঁহাদের উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাম্।
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতেঃ॥
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়বচনৈরাচার্যগোবর্ধনৈঃ।
স্পর্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ॥

১৯। তুলঃ স দামোদরগুপ্তাখ্যং কুট্টনীমতকারিণম্।
কবিং কবিং বালমিব ধুর্যং ধীসচিবং ব্যধাৎ॥

—রাজতরঙ্গিণী, ৪.৪৯৬

নাম্নী এক কুরূপা রমণীর নিকট হইতে পুরুষচিত্ত জয় করার কৌশল কিরূপে আয়ত্ত করিয়াছিল, তাহাই ইহার বিষয়বস্তু।

কাশ্মীরী কবি **বিল্‌হণের চৌরপঞ্চাশিকা** একখানি উল্লেখযোগ্য লিরিক্‌ কাব্য। বিল্‌হণের পিতার নাম জ্যেষ্ঠকলশ এবং মাতার নাম নাগদেবী। যৌবনে তিনি বিভিন্ন দেশ পর্যটন করিয়াছিলেন এবং বুন্দেলখণ্ডের রাজা কৃষ্ণের রাজসভায় সম্মানের সহিত গৃহীত হইয়াছিলেন। কল্যাণরাজ বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্লের (১০৭৬—১১২৭ খৃঃ অঃ) রাজসভায় সাদরে গৃহীত হইয়া তিনি কিছুদিনের জন্য সেই রাজ্যের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার রচিত কাব্য **বিক্রমাঙ্কদেবচরিতের** কয়েকটি শ্লোক হইতে অনুমিত হয় যে সম্ভবতঃ শেষ দিকে তিনি রাজার বিরাগভাজন হইয়াছিলেন এবং রাজাদেশে তাঁহার সর্বস্ব বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল।[২০]

পঞ্চাশটি শ্লোকে রচিত **চৌরপঞ্চাশিকা** প্রেমিক কর্তৃক প্রেমিকার স্মৃতির কাব্যময় প্রকাশ। অনেকে বলেন ইহা কবির নিজের জীবনেরই কাহিনী। গুজরাটের রাজা বৈরিসিংহের কন্যা রাজকুমারী চন্দ্রলেখার[২১] শিক্ষক ছিলেন কবি। শিক্ষক ও ছাত্রীর মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হয় এবং রাজা তাহা জানিতে পারিয়া কবির মৃত্যুদণ্ডের আজ্ঞা দেন। বধ্যভূমিতে নীত হইয়া কবি চন্দ্রকলার উদ্দেশে মুখে মুখে পঞ্চাশটি শ্লোক রচনা করেন। কবি যখন শেষ শ্লোকটি[২২] পাঠ করিতে ছিলেন তখন ঘাতকগণ রাজার নিকট সেই সংবাদ বহন করিয়া লইয়া যায় এবং রাজা সন্তুষ্টচিত্তে কন্যাকে কবির হাতে সমর্পণ করেন। 'চোর পঞ্চাশৎ' বা 'চৌরী-সুরত-পঞ্চাশিকা' নামেও ইহা প্রসিদ্ধ। এক সময়ে মনে করা হইত যে 'চোর' নামে কোনও কবি ইহার রচয়িতা কিন্তু Buhler নিঃসংশয়ে বিল্‌হণকেই ইহার কবি বলিয়া মনে করেন।[২৩]

২০। তুলঃ সর্বস্বং গৃহবর্ত্তি কুন্তলপতির্গৃহাতু তন্মে পুন-
র্ভাণ্ডাগারমখণ্ডমেব হৃদয়ে জাগর্ত্তি সারস্বতম্‌।
রে ক্ষুদ্রাস্ত্যজত প্রমোদমচিরাদেষ্যন্তি মন্মন্দিরম্‌
হেলান্দোলিতকর্ণতালকরটিস্কন্ধাধিরূঢ়াঃ শ্রিয়ঃ ॥

২১। রাজা ও রাজকুমারীর নাম সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

২২। শ্লোকটি এই ঃ
পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহে স্বাংশা মিলন্তু ধ্রুবং
ধাতস্ত্বাং প্রণিপত্য সাদরমিদং যাচে নিবদ্ধাঞ্জলিঃ।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গনে
ব্যোম স্যাচ্চ তদীয়বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ ॥

২৩। ইহার প্রতিটি শ্লোক 'অদ্যাপি তাম্‌' দিয়া আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম শ্লোক হইতে মনে হয় রাজকুমারীর নাম ছিল বিদ্যা ঃ
অদ্যাপি তাং কনক-চম্পক-দাম-গৌরীম্‌
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুলোমরাজীম্‌।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বলালসাঙ্গীম্‌
বিদ্যাং প্রমাদগুণিতামিব চিন্তয়ামি ॥

'বিদ্যাসুন্দর' নামে আর একখানি খণ্ডকাব্যও এক রাজকুমারী ও তাঁহার প্রেমিকের মধ্যে কথোপকথনকে লইয়া রচিত। মনে হয় এই উভয় কাব্য একই কাহিনীর দ্বৈতরূপ। ভাষা ও রচনাশৈলীতেও উভয়ের অনেক সাদৃশ্য আছে। বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়ীর নাম 'চোর'। উহার শেষ শ্লোক হইতে ইহা জানা যায় ঃ
রাজা তানপি সেবকান্‌ সুবসনালঙ্কারভূষীকৃতান্‌
কৃত্বা ঘ্নন্তু বিপক্ষকং খরতরং খড়্‌গং সমানীয়তে।
নীত্বা তং ভবনাদ্‌ বহির্বিলসিতং রাজাত্মজং সাহসম্‌
দৃষ্টবা সংস্মর দেবতামিতি তদাঽপ্যেবং স চৌরোঽবদৎ ॥

অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দে বাঙালী কবি ভারতচন্দ্র এই উভয় কাব্যের সম্মিলিত রূপ হইতেই তাঁহার 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করিয়াছেন।

"The Suryasataka of Mayura and Bhaktamarastotra of Manatunga (and the Candisataka of Bana) are three opposing poems written by devotees of one or other of the great forms of religion which flourished side by side under Harsha's protection."—Peterson.

উত্তর-পশ্চিম ভারতের আনন্দপুর নামক স্থান তাঁহার পূর্বপুরুষদের বাসভূমি ছিল। সেখান হইতে তাঁহারা দাক্ষিণাত্যে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। স্থানীয় রাজকুমার বিষ্ণুবর্ধনের সহিত মৃগয়ায় গিয়া ভারবি এক সময়ে মাংসভক্ষণ করিতে বাধ্য হন এবং তজ্জনিত পাপ দূর করিবার জন্য তীর্থযাত্রা করেন। পথে দুর্বিনীত[৩১] নামক এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। কিছুদিনের জন্য ভারবি কাঞ্চীরাজ সিংহ-বিষ্ণুর পুত্র মহেন্দ্রবিক্রমের নিকটও অবস্থান করিয়াছিলেন।[৩২]

অষ্টাদশ সর্গে বিরচিত কিরাতার্জুনীয়ের আখ্যানভাগ মহাভারতের বন-পর্ব হইতে গৃহীত। বনবাসকালে পাণ্ডবেরা দ্বৈত বনে আগমন করেন। ব্যাসের উপদেশে সেখান হইতে তাঁহারা কাম্যক বনে গমন করেন এবং শিবের নিকট হইতে অস্ত্রলাভ করিবার জন্য অর্জুন ইন্দ্রকীল পর্বতে তপস্যা করিতে গমন করেন। তাঁহার দুশ্চর তপস্যায় ভীত দেবগণের প্রার্থনায় শিব ও পার্বতী কিরাতবেশে অর্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং একটি বরাহকে বাণবিদ্ধ করার ব্যাপার লইয়া অর্জুন ও কিরাতের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। অর্জুনের বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া কিরাতরূপী মহাদেব অর্জুনকে তাঁহার অভীষ্ট পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেন।

এই কাব্যের মধ্যে পৌরাণিক অংশ এবং অলৌকিকতা অধিক পরিমাণে সন্নিবেশিত হওয়ার ফলে আখ্যানভাগের বাস্তবতা বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। শব্দের যাদুকর ভারবি পঞ্চদশ সর্গে শব্দকে স্বেচ্ছামত গ্রথিত করিয়া অনেক সময়ে রচনায় এমন এক কৃত্রিম বন্ধের সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা স্থানে স্থানে বিরক্তিকর হইয়াছে।[৩৩] ভারবিতেই সর্বপ্রথম এই কৃত্রিম শব্দসজ্জা দেখা যায়। ইহার ফলে ভাবপ্রতীতি অনেক স্থানে ব্যাহত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থভূয়িষ্ঠ শব্দচয়নই তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য এবং তাঁহার কাব্যকে যে অর্থগৌরবের[৩৪] অধিকারী করা হয়, রচনার এই বৈশিষ্ট্যই তাহার মূল। ভাষার বাহ্য-রুক্ষতা অতিক্রম করিয়া ভারবির কাব্যরস পান করিতে হয় বলিয়াই মল্লিনাথ ভারবির কাব্যকে নারিকেল ফলের সহিত তুলনা করিয়াছেন।[৩৫] ভাব ও ভাষা অপরূপ প্রকাশভঙ্গীর সহিত যুক্ত হইয়া ভারবির কাব্যে যে নূতন মাধুরীর সৃষ্টি করিয়াছে তাহা কালিদাসের কাব্যে দেখা যায় না।

৩১। এই দুর্বিনীত কিরাতার্জুনীয়ের ১৫টি সর্গের টীকা রচনা করিয়াছেন।

৩২। জীবনী সম্বন্ধে M. Suryanarayana Sastri : *Lives of Sanskrit Poets* দ্রষ্টব্য।

৩৩। একটি মাত্র বর্ণকে লইয়া তিনি একটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

ন নোননুন্নো নুন্নোনো নানা নানাননা ননু।
নুন্নোঽনুন্নো ননুন্নেনো নানেনা নুন্ননুন্ননুৎ ॥

কখনও বা অপূর্ব কৌশলে শ্লোকের প্রতি পাদের প্রথমার্ধের বর্ণসংস্থানই বিপরীতভাবে দ্বিতীয়ার্ধে সন্নিবেশিত করিয়াছেন ঃ

দেবাকানিনিকাবাদে বাহিকাস্বস্বকাহিবা।
কাকারেভভরেকাকা নিস্বভব্যব্যভস্বনি ॥

৩৪। তুল ঃ প্রদেশবৃত্ত্যাপি মহান্তমর্থং প্রদর্শয়ন্তী রসমাদধানা।
সা ভারবেঃ সৎপথদীপিকেব রম্যা কৃতিঃ কৈরিব নোপজীব্যা ॥
—কৃষ্ণকবি, ভরতচরিত

৩৫। তুল ঃ নারিকেলফলসম্মিতং বচো ভারবেঃ সপদি তদ্বিভজ্যতে।
স্বাদয়ন্তু রসগর্ভনির্ভরং সারমস্য রসিকা যথেপ্সিতম্ ॥

একটি শ্লোকের কাব্যসৌন্দর্যের জন্য ভারবি **ছত্র-ভারবি** নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। শ্লোকটি এই ঃ

উৎফুল্লস্থলনলিনীবনাদমুষ্মাদুদ্ভূতঃ সরসিজসম্ভবঃ পরাগঃ।
বাত্যাভির্বিয়তি বিবর্তিতঃ সমন্তাদাধত্তে কনকময়াতপত্রলক্ষ্মীম্ ॥
—কিরাত, ৫.৩৯

ভর্তৃহরি

ভর্তৃহরি রচিত **ভট্টিকাব্য** বা **রাবণবধ** দ্বাবিংশ সর্গে বিভক্ত। এই দ্বাবিংশ সর্গ আবার চারিটি কাণ্ডে বিভক্ত—প্রকীর্ণকাণ্ড, প্রসন্নকাণ্ড, অলংকারকাণ্ড ও তিঙন্তকাণ্ড। 'ভর্তৃ' শব্দের প্রাকৃত রূপ 'ভট্টি' সুতরাং কবির নাম অনুসারেই কাব্যের নামকরণ হইয়াছে। রামের জন্ম হইতে রামকর্তৃক সীতার উদ্ধার, তাঁহার লংকা হইতে প্রত্যাবর্তন এবং রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে।

কবি নিজেই বলিয়াছেন যে তিনি বলভীরাজ শ্রীধরসেনের পৃষ্ঠপোষকতায় বলভীতে তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।[৩৬] শ্রীধরসেন নামে চারিজন রাজার কথা জানা যায় এবং তাঁহাদের মধ্যে শেষ জনের মৃত্যু হয় ৬৪১ খৃষ্টাব্দে। ঐ চারিজন নরপতি বলভীতে ৪৯৫ হইতে ৬৪১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহা হইতে অনুমান করা চলে যে ষষ্ঠ শতকের প্রথমভাগ হইতে সপ্তম শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ভর্তৃহরি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে মান্দাসোর লিপির বৎসভট্টিই ভট্টিকাব্যের কবি[৩৭] এবং **বাক্যপদীয়**-এর রচয়িতা কবি-বৈয়াকরণ ভর্তৃহরিও ঐ একই ব্যক্তি। এইরূপ অনুমানের পক্ষেও কোনও দৃঢ়যুক্তি দেখানো হয় নাই।[৩৮]

ভর্তৃহরি সম্বন্ধে প্রচলিত অনেকগুলি কাহিনী আছে। একটি কাহিনী অনুসারে এক ব্রাহ্মণের চারিবর্ণের চারিজন পত্নীর গর্ভে যথাক্রমে বররুচি, বিক্রমার্ক, ভট্টি ও ভর্তৃহরির জন্ম হয়। বিক্রমার্ক রাজা হইয়াছিলেন এবং ভট্টি তাঁহার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। আর একটি কাহিনী অনুসারে বলভীরাজ ভট্টারকই ভট্টি নামে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার সভাকবি ভর্তৃহরি এই কাব্য রচনা করিয়া রাজার নামে প্রচলিত করেন। তৃতীয় কাহিনী অনুসারে ভর্তৃহরি নিজেই রাজা ছিলেন। এক ব্রাহ্মণ ভর্তৃহরিকে একটি ফল উপহার দেন। ভর্তৃহরি সেই ফলটি তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীকে দান করেন। ভর্তৃহরি-পত্নী আবার সেই ফল তাঁহার প্রণয়ীকে দান করেন। ইহা জানিতে পারিয়া রাজা সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সংসারের প্রতি বীতস্পৃহা হইতেই যে পরবর্তীকালে তিনি শতকত্রয় রচনা করিয়াছিলেন এইরূপ ইংগিত সুভাষিতে পাওয়া যায়।[৩৯]

একটি কাহিনী হইতে জানা যায় যে ভর্তৃহরি তাঁহার শিষ্যাদিগকে যখন ব্যাকরণ শিক্ষা দিতেছিলেন তখন সেই স্থান দিয়া একটি হস্তী চলিয়া যায়। ইহাকে দুর্লক্ষণ মনে করিয়া এক বৎসরের জন্য তিনি ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া বন্ধ রাখেন এবং কাব্যের মধ্য দিয়া ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভট্টিকাব্য প্রণয়ন করেন। ভট্টি নিজেই

৩৬। কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং শ্রীধরসেননরেন্দ্রপালিতায়াম্।
কীর্তিরিয়ং ভবতাদতো নৃপস্য ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপো যতঃ প্রজানাম্॥

৩৭। B. C. Majumdar; *JRAS*, 1904, p. 306; Keith; *JRAS*, 1909, p. 435

৩৮। তুলঃ "The author was Bhartrihari, not, as might be supposed from the name, the celebrated brother of Vikramaditya but a grammarian and poet who was son of Sridhara Swami, as we are informed by one of his scholiasts, Vidyavinode."—Colebrook : *Essays* II, p. 116

৩৯। শ্লোকটি এই ঃ

সা রম্যা নগরী মহান্ স নৃপতিঃ সামন্তচক্রং চ তৎ
পার্শ্বে তস্য চ সা বিদগ্ধপরিষত্তাশ্চন্দ্রবিম্বাননাঃ॥
উদ্বৃত্ত স চ রাজপুত্রনিবহস্তে বন্দিনস্তাঃ কথাঃ
সর্বং যস্য বশাদগাৎ স্মৃতিপথং কালায় তস্মৈ নমঃ॥

—M. Suryanarayana Sastri: *Lives of Sanskrit Poets*, p. 85

ভট্টিকাব্যে বলিয়াছেন, যাঁহারা ব্যাকরণে পারদর্শী তাঁহারাই কেবল তাঁহার কাব্যের রসাস্বাদন করিতে পারিবেন।[৪০] তিনি আরও বলিয়াছেন, তাঁহার বিদ্যাবত্তার জন্য তাঁহার রচিত কাব্য ব্যাখ্যা ব্যতীত বোধগম্য হইবে না এবং কেবল সুধীবর্গই উহাতে আনন্দ পাইবেন, জড়ধীগণ অনুশোচনা করিবেন মাত্র।[৪১]

ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য লইয়া কবি তাঁহার কাব্য রচনা করিতে গিয়াছিলেন বলিয়াই অনেক সময়ে তাঁহাকে কষ্ট করিয়া শব্দচয়ন করিতে হইয়াছে। তাহার ফলে ভাষাতে শুধু কৃত্রিমতাই আসিয়া পড়ে নাই, ভাষা দুর্বোধ্যও হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি ভট্টিকাব্যে এমন অনেক স্থান আছে যাহা কাব্যসৌন্দর্যে অতুলনীয়। দ্বিতীয় সর্গে শরদ্‌বর্ণনা এইরূপ কাব্যসৌন্দর্যের অপূর্ব নিদর্শন। আবার সীতার রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে কবি যখন একের পর এক উপমার অবতারণা করিয়াও সেই অলৌকিক রূপলাবণ্যের মনোমত প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না[৪২], কুমুদ্বতী-রেণু-পিশঙ্গ-বিগ্রহ ভ্রমরকে চলমান পদ্মের উপর বসি বসি করিয়াও ব্যর্থকাম দেখিয়া কবি যখন সুরত-লম্পট দয়িতের প্রতি মানিনী দয়িতার অভিমান-ব্যঞ্জনার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন[৪৩] তখন সত্যই তাঁহার কবিত্বশক্তি আমাদিগকে মুগ্ধ করে।

ভামহ ও ভট্টির রচনাংশে বহুল সাদৃশ্য[৪৪] আছে। এই সাদৃশ্য এবং দশম সর্গে অলঙ্কারের বিবৃতি হইতে অনেকে ভট্টিকে ভামহের পরবর্তী বলিয়া মনে করেন। ভামহের কাল সম্বন্ধে মতভেদ থাকায় ভামহ ও ভট্টির পূর্বাপরত্ব সম্বন্ধেও মতভেদের নিরসন হয় নাই।

মাঘ

কালিদাসোত্তর যুগে কাব্য রচনা করিয়া যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন, মাঘ নিঃসংশয়ে তাঁহাদের অন্যতম। ধারারাজ্যের নরপতির পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি সাহিত্য-সাধনা করেন। কিংবদন্তী আছে, অভাবের তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া কবি একদিন একটি শ্লোক[৪৫] রচনা করিয়া পত্নীর হাতে দিয়া পত্নীকে রাজসভায় পাঠাইয়া দেন। রাজা শ্লোকটি দেখিয়া খুশী হন এবং কবি-জায়াকে কিছু অর্থ দান করেন। পথে আসিবার সময়ে কতকগুলি ভিক্ষুকের কাতর প্রার্থনায় কবি-জায়া সমস্ত অর্থ বিলাইয়া

৪০। তুলঃ দীপতুল্যঃ প্রবন্ধোঽয়ং শব্দলক্ষণচক্ষুষাম্।

৪১। তুলঃ ব্যাখ্যাগম্যমিদং কাব্যমুৎসবঃ সুধিয়ামলম্।
হতা দুর্মেধসশ্চাস্মিন্ বিদ্বৎপ্রিয়তয়া ময়া।

৪২। তুলঃ হিরন্ময়ী সাললতেব জঙ্গমা চ্যুতা দিবঃ স্থাস্নুরিবাচিরপ্রভা।
শশাঙ্ককান্তেরধিদেবতাকৃতিঃ সুতা দদে তস্য সুতায় মৈথিলী॥

৪৩। তুলঃ প্রভাতবাতাহতিকম্পিতাকৃতিঃ কুমুদ্বতীরেণুপিশঙ্গবিগ্রহম্।
নিরাস ভৃঙ্গং কুপিতেব পদ্মিনী ন মানিনী সংসহতেঽন্যসঙ্গমম্॥

৪৪। সাদৃশ্যঃ

ভামহ	ভট্টি
কাব্যান্যপি যদীমানি ব্যাখ্যাগম্যানি শাস্ত্রবৎ। উৎসবঃ সুধিয়ামেব হন্ত দুর্মেধসো হতাঃ॥ —২. ২০	ব্যাখ্যাগম্যমিদং কাব্যমুৎসবঃ সুধিয়ামলম্। হতা দুর্মেধসশ্চাস্মিন্ বিদ্বৎপ্রিয়তয়া ময়া॥ —২২. ৩৪
যথেবশব্দৌ সাদৃশ্যমাহতুর্ব্যতিরেকিণোঃ। দূর্বাকাণ্ডমিব শ্যামং তন্বী শ্যামা লতাযথা॥ —২. ৩১	যোষিদ্বৃন্দারিকা তস্য দয়িতা হংসগামিনী। দূর্বাকাণ্ডমিব শ্যামা ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা॥ —৫.১৮

৪৫। শ্লোকটি এইঃ
কুমুদবনমপশ্রি শ্রীমদম্ভোজখণ্ডং ত্যজতি মদমুলূকঃ প্রীতিমাংশ্চক্রবাকঃ।
উদয়মহিমরশ্মির্যাতি শীতাংশুরস্তং হতবিধিললিতানাং হা বিচিত্রো বিপাকঃ॥

দেন এবং যখন রিক্ত হস্তে গৃহে ফেরেন তখনও ভিক্ষুকের দল তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছে। এই অবস্থা শুনিয়া ও দেখিয়া কবি কয়েকটি শ্লোকে দারিদ্র্যের বেদনা বর্ণনা করিয়া সেই স্থানেই পড়িয়া মৃত্যুবরণ করেন। নরপতি এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং কবির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সকল ব্যবস্থা করিয়া দেন। পরে কবির স্মৃতিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য কবির নামে একটি গ্রামের নামকরণ করেন।[৪৬]

শিশুপালবধের শেষ দিকের পাঁচটি শ্লোক হইতে[৪৭] কবির পরিচয় কিছু কিছু জানিতে পারা যায়। কবির পিতার নাম দত্তক সর্বাশ্রয় এবং তাঁহার পিতামহ সুপ্রভদেব বর্মলা বা বর্মলাট নামক কোনও রাজার মন্ত্রী ছিলেন। ইহার বেশী কোনও সংবাদ কবি নিজে দেন নাই। মাঘের কতকগুলি উপমা একান্ত নিজস্ব এবং এইরূপ একটি উপমাতে[৪৮] অস্তগমনোন্মুখ সূর্য ও উদীয়মান চন্দ্রের মধ্যবর্তী অচলশিখরকে উভয় পার্শ্বে ঘণ্টা-বাঁধা হস্তীর সহিত তুলনা করিয়া তিনি **ঘণ্টা-মাঘ** নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন।

কবি নিজে কৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন এ কথা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে; কিন্তু অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধেও তাঁহার উদার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল এবং একস্থানে তিনি তাঁহার পিতামহ সুপ্রভদেব সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তাঁহার পিতামহের মন্ত্রণা রাজা বর্মলাট শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিতেন,[৪৯] যেমনভাবে জনগণ তথাগতের উপদেশাবলী শ্রবণ করিত। কৃষ্ণকে বোধিসত্ত্বের সহিত এবং শিশুপাল ও তাঁহার অনুচরবর্গকে মার ও তাহার অনুচরবর্গের সহিত তুলনা হইতেও[৫০] বৌদ্ধধর্মের প্রতি কবির অনুরাগই প্রকাশিত হয়। প্রভাচন্দ্র তাঁহার প্রভাবক-চরিতে মাঘের পিতৃব্য শুভংকরকে 'শ্রেষ্ঠী' আখ্যা দিয়াছেন। সাধারণতঃ জৈনগণ সম্বন্ধেই ঐ আখ্যা প্রচলিত। মাঘ যদি শিশুপালবধে কৃষ্ণকে পরমপুরুষ বলিয়া প্রচার না করিতেন তবে তাঁহাকে জৈন বা বৌদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করার পক্ষে কোনও প্রত্যক্ষ আপত্তি থাকিত না।

শিশুপালবধ হইতে প্রমাণিত হয় যে মাঘ শুধু বড় কবিই ছিলেন না, তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁহাকে অগাধ ব্যুৎপত্তিও দান করিয়াছিল। বিশেষ করিয়া মাঘ একজন বড় বৈয়াকরণ ছিলেন।[৫১] ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তির ছাপ তাঁহার রচনার প্রায় ছত্রে ছত্রে দেখা যায় এবং অনেক সময়ে মনে হয় হয়ত বা তিনি এই বিষয়ে ভট্টির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। শিশুপালবধের একটি শ্লোকে[৫২] তিনি **কাশিকাবৃত্তি** ও **ন্যাস** নামে ব্যাকরণশাস্ত্রের দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ বলেন। রাজনীতিশাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান শিশুপালবধের দ্বিতীয় সর্গে

৪৬। মেরুতুঙ্গের **প্রবন্ধচিন্তামণি**, প্রভাচন্দ্রের **প্রভাবকচরিত**, বল্লালের **ভোজ-প্রবন্ধ** প্রভৃতিতে এইরূপ কিংবদন্তীর উল্লেখ আছে।

৪৭। বল্লভদেব এই শ্লোকগুলির টীকা করিয়াছেন, কিন্তু মল্লিনাথ করেন নাই।

৪৮। শ্লোকটি এই ঃ
উদয়তি বিততোর্ধ্বরশ্মিরজ্জাবহিমরুচৌ হিমধাম্নি যাতি চাস্তম্।
বহতি গিরিরয়ং বিলম্বিঘণ্টাদ্বয়পরিবারিতবারণেন্দ্রলীলাম্ ॥—শি. শু. ৪. ২০.

৪৯। তুল ঃ কালে মিতং তথ্যমুদর্কপথ্যং তথাগতস্যেব জনঃ সচেতাঃ।
বিনানুরোধাৎ স্বহিতেচ্ছয়ৈব মহীপতির্যস্য বচশ্চকার ॥

৫০। দ্রষ্টব্য ঃ শিশু., ১৫. ৫৮

৫১। একটি পুঁথিতে তাঁহার কাব্যের সমাপ্তি-বাক্য (colophon) এইরূপ ঃ
শ্রীভিন্নমালববাস্তব্যদত্তকসূনোর্মহাবৈয়াকরণস্য মাঘস্য কৃতৌ।

৫২। অনুৎসূত্রপদন্যাসা সদ্বৃত্তিঃ সন্নিবন্ধনা।
শব্দবিদ্যেব নো ভাতি রাজনীতিরপস্পশা ॥—শিশু., ২. ১১২

উদ্ধব ও বলরামের ভাষণে পরিস্ফুট হইয়াছে। উদ্ধব তাঁহার সুদীর্ঘ ভাষণে রাজার স্বরূপ সম্বন্ধে যখন বলিতেছেন ঃ

বুদ্ধিশস্ত্রঃ প্রকৃত্যঙ্গো ঘনসংবৃতিকঞ্চুকঃ।
চারেক্ষণো দূতমুখঃ পুরুষঃ কোঽপি পার্থিবঃ॥—শিশু, ২.৮২

তখন তাঁহাকে আমরা প্রবীণ রাজনীতিবিশারদরূপে দেখিতে পাই। বৌদ্ধ দর্শন[৫৩], সাংখ্যদর্শন[৫৪], কামশাস্ত্র[৫৫], অলঙ্কারশাস্ত্র[৫৬], জ্যোতিঃশাস্ত্র[৫৭], পুরাণ[৫৮] প্রভৃতিতেও তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

সোমদেব তাঁহার **যশস্তিলকচম্পূতে**, রাজশেখর তাঁহার **কাব্যমীমাংসায়**, আনন্দবর্ধন তাঁহার **ধ্বন্যালোকে**, ভোজ তাঁহার **সরস্বতীকণ্ঠাভরণে** মাঘের উল্লেখ করিয়াছেন। **সুভাষিতাবলী**, **ঔচিত্যবিচারচর্চা** প্রভৃতি গ্রন্থেও মাঘের রচিত বলিয়া কয়েকটি শ্লোক[৫৯] উদ্ধৃত হইয়াছে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে মাঘের পিতামহ সুপ্রভদেব বর্মল নামক নরপতির মন্ত্রী ছিলেন। বর্মলাট নামক একজন নরপতির একটি লিপি (৬২৫ খৃষ্টাব্দ) পাওয়া গিয়াছে। এই বর্মলাট ও বর্মল যদি একই ব্যক্তি হন তবে সপ্তম খৃষ্টাব্দকেই মাঘের আবির্ভাবকাল বলিয়া মনে করা চলিতে পারে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে মাঘ কাশিকাবৃত্তি ও ন্যাসের উল্লেখ করিয়াছেন। কাশিকাবৃত্তি জয়াদিত্য ও বামনের রচিত। I-tsing-এর মতে ৬৬১ খৃষ্টাব্দে জয়াদিত্যের মৃত্যু হয়। এদিক দিয়া বিচার করিলেও **সপ্তম খৃষ্টাব্দই মাঘের আবির্ভাবকাল বলিয়া মনে হয়।**[৬০] বামন অষ্টম খৃষ্টাব্দে এবং আনন্দবর্ধন নবম খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি মাঘের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাও পূর্বোক্ত অনুমানকেই সমর্থন করে।[৬১]

৫৩। শিশু. ২.২৮ ৫৪। ঐ. ২.৫৯ ৫৫। ঐ. ২.৪৪
৫৬। ঐ. ২.৮৭ ৫৭। ঐ. ২.৩৫ ৫৮। ঐ. ২.৩৮, ১০৭

৫৯। এই শ্লোকগুলি শিশুপালবধে পাওয়া যায় না। অনুমান করা চলিতে পারে শিশুপালবধই মাঘের একমাত্র রচনা নহে।

৬০। I-tsing কাশিকাবৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু উহার টীকা ন্যাসের উল্লেখ করেন নাই। ইহা হইতে K. B. Pathak মনে করেন যে কাশিকাবৃত্তিকার জয়াদিত্যের মৃত্যু এবং I-tsing-এর ভারত পরিত্যাগের মধ্যে যে ৪৪ বৎসর ব্যবধান তাহার মধ্যে ন্যাসকার জিনেন্দ্রবুদ্ধির আবির্ভাব হয় নাই; সুতরাং ন্যাস অষ্টম শতকের প্রথমে রচিত এবং মাঘ যখন ন্যাসের উল্লেখ করিয়াছেন তখন তিনিও অষ্টম শতাব্দীর (*JBRAS.*, X.X, p. 303)। Kielhorn বলেন যে, অনুৎসূত্র...ইত্যাদি শ্লোকে 'ন্যাস' পদ কাশিকাবৃত্তির টীকা ন্যাসগ্রন্থকে বুঝায় নাই, শুধু 'বৃত্তি' পদের সান্নিধ্যের জন্যই ব্যাখ্যাতৃগণ ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ জিনেন্দ্রবুদ্ধি মাঘের অনেক পরে; কারণ জিনেন্দ্রবুদ্ধি হরদত্তের পদমঞ্জরী হইতে অনেক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ঐ পদমঞ্জরীতেই একাধিকবার মাঘের উল্লেখ আছে (*JRAS*, 1908, p. 499)। Keith এই মত সমর্থন করেন না ঃ

"What is more important is that in II, 112 the only natural interpretation of the verse is that we have a reference to the Nyasakara, a commentator on the Kasika, Jinendrabuddhi, whose date must be c. A. D. 700. It is much wiser to accept this date and to place Magha about that time than to endeavour to explain the passage away, and there is no reason whatsoever to think the date too late."—*History of Sanskrit Literature.*, p. 124.

৬১। ..."but what is fairly certain is that the lower terminus of his date is furnished by the quotation from his poem by Vamana and Anandavardhana at the end of the 8th and in the middle of the 9th century A.D. respectively, and the upper terminus by the very likely presumption that he is later than Bharavi whom he appears to emulate."—Das Gupta & De, p. 189

মেরুতুঙ্গের **প্রবন্ধচিন্তামণি** হইতে আমরা জানিতে পারি যে গুজরাটের মাল নামক স্থানে মাঘের জন্ম হয় এবং মালবান্তঃপাতি ধারা রাজ্যের নরপতি ভোজের তিনি সমসাময়িক। বল্লাল ভোজপ্রবন্ধেও তাহাই বলিয়াছেন। প্রভাচন্দ্রের **প্রভাবক-চরিতে** বলা হইয়াছে যে মাঘের পিতৃব্যপুত্র সিদ্ধ **উপমিতিভবপ্রপঞ্চ** নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ঐ দুইখানি গ্রন্থ অনুসারে **দশম বা একাদশ শতাব্দীই** মাঘের আবির্ভাবকাল। নরপতি ভোজ তাঁহার সরস্বতীকণ্ঠাভরণে মাঘের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনিও একাদশ খৃষ্টাব্দের।

মাঘ তাঁহার শিশুপালবধের বিষয়বস্তু মহাভারত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। তবে কোনও কোনও অংশে মহাভারতের মূল আখ্যানভাগ হইতে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। শিশুপালই যে পূর্বজন্মে রাবণ ও হিরণ্যকশিপু ছিলেন, ইহা মাঘ বিষ্ণুপুরাণ[৬২] ও ভাগবতপুরাণ[৬৩] হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। মহাভারতে মাত্র অংশতঃ ইহার উল্লেখ দেখা যায়।[৬৪] যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে অর্ঘ্য পাইবার যোগ্যতম অধিকারী যে কৃষ্ণ সে কথা শিশুপালবধে ও মহাভারতে ভীষ্ম বলিয়াছেন, ভাগবতপুরাণে সে কথা সহদেবের মুখে। কৃষ্ণ যে শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন ইহার উল্লেখ মহাভারতে আছে, কিন্তু ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে নাই। এইরূপ আলোচনায় দেখা যায়, মাঘ প্রধানতঃ মহাভারতকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণ কর্তৃক চেদিরাজ দমঘোষের ঔরসে শ্রুতশ্রবার গর্ভে জাত শিশুপালের নিধন-কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া ২০টি সর্গে বিভক্ত মহাকাব্য **শিশুপালবধ**। প্রথম সর্গে নারদ শ্রীহরির নিকট উপস্থিত হইলেন। হরি কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া কুশলপ্রশ্নাদির পর, পূর্বে হিরণ্যকশিপু ও রাবণের অত্যাচার হইতে শ্রীহরি কিরূপে পৃথিবীকে মুক্ত করিয়াছিলেন তাহারই বর্ণনা করিয়া নারদ তাঁহাদেরই অবতার শিশুপালের অত্যাচার-কাহিনী বর্ণনা করিলেন এবং ইন্দ্র শিশুপালকে বধ করিবার জন্য নারদের মাধ্যমে কৃষ্ণের নিকট যে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহাও বলিলেন। শ্রীহরি সম্মতি দান করিলেন। দ্বিতীয় সর্গে দেখা যায়, শিশুপালকে বধ করিবার জন্য কৃষ্ণ যুদ্ধযাত্রায় উদ্যত এমন সময় যুধিষ্ঠিরের আমন্ত্রণ আসিয়া পৌঁছিল। কর্তব্যনির্ধারণে বিমূঢ় কৃষ্ণ উদ্ধব ও বলরামকে আহ্বান করিলেন মন্ত্রণার জন্য। এই সর্গে উদ্ধব ও বলরামের দীর্ঘ ভাষণ রাজনীতির বিশদ ব্যাখ্যায় পূর্ণ। শেষ তিন সর্গে কৃষ্ণ ও শিশুপালের যুদ্ধের বর্ণনা।

কাব্যসৌন্দর্যে ও গৌরবে ভারবির **কিরাতার্জুনীয়**কে অতিক্রম করিবার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা লইয়া মাঘ তাঁহার শিশুপালবধ রচনা করেন, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে।[৬৫]

৬২। বি, পু., ৪. ১৪. ১২. ১৩ ৬৩। ভাগ., ৭. ১. ৩৮; ৩. ১৫. ১৬

৬৪। তুলঃ দিতেঃ পুত্রস্ত যো রাজন্ হিরণ্যকশিপুঃ স্মৃতঃ।
স যজ্ঞে মানুষে লোকে শিশুপালো নরর্ষভঃ॥

৬৫। কিরাতার্জুনীয় ও শিশুপালবধের একটি সুদীর্ঘ ও তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া Jacobi প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে ভারবির কিরাতার্জুনীয়কে লক্ষ্য করিয়াই মাঘ তাঁহার শিশুপালবধ রচনা করিয়াছেন। উভয় কাব্যই 'শ্রী' শব্দ দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম সর্গে শিশুপালবধে কৃষ্ণ ও নারদের কথোপকথনের ন্যায় কিরাতে যুধিষ্ঠির ও কিরাতের কথোপকথন, উভয় মহাকাব্যেই দ্বিতীয় সর্গে রাজনীতির আলোচনা, যুদ্ধের বর্ণনা দ্বারা উভয় মহাকাব্যের পরিসমাপ্তি প্রভৃতি এ বিষয়ে লক্ষণীয়। কবি হিসাবে ভারবি ও মাঘের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তুলঃ

"Like Bharavi, he is a poet not of love, but of the art of love; but he can refine the rather indelicate theme of amorous sports with considerable delicacy. It is perhaps not fortuitous that Magha selects Krishna, and not Siva, as his favourite god. The Indian opinion speaks

মাঘ এ বিষয়ে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন তাহা প্রচলিত শ্লোক হইতে বুঝা যায়। মাঘের কাব্যে কালিদাসের উপমা, ভারবির অর্থগৌরব এবং দণ্ডীর পদলালিত্যের অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছে এরূপ অনেকে এক সময়ে মনে করিয়াছিলেন।[৬৬] একথা অনেকে মাঘের জনপ্রিয়তার অতিরঞ্জিত প্রকাশ বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ ভারবিকে লক্ষ্য করিয়া কাব্য রচনা করিতে যাওয়ার উদগ্র চেষ্টা মাঘের মৌলিকতাকে অনেকাংশে খর্ব করিয়াছে। ভারবির গুণগুলি তিনি তাঁহার কাব্যে দেখাইতে পারিয়াছেন সত্য, কিন্তু ভারবির দোষগুলিও তাঁহার কাব্যে অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকট হইয়া পড়িয়াছে।[৬৭] অসাধারণ কবিত্বশক্তির ও অনবদ্য প্রতিভার অধিকারী হইয়াও শুধু পূর্ববর্তী কবিগণের শক্তি ও যশকে ম্লান করার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা লইয়াই মাঘ তাঁহার কবিজীবনের যাত্রা শুরু করিয়াছিলেন, যাহার ফলে স্বীয় মৌলিকতাকে কখনই তিনি স্বকীয় ছন্দে চলিতে দেন নাই। ফলে তাঁহার স্বকীয়তা সংস্কৃত সাহিত্যকে যাহা দিতে পারিত তাহা দেয় নাই; কিন্তু যাহা দেয় নাই তাহা দেওয়ার শক্তি যে তাঁহার ছিল তাহার প্রমাণ শিশুপালবধের সর্বত্র রহিয়াছে। অলঙ্কার-সৌন্দর্যে ও ছন্দের ব্যবহারে[৬৮] মাঘ অবশ্যই ভারবিকে অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু কাব্যসৌন্দর্যে শিশুপালবধ কিরাতার্জুনীয়কে অতিক্রম করিয়াছে একথা মনে হয় না। ভাষার যাদুকর মাঘ ভাষাকে ইচ্ছামত রূপদান করিবার কৌশল অনেক সময়ে অতিরিক্ত মাত্রায় দেখাইয়া পাঠকরুচিকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন।[৬৯] নিজের কাব্যের বৈশিষ্ট্যের কথা মাঘ নিজেই বলিয়াছেন ঃ

মদীয়সীমপি ঘনামনল্পগুণকল্পিতাম্।
প্রসারয়ন্তি কুশলাশ্চিত্রাং বাচং পটীমিব॥—২. ৭৪

শব্দ ও অর্থের সমন্বয়ই যে সৎ-কবির পরমা সৃষ্টি, অনুজ্ঝিতার্থসম্বন্ধ প্রবন্ধই যে কবিত্বশক্তির পরাকাষ্ঠা ইহা মাঘ নিজেই বলিয়াছেন ঃ

শব্দার্থৌ সৎকবিরিব দ্বয়ং বিদ্বানপেক্ষতে।—২.৮৬
অনুজ্ঝিতার্থসম্বন্ধঃ প্রবন্ধো দুরুদাহরঃ॥—২.৭৩

এবং স্বীকার করিতেই হইবে যে শিশুপালবধে মাঘ সে শক্তির পরিচয়ও দিয়াছেন।

highly of his devotional attitude, and Bhisma's panegyric of Krishna, to which Bharavi has nothing corresponding, is often praised; but one at once observes here the difference in the temperament of the two poets."—Das Gupta & De, p. 193

৬৬। তুলঃ (১) উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
দণ্ডিনঃ পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ।
(২) তাবদ্ভাঃ ভারবের্ভাতি যাবৎ মাঘস্য নোদয়ঃ।
উদিতে চ পুনর্মাঘে ভারবের্ভারবেরিব॥

৬৭। তুলঃ "His poem is a careful mosaic of the good and the bad of his predecessors, some of whose inspirations he may have caught, but some of whose mannerism he develops to no advantage." —Das Gupta & De, p. 193

৬৮। ভারবি একটি সর্গে যেখানে ১৬টি ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন, মাঘ একটি সর্গে সেখানে ২২টি ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন।

৬৯। "The worst of his sins is his deplorable exhibition in XIX of his power of twisting language."—Keith

গদ্য-কাব্য

[PROSE ROMANCE OR KUNSTROMAN]

কাব্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—শ্রব্য ও দৃশ্য। শ্রব্য কাব্যগুলির কতক গদ্যে[১], কতক আবার পদ্যে রচিত। সংস্কৃতে গদ্য-কাব্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(ক) কথা, (খ) আখ্যায়িকা। ভামহ কথা ও আখ্যায়িকার পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন।[২] তাঁহার মতে আখ্যায়িকার নায়ক স্বীয় অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করিবেন। ইহা সরল গদ্যে রচিত হইবে, মাঝে মাঝে বক্ত্র ও অপরবক্ত্র ছন্দে রচিত শ্লোক থাকিবে এবং 'উচ্ছ্বাসে' বিভক্ত হইবে। কন্যাহরণ, যুদ্ধ, বিরহ প্রভৃতির মধ্য দিয়া শেষ পর্যন্ত নায়ককে বিজয়ী করা হইবে। আখ্যায়িকা সংস্কৃতেই রচিত হইবে। 'কথা' সংস্কৃত বা অপভ্রংশে রচিত হইতে পারে। কল্পিত কাহিনী অবলম্বনে ইহা রচিত হয় এবং নায়ক ব্যতীত অপর কেহ ইহার বক্তা হইবেন। বক্ত্র বা অপরবক্ত্র ছন্দে রচিত শ্লোক বা উচ্ছ্বাস-বিভাগ ইহাতে থাকিবে না। দণ্ডী কিন্তু এই ভেদ মানেন নাই।[৩] বাণের হর্ষচরিত ও কাদম্বরীকে যথাক্রমে আখ্যায়িকা ও কথার উদাহরণরূপে দেখানো হইলেও ভামহের সংজ্ঞার অনুসরণ ইঁহারা করেন নাই। মনে হয় কথা ও আখ্যায়িকা-শ্রেণীর যে রচনা দেখিয়া ভামহ সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের হস্তগত হয় নাই।[৪] ভামহের সংজ্ঞা যে পরবর্তী কবিগণ অনুসরণ করেন নাই তাহা বুঝা যায় যখন দেখি কাদম্বরীর সহিত ভামহ-নির্দিষ্ট কথার সংজ্ঞা না মিলিলেও বাণ কাদম্বরীকে 'কথা'ই বলিয়া গিয়াছেন।[৫] Peterson বলেন যে ভামহ-নির্দিষ্ট কথা-সংজ্ঞা কাদম্বরী সম্বন্ধে

১। গদ্যের সংজ্ঞা এইরূপঃ 'বৃত্তগন্ধোজ্ঝিতং গদ্যম্'।

২। তুলঃ প্রকৃতানাকুলশ্রব্যশব্দার্থপদবৃত্তিনা।
গদ্যেন যুক্তোদাত্তার্থা সোচ্ছ্বাসাখ্যায়িকা মতা ॥
বৃত্তমাখ্যায়তে তস্যাং নায়কেন স্বচেষ্টিতম্।
বক্ত্রং চাপরবক্ত্রং চ কালে ভাব্যর্থশংসি চ ॥
কবেরভিপ্রায়কৃতৈঃ কথনৈঃ কৈশ্চিদঙ্কিতা।
কন্যাহরণসংগ্রামবিপ্রলম্ভোদয়ান্বিতা ॥
ন বক্ত্রাপরবক্ত্রাভ্যাং যুক্তা নোচ্ছ্বাসবত্যপি।
সংস্কৃতং সংস্কৃতাচেষ্টা কথাপভ্রংশভাক্ তথা ॥
অন্যৈঃ স্বচরিতং তস্যাং নায়কেন তু নোচ্যতে।
স্বগুণাবিষ্কৃতিং কুর্যাদভিজ্ঞাতঃ কথং জনঃ ॥ —কাব্যালঙ্কার

৩। তুলঃ অপাদঃ পদসন্তানো গদ্যমাখ্যায়িকা কথা।
ইতি তস্য প্রভেদৌ দ্বৌ তয়োরাখ্যায়িকা কিল ॥
নায়কেনৈব বাচ্যান্যা নায়কেনেতরেণ বা।
স্বগুণাবিষ্ক্রিয়া দোষো নাত্র ভূতার্থশংসিনঃ ॥
অপিত্বনিয়মো দৃষ্টস্তথাপ্যন্যৈরুদীরণাৎ।
অন্যো বক্তা স্বয়ং বেতি কীদৃগ্ বা ভেদকারণম্ ॥
বক্ত্রং চাপরবক্ত্রং চ সোচ্ছ্বাসত্বং চ ভেদকম্।
চিহ্নমাখ্যায়িকায়াশ্চেৎ প্রসঙ্গেন কথাস্বপি ॥
আর্যাদিবৎ প্রবেশঃ কিং ন বক্ত্রাপরবক্ত্রয়োঃ।
ভেদশ্চ দৃষ্টো লম্ভাদিরুচ্ছ্বাসো বাস্তু কিং ততঃ ॥
তৎকথাখ্যায়িকেত্যেকা জাতিঃ সংজ্ঞাদ্বয়াঙ্কিতা।
অত্রৈবান্তর্ভবিষ্যন্তি সর্বে চাখ্যা জাতয়ঃ ॥

৪। রুদ্রটের সংজ্ঞা কিন্তু কাদম্বরী ও হর্ষচরিতের সহিত মেলে।

৫। দ্বিজেন তেনাক্ষতকণ্ঠকৌণ্ঠ্যয়া মহামনোমোহমলীমসান্ধয়া।
অলব্ধবৈদগ্ধ্যবিলাসমুগ্ধয়া ধিয়া নিবদ্ধেয়মতিদ্বয়ী কথা ॥—কাদম্বরী

প্রযুক্ত হইতেই পারে না, যশস্তিলকচম্পূ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। কথার উদাহরণ সম্বন্ধে জোর করিয়া কাদম্বরীকে টানিয়া আনা হইয়াছে, কারণ যাঁহারা টানিয়া আনিয়াছেন জৈন গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে তাঁহাদের উদার মনোভাব ছিল না। তাঁহারা ভামহের সংজ্ঞাকেও ছাড়িতে পারেন নাই, আবার সেই সংজ্ঞার অনুগামী দ্বিতীয় গ্রন্থও খুঁজিয়া পান নাই। ফলে বাধ্য হইয়া কাদম্বরীকেই কথা-সাহিত্যের উদাহরণরূপে উল্লেখ করিতে হইয়াছে।[৬]

দণ্ডী, সুবন্ধু, ও বাণের রচনা ছাড়া গদ্য-কাব্য বলিতে উল্লেখযোগ্য কিছু নাই। কালিদাসের পূর্বে পদ্য-কাব্যে অশ্বঘোষের রচনা, দৃশ্যকাব্যে ভাসের নাটকচক্র তবু পাওয়া যায়; কিন্তু গদ্য-কাব্যে দণ্ডী-সুবন্ধু-বাণের পথিকৃৎ কাহারা তাহার সন্ধান এখনও হয় নাই। কাত্যায়নের বার্তিকে আখ্যায়িকার উল্লেখ আছে। **বাসবদত্তা, সুমনোত্তরা** ও **ভৈমরথী** নামে তিনখানি গদ্য-কাব্যের উল্লেখ পতঞ্জলি করিয়াছেন।[৭] বররুচির চারুমতী,[৮] সোমিলের শূদ্রক-কথা,[৯] শ্রীপালিতের তরঙ্গবতী,[১০] ধনপাল উল্লিখিত ত্রৈলোক্যসুন্দরী[১১] প্রভৃতি গদ্য-কাব্য আজ নামমাত্রে পর্যবসিত। বাণ নিজে ভট্টার হরিচন্দ্রের গদ্যবন্ধের উল্লেখ করিয়াছিলেন।[১২] শীলাভট্টারিকা নামে আরও একজন গদ্যরচয়িত্রীর নাম পাওয়া যায়।[১৩] সুতরাং, দণ্ডী-সুবন্ধু-বাণ যে গদ্য-কাব্য রচনার ক্ষেত্রে পুরোধা নহেন ইহা অনস্বীকার্য।

তুলঃ "It is noteworthy, however, that later rhetoricians do not expressly speak of the essential distinction based upon tradition and fancy, although they emphasise the softer character of the Katha by insisting that its main issue is Kanya-labha, which would give free scope to the delineation of the erotic sentiment."—Das Gupta & De, p. 204

৬। "This is a description wholly inapplicable to Kadambari, but it is an exact description of Yasastilakacampu. I conclude that the definition of Katha was drawn up at a time when the literary pantheon of India opened its doors to adherents of all creeds and that Kadambari was dragged into the explanation by later fanatics who abhorred the Jain and his works and would find no better illustration among the books left to them of a definition which they were too conservative to abandon."—Peterson

৭। মহাভাষ্য, ৪. ৩. ৮৭; দ্রষ্টব্যঃ ঐ, ৫. ২, ৯৫

৮। চারুমতী ছাড়াও ভোজ মনোবতী ও শাতকর্ণীহরণ নামক দুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন (শৃঙ্গার প্রকাশ, ২৮.৩)। দণ্ডী মনোবতীর উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন ঃ

ধবলপ্রভবা রাগং সা তনোতি মনোবতী।—অবন্তিসুন্দরী

৯। তুলঃ তৌ শূদ্রককথাকারৌ রম্যৌ রামিল-সোমিলৌ।
কাব্যং যয়োর্দ্বয়োরাসীদর্ধনারীশ্বরোপমৌ ॥—জল্হণ;
শূদ্রক-কথা রামিল ও সোমিল উভয়ের রচনা।

১০। তুলঃ পুণ্যা পুণাতি গঙ্গেব গাং তরঙ্গবতী কথা।—ধনপাল, তিলকমঞ্জরী। খুব সম্ভব ইহা প্রাকৃতে রচিত। শ্রীপালিত হালের সভাকবি ছিলেন। ধর্মপাল ও অভিনন্দ ইঁহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

১১। ইহা রুদ্রের রচিত। ধনপাল, তাঁহার তিলকমঞ্জরীতে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।
সমবান্ধকবিধ্বংসী রুদ্রঃ কৈর্নাভিনন্দ্যতে।
সুশ্লিষ্টললিতা যস্য কথা ত্রৈলোক্যসুন্দরী ॥

১২। পদবন্ধোজ্জ্বলো হারী কৃতবর্ণক্রমস্থিতিঃ।
ভট্টারহরিচন্দ্রস্য গদ্যবন্ধো নৃপায়তে ॥—হর্ষচরিত

১৩। শব্দার্থয়োঃ সমো গুম্ফো পাঞ্চালীরীতিরিষ্যতে।
শীলাভট্টারিকাবাচি বাণোক্তিষু চ সা যদি ॥—জল্হণ, সূক্তিমুক্তাবলী

অনেকে মনে করেন, সংস্কৃতের গদ্য-কাব্যে গ্রীক গদ্য-কাব্যের প্রভাব আছে এবং হিন্দুগণ গ্রীক সাহিত্য হইতেই উহা গ্রহণ করেন। বিশেষ করিয়া Peterson এই মত পোষণ করেন।[১৪] Levy-র মতে সংস্কৃত গদ্য-কাব্যের সহিত গ্রীক ও ল্যাটিন গদ্য-কাব্যের একটি লক্ষণীয় পার্থক্য আছে। সংস্কৃত গদ্য-কাব্যে মূল আখ্যানভাগের প্রতি তত মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। অলঙ্কার-পারিপাট্য, প্রাকৃতিক বর্ণনা এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি ব্যাপারে বর্ণনার দিকটিই সেখানে কবির সর্বাধিক মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। গ্রীক ও ল্যাটিন গদ্য-কাব্য ঠিক ইহার বিপরীত। আখ্যানভাগ সেখানে নব নব বৈচিত্র্য লইয়া অগ্রসর হইয়াছে, ঘটনা-সমারোহ সেখানে প্রচুর, প্রাণবন্ত এবং দ্রুত পটপরিবর্তনশীলা। কিন্তু রচনাশৈলী ও বর্ণনার ক্ষেত্রে রচয়িতা যেন উদাসীন।[১৫]

দণ্ডী

দণ্ডীর পিতামাতা কাঞ্চীর অধিবাসী ছিলেন। বাল্যকালেই দণ্ডীর পিতার ও মাতার মৃত্যু হয়। সরস্বতী ও শ্রুত নামে দুইজন তাঁহার লালন-পালন করেন।[১৬] ৬৫৫ খৃষ্টাব্দে চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য কাঞ্চী অধিকার করিলে দণ্ডী জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমণে বাহির হন। পরে পল্লবনরপতি নরসিংহবর্মা কর্তৃক কাঞ্চী পুনরধিকৃত হইলে দণ্ডী দেশে ফিরিয়া আসেন এবং রাজসভায় উচ্চপদে নিযুক্ত হন।

দশকুমার রচয়িতা দণ্ডী ও কাব্যাদর্শ রচয়িতা দণ্ডী একই ব্যক্তি কি না এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কাব্যাদর্শের দণ্ডী কথা ও আখ্যায়িকার লক্ষণভেদ স্বীকার করেন নাই এবং দশকুমারচরিতে ঐ লক্ষণভেদ সর্বথা অনুসৃত হয় নাই বলিয়া অনেকে মনে করেন উক্ত দুই দণ্ডী একই ব্যক্তি। আবার আলঙ্কারিক দণ্ডী যে মত পোষণ করেন, দশকুমারচরিতের গদ্য-রচনার রচয়িতা তাহা মানিয়া চলেন নাই, সুতরাং এই উভয় দণ্ডী পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়াও অনেকে মনে করিয়াছেন। ইহাও অনেকে বলিয়াছেন যে দশকুমারচরিত লেখকের অল্প বয়সের রচনা এবং কাব্যাদর্শ পরিণত বয়সের রচনা, সুতরাং উক্ত পার্থক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু দশকুমারচরিতে কোথাও কাঁচা হাতের পরিচয় পাওয়া যায় না। কাব্যাদর্শকে অষ্টম শতাব্দীর রচনা বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে এবং দশকুমারচরিত যে কাব্যাদর্শের পূর্বে রচিত হইয়াছিল এরূপ মনে করিবার পক্ষে কোনও কারণ পাওয়া যায় না। দুই দণ্ডী একই ব্যক্তি হউন বা না হউন, দুইজনেরই কাল আমাদের নিকট অজ্ঞাত।

অবন্তিসুন্দরীকথার সহিত বাণের কাদম্বরীর পূর্বভাগের রচনারীতির, এমন কি আখ্যানাংশেরও মিল আছে, অথচ উত্তরভাগের সহিত কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে বাণপুত্র পুলিন্দ কাদম্বরীর উত্তরভাগ রচনা করার পূর্বে দণ্ডী অবন্তিসুন্দরীকথা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। দণ্ডী নিজে ভামহের সমালোচনা করিয়াছেন এবং বামন আবার দণ্ডীর সমালোচনা করিয়াছেন; সুতরাং ভামহ ও বামনের মধ্যবর্তী তিনি। দশকুমারচরিতে যে ভৌগোলিক বিবরণ পাওয়া যায় তাহা হইতে মনে হয় যে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের পূর্বেই দণ্ডী উহা রচনা করিয়াছিলেন। দশকুমারচরিতের রচনাশৈলী সহজ ও অনাড়ম্বর, তাহা কাদম্বরীর রচনাশৈলীর পূর্বভাবিত্বই সূচিত করে। বাণের পূর্বে **সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে দণ্ডীর আবির্ভাব হইয়াছিল** ইহা মনে করা অসংগত নহে।

১৪। দ্রষ্টব্য: Peterson's *Introduction to Kadambari*

১৫। দ্রষ্টব্য: G. Banerjee: *Hellenism in Ancient India*

১৬। স বাল এব মাত্রা চ পিত্রা চাপি ব্যযুজ্যত।
অয়ুজ্যত গরীয়স্যা সরস্বত্যা শ্রুতেন চ॥—অবন্তিসুন্দরীকথাসার।

দণ্ডীর তিনখানি গ্রন্থ আছে।[১৭] **দশকুমারচরিত** দুই অংশে বিভক্ত—পূর্বপীঠিকা ও উত্তরপীঠিকা। পূর্বপীঠিকায় পাঁচটি এবং উত্তরপীঠিকায় আটটি উচ্ছ্বাস আছে। উত্তরপীঠিকার শেষ চারিটি উচ্ছ্বাসের নাম **শেষ**। **চক্রপাণি দীক্ষিত** নামে দাক্ষিণাত্যবাসী কোনও লেখক কর্তৃক ইহা পরবর্তীকালে রচিত হইয়াছে। দশকুমারচরিতের আরম্ভ ও শেষ দুই-ই অসংলগ্ন। বোধ হয় দণ্ডী দশকুমারচরিত সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই কিংবা তাঁহার রচনার অনেকখানি নষ্ট হইয়া যাওয়ার পর অপরের দ্বারা সেই অংশ রচিত হইয়াছিল।[১৮]

গদ্য রচয়িতা হিসাবে দণ্ডীর রচনায় সামঞ্জস্যবোধ আছে; শ্লেষ, অর্থহীন শব্দ-সম্ভার বা সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের দ্বারা অথবা তাঁহার রচনা কোথাও ভারাক্রান্ত হয় নাই। গদ্য রচনায় দণ্ডী প্রকৃত শক্তির পরিচয় দিয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই। চরিত্র-চিত্রণে দণ্ডী সফল হইয়াছেন। কামমঞ্জরী, বসুপালিত, মরীচি প্রভৃতি অপ্রধান চরিত্রগুলিও তাঁহার রচনায় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সুবন্ধু

বাসবদত্তার সহিত সুবন্ধুর নাম জড়িত। হর্ষচরিতে বাণ একখানি বাসবদত্তার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে রচনার উৎকর্ষতায় বাসবদত্তা কবিগণের দর্পহরণ করিয়াছে।[১৯] হয়ত সুবন্ধু রচিত বাসবদত্তাই বাণের লক্ষ্য ছিল। বাণ কাদম্বরীকে 'অতিদ্বয়ী কথা' (অর্থাৎ 'দুইখানি কথাকে অতিক্রমকারী') বলিয়াছেন। গুণাঢ্যের বৃহৎকথা এবং সুবন্ধুর বাসবদত্তাই যে ঐ দুইখানি কথা, ইহাও অনেকে মনে করেন। বাসবদত্তায় সুবন্ধু আক্ষেপ করিয়াছেন যে বিক্রমাদিত্যের পর কবি ও কাব্যের পৃষ্ঠপোষকতা চলিয়া গিয়াছে।[২০] এই আক্ষেপোক্তিতে তিনি কালিদাসের কালের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন মনে করা যায়। বাক্‌পতিরাজের গৌড়বহে ভাস-কালিদাস-হরিচন্দ্রের সহিত, মাঙ্খের শ্রীকণ্ঠচরিতে মেণ্ঠ-ভারবি-বাণের সহিত সুবন্ধুর নামের উল্লেখ আছে। বামন কাব্যা-লঙ্কারে সুবন্ধুর উল্লেখ করিয়াছেন। 'ন্যায়স্থিতিমিব উদ্যোতকরস্বরূপাম্, বৌদ্ধসংগতি-মিবালঙ্কারভূষিতাম্'—সুবন্ধুর এই রচনাংশ হইতে অনেকে মনে করেন যে সুবন্ধু ইহাতে উদ্যোতকার এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ধর্মকীর্তি রচিত বৌদ্ধসংগতি নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই অনুমান যদি সত্য হয় এবং সপ্তম শতাব্দীর মধ্য ভাগে বাণ কর্তৃক উল্লিখিত বাসবদত্তার রচয়িতাও যদি এই সুবন্ধু হন, তবে **সুবন্ধুর আবির্ভাব-কাল ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগ**। কন্দর্পকেতুকে দেখিয়া বাসবদত্তার অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল সেই প্রসঙ্গে সুবন্ধু যে বর্ণনা দিয়াছেন[২১], তাহার সহিত ভবভূতির মালতী-মাধবের অংশবিশেষের[২২] সাদৃশ্য সুবন্ধু ও ভবভূতির পৌর্বাপর্যনির্ণয়ে সাহায্য করে।

১৭। তুলঃ ত্রয়োঽগ্নয়স্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ো বেদাস্ত্রয়ো গুণাঃ।
ত্রয়ো দণ্ডিপ্রবন্ধাশ্চ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ॥—হারাবলী

এই তিনখানি রচনা সম্বন্ধে S. K. De-র *Sanskrit Poetics*, I. p. 62 note and p. 72 দ্রষ্টব্য।

১৮। S. K. De মনে করেন অবন্তিসুন্দরীকথা দণ্ডীর রচিত নহে—*IHQ*. III. p. 161

১৯। কবীনামগলদ্দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া—হর্ষচরিত

২০। তুলঃ সা রসবত্তা বিহতা নবকা বিলসন্তি নো কঙ্কঃ।
সরসীব কীর্তিশেষং গতবতি ভুবি বিক্রমাদিত্যে॥

২১। হৃদয়ে বিলিখিতমিব উৎকীর্ণমিব, প্রত্যুপ্তমিব কীলিতমিব, নিগড়িতমিব বজ্রলেপ-ঘটিতমিব, অস্থিপঞ্জরপ্রবিষ্টমিব মর্মান্তরস্থিতমিব......কন্দর্পকেতুং মন্যমানা।—বাসবদত্তা

২২। লীনেব প্রতিবিম্বিতেব লিখিতেবোৎকীর্ণরূপেব সা।
প্রত্যুপ্তেব চ বজ্রলেপঘটিতেবান্তর্নিখাতেব চ॥
সা নশ্চেতসি কীলিতেব বিশিখৈশ্চেতোভুবঃ পঞ্চভিঃ।
চিন্তাসন্ততিতন্তুজালনিবিড়স্যূতেব লগ্না প্রিয়া॥—মালতীমাধব, ৫. ১০

ভবভূতির রচনায় যখন কালিদাসের প্রভাব পড়িয়াছে তখন সুবন্ধুর প্রভাব আসাও বিচিত্র নহে। ইহা হইতে **সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনও সময়ে সুবন্ধুর আবির্ভাব হইয়াছিল** মনে করা হয়।[২৩]

বাসবদত্তার আখ্যানভাগ এইরূপ—রাজা চিন্তামণির পুত্র কন্দর্পকেতু স্বপ্নে পরমাসুন্দরী এক কন্যাকে দেখিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিবার জন্য বন্ধু মকরন্দকে সঙ্গে লইয়া গৃহ ত্যাগ করেন। রাত্রিতে এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট থাকিবার সময় পক্ষী-দম্পতীর কথোপকথন হইতে জানিতে পারিলেন যে কুসুমপুরের রাজা শৃঙ্গারশেখরের কন্যা বাসবদত্তা স্বপ্নে এক অপরূপ যুবককে দেখিয়া তাঁহার সন্ধান করিবার জন্য স্বীয় সখী তমালিকাকে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার স্বয়ংবরে বহু রাজকুমার আজ তাঁহার গৃহে সমাগত, কিন্তু সেই স্বপ্নদৃষ্ট যুবককে ব্যতীত আর কাহাকেও বাসবদত্তা পতিত্বে বরণ করিবেন না। কন্দর্পকেতু তমালিকার সহিত মিলিত হইলেন এবং তাহার সাহায্যে গোপনে বাসবদত্তার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিলেন। পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া উভয়েই একস্থানে নিদ্রা যান। নিদ্রাভঙ্গে ফল আহরণের জন্য বাসবদত্তা বনে প্রবেশ করিলে তাঁহার রূপমুগ্ধ দুই কিরাত-প্রধানের মধ্যে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য যুদ্ধ হয় এবং তাহাতে উভয়েই নিহত হয়। সেই বনভাগ কোনও এক ঋষির তপোবন ছিল। ঋষি যখন জানিতে পারিলেন যে যুদ্ধের ফলে তাঁহার তপোবন হতশ্রী হইয়াছে এবং বাসবদত্তাই ঐ যুদ্ধের কারণ, তখন তিনি বাসবদত্তাকে প্রস্তরমূর্তিতে পরিণত হইবার অভিশাপ দেন। বাসবদত্তার অনুনয়ে শেষ পর্যন্ত এইটুকু অনুগ্রহ করেন যে প্রেমিকের করস্পর্শে তিনি পূর্বরূপ ফিরিয়া পাইবেন। এদিকে কন্দর্পকেতু বাসবদত্তার অনুসন্ধানে হতাশ হইয়া আত্মহত্যার উদ্যোগ করিলে এক দৈববাণী তাঁহাকে প্রিয়ার সহিত মিলনের আশ্বাস দেয়। আশায় বুক বাঁধিয়া কন্দর্পকেতু ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। দৈবক্রমে একদিন তিনি ঐ প্রস্তরমূর্তির নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। প্রস্তরমূর্তিতে বাসবদত্তার রূপসাদৃশ্য দেখিয়া আবেগে মূর্তিটি জড়াইয়া ধরেন। মূর্তি জীবন্ত হইল, কন্দর্পকেতু দয়িতাকে ফিরিয়া পাইলেন।

আখ্যানভাগে নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না এবং চরিত্র-চিত্রণেও সুবন্ধু শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই। অনেক সময়ে আখ্যানভাগের অসম্ভাব্যতা ও অসংলগ্নতাও ধরা পড়িয়াছে। একশত কুড়ি লাইনে কন্দর্পকেতুর স্বপ্নদৃষ্টা প্রণয়িনীর রূপবর্ণনা কবির গদ্য-রচনায় পারদর্শিতা প্রমাণ করিলেও বিরক্তি-জনক। শ্লেষ ও বিরোধাভাসের প্রাচুর্যের সহিত সমাসবদ্ধ শব্দচয়ন অনেক সময়ে ভাবপ্রতীতির বাধা জন্মাইয়াছে। গল্প বলার রীতিতে বাণ ও সুবন্ধুর মধ্যে পার্থক্য নাই বলিলেই চলে এবং শব্দ ও ভাবের দিক দিয়াও মনে হয় সুবন্ধু বাণের অনুগামী।[২৪]

২৩। "The only certain point about Subandhu's date is the fact that in the first half of the 8th century, Vakpati in his prakrit poem *Gaudavaho* (St. 800) connects Subandhu's name with those of Bhasa, Kalidasa and Harichandra and a little later in the same century, Vamana quotes anonymously a passage which occurs, with a slight variation, in Subandhu's *Vasavadatta*."—Das Gupta & De, p. 219

"..in view of the evidence available as to Dharmakirti's date, that Subandhu must be placed in the second quarter of the seventh century and that he was only a contemporary of Bana whose work came to fruition before Bana's."—Keith

২৪। উভয়ের রচনার তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য :

"There is, thus, no essential difference between Subandhu and Bana; only, Subandhu's gifts are often rendered ineffectual by the

বাণ

বাৎস্যগোত্রীয় চিত্রভানু ও রাজদেবীর পুত্র বাণ **হর্ষচরিত** ও **কাদম্বরী**[২৫] নামক দুইখানি গদ্য-কাব্য রচনা করেন। প্রথমটি আখ্যায়িকা, দ্বিতীয়টি কথা। হর্ষচরিতের প্রথম আড়াই উচ্ছ্বাসে এবং কাদম্বরীর প্রথম কয়েকটি শ্লোকে বাণ বিশদভাবে তাঁহার জীবনের অনেক কথাই বলিয়া গিয়াছেন। অতি বাল্যকালে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয় এবং মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে তিনি পিতাকেও হারান। পিতার মৃত্যুর পর বালক বাণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়েন এবং বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীদের সহিত মেলামেশা করিতে থাকেন। বহুদিন বিদেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া আসেন। একদিন হর্ষবর্ধনের রাজসভায় তাঁহার ডাক পড়ে। হর্ষের ভ্রাতা কৃষ্ণের সহায়তায় তিনি রাজসভায় সাদরে গৃহীত হন এবং শীঘ্রই রাজার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন।[২৬]

হর্ষচরিতে বাণ মহারাজ হর্ষের যেটুকু ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহার সহিত চীনা-পরিব্রাজক ইউয়েন সাঙ লিখিত রাজা হর্ষবর্ধন শীলাদিত্যের বিবরণের তুলনা করিলে মনে হয় কনৌজেশ্বর হর্ষবর্ধন শীলাদিত্যই (৬১০-৬৪৭ খৃষ্টাব্দ) ছিলেন বাণের পৃষ্ঠপোষক। অনুমান করা হয়, হর্ষের রাজত্বকালের প্রথম ভাগে বাণ হর্ষের সংস্পর্শে আসেন এবং তখন বাণের বয়স খুব কম। ৬২০ খৃষ্টাব্দকে যাঁহারা বাণের আবির্ভাবকাল বলিয়া মনে করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই ঐরূপ অনুমান করিয়াছেন। ভ্রাতৃঘাতীর উপর প্রতিশোধ লইবার পর হর্ষবর্ধন বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ

---

mediocrity of his poetic powers. There is the sameness of characteristics and of ideas of workmanship; but while Subandhu often plods, Bana can often soar. The extreme excellence, as well as the extreme defect, of the literary tendency, which both of them represent in their individual way, are, however, better mirrored in Bana's works, which reach the utmost limit of the peculiar type of the Sanskrit prose narrative."—Das Gupta & De, p. 225

২৫। দ্রষ্টব্য: কাদম্বরী (পূর্বভাগ), শ্লোক ১০-১৯

বাণের বংশাবলী

ব্রহ্মা
|
পুলহঃ
|
বাৎস্যঃ
|
কুবেরঃ
|
অচ্যুতঃ ঈশানঃ হরঃ পাশুপতঃ
|
অর্থপতিঃ
|
চিত্রভানুঃ
|
বাণভট্টঃ
|
ভূষণভট্টঃ
(নামান্তর ভূষণবাণঃ, পুলিন্দঃ, পুলিনঃ)

২৬। দ্রষ্টব্য: Peterson's *Introduction to Kadambari*

করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, একথা বাণ বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং মনে হয়, হর্ষের রাজত্বের প্রথম ভাগে বাণ তাঁহার সংস্পর্শে আসিলেও হর্ষচরিত যখন তিনি রচনা করেন তখন হর্ষের রাজত্বের শেষ ভাগ। আমরা জানি ৬৪৭ খৃস্টাব্দে হর্ষের রাজত্বের অবসান হয়। কাজেই ঐ সময়ের অল্প পূর্বেই বাণ হর্ষচরিত রচনা করিয়াছিলেন।

হর্ষচরিত—প্রথম আড়াই উচ্ছ্বাসে বাণ আত্মচরিত লিপিবন্ধ করিয়াছেন। তারপর আরম্ভ হইয়াছে হর্ষবর্ধনের কথা। স্থানীশ্বরের রাজা পুষ্পভূতি, তাঁহার বংশে মহা-প্রতাপশালী রাজা প্রভাকরবর্ধন। তাঁহার দুই পুত্র—রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধন; এক কন্যা—রাজ্যশ্রী। মৌখরীরাজ গ্রহবর্মার সহিত রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয়। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর রাজ্যবর্ধন সিংহাসন গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু হর্ষকে অভিষিক্ত করার পূর্বেই মালবরাজ কর্তৃক গ্রহবর্মার নিধন এবং রাজ্যশ্রীর অপহরণের সংবাদ আসে। রাজ্যবর্ধন মালবরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু গৌড়রাজের বিশ্বাসঘাতকতায় নিজেই নিহত হন। প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য হর্ষবর্ধনও যুদ্ধযাত্রা করিলেন কিন্তু পথে শুনিলেন যে রাজ্যশ্রী মালবরাজের কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া যখন আত্মহত্যা করিতে যাইতেছিলেন তখন এক বৌদ্ধ ভিক্ষু তাঁহার উদ্ধারসাধন করেন। হর্ষ ও রাজ্যশ্রীর মিলন দেখাইয়া এইখানেই আখ্যায়িকা শেষ হইয়াছে এবং মনে হয় হঠাৎ শেষ হইয়াছে।

কাদম্বরী—কাদম্বরীই বাণের যশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কাদম্বরীর পূর্ব-ভাগ বাণের রচনা, উত্তরভাগ রচিত হয় বাণের পুত্র ভূষণভট্ট বা পুলিন্দ কর্তৃক।[২৭] বিদিশাধিপতি শূদ্রকের নিকট বৈশম্পায়ন নামে এক শুক কথাংশের বক্তা।[২৮] উজ্জয়িনীর চন্দ্রাপীড় এবং গন্ধর্বরাজকুমারী কাদম্বরীর প্রণয়-কাহিনী গ্রন্থের মুখ্য উপজীব্য, প্রসঙ্গক্রমে ইহার সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছে পুণ্ডরীক ও কাদম্বরী-সখী মহাশ্বেতার প্রণয়-কাহিনী।

ঐতিহাসিক কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনার প্রচেষ্টা হর্ষচরিতেই প্রথম। এই দিক দিয়া গ্রন্থখানির গুরুত্ব আছে। বাণের সময়ের দেশ, জাতি ও সমাজের চিত্রও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। তথাপি ইহাকে ঐতিহাসিক কাব্য মনে করিলে ভুল করা হইবে। বাণেরও ইতিহাস রচনা করার উদ্দেশ্য ছিল না। কাব্যাংশে কাদম্বরী উৎকৃষ্টতর। 'কাদম্বরী' শব্দের অর্থ 'সুরা'। সুরার প্রভাবে মানুষ যেমন আত্মহারা হয়, কাদম্বরী পাঠেও সত্যই পাঠক তেমনি আত্মহারা হন। এই দিক দিয়া নামকরণ সার্থক হইয়াছে।[২৯]

কাদম্বরী যে এক সময়ে বাণকে প্রভূত যশ ও জনপ্রিয়তার অধিকারী করিয়াছিল প্রচলিত উক্তিসমূহই তাহার প্রমাণ।[৩০] Weber বাণের মারাত্মক সমালোচনা করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ গদ্য-কাব্যকার হিসাবে বাণকে সর্বথা স্বীকৃতি দান

২৭। তুলঃ যাতে দিবং পিতরি তদ্বচসৈব সার্ধং বিচ্ছেদমাপ ভুবি যস্তু কথাপ্রবন্ধঃ।
দুঃখং সতাং তদাসমাপ্তিকৃতং বিলোক্য প্রারব্ধ এষাময়া ন কবিত্বদর্পাৎ ॥

২৮। কাদম্বরীর নায়ক চন্দ্রাপীড়, নায়িকা কাদম্বরী, রীতি পাঞ্চালী, প্রধান রস বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার এবং মাধুর্য গুণ। এ বিষয়ে সংগ্রহশ্লোক ঃ
চন্দ্রাপীড়োঽনুকূলঃ সকলগুণধরো নায়কোঽস্মিন্নুদাত্তঃ
নেত্রী কন্যান্যদীয়ামৃদুললিততনুর্মুগ্ধকাদম্বরী চ।
পাঞ্চালী নাম রীতির্বিলসতি বহুলা বিপ্রলম্ভো রসোঽঙ্গী
মাধুর্যাখ্যো গুণো বা কবিমুকুটমণেঃ কাব্যয়োরন্ত্যমেতৎ ॥

২৯। তুলঃ কাদম্বরীরসজ্ঞানামাহারোঽপি ন রোচতে।

৩০। কয়েকটি বাণপ্রশস্তি ঃ
(১) বাণীপাণিপরামৃষ্টবীণানিক্কাণহারিণীম্।
ভাবয়ন্তি কথং বান্যে ভট্টবাণস্য ভারতীম্ ॥—গঙ্গাদেবী

করিলেও তাঁহার রচনার ত্রুটিও উপেক্ষণীয় নহে। সর্বপ্রধান ত্রুটি হইল যে গল্প বলিতে বলিতে তিনি হুঁশ হারাইয়া ফেলেন। নায়ক নায়িকার রূপবর্ণনা বা প্রাকৃতিক শোভাবর্ণনার অবকাশ পাইলেই তাঁহার বর্ণনাশক্তি মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত ছুটিয়া চলে এবং শেষ হইলে দেখা যায় ততক্ষণে মূল আখ্যানভাগ বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া গিয়াছে। সমাসবন্ধ সুদীর্ঘ পদ, দ্ব্যর্থক শব্দচয়ন ও ব্যাকরণ-জ্ঞানের পরিচয় দিবার অত্যধিক আগ্রহ যেন তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। শব্দের উপর তাঁহার আধিপত্য, বর্ণনার অফুরান শক্তি, প্রকৃতিকে প্রাণ ভরিয়া ও নয়ন মেলিয়া দেখিবার ক্ষমতা তাঁহার মত আর কাহারও নাই, কিন্তু এ সবই সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।[৩১] এই সীমা-জ্ঞানের অভাবই তাঁহার রচনার সবচেয়ে বড় ত্রুটি। ক্রিয়াপদ দ্বারা তাঁহার কাদম্বরীর প্রথম বাক্য আরম্ভ হইয়াছে এবং বাক্যের সবশেষে যখন কর্তৃপদের নাগাল পাওয়া যায় তখন ক্রিয়াপদের কথা আর মনে থাকে না। বর্ণনার ব্যাপারে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোনও কিছুকেও বাদ দিতে তিনি যেন নারাজ।[৩২] যাদুকর, যেমন যাদুপ্রভাবে একটি বাক্সের মধ্যে হাজার হাজার বাক্স দেখাইতে পারেন, বাণও সেইরূপ কাব্যের খেলায় যাদুরই পরিচয় দিয়াছেন—অপূর্ব কৌশলে মূল আখ্যানভাগের সহিত গাঁথিয়া চলিয়াছেন বিভিন্ন উপাখ্যান। সে কৌশল অনবদ্য ও অনতিক্রমণীয় হইলেও মূল আখ্যানভাগের সহজ প্রতীতির পথে প্রধান অন্তরায়। সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে যে কৌশল দেখা গিয়াছে, বাণ সেই কৌশলকেই শেষ সীমায় টানিয়া লইয়া গিয়াছেন।[৩৩] বাণের কাব্য-কাননে পুষ্প-সম্ভারের অপ্রাচুর্য নাই, কিন্তু তাহাতে প্রবেশ করা দুষ্কর।[৩৪]

---

(২) শ্লেষে কেচন শব্দগুম্ফবিষয়ে কেচিদ্রসে চাপরে—
অলঙ্কারে কতিচিৎসদর্থবিষয়ে চান্যে কথাবর্ণনে।
আসর্বত্র গভীরধীরকবিতা বিন্ধ্যাটবীচাতুরী—
সঞ্চারো কবিকুম্ভিকুম্ভভিদুরো বাণস্তু পঞ্চাননঃ ॥—চন্দ্রদেবকবি

(৩) বাগীশ্বরং হন্ত ভজেঽভিনন্দমর্থেশ্বরং বাক্‌পতিরাজমীড়ে।
রসেশ্বরং স্তৌমি চ কালিদাসং বাণং তু সর্বেশ্বরমানতোঽস্মি ॥
—সোড্‌ঢল

(৪) হৃদি লগ্নেন বাণেন যন্মন্দোঽপি পদক্রমঃ।
ভবেৎকবিকুরঙ্গাণাং চাপলং তত্র কারণম্ ॥ —ত্রিলোচন

৩১। বিন্ধ্যাটবী, পম্পাসরোবর, শুকনাসের প্রাসাদ, চণ্ডিকার মন্দির প্রভৃতির বর্ণনা এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

৩২। "His choice of subject may be good, but his choice of scale is fatal. The readiness of his resources is truly astonishing, but the exaggeration often swamps the reality of his pictures."—Das Gupta & De, p. 233

"Indeed, the chief value of Bana's unique romance lies, not in its narrative, not in its characterisation, nor in its presentation, but in its sentiment and poetry."—*Ibid,* p. 235

"He is verbose, not in the sense that he takes many words to express an idea, but in the sense that he gives expression to a multitude of ideas where a few would suffice."—*Ibid* p. 238

৩৩। "That the method of emboxing tales can be carried to a confusing extent is seen in the arrangement of Somadeva's Kathasarit-sagara, where, often with an insignificant framework, we have A'S account of B'S report of C'S recounting of D'S relating of what E said, and so forth, until we have the disentangling of the entire intricate progression, or reversion to the main story, which the reader in the meantime probably forgets."—*Ibid,* p. 231

৩৪। "His prose has been compared to an Indian jungle, where

বাণকে অনুকরণ করিয়া শ্বেতাম্বর জৈন **ধনপাল** ধারারাজ বাক্‌পতির (৯৭০ খৃষ্টাব্দ) পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁহার **তিলকমঞ্জরী** কাব্য প্রণয়ন করেন। তিলকমঞ্জরী ও সমরকেতুর প্রণয়-কাহিনীই এই কাব্যের বিষয়বস্তু এবং তিলকমঞ্জরীতে আমরা কাদম্বরীর চিত্রই দেখিতে পাই। কয়েকটি শ্লোকে ধনপাল পরমারবংশীয় রাজগণের এবং বাণ, ভবভূতি, রাজশেখর, রুদ্র, মহেন্দ্র, কর্দমরাজ প্রভৃতি কবিগণের উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং 'তরঙ্গবতী' ও 'ত্রৈলোক্যসুন্দরী' নামে দুইখানি কথারও উল্লেখ করিয়াছেন।[৩৫]

সোড্‌ঢলের উদয়সুন্দরীকথা নাগলোকের অধিপতি শিখণ্ডতিলের কন্যা উদয়সুন্দরী ও প্রতিষ্ঠানের রাজা মলয়বাহনের প্রণয়-কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া রচিত।[৩৬] **ওডেয়দেব বাদীবসিংহের গদ্য-চিন্তামণি, বামনভট্টবাণের বেমভূপালচরিত** প্রভৃতি আরও এই শ্রেণীর রচনার নাম করা যাইতে পারে।

চম্পূ-কাব্য [CAMPU LITERATURE]

গদ্য-পদ্যময়ী ভাষাতে যে কাব্য রচিত হয় তাহা 'চম্পূ'।[৩৭] বিভিন্ন আলঙ্কারিকগণ চম্পূর সংজ্ঞানির্ধারণ করিতে যাইয়া ঐ একই কথা বলিয়াছেন, কিন্তু কাব্যে গদ্যে ও পদ্যের অনুপাতের হার সম্বন্ধে কেহই কিছু বলেন নাই; অর্থাৎ চম্পূ-কাব্যে গদ্যাংশই বা কতখানি স্থান গ্রহণ করিবে, আর পদ্যাংশই বা কতখানি স্থান গ্রহণ করিবে সে বিষয়ে কোনও নিয়ামক নাই। তবে মনে হয় গদ্য-কাব্যের সহিত ইহার পার্থক্য এইটুকুই যে গদ্য-কাব্যে গদ্যই আখ্যান ভাগের মূল বাহন কিন্তু চম্পূতে আখ্যানভাগ গদ্য ও পদ্য উভয়ের সাহায্যেই বর্ণিত হয়। গদ্য-কাব্যের স্বাভাবিক পরিণতিরূপেই

---

progress is rendered impossible by luxuriant undergrowths until the traveller cuts out a path for himself, and where wild beasts lie in wait for him in the shape of recondite words, far-fetched allusions, vast sentences, undiscriminated epithets upon epithets in a multitude of aggressive compounds and of a whole battalion of puns, similes, hyperboles, alliterations and assonances."—*Ibid*, p. 236

৩৫। শ্লোকগুলি এইঃ

প্রসন্নগম্ভীরপথা রথাঙ্গমিথুনাশ্রয়া।
পুণ্যা পুনাতি গঙ্গেব গাং তরঙ্গবতী কথা॥
কেবলোঽপি স্ফুরন্ বাণঃ করোতি বিমদান্ কবীন্।
কিং পুনঃ ক্লৃপ্তসন্ধানপুলিন্দকৃতসন্নিধিঃ॥
নিরোদ্ধুং পার্যতে কেন সমরাদিত্যজন্মনঃ।
প্রশমস্য বশীভূতং সমরাদিত্যজন্মনঃ॥
ভদ্রকীর্তের্ভ্রমত্যাশাঃ কীর্তিস্তারাগণাধ্বনঃ।
প্রভা তারাধিপস্যেব শ্বেতাম্বরশিরোমণেঃ॥
সূরির্মহেন্দ্র এবৈকঃ বৈবুধারাধিতক্রমঃ।
যস্যামর্ত্যোচিতপ্রৌঢ়কবিবিস্ময়কৃদ্বচঃ॥
সমবান্ধকবিধ্বংসী রুদ্রঃ কৈর্নাভিনন্দ্যতে।
সুশ্লিষ্টললিতা যস্য কথা ত্রৈলোক্যসুন্দরী॥
সন্তু কর্দমরাজস্য কথং হৃদ্যা ন সূক্তয়ঃ।
কবিস্ত্রৈলোক্যসুন্দর্যাঃ যস্য প্রজ্ঞানিধিঃ পিতা॥

৩৬। ধনপাল ও সোড্‌ঢলের কাব্যে কাদম্বরী অপেক্ষা শ্লোকসংখ্যা অনেক বেশী। এই দিক দিয়া ইহাদের চম্পূ-কাব্যও বলা যাইতে পারে।

৩৭। ভোজ চম্পূর এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেনঃ

গদ্যানুবন্ধরসমিশ্রিতপদ্যসূক্তিঃ হৃদ্যাপি পদ্যকলয়া কলিতেব গীতিঃ।
তস্মাদ্দধাতু কবিমার্গজুষাং সুখায় চম্পূপ্রবন্ধরচনাং রসনা মদীয়া॥

গদ্যপদ্যময়ী ভাষা চম্পূরিত্যভিধীয়তে—দণ্ডীঃ কাব্যাদর্শ
গদ্যপদ্যময়ং কাব্যং চম্পূরিত্যভিধীয়তে—বিশ্বনাথ ঃ সাহিত্যদর্পণ

চম্পুর জন্ম হইয়াছিল। গদ্য-কাব্যের গদ্য-রচনায় একঘেয়েমির হাত হইতে পাঠক-মনে মাঝে মাঝে ছন্দের দোলা দিয়া একটু বৈচিত্র্যের আস্বাদ দেওয়া এবং কাহিনীর কথন-ভঙ্গীতেও বৈচিত্র্য আনিবার উদ্দেশ্যে এক সময়ে অতি স্বাভাবিকভাবে গদ্য-কাব্যে কবিতা অজ্ঞাতসারে স্থানলাভ করিয়াছিল। দশম খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বিশেষ রচনা-ধারাটি তেমন পুরাপুরি আত্মপ্রকাশ করে নাই। মহাভারত, পুরাণ, এমন কি বেদের আখ্যানভাগেও গদ্যের ও পদ্যের সংমিশ্রণ একেবারে অজানা ছিল না এইটুকুই মাত্র বলা চলে। পালি-জাতকসমূহে ও গল্প-সাহিত্যে গদ্য ও পদ্যের যে সংমিশ্রণ দেখা যায় তাহাতে পদ্যাংশ হয় উপদেশমূলক কিংবা আখ্যানভাগের সার-সংক্ষেপীকরণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। চম্পু-কাব্যের সহিত তাই উহাদের কোনও যোগাযোগ ছিল এরূপ মনে করা চলে না।[৩৮] সাধারণতঃ পৌরাণিক বিষয়কে অবলম্বন করিয়াই চম্পু-কাব্য রচিত হইয়াছে। গদ্য-রচনার ওজস্বিতা ও বলিষ্ঠতাও ইহাতে নাই আবার পদ্য-রচনার মাধুর্য ও সুকুমারতাও ইহাতে নাই।[৩৯]

শাণ্ডিল্যগোত্রীয় শ্রীধরের পৌত্র ও নেমাদিত্যের পুত্র **ত্রিবিক্রম** বা সিংহাদিত্য কর্তৃক সাত উচ্ছ্বাসে রচিত **নলচম্পুই**[৪০] বোধহয় চম্পু-সাহিত্যের মধ্যে প্রাচীনতম। রাষ্ট্র-কূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্রের নৌসরী লিপির (৯১৫ খৃষ্টাব্দ) রচয়িতা ইনিই। এই তৃতীয় ইন্দ্রই কনৌজ আক্রমণ করিয়া প্রতীহার রাজবংশের উচ্ছেদসাধন করিয়াছিলেন। ত্রিবিক্রম বাণের উল্লেখ করিয়াছেন এবং সরস্বতীকণ্ঠাভরণে তাঁহার উল্লেখ আছে। ইঁহার পিতা রাজার সভাকবি ছিলেন। একদিন পিতার অনুপস্থিতিকালে এক প্রতিস্পর্ধী আসিয়া তাঁহার পিতার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কামনা করেন। সরস্বতীর বরে ত্রিবিক্রম তখন নলচম্পু রচনা করিয়া তাঁহাকে যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার পিতা আসিয়া পড়েন এবং কাব্য অসম্পূর্ণই রহিয়া যায়। কবি বিশ্বাস করেন যে সাধারণ প্রকাশভঙ্গী কাব্যের মর্যাদা লাভ করিতে পারে না।[৪১] একটি বিচিত্র কল্পনার[৪২] জন্য তিনি যমুনা-ত্রিবিক্রম নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন।

দিগম্বর জৈন **সোমদেব** কর্তৃক সাতটি আশ্বাসে রচিত **যশস্তিলকচম্পু** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চালুক্য বংশীয় রাজা অরিকেশরীর জ্যেষ্ঠপুত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় সোমদেব এই কাব্য প্রণয়ন করেন।[৪৩] অবন্তীরাজ যশোধরের কাহিনী অবলম্বনে ইহা রচিত—তাঁহার রাজধানী উজ্জয়িনীর বর্ণনা, তাঁহার পত্নীগণের বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের কথা, শেষ পর্যন্ত তাঁহার জৈন ধর্ম গ্রহণ, তাঁহার হত্যা ও পুনর্জন্ম প্রভৃতি ইহাতে

৩৮। চীনদেশের কাব্যে, মধ্য আয়ার্ল্যাণ্ডের গল্প ও ইতিহাসে গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণ দেখা যায়।

৩৯। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বাণ ভট্টার হরিচন্দ্রের যে গদ্যবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হরিচন্দ্রের জীবন্ধরচম্পু।

৪০। নামান্তর 'দময়ন্তীকথা'। 'মদালসা চম্পু'ও ত্রিবিক্রমের রচিত।

৪১। তুলঃ কিং কবেস্তস্য কাব্যেন কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ।
পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ॥
অপ্রগল্ভাঃ পদন্যাসং জননীরাগহেতবঃ।
সন্ত্যেকে বহুলালাপাঃ কবয়ো বালকা ইব॥—নলচম্পু

৪২। শ্লোকটি এই ঃ
উদয়গিরিগতায়াং প্রাক্প্রভাপাণ্ডুতায়া—
মনুসরতি নিশীথে শৃঙ্গমস্তাচলস্য।
জয়তি কিমপি তেজঃ সাম্প্রতং ব্যোমমধ্যে।
সলিলমিব বিভিন্নং জাহ্নবং যামুনং চ॥—ঐ

৪৩। কাব্যের সমাপ্তি বাক্যে আছে—...শ্রীমদরিকেসরিণঃ প্রথমপুত্রস্য শ্রীমৎ বাদ্যরাজ্য-প্রবৃদ্ধমানবসুন্ধরায়াং বিনির্মাপিতমিদম্।

বিবৃত হইয়াছে। ইহার শেষ তিন আশ্বাস জৈন ধর্মের ব্যাখ্যানস্বরূপ। সোমদেব অনেক কবির ও কাব্যের নাম করিয়া গিয়াছেন, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসনির্ধারণে যাহার মূল্য কম নয়।

গুণভদ্রের উত্তরপুরাণকে অবলম্বন করিয়া **হরিচন্দ্রের জীবন্ধরচম্পূ** রচিত হয়। ইহা খৃষ্টাব্দ নবম শতকের পরে রচিত। বাণের উল্লিখিত ভট্টার হরিচন্দ্র এবং ২১টি সর্গে রচিত ধর্মশর্মাভ্যুদয়ের রচয়িতা হরিচন্দ্র এই একই চম্পূর রচয়িতা কি না সে বিষয়েও সংশয়ের অবকাশ আছে।

পরমার রাজবংশীয় ধারা-নরপতি **ভোজের** রচিত **রামায়ণ-চম্পূ** উল্লেখযোগ্য। ১০১৮-১০৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভোজ রাজত্ব করেন। তাঁহার পিতার নাম সিন্ধুল। তাঁহার বাল্যকালেই পিতার মৃত্যু হয়। তিনি নাবালক ছিলেন বলিয়া তাঁহার পিতৃব্য মুঞ্জ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এক জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে ভোজ পঞ্চান্ন বৎসর রাজত্ব করিবেন।[৪৪] তাহা শুনিয়া মুঞ্জ তাঁহার অধীন নরপতি বৎসরাজের উপর ভোজকে কোনও অরণ্যে লইয়া হত্যা করিবার ভার অর্পণ করেন। বৎসরাজ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ভোজকে লইয়া যান কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের গৃহে ভোজকে লুকাইয়া রাখেন এবং তরবারিতে পশুর রক্ত মাখাইয়া আনিয়া মুঞ্জের নিকট সমর্পণ করেন। নিহত হইবার পূর্বে ভোজ কিছু বলিয়াছিলেন কি না মুঞ্জ বৎসরাজকে জিজ্ঞাসা করিলে, বৎসরাজ বৃক্ষপত্রে ভোজের স্বহস্তলিখিত একটি শ্লোক[৪৫] মুঞ্জকে দেখান। উহা পাঠ করিয়া মুঞ্জ দুঃখে ও অনুতাপে ভূমিতে পড়িয়া যান। তখন বৎসরাজ সত্য ঘটনা বিবৃত করিলে ভোজকে আনা হয় এবং মুঞ্জ ভোজকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

ভোজ রচিত রামায়ণ-চম্পূ বিশেষ জনপ্রিয় কাব্য। খুব সম্ভব কিষ্কিন্ধাকাণ্ড পর্যন্তই ভোজের রচিত। অবশিষ্ট অংশ লক্ষ্মণ কবি নামে কোনও একজন পরবর্তী-কালে রচনা করিয়া ইহার সহিত সংযোজিত করেন।[৪৬]

অনন্তভট্ট রচিত ভারতচম্পূ, নারায়ণ রচিত স্বাহাসুধাকরচম্পূ[৪৭] (সপ্তদশ শতাব্দী), কেশবভট্টের নৃসিংহচম্পূ, শঙ্কর রচিত শঙ্করচেতোবিলাসচম্পূ,[৪৮] শেষকৃষ্ণ রচিত পারিজাত-হরণচম্পূ, নীলকণ্ঠ দীক্ষিতের নীলকণ্ঠবিজয়চম্পূ প্রভৃতি বহু কাব্য এই সাহিত্যধারার পুষ্টিসাধন করিয়াছে।

৪৪। তুলঃ পঞ্চাশৎপঞ্চবর্ষাণি সপ্তমাসা দিনত্রয়ম্।
ভোজরাজেন ভোক্তব্যঃ সগৌড়ো দক্ষিণাপথঃ॥

৪৫। শ্লোকটি এই ঃ

মান্ধাতা চ মহীপতিঃ কৃতযুগালঙ্কারভূতো গতঃ।
সেতুর্যেন মহোদধৌ বিরচিতঃ ক্বাসৌ দশাস্যান্তকঃ॥
অন্যে চাপি যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতয়ো যাতা দিবং ভূপতে।
নৈকেনাপি সমং গতা বসুমতী নূনং ত্বয়া যাস্যতি॥

৪৬। তুলঃ যঃ কাণ্ডান্নিববন্ধ চম্পূবিধয়া পঞ্চাপি ভোজঃ কবিঃ।
যো বা ষষ্ঠমচষ্ট লক্ষ্মণকবিস্তাভ্যামুভাভ্যামপি॥

সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ও শৃঙ্গারপ্রকাশের রচয়িতা ভোজ এবং রামায়ণচম্পূর রচয়িতা ভোজ একই ব্যক্তি কি না এ বিষয়ে সংশয় আছে। রামায়ণচম্পূর সমাপ্তিবাক্য (colophon) হইতেছে 'ইতি শ্রীবিদর্ভরাজবিরচিতে চম্পূরামায়ণে', আর পূর্বোক্ত দুইখানি গ্রন্থের সমাপ্তিবাক্য হইতেছে 'ইতি শ্রীমহারাজাধিরাজ শ্রীভোজদেববিরচিতে সরস্বতীকণ্ঠাভরণে শৃঙ্গারপ্রকাশে'। ধারাধিপ ভোজ ও বিদর্ভাধিপ ভোজ একই ব্যক্তি কি? ধারা মালবের অন্তর্গত, বিদর্ভ বেরারের অন্তর্গত।

৪৭। অগ্নির পত্নী স্বাহা ও চন্দ্রের প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

৪৮। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলের প্রসিদ্ধ চৈৎ-সিংহের সম্বন্ধে রচিত।

ঐতিহাসিক কাব্য

কাব্য, নাটক, কথা, আখ্যায়িকা, চম্পূ, গীতিকাব্য, ছন্দ, অলংকার, ব্যাকরণ, দর্শন, তন্ত্র, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কৃত কবি ও লেখকগণ তাঁহাদের প্রতিভাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইতিহাসকে রচনার বিষয়বস্তুরূপে কোনও দিন গ্রহণ করেন নাই। ভাবিতেও বিস্ময় লাগে, যে দেশ ব্যাস-বাল্মীকির মত মহাকবি, কালিদাস-শূদ্রক-ভবভূতির মত নাট্যকার, বাণ-সুবন্ধু-দণ্ডীর মত গল্পকথক, কপিল-কণাদের মত দার্শনিক এবং পাণিনি বররুচি-পতঞ্জলির মত বৈয়াকরণের সৃষ্টি করিতে পারে সেই দেশে এমন একজনও এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন না, যাঁহার রচনায় ভারতের ইতিহাসকে ধরিয়া রাখিবার ক্ষীণতম প্রচেষ্টাও করা হইয়াছে। কোনও বিশেষ ব্যক্তি, কোনও বিশেষ বস্তু বা কোনও বিশেষ ঘটনাকে বড় করিয়া দেখিবার বা দেখাইবার যে প্রবৃত্তি ইতিহাস রচনার মূলে কাজ করে তাহা সংস্কৃত কবিগণের মধ্যে কখনই ছিল না। একমাত্র বাণ ছাড়া সংস্কৃত কবিগণ তাঁহাদের কালজয়ী রচনাতে নিজেদের সম্বন্ধেও কিছু বলিয়া যান নাই, যাহার ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাস তো দূরের কথা, আমরা আমাদের কবিগণের জীবনী সম্বন্ধেও কিছু জানি না।

কিন্তু কেন? ভারতবর্ষের কি ইতিহাস ছিল না? কোনও যুগে ভারতে কি উল্লেখযোগ্য কোনও ব্যক্তির, কোনও বস্তুর বা কোনও ঘটনার জন্ম হয় নাই, না সংস্কৃত কবিগণের ইতিহাস রচনা করিবার শক্তি ছিল না? এই প্রশ্নগুলির উত্তরের মধ্যেই ঐতিহাসিক কাব্যের অভাবের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।

জাতি ইহসর্বস্ব না হইলে ইহকালের কোনও কিছুকে চিরস্থায়ী করিয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করে না। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্মক্ষেত্র ভারতভূমিতে পর পর যে কয়েকটি ধর্মের স্রোত ভারতবাসীর চিন্তা, বুদ্ধি ও বোধকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহাদের সবগুলিরই মূল বাণী হইতেছে 'ইহ'-কে ত্যাগ কর, 'পর'-কে অবলম্বন কর, 'পর'-এর জন্য প্রস্তুত হও। 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা', 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ', 'ত্যাগাচ্ছান্তির্নিরন্তরম্', 'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ' প্রভৃতি এই শ্রেণীর কথাই ভারতের ধর্ম ও ধর্মপ্রচারকগণ প্রচার করিয়াছেন। ভারতের ধর্মের সহিত ভারতের দর্শনশাস্ত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভারতের ঋষিরা চিন্তায় যে তত্ত্ব দর্শন করিয়াছেন, ধর্মপ্রচারকগণ তাহাই প্রচার করিয়া জীবনে সেইভাবে আচরণ করিয়াছেন। ধর্ম ও দর্শনের প্রভাবে আচ্ছন্ন ভারতবাসীর বোধ, বুদ্ধি, মন, চিন্তা, কর্ম সবই ইহকাল ও ইহজগৎকে অবজ্ঞা করিতে শিখিয়াছে, দেশ-কাল-পাত্রের সংকীর্ণতাকে তুচ্ছ করিয়া ভূমার মহানন্দলাভের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

রাজনৈতিক কারণ বা রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতিও ইতিহাস রচনার অনুকূল ছিল না। খৃষ্টের জন্মের পূর্বে প্রথম কয়েক শত বৎসরের মধ্যে ভারতবাসীর জাতীয়তা-বোধ এক রকম ছিল না বলিলেই হয়। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় একমাত্র পুরু ছাড়া আর কেহই তাঁহাকে বাধা দেন নাই। খৃষ্টাব্দ একাদশ শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষে যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়াছে কিন্তু তাহা অন্তর্যুদ্ধ,—এক রাজবংশের সহিত আর এক রাজবংশের, ভারতের এক অংশের সহিত আর এক অংশের। এই সব যুদ্ধ-বিগ্রহকে ভারতবাসী জাতীয় সর্বনাশ বলিয়া গ্রহণ করে নাই। দেশ ও জাতির ইতিহাস রচনা করিবার প্রেরণা আসে জাতীয়তাবোধ হইতে। জাতীয় সর্বনাশের সমুপস্থিতিতেই হয় জাতীয়তাবোধের উন্মেষ। সেইখানেই হয় উহার অগ্নিপরীক্ষা। বিশাল পারস্য-বাহিনীর আক্রমণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রীক রাষ্ট্রসমূহ তাহাদের সমস্ত দলাদলি ভুলিয়া যে

ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিয়াছিল, তাহার মূলেও ছিল গ্রীকজাতির এই জাতীয়তাবোধ। সে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হইয়াছিল পারস্যবাহিনীর আক্রমণে, আর তাহার দ্বারা গ্রীকজাতি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই পারস্যবাহিনীকে পরাজিত করিতে পারিয়াছিল। জাতির সর্বনাশের উপস্থিতিতেও ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয় নাই, আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে একক পুরুর বাধাদানই ইহা প্রমাণ করে।[১] ভারতবাসীর এই জাতীয়তাবোধের অভাবের সুযোগ লইয়াই মুসলমান আক্রমণকারীগণও ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তারে সফলকাম হইয়াছিলেন—আকবর-প্রতাপসিংহ, ঘোরী-পৃথ্বীরাজের কাহিনীই তাহার প্রমাণ। জাতির জন্য কোনও বোধ ছিল না বলিয়াই ভারতবর্ষে জাতির ইতিহাসও রচিত হয় নাই।

শুধু কতকগুলি ঘটনার বিবরণ ও তাহাদের সাল-তারিখের সংরক্ষণই ইতিহাস নহে, ঘটনাগুলির কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করাও ঐতিহাসিকের কাজ। সমাজ, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির পটভূমিকায় একটি ঘটনা আর একটি ঘটনার সহিত কিরূপে এবং কতখানি সংশ্লিষ্ট তাহাও ঐতিহাসিকগণ দেখাইয়া থাকেন। ভারতবাসী ব্রহ্মকে বিশ্বের কারণ ধরিয়াছে, জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলবাদকে স্বীকার করিয়া যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার মূলে এক দৈবী ও অতিপ্রাকৃত শক্তিকে কর্তার আসনে বসাইয়াছে। ভারতবাসী বুঝিয়াছিল, মহাপ্রলয়-প্রলয়-খণ্ডপ্রলয়ের চক্রবৎ আবর্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে সমগ্র সৃষ্টি-প্রবাহ, যাহা ঘটিতেছে তাহার কারণ মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য, যাহা ঘটিতেছে তাহাই ঘটিয়াছিল এবং তাহাই আবার ঘটিবে। ব্যষ্টি-ধর্মের উপরেও ভারতবাসী বিশ্ব-ধর্মের স্থান দিয়াছে। সৃষ্টি সে ধর্ম পালন করিবেই; কখন করিবে, কেমন করিয়া করিবে, কোন্ পথে করিবে এ সবই ভারতবাসী ধরিয়া লইয়াছিল বাক্য-মন-বুদ্ধির অগম্য এক রহস্যরূপে। ব্যষ্টিসত্তাই ভারতবাসীর কাছে শেষ কথা নহে, তাই ব্যক্তি বা বস্তুর সম্বন্ধে কোনও তথ্যকে ধরিয়া রাখিবারও আগ্রহ তাহাদের ছিল না। বেদ, উপনিষদ, পুরাণের ঋষিদের ইতিবৃত্ত তাই আজও আমাদের কাছে অজ্ঞাত।

সংহিতার যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ত-সাহিত্যের যুগ পর্যন্ত যে সাহিত্য-ধারা প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল, তাহা মূলতঃ ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য—ব্রাহ্মণগণই তাহার রচয়িতা, ব্রাহ্মণ্য ধর্মই তাহার উপজীব্য। যে ভারতভূমিতে বৈদিক আর্যগণ তাঁহাদের প্রথম কাব্য রচনা করিয়াছিলেন সেই ভারতভূমির প্রাকৃতিক অবস্থাকে তাঁহাদের অনুকূলে কার্য করাইয়া নিজেদের অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিবার চিন্তাই প্রধানভাবে তাঁহাদের চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল। তাঁহারা প্রাকৃতিক শক্তির স্তব করিয়াছেন, তাহার কাছে প্রার্থনা জানাইয়াছেন, যজ্ঞের দ্বারা প্রতিকূলা শক্তিকে অনুকূলা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, অনুকূলা শক্তিকে আরও অনুকূলা করিতে চাহিয়াছেন। যজ্ঞের সুসমঞ্জস সম্পূর্তির জন্য বিধি-নিষেধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাঁচিয়া থাকাই ছিল তখন তাঁহাদের কাছে সবচেয়ে বড় কথা। ঐ কালের সাহিত্যে ঐতিহাসিক তথ্য যে নাই এমন নহে; তবে সাহিত্যকলেবরের বিপুলতার তুলনায় সে তথ্য নিতান্ত গৌণ ও তুচ্ছ, দুই একটি ক্ষেত্রে মাত্র প্রসঙ্গক্রমেই আসিয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে কোনও উপাখ্যান বলিয়া তাহার শেষে বলা হইয়াছে 'ইতি হ আস'[২] অর্থাৎ 'এইরূপই ছিল'। কিন্তু ইতিহাস বলা সেখানেও ঋষির মুখ্য উদ্দেশ্য নহে।

১। "It may be that India failed to produce historians because the great political events which affected her during the period up to A. D. 1200 did not call forth popular action in the sense in which the repulse of the Persian attacks on Greece evoked the history of Herodotos."—Keith

২। 'ইতিহাস' শব্দের মূল এইখানে।

তথাপি একথা একেবারে সত্য নহে যে সংস্কৃত সাহিত্যে জাতির ইতিহাস রক্ষা করিবার কোনও চেষ্টা করা হয় নাই। সংস্কৃত কবিগণের ইতিহাস রচনায় অক্ষমতাই একমাত্র কারণ নহে। নির্ভুল ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবও ইতিহাস রচনার পথে প্রবল অন্তরায় ছিল।[৩]

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গণ্ডী ছাড়াইয়া ভারতবাসীর প্রতিভা ব্যাপকতর ক্ষেত্রে নিযুক্ত হইয়াছে প্রথম পুরাণ সাহিত্যে। পুরাণ সাহিত্যেই প্রথম দেখা যায় জাতির সর্বস্তরের কথা, প্রথম দেখা যায় ধর্ম ছাড়াও অন্যান্য দিকে জাতীয় প্রতিভার স্ফুরণ।[৪] পুরাণের যে পঞ্চলক্ষণ[৫] বিহিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে রাজবংশের বিভিন্ন রাজার নামের তালিকা পূর্বাপর সংরক্ষণ করাও একটি। ব্রাহ্মণ্য প্রতিভা এইখানেই প্রথম নিযুক্ত হইল জাতির ইতিহাস সংরক্ষণ করিবার ক্ষেত্রে। তবুও এগুলি নির্ভরযোগ্য নহে, কারণ একই রাজবংশের তালিকা বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্নরূপে পাওয়া যায়। শেষ দিকে রচিত পুরাণগুলি পঞ্চলক্ষণের গণ্ডীকেও অতিক্রম করিয়া আরও ব্যাপক ক্ষেত্রে আত্মপ্রসার করিয়াছে এবং ভারতবাসীর ইতিহাসের বিভিন্ন দিকের চিত্র উপস্থাপিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় এই দিক দিয়া পুরাণগুলি অমূল্য সম্পদ[৬]।

রামায়ণ ও মহাভারত মূলতঃ ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস। অতিশয়োক্তি ও অসঙ্গতিকে বিচক্ষণতার সহিত বাদ দিয়া যদি নিরপেক্ষ বিচারকের দৃষ্টিতে ইহাদের আলোচনা করা যায় তবে তৎকালীন ভারতের ভৌগোলিক তথ্য ও রাজা ও রাজবংশের অনেক কথাই জানা যাইতে পারে।

ইতিহাস সংরক্ষণের ব্যাপারে বৌদ্ধগণ বোধ হয় হিন্দুগণ অপেক্ষা অধিক মনোযোগী ছিলেন। ৫ম খৃষ্টাব্দে **মহানামন্** কর্তৃক রচিত **মহাবংশ** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তথাপি বলিতে হইবে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এই গ্রন্থ রচিত হয় নাই। জৈনগণের **পট্টাবলী**ও নিরপেক্ষ ইতিহাস নহে। মহাবংশ, পট্টাবলী বা অবদান-সাহিত্যের রচয়িতৃগণ তথ্য অপেক্ষা ধর্মের প্রচারের দিকেই অধিক দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। তাই যেখানে ঐতিহাসিক তথ্য আছে, সেখানেও তাহা ধর্মের রঙে রঞ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। তথ্য কতখানি সত্য এবং কতখানি ধর্মানুরাগীর অতিশয়োক্তি তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।

ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের পক্ষে পরবর্তীকালের লিপি-সাহিত্যগুলি সর্বাধিক সাহায্য করিয়াছে। রাজাদের দানপত্র, প্রশস্তিপত্র বা ধর্মের বাণী বুকে ধরিয়া যে সকল ক্ষোদিতলিপি পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হইয়াছে সেইগুলি ভারতবর্ষের অজ্ঞাতকালের উপর যথেষ্ট আলোকসম্পাত করিয়াছে।[৭]

৩। "It is not only poverty in a particular branch of literature, but also absence of trustworthy information regarding the complex movements of human act and idea in their panoramic procession. The reason lies perhaps in the innate and deep-rooted limitations of the ancient, ideal, outlook and environment, as well as in the peculiarity of the literary objective, method and tradition, which affected the sustained and assiduous practice of Sanskrit literature as a whole, no less than in its haphazard and uninterested attempt at definite historical writing."—Das Gupta & De, p. 347

৪। পূর্বেকার পুরাণ সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৫। সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥

৬। দ্রষ্টব্য: F. E. Pargiter: *Ancient Indian Historical Tradition*

৭। পূর্বে প্রাক্-কালিদাসীয় যুগের লিপিগুলির আলোচনা করা হইয়াছে।

কাব্য-সাহিত্যের যুগে **বাণভট্টের হর্ষচরিতই** ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত। গ্রন্থের নামকরণ হইতেই মনে হয় যে বাণ তাঁহার পৃষ্ঠপোষক মহারাজ হর্ষবর্ধনের জীবনী রচনা করিতেই চাহিয়াছিলেন। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে বাণ এই গ্রন্থ কাব্য হিসাবেই রচনা করিয়াছেন, ইতিহাস রচনা করা তাঁহার উদ্দেশ্যই ছিল না।[৮]

বাক্‌পতিরাজ কর্তৃক মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত **গৌড়বহ** এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কবির পৃষ্ঠপোষক কনৌজেশ্বর যশোবর্মন কর্তৃক গৌড়েশ্বরের পরাজয়ই কাব্যের বিষয়বস্তু। এই যশোবর্মনই পরে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন। মোট ১২০৯টি শ্লোকে রচিত এই কাব্যে কবি নিজের কথা কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।[৯] বিস্ময়বোধ হয় যে সমগ্র কাব্যে কোথাও গৌড়েশ্বরের নাম করা হয় নাই। খৃষ্টাব্দ ৮ম শতকের প্রথম ভাগে উহা রচিত হয়।

পদ্মগুপ্ত[১০] রচিত **নবসাহসাঙ্কচরিত** ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত আর একখানি কাব্য। পদ্মগুপ্তের পিতার নাম মৃগাঙ্কগুপ্ত। পরমার রাজবংশীয় নরপতি মুঞ্জর সভাকবি ছিলেন তিনি এবং এই মুঞ্জরই আর এক নাম ছিল নবসাহসাঙ্ক। ১৮টি সর্গে লিখিত এই কাব্যে (১০০৫ খৃষ্টাব্দ) নাগরাজকুমারী শশিপ্রভার সহিত সিন্ধুরাজের বিবাহের বর্ণনা করা হইয়াছে। মৃগয়ায় বহির্গত রাজা গলদেশে স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত এক মৃগকে বাণবিদ্ধ করেন। মৃগ পলায়ন করে। শশিপ্রভারই প্রিয় মৃগ শশিপ্রভার নিকটেই উপস্থিত হয়। মৃগের গাত্রবিদ্ধ বাণ হইতে শশিপ্রভা রাজার নাম জানিতে পারেন। এদিকে মৃগের সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে রাজাও আসিলেন এক সরোবরের তীরে। তাহাতে দেখিলেন এক মরাল, চঞ্চুতে তাহার দোদুল্যমান এক মুক্তাহার। মুক্তায় ক্ষোদিত নাম হইতে রাজা জানিতে পারিলেন শশিপ্রভার কথা। শশিপ্রভা কর্তৃক মুক্তাহারের অন্বেষণে প্রেরিতা পরিচারিকার সহিত রাজার সাক্ষাৎ হয়। শশিপ্রভাকে লাভ করিবার জন্য রাজা নাগলোক আক্রমণ করেন এবং বজ্রাঙ্কুশকে নিহত করিয়া শশিপ্রভার পাণিগ্রহণ করেন।

অষ্টাদশ সর্গে বিল্‌হণের (১১শ খৃঃ প্রথম দিকে) **বিক্রমাঙ্কদেবচরিত** ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া রচিত। কবির নাম হইতে মনে হয় তিনি কাশ্মীরী। রাজবংশের যুদ্ধ এবং বিবাহ লইয়া রচিত এই কাব্যে বিল্‌হণ কল্যাণরাজ বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্লের যশোগান গাহিয়াছেন। কাব্যের প্রথম দিকে চালুক্য রাজবংশের সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্বে বিক্রমাদিত্যের দিগ্বিজয়ের কাহিনী, বিক্রমাদিত্য কর্তৃক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিতীয় সোমেশ্বরের সিংহাসনচ্যুতি, চোলগণের সহিত বিক্রমাদিত্যের যুদ্ধ প্রভৃতি ইতিহাসের বহু সংবাদ এই কাব্যে পাওয়া যায়।[১১] বিল্‌হণ কবিরূপেই অধিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। পঞ্চম অঙ্কে বর্ণিত আহবমল্লের মৃত্যুদৃশ্য কাব্যাংশে অতীব উৎকৃষ্ট।

৮। "The sum-total of the story, lavishly embellished as it is, is no more than an incident in Harsa's career; and it cannot be said that the picture is either full or satisfactory from the historical point of view. Many points in the narrative, especially the position, action and identity of the Malava and the Gauda kings, are left obscure; and the gorgeously descriptive and ornamental style leaves little room for the poor thread of actual history."—Das Gupta & De, p. 228

৯। দ্রষ্টব্য: গৌড়বহ, শ্লোক ৭৯৭-৮০৪; স্বরচিত আরও একখানি কাব্যের তিনি উল্লেখ করিয়াছেন—ঐ, শ্লো. ৬৯

১০। নামান্তর পরিমল-কালিদাস।

১১। "The date of that work appears to fall before 1088, because it passes in silence the great expedition of the king to the south which

ঐতিহাসিক কাব্য হিসাবে কহ্লণের রাজতরঙ্গিণী সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত সাহিত্যে কোনও কবিকে যদি ঐতিহাসিকের মর্যাদা দিতে হয় তবে তিনি কহ্লণ। পূর্ব আলোচিত গ্রন্থগুলি ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত হইয়াছিল মাত্র, কবিগণের ইতিহাস রচনা করার কোনও উদ্দেশ্যও ছিল না এবং ইতিহাস লিখিতে হইলে যে বিশ্লেষণক্ষমতা, নিরপেক্ষতা ও নিখুঁত তথ্যের প্রয়োজন হয় সেগুলিও তাঁহাদের ছিল না। কিন্তু কহ্লণ ইতিহাস রচনা করার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা লইয়াই রাজতরঙ্গিণী রচনা করিয়াছিলেন। পূর্ব আলোচিত গ্রন্থগুলি ইতিহাসের কাঠামোকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও কবিরা তাহা রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের নিজেদের পৃষ্ঠপোষক রাজার কাহিনী ও কীর্তিকলাপকেই বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আবার তাঁহারা যে রাজার কাহিনী অবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহারই সভাকবি ছিলেন। পৃষ্ঠপোষক যদি রাজা হন এবং তাহার উপর আবার যদি তিনি জীবিত থাকেন তবে তাঁহার সভাকবির পক্ষে উৎকৃষ্ট কাব্য রচিত হইতে পারে, ইতিহাস রচিত হইতে পারে না। ঐতিহাসিকের পক্ষে প্রয়োজন ইতিহাস রচনা করিবার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, ঐতিহাসিকের দূরদৃষ্টির ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতা এবং সর্বোপরি নিরপেক্ষতা। আর স্বাভাবিক কারণেই সভাকবিদের নিরপেক্ষতা ছিল না। ফলে, তাঁহাদের রচনা ইতিহাস হয় নাই, রাজপ্রশস্তি হইয়াছে বলা চলে।

রাজতরঙ্গিণীর রচনার একটু বিশেষ অবস্থায় সৃষ্টি হইয়াছিল। কহ্লণ কাশ্মীর-রাজ হর্ষের (১০৮৯-১১০১ খৃষ্টাব্দ) মন্ত্রী ছিলেন। কহ্লণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন অলকদত্ত এবং অলকদত্তের উৎসাহেই কহ্লণ কাশ্মীরের ইতিহাস রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। জয়সিংহ (১১২৭-১১৫৯ খৃষ্টাব্দ) কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিলে কহ্লণ তাঁহারও সভাকবি হন। ১১৪৯ খৃষ্টাব্দে কহ্লণ রাজতরঙ্গিণীর রচনা আরম্ভ করেন এবং বৎসরকালের মধ্যেই উহা সম্পূর্ণ করেন।

নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধি, তথ্যানুসন্ধান এবং দেশ ও জাতির সম্বন্ধে জানবার তথ্য-সমূহের সহিত নিবিড় পরিচিতিই ঐতিহাসিককে প্রকৃত ইতিহাস রচনায় সাহায্য করে। এ সব গুণগুলিই কহ্লণের ছিল। কাশ্মীর সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার, সব কিছু সম্বন্ধে কহ্লণ জানিয়াছেন। তাঁহার পূর্বসূরিগণের রচনার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বসূরিগণের ১১ খানি গ্রন্থকে কহ্লণ কাজে লাগাইয়াছেন এবং **নীলমত পুরাণ**, ক্ষেমেন্দ্র রচিত **নৃপাবলী**, শিলালিপি ও তাম্রশাসনের বিবরণসমূহ, কৌলিক রীতি ও প্রথাদি, কুলপঞ্জী, লোকমুখে প্রচলিত কাহিনী সব কিছু তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়া কহ্লণ এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। রাজবংশের নরপতি-গণের শৌর্যবীর্য এবং কাজে কিছু কিছু অসঙ্গতি আছে; তথাপি চরিত্র-অঙ্কনে, তৎকালীন কাশ্মীরের সর্বক্ষেত্রের জনগণের নিখুঁত চিত্রাঙ্কনে কহ্লণ অপূর্ব শক্তি-মত্তার পরিচয় দিয়াছেন। শান্তরসপ্রধান এই রচনা একাধারে ইতিহাস ও মহাকাব্যের মর্যাদালাভের অধিকারী হইবার যোগ্য।

ঐতিহাসিক কাব্য হিসাবে জৈন আচার্য হেমচন্দ্রের **কুমারপালচরিত**[11] বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১০৮৮ খৃষ্টাব্দে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে হেমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁহার পিতার অজ্ঞাতসারে তাঁহার মাতা তাঁহাকে এক জৈন ভিক্ষুর নিকট

---

took place then, because it mentions as prince, not king, Harsadeva of Kashmir who became king only in that year, and we know from Kalhana that Bilhana actually lived to hear of Harsadeva's accession."
—Keith

১১। নামান্তর দ্ব্যাশ্রয়কাব্য

সন্ন্যাস গ্রহণ এবং তখনই হেমচন্দ্র জৈন ধর্মে দীক্ষিত হন। সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে তাঁহার সম অধিকার। তিনি এক নূতন বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন[১০] এবং তাঁহার প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ সুপ্রসিদ্ধ। সাধক হিসাবে তিনি অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এবং 'সর্বজ্ঞ' নামে সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন। গুজরাটের অনহিলবাড়্-এর রাজা জয়সিংহ সিদ্ধরাজের (১০৯৪-১১৪৩ খৃষ্টাব্দ) ও তাঁহার উত্তরাধিকারী রাজা কুমারপালের রাজসভায় হেমচন্দ্র বহুদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁহার সময়ে রাজ্যে জৈন ধর্ম প্রভূত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

২৮টি সর্গে রচিত **কুমারপালচরিত** রাজা কুমারপালের জীবনী বিবৃত করিয়াছে। প্রথম ২০টি সর্গ সংস্কৃতে এবং শেষ ৮টি সর্গ প্রাকৃত ভাষায় রচিত। দুইটি ভাষাকে আশ্রয় করিয়া রচিত হওয়ার জন্য ইহার নামান্তর **দ্ব্যাশ্রয়কাব্য**। প্রাকৃত অংশে বহুবিধ প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার করা হইয়াছে এবং প্রাকৃত-ব্যাকরণের সূত্রগুলিকে দৃষ্টান্ত দ্বারা হেমচন্দ্র এই অংশ রচনা করিয়াছিলেন।

সোমেশ্বরদেবের কীর্তিকৌমুদী (১১৭৯-১২৬২ খৃষ্টাব্দ), **অরিসিংহের সুকৃতসংকীর্তন, বসন্তবিলাস মহাকাব্য, সর্বানন্দের জগডুচরিত** প্রভৃতি আরও বহু কাব্য এই শ্রেণীর কাব্যগুলিকে পুষ্টিসাধন করিয়াছে।

১০। দ্রষ্টব্য: Belvalkar: *System of Sanskrit Grammar*

গল্প-সাহিত্য

গল্প শুনিবার আকর্ষণ মানুষের চিরন্তন। গল্প বলার ভঙ্গী সে আকর্ষণকে আরও বাড়াইয়া তোলে। একই কাহিনী নানা যুগে নানা ভাবে বলা হইয়াছে, তবুও মানুষের কাছে তাহা পুরানো হইয়া যায় নাই। উর্বশী-পুরুরবার কাহিনী ঋগ্বেদে শুনিয়াছি, পুরাণে শুনিয়াছি, মহাভারতে শুনিয়াছি, কালিদাসের নাটকেও শুনিয়াছি। কাহিনী এক হইলেও বর্ণনার নব নব ভঙ্গীর জন্য তাহা নিত্য নূতন ও উপাদেয় লাগিয়াছে। মানুষের এই সহজাত প্রবৃত্তি হইতে গল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বাণ-সুবন্ধু-দণ্ডীও গল্পই বলিয়াছিলেন। সেই বলার ভঙ্গীটি অবশ্যই ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু একই ভঙ্গীর প্রতি আকর্ষণ চিরদিন থাকে না, তাই চম্পূকাব্যে সেই ভঙ্গী নূতন রূপ গ্রহণ করিল। সে ভঙ্গীও পুরানো হইল, আসিল গল্প-সাহিত্য।

সংস্কৃত সাহিত্যের পিছনে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা বরাবরই ছিল, কিন্তু রাজাদের কোনও বিশেষ প্রয়োজনকে সিদ্ধ করা সাহিত্য রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। গল্পসাহিত্যের সৃষ্টির পিছনে মূলতঃ তিনটি কারণ কাজ করিয়াছে—(ক) অবসর যাপন (খ) নিছক চিত্ত-বিনোদন (গ) রাজকুমারগণের শিক্ষাদান। রাজদরবারে কোমল-মতি রাজকুমারগণকে অর্থশাস্ত্রে, নীতিশাস্ত্রে বুৎপন্ন করিয়া তুলিবার জন্য একসময়ে রাজারাই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুকুমার চিত্তে অর্থ ও নীতি-শাস্ত্রের জটিল তত্ত্বসমূহ যাহাতে অতি সহজভাবে গভীর প্রভাব বিস্তার করে তাহার জন্য সেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ গল্পকে মাধ্যমরূপে নির্বাচিত করিলেন। শিশুশিক্ষার বাহনরূপে গল্পকে নির্বাচন করার কৃতিত্ব ব্রাহ্মণগণেরই। গল্প-সাহিত্যের সহিত তাই অর্থ ও নীতিশাস্ত্রের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।[১] গল্পের চরিত্ররূপে পশু-পক্ষিগণকে নির্বাচিত করিয়া শিশুশিক্ষার পুরোধাগণ শিশুগণকে এক সময়ে জীবন ও প্রকৃতির বৃহত্তর পরিবেশের সহিত পরিচিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। গল্প-সাহিত্যের অন্তর্গত গল্পগুলির[২] তাই দুইটি সুনির্দিষ্ট ভাগ আছে—এক ভাগের চরিত্রগুলি মানুষ আর এক ভাগের চরিত্র পশুপক্ষী। ব্যাপকভাবে উভয় শ্রেণীই গল্প-সাহিত্যের (popular tales) অন্তর্গত এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্পগুলিকে একটু স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা দেওয়ার জন্য ইংরাজীতে বলা হয় ফেবল্স (fables)।[৩]

১। তুল: "The fable, indeed, is essentially connected with the two branches of science known by Indians as the *Nitisastra* and the *Arthasastra*, which have this in common as opposed to the Dharmasastra that they are not codes of morals, but deal with man's action in practical politics and conduct of the ordinary affairs of everyday life and intercourse. We must not, however, exaggerate the contrast between these Sastras, for in the *Arthasastra* and the *Nitisastra* alike there is much common sense and that is often in accord with practical morality; at no time can we regard the didactic as intended merely to extol cleverness without regard to morality.—Keith

২। তুল: *In these fables and fairy tales*, the abundant introduction of ethical reflection and popular philosophy is characteristic; the apologue with its moral is peculiarly subject to this method of treatment."—Macdonell; *Sanskrit Literature*, p. 368

৩। এই দুই শ্রেণীর গল্পের পার্থক্য সম্বন্ধে Keith বলেন:
"It differs from the tales in that the fable element with its didactic

গল্পের আখ্যানভাগকে শিশুদের বোধগম্য করিবার জন্য সহজ ও অনাড়ম্বর ভাষার ব্যবহার করা হইয়াছে এবং সমগ্র গল্পটি পড়িয়া শিশু যাহাতে তাহার নীতিটি অক্লেশে মনে রাখিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে গল্পে এমন শ্লোক সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে যাহা একাধারে চুম্বকাকারে গল্প ও তৎসংশ্লিষ্ট নীতির স্মারক।[৪]

গল্প-সাহিত্যের মধ্যে **পঞ্চতন্ত্রের** নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বাইবেলের পর পৃথিবীতে এত বহুল প্রচারিত গ্রন্থ আর নাই। প্রায় ৫০টি ভাষায় দুই শতেরও অধিক সংস্করণে পঞ্চতন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্ধে পহ্‌লবী ভাষায় ইহার একটি অনুবাদ হয়। যে মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ঐ অনুবাদ করা হইয়াছিল তাহার সহিত ঐ অনুবাদও আজ লুপ্ত। ৫৭০ খৃষ্টাব্দে একটি সিরিয়াক্‌ সংস্করণ এবং ৭৫০ খৃষ্টাব্দের একটি আরবী সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছিল।

পঞ্চতন্ত্রের রচনাকাল সম্বন্ধে Hertel বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।[৫] খৃঃ পূঃ ২য় শতকের পরে যে ইহা রচিত তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। পঞ্চতন্ত্র মহাভারতের সহিত পরিচিত এবং ইহাতে 'দীনার'[৬] শব্দের ব্যবহার খৃষ্টাব্দের প্রথম দিককেই ইহার রচনাকাল বলিয়া নির্দেশ করে।[৭] মহিলারোপ্যনগরে রাজা অমরশক্তির জড়ধী পুত্রগণের শিক্ষার জন্য বিষ্ণুশর্মা নামে কোনও ব্রাহ্মণ ইহা রচনা করেন, এইরূপ বলা হইয়াছে। অমরশক্তি ও বিষ্ণুশর্মা নামের ঐতিহাসিকত্ব আজও নির্ণীত হয় নাই। মহিলারোপ্য দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত,[৯] সুতরাং মনে করা যাইতে পারে যে দাক্ষিণাত্যই পঞ্চতন্ত্রের রচনাস্থান।[৮]

মূল গ্রন্থ পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত ছিল বলিয়া 'পঞ্চতন্ত্র' নাম হইয়াছিল। এই পাঁচটি

---

stanzas decidedly prevails over other elements while the tale includes the fable merely as a lesser constituent. Both profit by this absence of rigidity, which permits either a richer content and more elaborate development. Even so late a work as the Hitopadesa knows how to seek variety by blending the beast fable with Marchen and spicy narratives of human life."

৪। Rhys Davids ও Otto Keller ভারতীয় গল্প-সাহিত্যের উপর প্রভূত আলোচনা করিয়াছেন। গ্রীক গল্প-সাহিত্য হইতে ভারতীয়গণ গল্প বলার এই রীতি গ্রহণ করিয়াছেন এমন মনে হয় না। বস্তুতঃ ভারতবাসী গ্রীকদের সব কিছুই বর্জন করিয়াছেন।

তুল: .."neither Alexander's conquest nor the association with Bactrian Kings, seems to have left any permanent impression on Indian mind. ..hardly any effect of Hellenisation can be discovered. ..The people of India rejected Greek political institutions and architecture as well as language."—Das Gupta & De, Introd., p. ciii

৫। *History of the Beast Fable in India* (HOS)

৬। লাটিন *denarius*

৭। "..and the use of *dinara*, the Latin *denarius* points definitely to a time after the Christian era, though it is not sufficient to assign it the second century A. D. at earliest,"—Keith

৮। "Hertel's view that the work was composed in Kashmir because neither the tiger nor the elephant plays a part in the original, while the camel is known, is inconclusive in view of the late origin of the work, which would render it possible for persons in a very wide area in India to know all about the camel."—Keith

৯। তন্ত্রাখ্যায়িকাতে ঋষ্যমূক পর্বতের উল্লেখ আছে এবং ঐ পর্বতও দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত।

খণ্ড বা তন্ত্রের নাম—(ক) মিত্রলাভ (খ) মিত্রভেদ (গ) কাকোলূকীয় (ঘ) লব্ধপ্রণাশ (ঙ) অপরীক্ষিত কারক।[১০]

১১৯৯ খৃষ্টাব্দে জিনপতি সূরির শিষ্য শ্বেতাম্বর জৈন ভিক্ষু পূর্ণভদ্র পঞ্চতন্ত্রের একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই সংস্করণে ২১টি নূতন গল্প সংযোজিত হইয়াছিল। ইহা **পঞ্চাখ্যানক** নামে পরিচিত। ইহারও পূর্বে **তন্ত্রাখ্যায়িকা** নামে মূল পঞ্চতন্ত্রের আরও একখানি সংস্করণ ছিল। মূল পঞ্চতন্ত্রের ভাষাকে তন্ত্রাখ্যায়িকা যতখানি অনুসরণ করিয়াছে, পঞ্চতন্ত্রের কোনও পরবর্তী সংস্করণ ততখানি করে নাই।[১১] পঞ্চতন্ত্রের একখানি **দক্ষিণ ভারতীয়** সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারবির পরে তাহা রচিত হয়। মূল পঞ্চতন্ত্রের ভাষাকে ইহা তন্ত্রাখ্যায়িকা অপেক্ষাও ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করিয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতে পঞ্চতন্ত্রের যে সংস্করণ প্রচলিত ছিল তাহাকে অবলম্বন করিয়া পরবর্তীকালে বৃহৎকথামঞ্জরী ও কথাসরিৎসাগর রচিত হয়।

পঞ্চতন্ত্রের পরই **হিতোপদেশ** উল্লিখিত হইবার দাবি রাখে। বঙ্গদেশেই ইহা রচিত হয় এবং বঙ্গদেশেই ইহা সর্বাধিক জনপ্রিয়। ইঁহার রচয়িতা নারায়ণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ধবলচন্দ্র। একটি পুঁথিতে ইহার তারিখ দেওয়া আছে ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দ, সুতরাং ইহার রচনাকাল তাহার পূর্বে।

গ্রন্থে রবিবারকে বলা হইয়াছে 'ভট্টারকবার'; ৯০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ঐ শব্দটির প্রচলন ছিল না। নারায়ণকে মাঘের পরবর্তী বলিয়া মনে করা হয়। পঞ্চতন্ত্র কামন্দকীয় নীতিসার এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে নারায়ণ রচনার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। হিতোপদেশের চারিটি খণ্ড আছে এবং ইহার তৃতীয় খণ্ড পঞ্চতন্ত্রের চতুর্থ খণ্ডেরই ছায়া মাত্র। অন্যান্য বিষয়েও ইহার উপর পঞ্চতন্ত্রের প্রভূত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

গুণাঢ্য রচিত **বৃহৎকথা** আজ নামমাত্রে পর্যবসিত। বৃহৎকথা নষ্ট হওয়ায় ভারতীয় গল্প-সাহিত্যের অপরিমেয় ক্ষতি হইয়াছে। আজ গুণাঢ্যের নাম ও রচনা-কাহিনী গল্পের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'বৃহৎকথা' নামে যে একখানি গ্রন্থ ছিল তাহা সর্বপ্রথম ৭ম খৃষ্টাব্দে সুবন্ধু[১২], বাণ[১৩] ও দণ্ডীর[১৪] উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি। ব্যাস-বাল্মীকির সহিতই এক সময়ে গুণাঢ্যের নাম উল্লেখ করা হইত। নবম খৃষ্টাব্দের একখানি কাম্বোডীয় লিপিতে[১৫] গুণাঢ্যের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে ৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দের পূর্বে যে গুণাঢ্যের বৃহৎকথার অস্তিত্ব ছিল তাহা প্রমাণিত হয়।

১০। তুলঃ সকলার্থশাস্ত্রসারং জগতি সমালোক্য বিষ্ণুশর্মেনম্।
তন্ত্রৈঃ পঞ্চভিরেতচ্চকার সুমনোহরং কাব্যম্॥

১১। "In short, the difference between the Tantrakhyayika and the other versions, in their relations to the original is a difference of degree and not a difference of kind. All are to a considerable extent original. All are to a considerable extent unoriginal. On the whole, the Tantrakhyayika contains more of the original than of any other. In this respect it is surpassed by the Southern Panchatantra, which has much less unoriginal material than the Tantrakhyayika, and probably less than any other version, except the greatly abbreviated and versified Somadeva."—Edgerton

১২। তুলঃ বৃহৎকথালম্বৈরিব সালভঞ্জিকানিবহৈঃ। —বাসবদত্তা

১৩। তুলঃ সমুদ্দীপিতকন্দর্পা কৃতগৌরীপ্রসাধনা।
হরলীলেব নো কস্য বিস্ময়ায় বৃহৎকথা॥ —হর্ষচরিত

১৪। কাব্যাদর্শ, ১.৩৮

ক্ষেমেন্দ্রর বৃহৎকথামঞ্জরী, সোমদেবের কথাসরিৎসাগর এবং জয়রথের হরচরিত-চিন্তামণি হইতে গুণাঢ্য সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যায়। ক্ষেমেন্দ্রের মতে গোদাবরীর তীরে প্রতিষ্ঠানপুর হইল গুণাঢ্যের জন্মস্থান। প্রতিষ্ঠানপুর অন্ধ্রবংশীয় রাজাদের রাজধানি ছিল এবং হাল সাতবাহন (শালিবাহন?) এই বংশেরই রাজা ছিলেন। সাতবাহনের কাল সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। ফলে গুণাঢ্যের কাল সম্বন্ধেও মতভেদ আছে।[১৬] Keith গুণাঢ্যকে ৫ম খৃষ্টাব্দের পরে আনিতে কিছুতেই রাজী নহেন এবং খৃষ্টাব্দ ১ম শতক তাঁহার মতে অযৌক্তিক অনুমান মাত্র।[১৭]

বৃহৎকথার গল্পটি সোমদেবের মতে এইরূপ : পার্বতীর অনুরোধে মহাদেব একদিন পার্বতীকে সাতজন বিদ্যাধর চক্রবর্তীর কাহিনী বিবৃত করেন। মহাদেবেরই এক অনুচর পুষ্পদন্ত, আড়াল হইতে সেই কাহিনী শুনিয়া লয় এবং নিজের পত্নী জয়ার নিকট বিবৃত করে। জয়ার মুখ হইতে গল্পগুলি ছড়াইয়া পড়ে। পার্বতী সব জানিতে পারিয়া পুষ্পদন্তকে অভিশাপ দিলেন পৃথিবীতে মানুষ হইয়া জন্মিবার জন্য। পুষ্পদন্তের ভ্রাতা মলয়বান পুষ্পদন্তের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পার্বতীর নিকট অনেক অনুনয় করিল, ফলে তাহাকেও অনুরূপ শাপগ্রস্ত হইতে হইল। জয়া ছিল পার্বতীরই পরিচারিকা। জয়ার পরিচর্যায় খুশী হইয়া পার্বতী নিজেই একদিন অনুগ্রহ করিলেন; বলিলেন, কণভূতি নামক পিশাচের দেখা পাইয়া পুষ্পদন্ত যেদিন তাহার পূর্বজন্মের সমস্ত কথা স্মরণ করিয়া কণভূতির নিকট বিবৃত করিবে সেইদিন পুষ্পদন্ত নরদেহ হইতে মুক্তি পাইবে। আর কণভূতির নিকট হইতে সেই কাহিনী শুনিয়া মলয়বান যেদিন তাহা পৃথিবীতে প্রচার করিবে সেইদিন হইবে মলয়বানের মুক্তি।

বররুচি-কাত্যায়নরূপে কৌশাম্বীতে জন্মিলেন পুষ্পদন্ত আর গুণাঢ্যরূপে প্রতিষ্ঠানপুরে জন্মিলেন মলয়বান। রাজা সাতবাহনের প্রিয়পাত্র গুণাঢ্য। একদিন সাতবাহন রানীদের সহিত জলকেলি করিবার সময় রানীদের গায়ে জল নিক্ষেপ করিতেছিলেন। একজন মহিষী তখন রাজাকে বলিলেন, 'মোদকৈঃ' (মা + উদকৈঃ, অর্থাৎ আর জল নিক্ষেপ করিবেন না)। সন্ধির জ্ঞান না থাকায় রাজা ঐ শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না, মনে করিলেন জলের পরিবর্তে রানী তাঁহাকে মিষ্টান্ন দ্বারা আঘাত করিতে বলিতেছেন। নিজের অজ্ঞতার জন্য রাজার লজ্জা হইল এবং সেইদিন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেমন করিয়া হউক সংস্কৃত শিক্ষা করিবেন। গুণাঢ্য রাজাকে আশ্বাস দিলেন যে ছয় বৎসরের মধ্যে তিনি তাঁহাকে সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন করিয়া তুলিবেন। বৈয়াকরণ শরবর্মা বলিলেন, তিনি ছয়মাসেই উহা করিতে পারেন। তখন গুণাঢ্য শপথ করিলেন, শরবর্মা যদি ছয়মাসের মধ্যে রাজাকে সংস্কৃতে পারদর্শী করিতে পারেন তবে তিনি জীবনে আর কোনও দিন সংস্কৃত, প্রাকৃত বা কোনও দেশজ ভাষার ব্যবহার

১৫। লিপিটি এই:

পারদঃ স্থিরকল্যাণো গুণাঢ্যঃ প্রাকৃতপ্রিয়ঃ
অনীতিবর্যো বিশালাক্ষঃ শূরো ন্যককৃতভীমকঃ॥

১৬। "We can fairly claim that Gunadhya is not later than A. D. 500, but to place him in first century A. D. is quite conjectural, nor in reality is any other later date more assured."—Keith

১৭। Buhler-এর মতে তিনি খৃষ্টাব্দ ১ম বা ২য় শতকের, Smith-এর মতে ১ম শতাব্দীর শেষার্ধের, Levy-র মতে ২য় বা ৩য় শতাব্দীর, Weber-এর মতে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর, Speyer ও Tawney-র মতে ৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কোনও সময়ে।

করিবেন না। শরবর্মা নিজের কথা রক্ষা করিলেন। গুণাঢ্য মৌনাবলম্বন করিয়া বিন্ধ্যপর্বতে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে কাত্যায়নরূপী পুষ্পদন্ত আজীবন নন্দরাজবংশের সেবা করিয়া বৃদ্ধ বয়সে তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। বিন্ধ্যবাসিনী পার্বতীর মন্দিরে আসিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন পিশাচ কণভূতিকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল পূর্বজন্মের কথা—মনে পড়িয়া গেল সেই সাত বিদ্যাধর চক্রবর্তীর কাহিনী যাহা আড়ালে থাকিয়া তিনি মহাদেবের মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন। সমস্ত কাহিনী তিনি বিবৃত করিলেন কণভূতির নিকট। পার্বতীর বর সফল হইল, কাত্যায়ন স্বদেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে আগমন করিলেন।

বিন্ধ্যপর্বতে ভ্রমণ করিতে করিতে কণভূতির সহিত গুণাঢ্যের দেখা হইল। গুণাঢ্যের সঙ্গে আসিয়াছেন গুণদেব ও নন্দিদেব নামে তাঁহার দুই শিষ্য। কণভূতির নিকট হইতে গুণাঢ্য সেই কাহিনী শুনিলেন এবং সমস্ত লিপিবদ্ধ করিতে চাহিলেন। পূর্বপ্রতিজ্ঞামত সংস্কৃত, প্রাকৃত বা কোনও দেশজ ভাষার ব্যবহার না করিয়া ৭ লক্ষ শ্লোকে পৈশাচী ভাষাতে নিজের রক্ত দ্বারা সেই কাহিনী গুণাঢ্য লিপিবদ্ধ করিলেন। শিষ্যদ্বয়ের পরামর্শ মত গুণাঢ্য তাহা প্রেরণ করিলেন রাজা সাতবাহনের নিকট। রক্তাক্ষরে ও পৈশাচী ভাষায় লিখিত গ্রন্থের সমাদর রাজা করিলেন না। গুণাঢ্যের রচনা গুণাঢ্যের কাছে ফেরত আসিল। মর্মাহত গুণাঢ্য দিনের পর দিন সে রচনা পড়িয়া বনের পশুপাখীকে শোনান। পড়া শেষ হইয়া যায় আর আগুনে তাহা পোড়াইয়া ফেলেন। সে রচনা শুনিয়া পশুপাখীর চোখেও জল আসে, আহার-নিদ্রা ভুলিয়া তাহারা গুণাঢ্যের রচনা শুনিয়া চলে। রাজবাড়িতে শিকারের পশু আনা হয়, কিন্তু তাহা আর পূর্বের মত হৃষ্টপুষ্ট নহে। পাচক পশুমাংস রন্ধন করে, কিন্তু তাহার আর পূর্বের ন্যায় স্বাদ হয় না। রাজার টনক নড়িল। অনুসন্ধানে সব শুনিলেন ও অনুতপ্ত হইলেন। কিন্তু, যখন ভুল বুঝিতে পারিলেন তখন বড় দেরি হইয়া গিয়াছে; গুণাঢ্য ততদিনে ছয়টি গল্প অগ্নিদগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। রাজা ১ লক্ষ শ্লোকে রচিত একটি কাহিনীর মাত্র উদ্ধারসাধন করিলেন। তাহাই পৃথিবীতে 'বৃহৎকথা' নামে প্রচারিত হইল।

গুণাঢ্যের বৃহৎকথাকে অবলম্বন করিয়া পরবর্তীকালে যে তিনখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, অনেকে মনে করেন, তাহার মধ্যে **বুদ্ধস্বামী** রচিত **বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ** সর্বাপেক্ষা প্রধান। ইহা নেপালে রচিত হইয়াছিল। অসমাপ্ত অবস্থায় ২৮টি সর্গে ইহার ৪৫৩৯টি শ্লোক পাওয়া যায়।[১৮] তাহার পরই **ক্ষেমেন্দ্র** রচিত **বৃহৎকথামঞ্জরী**।[১৯] কাশ্মীররাজ অনন্তের (১০২৯-১০৬৪ খৃঃ অঃ) সভাকবি ছিলেন ক্ষেমেন্দ্র। ক্ষেমেন্দ্রেরও পরে ১০৬৩-১০৮১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ **সোমদেব** রচনা করেন **কথাসরিৎসাগর**। সোমদেবও কাশ্মীররাজ অনন্তেরই সভাকবি ছিলেন। অনন্তের পুত্র কলশ, কলশের পুত্র হর্ষ। মহারাজ অনন্তের মহিষী সূর্যমতী ছিলেন জলন্ধর-রাজদুহিতা। তাঁহারই চিত্তবিনোদনের জন্য ১৮ লম্ভকে, ১২৪ তরঙ্গে এবং

১৮। Lacote-র মতে ৫ম। ৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দ বুদ্ধস্বামীর কাল।

তুলঃ "If he is assigned to the eighth or ninth century, it is without any special ground save that the manuscript tradition suggests that a long time had elapsed before extant manuscripts came into being."—Keith

১৯। **মহাভারতমঞ্জরী** ও **রামায়ণমঞ্জরী**ও ক্ষেমেন্দ্রের রচিত।

২৪,০০০ শ্লোকে কথাসরিৎসাগর রচিত হয়। এখন পৃথিবীর প্রাচীনতম ও বৃহত্তম গল্পসঞ্চয়ন এই কথাসরিৎসাগর। সোমদেব নিজেই বলিয়াছেন যে, পৈশাচী ভাষায় রচিত গুণাঢ্যের বৃহৎকথার সারসংক্ষেপ তিনি সংস্কৃতে করিয়াছেন কথাসরিৎসাগরে। মূল বৃহৎকথার যথাসাধ্য অনুসরণ করিয়া উহাকে সহজে বোধগম্য করিবার জন্য সোমদেবের এই প্রচেষ্টা।[২০]

বত্রিশটি গল্পের সংকলন **সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা** বা **বিক্রমার্কচরিত**। মহারাজ বিক্রমাদিত্য ইন্দ্রের নিকট হইতে একটি সিংহাসন উপহার পান। শালিবাহন কর্তৃক বিক্রমাদিত্য পরাজিত ও নিহত হইবার পর ঐ সিংহাসন কালক্রমে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া পড়ে। ধারাধিপতি ভোজ ঐ সিংহাসনের উদ্ধারসাধন করিতে সমর্থ হন এবং যখন তিনি তাহাতে উপবেশন করিতে যাইতেছিলেন তখন সিংহাসনগাত্রে ক্ষোদিত ৩২টি পুত্তলিকা জীবন্ত হইয়া উঠে এবং প্রত্যেকে মহারাজ বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে এক একটি গল্প বলিয়া প্রস্থান করে। সেই ৩২টি গল্প ইহাতে স্থান পাইয়াছে। খৃষ্টাব্দ ১৩শ শতকের পূর্বে ইহা রচিত নহে বলিয়া অনুমান করা হয়।[২১] খৃষ্টাব্দ ১৪শ শতকে ক্ষেমঙ্কর নামে এক জৈন লেখক গদ্যে এই কাহিনীগুলির একটি সারসংক্ষেপ করিয়াছিলেন।

৭০টি গল্পের সংকলনরূপে চিন্তামণিভট্ট রচিত **শুক-সপ্ততিকথা** গল্পসাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। ১২শ খৃষ্টাব্দের পর ইহার রচনাকাল। দেবদাস নামে কোনও ব্যক্তির একটি শুক ছিল। দেবদাসের পত্নী ছিলেন পরমাসুন্দরী। তাঁহাকে অপহরণ করিবার জন্য রাজা কোনও কাজের অছিলায় দেবদাসকে দূরদেশে প্রেরণ করেন। যাত্রাকালে দেবদাস শুকের উপর সকল ভার অর্পণ করিয়া বিদেশে গমন করেন। শুক গৃহকর্ত্রীর মনোভাব বুঝিতে পারে। প্রতিদিন রাত্রে গৃহকর্ত্রী গৃহত্যাগ করিতে যাইলে শুক তাঁহাকে তাঁহার কৃতকর্মের দারুণ ফলের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এবং অতীতে অনুরূপ অবস্থায় কে কিরূপ আচরণ করিয়াছিল তাহাই গল্প করে। গল্পের আকর্ষণে গৃহকর্ত্রীর আর সে রাত্রে গৃহত্যাগ করা হয় না। এমনি করিয়া ৭০ রজনী অতিবাহিত হইল। ইতিমধ্যে দেবদাস গৃহে ফিরিলেন এবং এইরূপে শুক কর্তৃক গল্পের আকর্ষণের সৃষ্টি করিয়া দেবদাসপত্নীর চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করা হইল।

২৫টি গল্প লইয়া রচিত **বেতালপঞ্চবিংশতি** গল্প-সাহিত্যের আর একটি অমূল্য সম্পদ। গল্পগুলি খুব প্রাচীন। সোমদেব ও ক্ষেমেন্দ্রও এই গল্পগুলি তাঁহাদের রচনায় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার রচয়িতা শিবদাস! রাজা বিক্রমাদিত্যকে এক সন্ন্যাসী প্রতিদিন একটি করিয়া ফল উপহার দিতেন এবং সেই ফলের মধ্যে একটি করিয়া রত্ন পাওয়া যাইত। সন্ন্যাসীর প্রয়োজনের জন্য সন্ন্যাসীর অনুরোধে বিক্রমাদিত্য

২০। তুলঃ যথা মূলং তথৈবৈতন্ন মনাগপ্যতিক্রমঃ।
ঔচিত্যান্বয়রক্ষা চ যথাশক্তি বিধীয়তে॥
কথারসাবিঘাতেন কাব্যাংশস্য চ যোজনা।
বৈদগ্ধ্যখ্যাতিলোভায় মম নৈবায়মুদ্যমঃ॥
কিন্তু নানা কথাজালস্মৃতিসৌকর্যসিদ্ধয়ে।

২১। "The date and authorship of the work are unknown but since both the Southern and Jaina Versions, apparently independently, refer to the Danakhanda of Hemadri's *Caturvarga-cintamani*, it cannot date from a time earlier than the 13th century."—Das Gupta & De, p. 425

শ্মশানস্থ কোনও বৃক্ষের উপরিভাগ হইতে একটি শবকে আনিবার জন্য গমন করেন। শবটিকে আশ্রয় করিয়া এক বেতাল অবস্থান করিত। বিক্রমাদিত্য যতবার ঐ শব নীচে লইয়া আসেন বেতাল ততবার তাঁহাকে একটি করিয়া গল্প বলিয়া গল্পে বর্ণিত সমস্যার সমাধান করিতে বলে। বিক্রমাদিত্য যথাযথ উত্তর দেন এবং এইরূপে তাঁহার মৌনভঙ্গের সুযোগ লইয়া শব আবার বৃক্ষে উঠিয়া যায়। এইভাবে ২৫টি গল্প বেতাল বিক্রমাদিত্যকে বলিয়াছিল। সেই ২৫টি গল্পই ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

উল্লিখিত রচনা ছাড়াও বিদ্যাপতির **পুরুষ পরীক্ষা**, রাজশেখরের **প্রবন্ধ কোষ**, মেরুতুঙ্গের **প্রবন্ধ চিন্তামণি** প্রভৃতি বহু গল্প-সঙ্কলন সংস্কৃত গল্প-সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

রচনার উৎকর্ষ সাধন ও বক্তব্যকে বিশেষ ভঙ্গীতে প্রকাশ করার ধারার পরিচয় বৈদিক যুগেই কিছু কিছু দেখা গিয়াছে। ঋগ্বেদের যে সব সূক্তে প্রাকৃতিক বর্ণনা দেখা যায় সেগুলি এবং তাহা ছাড়াও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু সূক্তের মধ্যে প্রকৃত কাব্যের আস্বাদ দুর্লভ নয়। শতপথ ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্ ও মহাভাষ্যেও এই শ্রেণীর রচনা আছে। যাস্ক তাঁহার 'নিরুক্ত' গ্রন্থে 'অলঙ্কার' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন এবং ভূতোপমা, সিদ্ধোপমা, রূপোপমা ও লুপ্তোপমা—এই চতুর্বিধ উপমালঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছেন। অলঙ্কার হিসাবে উপমালঙ্কারের প্রসিদ্ধি যে পাণিনিরও পূর্ববর্তী তাহা পাণিনির সূত্র হইতেই বুঝা যায়।

সূত্রপাত

অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর প্রাচীনতম প্রামাণ্য গ্রন্থ হইল ভরতের নাট্যশাস্ত্র। কালিদাস (বিক্রমোর্বশীয় ২-১৭) নাট্যশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। নাট্যশাস্ত্রে বহু অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে এবং কতখানি মূল নাট্যশাস্ত্রের অংশ তাহা নিশ্চিতভাবে জানিবারও উপায় নাই। ভরতের পূর্বে নন্দিকেশ্বর ও নারদ অলঙ্কার সাহিত্যে বিশেষ পারঙ্গম ছিলেন। ভরত দশটি গুণ ও রূপক, উপমা, দীপক ও যমক এই চারিটি অলঙ্কারের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। রচনায় যে সব দোষ পরিহার করা উচিত নাট্যশাস্ত্রে তাহারও উল্লেখ আছে। খৃঃ পূঃ ২য় শতক হইতে খৃষ্টাব্দ ৩য় শতকের মধ্যে নাট্য শাস্ত্রের রচনাকাল বলিয়া সাধারণতঃ স্বীকৃত হইয়াছে। পরবর্তী আলঙ্কারিকগণ অলঙ্কার শাস্ত্রের আলোচনায় ভরতকে বিশেষ ভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। স্থানীশ্বরের অধিপতি হর্ষ: উদ্‌ভট, শঙ্কুক, মাতৃগুপ্ত, ভট্টনায়ক প্রভৃতি বহু আলঙ্কারিক নাট্যশাস্ত্রের উপর টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

ভরতের নাট্যশাস্ত্র প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ

কাব্যের উৎকর্ষ কিরূপে সাধন করা যায় এবং কোন্ বিশেষ উপাদান কাব্যকে সুষমামণ্ডিত করে এই লইয়া বিভিন্ন কালে কাব্যরসিকগণ চিন্তা করিয়াছেন এবং তাহার ফলে তাঁহারা সময়ে সময়ে যে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা হইতেই অলঙ্কার শাস্ত্রে বিভিন্ন মতেরও সৃষ্টি হইয়াছে। এই মতগুলির মধ্যে চারিটি প্রধান—(১) অলঙ্কার (figure), (২) রীতি (Style), (৩) রস (aesthetic pleasure) ও (৪) ধ্বনি (Suggestion)। ইহা ছাড়াও আরও চারিটি মতের নাম করা চলিতে পারে—(১) বক্রোক্তি (২) গুণ (৩) অনুমান (৪) ঔচিত্য।

অলঙ্কার সাহিত্যে বিভিন্ন চিন্তাধারা

এই সম্প্রদায়ের মত হইল অলঙ্কারই কাব্যমাধুর্যের জনক। রস সেখানে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিলেও তাহা গৌণ। রচনায় এই অলঙ্করণ শব্দ ও অর্থ উভয়ের দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে এবং এই কারণে অলঙ্কার দুইভাগে বিভক্ত—(১) শব্দালঙ্কার ও (২) অর্থালঙ্কার। ভামহ প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের মধ্যে অন্যতম এবং ৭ম খৃষ্টাব্দে তিনি জীবিত ছিলেন। ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত তাঁহার **কাব্যালঙ্কার** অলঙ্কারের একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। অলঙ্কারের উৎকর্ষ সাধনে শব্দ ও অর্থের সমান প্রাধান্য তিনি স্বীকার করিয়াছেন। ভামহের পিতার নাম রক্তিল গোমিন এবং তাঁহার গ্রন্থ কালে ভামহালঙ্কার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

অলঙ্কার : ভামহ, উদ্‌ভট, রুদ্রট

অষ্টম খৃষ্টাব্দের শেষার্ধে উদ্‌ভট তাঁহার **অলঙ্কার সংগ্রহ** রচনা করেন। ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থে উদ্‌ভট ভামহকেই প্রধানতঃ অনুসরণ করিয়াছেন এবং ৪১টি অলঙ্কারের আলোচনা করিয়াছেন। উদভট্ কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের সভার সভাসদ ছিলেন। তাঁহার রচিত একখানি টিকার নাম **ভামহালঙ্কার বিবরণ**। উহা পাওয়া যায় না। উদ্‌ভটের মতে রচনাশৈলী তিন প্রকারের—উপনাগরিকা (elegant), গ্রাম্যা (ordinary), পরুষা (harsh)। ভরতের পর উদ্‌ভটই রসের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন এবং শান্তরসকে নবম রস হিসাবে তিনিই প্রথম উল্লেখ করিয়াছেন।

ভামহ ও উদ্‌ভট হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া অলঙ্কারের আলোচনা করিয়াছেন রুদ্রট। নবম খৃষ্টাব্দের প্রথমদিকে রুদ্রট তাঁহার **কাব্যালঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেন**। গ্রন্থখানিতে ১৬টি অধ্যায় আছে। রুদ্রটের তিনজন টীকাকারের মধ্যে নমিসাধু বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

রীতি ঃ দণ্ডী, বামন

রীতিবাদী সম্প্রদায়ের পুরোভাগে দণ্ডীর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহাকে **কাব্যাদর্শ** ও **দশকুমার চরিতের** রচয়িতা বলিয়া মনে করা হয়। তিনিই **অবন্তীসুন্দরীকথার** রচয়িতা কী না এ বিষয়ে সন্দেহ আছে! সাধারণতঃ ৭ম খৃষ্টাব্দ তাঁহার রচনাকাল বলিয়া ধরা হইলেও ভামহ ও দণ্ডীর মধ্যে কে পূর্ববর্তী এ বিষয়ে সংশয় আছে। তাঁহার রচনায় দণ্ডী তাঁহার পূর্ববর্তী আলঙ্কারিকগণের নাম উল্লেখ না করিলেও তাঁহাদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। **সেতুবন্ধ** ও **বৃহৎকথার** তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তঁহার **কাব্যাদর্শ অলঙ্কারশাস্ত্রের** উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই গ্রন্থে তিনি কথা ও আখ্যায়িকার পার্থক্য স্বীকার করেন নাই এবং বিশেষ করিয়া বৈদর্ভী ও গৌড়ী এই দুই প্রকার রীতির বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি নিজে বৈদর্ভী রীতি অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কাব্যাদর্শের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অর্থালংকার ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে শব্দালঙ্কার এবং বিশেষ করিয়া যমকের আলোচনা করা হইয়াছে। কাব্যাদর্শের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য টীকাকার হইলেন তরুণ বাচস্পতি।

বামন দণ্ডীর সমর্থক এবং দণ্ডীকেই অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের সভাকবি ছিলেন এবং ভবভূতির রচনাও উদ্ধৃত করিয়াছেন। অষ্টম খৃষ্টাব্দ তাঁহার রচনাকাল বলিয়া মনে হয়। তাঁহার গ্রন্থের নাম **কাব্যালঙ্কার সূত্র**।

পাঁচ অধ্যায়ে ও দ্বাদশ অধিকরণে বিভক্ত এই গ্রন্থে ৩১৯টি সূত্র আছে। সূত্র-গুলির বৃত্তিও বামনেরই রচিত এবং অনেক উদাহরণও তিনি নিজের রচনা হইতেই দিয়াছেন। বামনের মতে রীতি তিন প্রকারের—বৈদর্ভী, গৌড়ী ও পাঞ্চালী এবং এই রীতিই হইল কাব্যের আত্মা। দশবিধ গুণ রীতির পোষকতা করে বলিয়াই তাহাদের প্রয়োজনীয়তা আছে। বামনের পর রীতিবাদী সম্প্রদায় আর কাহারও নিকট হইতে তেমন সমর্থন লাভ করেন নাই। কালে আরও তিনটি রীতির নাম করা হইয়াছে —লাটী, অবন্তী ও মাগধী।

এই মতবাদীগণের মতে রসই কাব্যসৌন্দর্যের জনক। কীথ বলেন—"Sentiment is a condition in the mind of the spectator of a drama, or, we may add, the hearer or reader of a poem produced by the emotions of the characters, and the emotions. Bhāvas are excited by factors which may either be the object of the

রস ঃ লোল্লট, শঙ্কুক, ভট্টনায়ক

emotion, as the loved one in the case of love, or serve to heighten it, as does the spring season"[১] রসোপলব্ধি কী ভাবে হইয়া থাকে সে বিষয়েও মতভেদ আছে। লোল্লটের মতে রস অভিনেতাকেই অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে। শঙ্কুকের মতে অনুমানের দ্বারা দর্শকের হৃদয়ে রসোপলব্ধি হইয়া থাকে। ভট্টনায়ক বলেন রস প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, ইহা সৃষ্টিও করা যায় না, শব্দের মাধ্যমে ও অভিনেতার অভিনয়দক্ষতার গুণে উহা অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। লোল্লট, শঙ্কুক, ভট্টনায়ক, রুদ্রভট্ট, ভোজ, শারদাতনয় প্রভৃতি রসের সমর্থক।

লোল্লট অষ্টম খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার মূল গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে; তবে তাহার বিষয়বস্তুর মোটামুটি বিবরণ আমরা পাই অভিনবগুপ্তের **অভিনবভারতী** ও মম্মটের **কাব্যপ্রকাশে**। শম্বুক লোল্লটের অনেক মতের সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহারও কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় না। নবম খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ভট্টনায়ক **হৃদয়দর্পণ** নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। লোল্লট ও শঙ্কুকের বহু মত তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

ধ্বনি : আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত

শব্দ অর্থকে প্রকাশ করে। অর্থপ্রকাশের শক্তি তিন রকম—অভিধা (Primary), লক্ষণা (Secondary) ও ব্যঞ্জনা (Suggested)। যেখানে অভিধাশক্তি দ্বারা কোনও অর্থ প্রকাশ পায় না, সেখানে লক্ষণাশক্তির দ্বারা অর্থবোধ হইয়া থাকে। যখন কোনও শব্দ উচ্চারিত হইয়া অভিধাশক্তির দ্বারা যে অর্থের বোধ জন্মায় তাহা ছাড়া অন্য অর্থেরও বোধের সৃষ্টি করে তখনই শব্দের ব্যঞ্জনা শক্তিকে স্বীকার করা হইয়া থাকে। ইহারই নাম ধ্বনি। বৈয়াকরণদের স্ফোটবাদের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। ধ্বনিবাদী সম্প্রদায় এই ধ্বনিকেই কাব্যের সব কিছু বলিয়া মনে করেন। আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত এই মতবাদের প্রধান সমর্থক। কাব্যের উৎকর্ষ বিচারে ধ্বনির স্থান যতখানি দেওয়া হইয়া থাকে সেই অনুপাতে এই সম্প্রদায় কাব্যকে তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) ধ্বনিকাব্য (যাহাতে ধ্বনির প্রাধান্য সর্বাধিক), (২) গুণীভূতব্যঙ্গ (যাহাতে ধ্বনি গৌণ স্থান অধিকার করিয়াছে) এবং (৩) চিত্র (যাহাতে ধ্বনি মোটেই নাই)। নবম খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে আনন্দবর্ধন তাঁহার **ধ্বন্যালোক** রচনা করেন এবং তাঁহার মতে ধ্বনিবাদ একটি প্রাচীন মতবাদ। ধ্বন্যালোক আনন্দবর্ধনের পূর্ববর্তী কাহারও রচিত ১২০টি কারিকার টীকাগ্রন্থ। ইহাতে মূল কারিকা, আনন্দবর্ধনের স্বরচিত বৃত্তি এবং নিজের এবং অন্যান্য রচনা হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। মূল কারিকাগুলি কাহার রচিত সে বিষয়ে সংশয় আছে। অনেকে মনে করেন ইহার কিছু আনন্দবর্ধনের স্বরচিত হইলেও হইতে পারে। **অর্জুনচরিত মহাকাব্য, বিষমবাণলীলা** ও **হরবিজয়** গ্রন্থ হইতে ধ্বন্যালোকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে এবং এ তিনখানিই আনন্দবর্ধনের রচিত।

অনুমান দশম খৃষ্টাব্দের শেষভাগে অভিনবগুপ্ত আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোকের উপর একখানি টীকা রচনা করেন। টীকা হইলেও ইহা মূল গ্রন্থের ন্যায় মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ইহার নাম **লোচন** বা **ধ্বন্যালোকলোচন**[২]। ইহা ছাড়াও নাট্যশাস্ত্রের উপর তাঁহার টীকা **অভিনবভারতী** এবং ভট্ট তৌতের রচিত **কাব্যকৌতুকের** উপর তাঁহার টীকা **কাব্যকৌতুকবিবরণ** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **চন্দ্রিকা** নামে ধ্বন্যালোকের আরও

১। Keith; *History of Sanskrit Literature,* pp. 372—73

২। নামান্তর **সহৃদয়ালোকলোচন, কাব্যালোকলোচন।**

৩। বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—K. C. Pandey: *Abhinavagupta, An*

একখানি টীকার কথা অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন, কিন্তু উহা কাহার রচিত তাহা জানা যায় না।[৩]

বক্রোক্তিবাদী সম্প্রদায়ের মতে বক্রোক্তিই (Turn of expression) হইল কাব্যের আত্মা। এই বক্রোক্তি শেষ পর্যন্ত একটি স্বতন্ত্র অলঙ্কার বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সমস্ত অলঙ্কারকে স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি এই দুই শ্রেণীতে ইঁহারা বিভক্ত করেন।

বক্রোক্তি : কুন্তক

কুন্তক বা কুন্তল (অনুমান দশম খৃষ্টাব্দ) এই মতের বিশেষ সমর্থক ছিলেন এবং ধ্বনিবাদের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে রস বা ধ্বনি স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি এই দ্বিবিধ অলঙ্কারের অধীন। তাঁহার রচিত **বক্রোক্তি-জীবিত** তিন অধ্যায়ে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়।

শঙ্কুকের মতে (প্রায় ৮ম খৃষ্টাব্দ) রসোপলব্ধি অনুমানের সাহায্যে হইয়া থাকে। লোল্লটের ন্যায় শঙ্কু রসের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি স্বীকার করেন না। শঙ্কুক আনন্দবর্ধনের সমকালীন। তাঁহার রচিত নাট্যশাস্ত্রের টীকা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। **ভুবনাভ্যুদয়** নামক তাঁহার একখানি কাব্যগ্রন্থও আর পাওয়া যায় না। শঙ্কুকের অনুসরণ করিয়া মহিমভট্ট (১১শ খৃঃ) ধ্বনিবাদের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন এবং অনুমানকেই রসোপলব্ধির উপায় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত **ব্যক্তিবিবেক** গ্রন্থে তাঁহার মত বিশদীকৃত হইয়াছে।

অনুমান : শঙ্কুক, মহিমভট্ট

Historical and Philosophical Study, p. p. 11, 22. 23.

ব্যাকরণ বেদাঙ্গ—
বেদব্যাখ্যার সহায়ক

বেদকে পুরুষাকার কল্পনা করিয়া ব্যাকরণকে সেই বেদপুরুষের মুখস্বরূপ বলা হইয়াছে (মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্)। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ—এই ছয়টি শাস্ত্র বেদপুরুষের ষড়ঙ্গ। ইহাদিগকে আয়ত্ত করিলে তবে বেদার্থের বোধ হয় এবং তাহাই সাঙ্গবেদাধ্যয়ন। এই সাঙ্গবেদাধ্যয়ন প্রাচীনকালে প্রতিটি ব্রাহ্মণ সন্তানের অবশ্য কর্তব্যরূপে পরিগণিত হইত। পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ কোনও কারণের অপেক্ষা না রাখিয়াই সাঙ্গবেদাধ্যয়ন করিবে এবং মহাভাষ্যের প্রথম দিকেই তিনি ব্যাকরণ শাস্ত্রপাঠের উপযোগিতা বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন। শিক্ষা, প্রাতিশাখ্য, নিরুক্ত—এইগুলিও অনেকাংশে ব্যাকরণের বিষয়বস্তুর আলোচনা করিয়াছে। বস্তুত বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় যে বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রাচীনকালে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নৈরুক্ত ও বৈয়াকরণ সম্প্রদায় অন্যতম।

ভাষার বিশুদ্ধতা সংরক্ষণই ব্যাকরণ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষে ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রচার ও প্রসার খুব বেশী পরিমাণেই হইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত ইহাকে দর্শনশাস্ত্রের পর্যায়ে উন্নীত করা হইয়াছে।

পাণিনি-পূর্ব
বৈয়াকরণগণ

বিভিন্ন বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের মধ্যে পাণিনি এবং তৎপ্রবর্তিত সম্প্রদায়ই সর্বাধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। পাণিনির পূর্বে ব্যাকরণশাস্ত্রে নিষ্ণাত বহু আচার্য ছিলেন। শাকটায়ন, সেনক, গালব, গার্গ্য, আপিশলি, কাশ্যপ, স্ফোটায়ন প্রভৃতি তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৈত্তিরীয়সংহিতায় বলা হইয়াছে যে ইন্দ্র ছিলেন বৈয়াকরণদের মধ্যে প্রথম। কাজেই পাণিনির পূর্ববর্তী আচার্যগণের রচিত গ্রন্থ পাওয়া না গেলেও শাস্ত্র হিসাবে যে ব্যাকরণ বহুদিন পূর্বেই স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্রাক্-পাণিনীয় এই সব আচার্যগণ ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন, না শুধু ইতস্ততঃবিক্ষিপ্তভাবেই ব্যাকরণের আলোচনা করিয়াছিলেন তাহাও সঠিক বলিবার উপায় নাই। যদি তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ ছিল এইরূপ ধরিয়া লওয়া যায় তবে তাহারা একেবারে লুপ্ত হইল কেন তাহাও নিতান্ত অনুমানসাপেক্ষ।

পাণিনি
ব্যাড়ি : সংগ্রহ
কাত্যায়ন : বার্তিক

আটকের নিকট শালাতুর নামক স্থানে পাণিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দাক্ষীর পুত্র। গোল্‌ডস্টুকারের মতে তিনি খৃঃ পূঃ ৮ম শতকে এবং ম্যাক্‌সমুলার ও ওয়েবারের মতে খৃঃ ৪র্থ শতকে জীবিত ছিলেন। কথাসরিৎসাগর অনুসারে পাণিনি বর্ষ নামক আচার্যের নিকট ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং কাত্যায়ন, ইন্দ্রদত্ত ও ব্যাড়ি ছিলেন তাঁহার সহপাঠী। পাণিনির রচিত **অষ্টাধ্যায়ী** সংস্কৃত ব্যাকরণের অপূর্ব গ্রন্থ। পাণিনির প্রবর্তিত রীতির সমালোচনা করিয়া ব্যাড়ি একলক্ষ শ্লোকে **সংগ্রহ** নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কাত্যায়নও (খৃঃ পূঃ ৩য় শতক) পাণিনীয় সূত্রগুলির ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা সংশোধন করিয়া **বার্তিক** রচনা করিয়াছেন এবং অনেক স্থানে নিজে অনেক সূত্রের অপ্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। **লিঙ্গানুশাসন** ও **পুষ্প-সূত্রের** রচয়িতা বররুচিকেই এই কাত্যায়ন বলিয়া মনে করা হয়।

পাণিনি রচিত ব্যাকরণ পতঞ্জলির হাতে আসিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করে। পাণিনি-কাত্যায়ন-পতঞ্জলি, এই ক্রমে বলা হয় 'ত্রিমুনি ব্যাকরণ'। সংস্কৃত সাহিত্যে যে কয়-

পতঞ্জলি ঃ মহাভাষ্য

জনের আবির্ভাবকাল সন্দেহাতীতরূপে জানা যায়, পতঞ্জলি তাঁহাদের অন্যতম। খৃঃ পূঃ ১৫০ অব্দে শুঙ্গ রাজবংশের রাজা পুষ্যমিত্র বা পুষ্পমিত্রের রাজত্ব-কালে পতঞ্জলি বাঁচিয়া ছিলেন। তাঁহার রচিত **মহাভাষ্য** ব্যাড়ির **সংগ্রহ**-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। পতঞ্জলি অনেক স্থলে পাণিনির অনেক সূত্রের বৈয়র্থ্য দেখাইয়াছেন, অনেক ক্ষেত্রে আবার কাত্যায়ন পাণিনির যে সকল ত্রুটি দেখাইয়াছেন তাহা সার্থকভাবে খণ্ডনও করিয়াছেন। ব্যাকরণ গ্রন্থ হিসাবে মহাভাষ্যের মূল্য যাহাই হউক না কেন, সংস্কৃত সাহিত্যে এক বিশেষ অননুকরণীয় রচনাশৈলীর অদ্বিতীয় গ্রন্থরূপে মহাভাষ্য বিস্মৃত হইবার নয়। অনেকে মনে করেন যে পতঞ্জলি আদিশেষের অবতার এবং গোনর্দ প্রদেশ তাঁহার জন্মস্থান।

ভর্তৃহরি ঃ বাক্যপদীয়

মহাভাষ্যের পর ব্যাকরণ হিসাবে মৌলিক কোনও গ্রন্থ বহুদিন পর্যন্ত রচিত হয় নাই। পঞ্চম শতকে ভর্তৃহরি নামক একজন বৈয়াকরণের কথা জানা যায়। কবিবৈয়াকরণ ভট্টি হইতে ইনি স্বতন্ত্র এবং খুব সম্ভব চীনদেশীয় পরিব্রাজক ৎ-সিং ৬৫১ খৃষ্টাব্দে যে একজন বৈয়াকরণের মৃত্যু সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, এই ভর্তৃহরিই সেই বৈয়াকরণ।

ইহার রচিত **বাক্যপদীয়** এবং **প্রকীর্ণক** নামক দুইখানি গ্রন্থ আছে। মহাভাষ্যের উপর ইহার স্বরচিত টীকা **মহাভাষ্য-দীপিকা**ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১] ব্যাকরণকে অনেকটা দর্শন হিসাবে গ্রহণ করিয়াই বাক্যপদীয় রচিত হইয়াছে এবং প্রথম অধ্যায় এই আলোচনাতেই পূর্ণ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবং প্রকীর্ণকে সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্যান্য দিকের আলোচনা করা হইয়াছে। ভর্তৃহরি নিজে স্ফোটবাদের সমর্থক।

বামন, জয়াদিত্য ঃ কাশিকা

জিনেন্দ্রবুদ্ধি ঃ ন্যাস

বামন ও জয়াদিত্য দুইজনই বৌদ্ধ বৈয়াকরণ। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর উপর ইঁহারা যে টীকা প্রণয়ন করেন তাহাই **কাশিকা** নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে। ৎ-সিং সংস্কৃত শিখিবার জন্য কাশিকা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সময়ে কাশিকার পঠন-পাঠন যে খুবই জনপ্রিয় ছিল এ বিষয়ে উল্লেখও করিয়াছেন। অনেকে মনে করেন যে প্রথম পাঁচ অধ্যায় জয়াদিত্যের রচনা, শেষ অংশটুকু বামনের। ৎ-সিং-এর উক্তি হইতে জানা যায় যে খৃষ্টাব্দ ৬৬০ জয়াদিত্যের মৃত্যুকাল।[২] কাশিকার নামান্তর 'বৃত্তি'।

জিনেন্দ্রবুদ্ধি একজন বাঙালী জৈন বৈয়াকরণ। কাশিকার উপর ইঁহার রচিত টীকার নাম **কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা**। **ন্যাস** নামেই ইহা পরে সমধিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। আলঙ্কারিক ভামহ জিনেন্দ্রবুদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং খৃঃ ৮ম শতকের পূর্বেই তাঁহার আবির্ভাবকাল মনে করা যাইতে পারে।

অন্যান্য বৈয়াকরণগণের রচনা

খৃঃ ১১ শতকে কাশিকার উপর একখানি টীকা রচনা করেন। উহার নাম **পদমঞ্জরী**। মতবাদের দিক দিয়া হরদত্ত অনেকখানি স্বতন্ত্র এবং পতঞ্জলির অনেক উক্তিরও তিনি পোষকতা করেন নাই। মল্লিনাথ হরদত্তের উল্লেখ করিয়াছেন এবং হরদত্ত নিজে মাঘের নাম জানিতেন। এই একাদশ শতকেই জৈয়টের পুত্র কৈয়ট মহাভাষ্যের উপর **প্রদীপ** নামে এক মূল্যবান টীকা রচনা করেন। প্রদীপের উপর টীকা রচিত হয় নাগেশভট্ট (খৃঃ

১। C. Kunhan Raja বাক্যপদীয় সম্বন্ধে Dr. Krishnaswamy Iyengar Commemoration Volume-এ আলোচনা করিয়াছেন।

২। "The object of Vamana and Jayaditya was to incorporate in the system of Panini all the improvement made by Candragomin." —G. Sastri: *A concise History of Classical Sanskrit Literature* (2nd. Ed.), p. 143

১৭ শতক) কর্তৃক, এবং ঐ টীকার নাম **উদ্দ্যোত**। প্রদীপ ও উদ্দ্যোত মহাভাষ্যের ব্যাখ্যাকে সম্পূর্ণ করিয়াছে বলা যাইতে পারে। দ্বাদশ শতকে বৌদ্ধ ভিক্ষু ধর্মকীর্তি **রূপাবতার** নামক গ্রন্থে পাণিনির সূত্রগুলিকে সহজবোধ্য করিবার জন্য নূতনভাবে বিন্যস্ত করেন। এই সময়েই আর একজন বৌদ্ধ বৈয়াকরণ শরণদেব প্রসিদ্ধ কবিগণের রচনায় যে সব প্রয়োগ ব্যাকরণসম্মত হয় নাই সেগুলিকে সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে **দুর্ঘটবৃত্তি** প্রণয়ন করেন। পঞ্চদশ শতকে রামচন্দ্র রচিত **প্রক্রিয়াকৌমুদী** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে বিট্ঠলাচার্য নামক একজন বৈয়াকরণ **প্রসাদ** নামে **প্রক্রিয়াকৌমুদীর** উপর এক বিশেষ মূল্যবান টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ভট্টোজিদীক্ষিত ঃ সিদ্ধান্তকৌমুদী

পতঞ্জলির মহাভাষ্যের পর সপ্তদশ শতক পর্যন্ত ব্যাকরণশাস্ত্রে কোনও মৌলিক গ্রন্থ রচিত হয় নাই এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া মহাভাষ্যেরই পঠন-পাঠন প্রচলিত ছিল এবং বৈয়াকরণ সম্প্রদায় ঐ মহাভাষ্যকে কেন্দ্র করিয়াই আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ পাইয়াছেন। মৌলিক গ্রন্থ রচিত না হইলেও বিভিন্নকালে বিভিন্ন বৈয়াকরণ যে সকল টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন, নিঃসংশয়ে সেগুলি ব্যাকরণের ক্ষেত্রে আলোচনাকে এক নূতন রূপ দান করিয়াছে এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রের বিষয়-বস্তুকেও সমৃদ্ধ করিয়াছে।

সপ্তদশ শতকে আসিলেন প্রতিভাধর ভট্টোজিদীক্ষিত। কথিত আছে, তাঁহার গুরুর নাম অপ্পয়্যদীক্ষিত এবং গুরুর নিকট তিনি বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ভট্টোজিদীক্ষিতের পরিবারেরও অনেকে এবং ছাত্রসম্প্রদায়ও ব্যাকরণের চর্চায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং আজও এই বিশেষ শাস্ত্রের ক্ষেত্রে তাঁহাদের দান অমলিন হইয়া আছে। পূর্বোল্লিখিত রামচন্দ্রের প্রক্রিয়াকৌমুদীর অনুসরণ করিয়া৩ ভট্টোজি-দীক্ষিত **সিদ্ধান্তকৌমুদী** রচনা করিয়াছেন। ভট্টোজির হাতে পাণিনির সূত্রগুলি যে উদ্দেশ্যে নূতন বিন্যাস লাভ করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছে। পরবর্তীকালে ব্যাকরণের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তকৌমুদী পূর্ববর্তী সমস্ত গ্রন্থের, এমন কী কাশিকার গৌরবময় স্থান স্বয়ং অধিকার করিয়াছে। সিদ্ধান্তকৌমুদীর উপর ভট্টোজির স্বরচিত টীকার নাম **প্রৌঢ়মনোরমা** এবং পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর উপর তাঁহার রচিত টীকার নাম **শব্দকৌস্তুভ**। অষ্টাদশ শতকে জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতীর **তত্ত্ববোধিনী** টীকা সিদ্ধান্তকৌমুদীর প্রামাণ্য টীকা হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে।

অন্যান্য বৈয়াকরণ সম্প্রদায়

পাণিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ী রচনা করিয়া ব্যাকরণের ক্ষেত্রে এক যুগান্তর সৃষ্টি করেন। তাহার পর হইতে কোনও কোনও বৈয়াকরণ সময়ে সময়ে স্বতন্ত্রভাবে ব্যাকরণের অনুশীলন করিলেও অষ্টাধ্যায়ীর প্রভাব ও জনপ্রিয়তা খর্ব করিতে পারেন না। সপ্তদশ হইতে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই পাণিনি প্রবর্তিত ব্যাকরণধারাই নিরঙ্কুশ রাজত্ব করিয়াছে এবং আজও করিতেছে। মাঝে যে কয়জন বৈয়াকরণ স্বতন্ত্রভাবে ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন, সংকীর্ণতার জন্য তাঁহাদের সে সব রচনা স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে নাই। এই সব বৈয়াকরণদের প্রায় সকলেই বৈদিক ধর্মের বিরোধী ছিলেন এবং সে কারণ নিজেদের গ্রন্থে বৈদিক ব্যাকরণের একেবারেই চর্চা করেন নাই, এমন কী পাণিনি প্রবর্তিত ধাতুপাঠ, গণপাঠ, উণাদিসূত্র এবং লিঙ্গানুশাসন পর্যন্ত গ্রহণ না করিয়া নিজেরাই নিজেদের ব্যবহারের জন্য ঐগুলির

৩। প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা যাহাতে সহজে ব্যাকরণ আয়ত্ত করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে প্রথম রামচন্দ্র পাণিনির সূত্রগুলিকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় সাজান। ভট্টোজিদীক্ষিতও ঐ একই উদ্দেশ্যে অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রগুলিকে সম্পূর্ণ নূতনভাবে সাজাইয়া গ্রন্থ রচনা করেন।

সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন। জনসাধারণ এই সব ব্যাকরণের বিশেষ মূল্য দেয় নাই। এই গুলির বেশীর ভাগই এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যে দুই একটি এখনও টিকিয়া আছে তাহাদেরও প্রাণস্পন্দন ক্ষীণ। এই সব বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের মধ্যে—(১) চন্দ্রগোমিন্ প্রবর্তিত চান্দ্র সম্প্রদায় (খৃঃ ৫ম শতক), (২) জিনেন্দ্র প্রবর্তিত **জিনেন্দ্র** সম্প্রদায় (খৃঃ ৫ম শতক), (৩) শাকটায়ন প্রবর্তিত **শাকটায়ন** সম্প্রদায় (খৃঃ ৯ম শতক), (৪) হেমচন্দ্র প্রবর্তিত **স্বসম্প্রদায়** (খৃঃ ১১ শতক), (৫) শরবর্মা প্রবর্তিত **কাতন্ত্র** সম্প্রদায়[৪], (৬) বোপদেবের **মুগ্ধবোধ** সম্প্রদায়[৫] (খৃঃ ১৩ শতক), (৭) অনুভূতিস্বরূপাচার্যের **সারস্বত** সম্প্রদায়, (৮) পদ্মনাভের **সৌপদ্ম** সম্প্রদায়ের (খৃঃ ১৪ শতক) উল্লেখ করা যাইতে পারে।[৬]

আরও পরবর্তীকালে ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের সহিত ব্যাকরণকে যুক্ত করার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। বোপদেবের মধ্যেই এ প্রচেষ্টার অংকুর দেখা গিয়াছিল। পরে বৈষ্ণব দার্শনিকগণ বিশেষভাবে এই ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেন। রূপগোস্বামীর **হরিনামামৃত** এই বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাধা ও কৃষ্ণের নাম দুইটিকে ব্যাকরণের দুইটি পারিভাষিক শব্দরূপে গ্রহণ করিয়া ইনি ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন।[৭]

৪। বাংলা ও কাশ্মীরে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল।

৫। মুগ্ধবোধের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার রাম তর্কবাগীশ।

৬। খৃঃ ১৩ শতকে ক্রমদীশ্বর তাঁহার **সংক্ষিপ্তসার** ব্যাকরণ রচনা করেন। জোমিরনন্দী নামে একজন বৈয়াকরণ **রসবতী** নামক ইহার উপর একখানি টীকা রচনা করিয়া সংক্ষিপ্তসারকে এক বিশেষ প্রতিষ্ঠা প্রদান করেন। ঐ টীকাকারের নাম হইতে এই সম্প্রদায় জোমির সম্প্রদায় নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গে এই ব্যাকরণের বিশেষ প্রতিষ্ঠা আছে।

৭। এই সব বিশেষ বিশেষ বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের বিশদ বিবরণের জন্য Belvalkar, S. K. *Systems of Sanskrit Grammar* দ্রষ্টব্য।

দর্শন

বাঁচার জন্য জীবজগতে এক বিরামহীন সংগ্রাম চলিয়াছে। মানুষও নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। কিন্তু, মানুষ ও মানুষেতর জীবের সংগ্রামের মধ্যে এক বিশেষ পার্থক্য আছে। সংগ্রামের রীতি সম্বন্ধে মানুষেতর জীব সম্পূর্ণ অন্ধ। কোনও সুচিন্তিত কর্মপন্থা লইয়া, ভবিষ্যতের ফলাফলের কথা চিন্তা করিয়া, মানুষেতর জীব সংগ্রাম করে না, কেবল প্রবৃত্তি (instincts) দ্বারা পরিচালিত হইয়াই সংগ্রাম করে। আর মানুষ তাহার বুদ্ধির দ্বারা পূর্বাপর চিন্তা করিয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, তাহাতে সফলতা লাভের জন্য পূর্ব হইতেই যথাসম্ভব প্রস্তুতি সারিয়া রাখে। সে নিজের সম্বন্ধে জানিতে চায়, বিশ্বের সম্বন্ধে জানিতে চায়, বিশ্বের সহিত নিজের সম্বন্ধ কি ও কতটুকু তাহাও জানিতে চায়। এই বিশ্ব কোথা হইতে আসিল, কে ইহার সৃষ্টি করিল, তাহার সহিত সম্বন্ধ কিরূপ?—ইত্যাদি বিবিধ প্রশ্ন মানুষের মনে আপনা হইতেই আসে। নিজের বুদ্ধির দ্বারা মানুষ এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজিতে চায়, যতটুকু বুঝিতে পারে তদনুসারেই সে তাহার জীবনের কর্মপন্থা নির্ধারিত করে। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন প্রভৃতি নিছক কতকগুলি জৈব প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই পশুর সংগ্রাম। কিন্তু মানুষ শুধু জীব নয়, বুদ্ধিমান জীব; তাই নিছক জৈব প্রয়োজনসাধন করা ছাড়াও তাহার জীবনে সে বুদ্ধির কৌতূহলকেও চরিতার্থ করিতে চায়। জীবন সম্বন্ধে মানুষের একটা ধারণা আছে, জীবনের পরিবেশ সম্বন্ধেও ধারণা আছে, এই উভয়ের স্রষ্টা সম্বন্ধেও ধারণা আছে। সেই সূত্রকে অবলম্বন করিয়া জৈবসত্তার লোক ছাড়াইয়া তদতিগ উচ্চতর ও মহত্তর সত্তা সম্বন্ধে প্রত্যেক মানুষই কিছু-না-কিছু কৌতূহল পোষণ করে। মানুষের এই চিরন্তন কৌতূহলকে চরিতার্থ করার চেষ্টা হইতেই দর্শনশাস্ত্রের জন্ম।[১]

ভারতীয় দর্শন ও হিন্দু দর্শন

যুগে যুগে ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতিগ তত্ত্ব সম্বন্ধে মানুষের যে চিরন্তনী জিজ্ঞাসা সে সম্পর্কে তাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করিয়াছেন, বিভিন্ন মত ও পথকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন সময়ে তাঁহারা বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, নিজেদের চিন্তালব্ধ জ্ঞানরাজি দ্বারা ভারত-ভূমিকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা হিন্দুই হউন, অহিন্দুই হউন—আস্তিকই হউন, নাস্তিকই হউন, প্রাচীনই হউন, নবীনই হউন—তাঁহাদের চিন্তালব্ধ জ্ঞানরাজিই 'ভারতীয় দর্শন' নামে অভিহিত। 'হিন্দু' শব্দকে যদি ইহার ভৌগোলিক অর্থে গ্রহণ করা যায়, তবে 'ভারতীয় দর্শন' ও 'হিন্দু দর্শন' সমার্থক।[২] আর 'হিন্দু' বলিতে যদি আমরা বিশেষ কোনও ধর্মাবলম্বী

১। "Men live in accordance with the philosophy of life, their conception of the world. This is true even of the most thoughtless. It is impossible to live without a metaphysic. The choice that is given to us is not between some kind of metaphysic and no metaphysic; it is always between a good metaphysic and a bad metaphysic."—Aldous Huxley: *Ends and Means*, p. 252

২। "The term 'Hindu' had originally a territorial and not a credal significance. It implied residence in a well-defined geographical area. Aboriginal tribes, savage and half-civilised people, the cultured Dravidians and the Vedic Aryans were all Hindus as they

সম্প্রদায়কে বুঝি, তবে অবশ্যই 'হিন্দু দর্শনের গণ্ডী 'ভারতীয় দর্শনের গণ্ডী হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া পড়িবে। প্রাচীনকালের ভারতের ঋষিগণ জানিতেন যে আসমুদ্র-হিমাচল বিশাল ভূখণ্ডই ভারতবর্ষ, তাহার অধিবাসিগণের ধর্মের পথ বিভিন্ন, কর্মের পথও বিভিন্ন, দেবতার্চনাও বিভিন্ন। ভারত-ভূখণ্ডে ধর্ম ও কর্মের বিভিন্ন পথ লইয়া যে বিশিষ্ট ধারার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাই 'ভারতী সন্ততি'।[৩] 'হিন্দু' শব্দের ভৌগোলিক অর্থে চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনও 'হিন্দু দর্শন'।[৪]

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রকারগণের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা

ভারতবর্ষে বিভিন্ন মত ও পথকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে, ভারত-ভূমিতে পাশাপাশি বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় নিজেদের মতবাদও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শুধু মত ও পথের বিরোধী বলিয়া এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বোধ করেন নাই, তাহার কুৎসাও প্রচার করেন নাই; বরং অপর সম্প্রদায়ের মত ধীরভাবে শুনিয়া যুক্তি ও তর্কের দ্বারা তাহার বিশ্লেষণ করিয়া, যাহা গ্রাহ্য তাহা গ্রহণ করিয়াছেন, যাহা ত্যাজ্য তাহা ত্যাগ করিয়াছেন। গায়ের জোরে নিজের সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠা দিবার বা অপর সম্প্রদায়ের মতবাদকে উড়াইয়া দিবার একগুঁয়েমি ভারতের কোনও দর্শনের মধ্যে ছিল না। যে কোনও দর্শন তাহার মতকে চরম বলিয়া ঘোষণা করার পূর্বে প্রচলিত অন্যান্য মতসমূহের উল্লেখ অতি সতর্কতার সহিত করিয়াছে, ইহার নাম 'পূর্বপক্ষ'; বলিষ্ঠ যুক্তির সাহায্যে সেই মতের নিরসন করিয়াছে, ইহার নাম 'খণ্ডন'; পরে নিজ সম্প্রদায়ের মতবাদকে স্থাপন করিয়াছে, ইহাই 'উত্তরপক্ষ' বা 'সিদ্ধান্তপক্ষ'। এই মূলনীতি সকল দর্শনে অনুসৃত হওয়ার ফলে যে কোনও একটি বিশেষ দর্শন পাঠ করিলে প্রচলিত অন্যান্য দার্শনিক মতবাদের সহিত পরিচিত হওয়া যায়। বস্তুতঃ, ভারতের দর্শনশাস্ত্রকারগণ বিশ্বাস করিতেন যে, যে কোনও স্তরের যে কোনও মানুষেরই চিন্তা করার অধিকার আছে, সে চিন্তার ফলাফল ঘোষণা করারও অধিকার আছে এবং উপলব্ধি যে স্তরেরই হউক, কখনও ব্যর্থ হয় না।[৫] ভারতীয় দর্শনকারগণের এই উদার ও উন্মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী একান্ত নিজস্ব।[৬]

---

were the sons of the same mother."—Radhakrishnan : *The Hindu View of Life*, p. 3

৩। উত্তরেণ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণে।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ ॥—ব্রহ্মপুরাণ
ভারতেষু স্ত্রিয়ঃ পুংসো নানাবর্ণাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
নানাদেবার্চনে যুক্তা নানাকর্মাণি কুর্বতে ॥—কূর্মপুরাণ

৪। মাধবাচার্য তাঁহার **সর্বদর্শনসংগ্রহ** গ্রন্থে ভারতীয় দর্শনসমূহের মূল কথা আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, পাশুপত প্রভৃতি সকল দর্শনই স্থান পাইয়াছে।

৫। "Hinduism does not distinguish ideas of God as true or false, adopting one particular idea as the standard for the whole human race. It accepts the obvious fact that mankind seeks its goal of Good at various levels and in various directions, and feels sympathy with every stage of the search."—Radhakrishnan : *The Hindu View of Life*, p. 31

৬। খৃষ্টীয় ধর্ম ও দর্শনের সহিত হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের মূলগত এই পার্থক্য রাধাকৃষ্ণণ এইরূপে বলিয়াছেন: Other religious systems start with this or that particular experimental datum. Christian theology, for example, takes its stand on the immediate certitude of Jesus as one whose absolute authority over conscience is self-certifying and whose ability and willingness to save the soul it is impossible not to trust. Christian

ভারতীয় দর্শনগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—(ক) আস্তিক ও (খ) নাস্তিক। সাধারণতঃ আমরা মনে করি 'আস্তিক' শব্দের অর্থ 'যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে' এবং 'নাস্তিক শব্দের অর্থ 'যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না'। দর্শন-

দর্শনশাস্ত্র ঃ তাহার শ্রেণীবিভাগ

শাস্ত্রে কিন্তু ঐ শব্দ দুইটি ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। সেখানে 'আস্তিক' শব্দের দুইটি অর্থ—(১) যাহা বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাস করে এবং (২) যাহা মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস করে। 'নাস্তিক' শব্দের অর্থ ইহার বিপরীত। মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক—এই ছয়টি দর্শন বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে বলিয়া ইহাদিগকে 'অস্তিকদর্শন' বলে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে বলিয়া নহে। সাংখ্য ও মীমাংসা ঈশ্বরকে বিশ্বস্রষ্টা-রূপে স্বীকার না করিয়াও শুধু বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করার ফলেই আস্তিক ষড়-দর্শনের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। আর বেদের প্রামাণ্যকে স্বীকার না করার জনাই চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনকে 'নাস্তিক-দর্শন' বলা হয়।[৭]

বেদ ও দর্শন

ভারতীয় দর্শনে হিন্দু মনীষা ও চিন্তাধারা যে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহার মূল হইতেছে বেদ। বেদের কর্মকাণ্ডকে অবলম্বন করিয়া মীমাংসা দর্শন এবং জ্ঞানকাণ্ডকে অবলম্বন করিয়া বেদান্ত দর্শন পল্লবিত হইয়াছে। এই দুইটিই বৈদিক কর্মধারা ও চিন্তাধারার প্রত্যক্ষ ধারক ও বাহক।[৮] সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক প্রত্যক্ষভাবে যুক্তি ও অভিজ্ঞতার উপর গড়িয়া উঠিলেও বেদের প্রামাণ্যকে কখনও অস্বীকার করে নাই। তাহাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ ও যুক্তিপ্রতিপাদিত সিদ্ধান্তসমূহ যে শ্রুতিবাক্যেরই অনুগামী তাহাই দেখাইতে চাহিয়াছে। বেদের প্রতিস্পর্ধীরূপেই চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের উৎপত্তি, তাই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করার প্রশ্নও তাহাদের ক্ষেত্রে উঠে না।

বিভিন্ন দর্শন বিভিন্ন মতের উপস্থাপনা করিলেও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সবগুলির মধ্যেই কয়েকটি বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়। প্রত্যেক দর্শনই মনুষ্য-

দর্শন-সমূহের নীতিগত ঐক্য

জীবনে দর্শনশাস্ত্রের বাস্তব উপযোগিতাকে স্বীকার করে। নিছক বুদ্ধিগত কৌতূহলের নিবৃত্তিই দর্শনশাস্ত্রের শেষ কথা নয়, অনুভূতি ও চিন্তালব্ধ জ্ঞান অনুসারে জীবনকে ঠিক পথে চালিত করিয়া তাহাকে মহত্তর ও উচ্চতর করিয়া তোলাই দর্শনশাস্ত্রের লক্ষ্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কেহ কেহ মনে করেন যে ভারতীয় দর্শনের বাস্তব উপযোগিতা স্বীকৃত হওয়ার ফলে চিন্তার দিকে ভারতীয় দর্শন সর্বাঙ্গীণ পরিণতি লাভ করিতে পারে

---

theology becomes relevant only for those who share or accept a particular kind of spiritual experience, and these are tempted to dismiss other experiences as illusory and other scriptures as imperfect. Hinduism was not betrayed into this situation on account of its adherence to fact."—Radhakrishnan: *The Hindu View of Life*. pp. 19 & 20

৭। 'আস্তিক' শব্দের অর্থ যদি 'মৃত্যুর পরবর্তী জীবনেও বিশ্বাসী' ধরা যায়, তবে সে অর্থে জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনও আস্তিক-দর্শন, কারণ ইহারা মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস করে। আর পূর্বোক্ত দুইটি অর্থের যে কোনও অর্থেই চার্বাক-দর্শন নাস্তিক-দর্শন, কারণ ইহা বেদের প্রামাণ্যও স্বীকার করে না, মৃত্যুর পরের জীবনেও বিশ্বাস করে না।

৮। 'মীমাংসা' ও 'বেদান্ত' উভয়কেই 'মীমাংসা' বলা হয়। পার্থক্য বুঝাইবার জন্য মীমাংসা দর্শনকে 'পূর্ব-মীমাংসা' বা 'কর্ম-মীমাংসা' আর বেদান্ত দর্শনকে 'উত্তর-মীমাংসা' বা 'জ্ঞান-মীমাংসা' বলা হয়।

নাই।[৯] একথা ঠিক নয়। ভারতীয় দর্শনের বীজ নিহিত আছে মানুষের আধ্যাত্মিকী জিজ্ঞাসায়। জীবনের দুঃখ ও অশান্তিতে বিচলিত মনুষ্যহৃদয় যে দিন চিন্তা করিতে শিখিয়াছে দুঃখ ও অশান্তির মূল কোথায়, জীবনের অর্থ কি এবং কোন্ পথ অবলম্বন করিলে সেই দুঃখ ও অশান্তির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, সেই দিনই হইয়াছে দর্শনশাস্ত্রের জন্ম। তাই অতি স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় দর্শনে চিন্তাধারা পরিণতির পথে কোথাও বাধা পায় নাই। ইহা হইতে এরূপ মনে করিলে ভুল করা হইবে যে ভারতীয় দর্শন নৈরাশ্যবাদী (pessimist), তাহা মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকেই বড় করিয়া দেখিয়াছে। অবশ্যই দুঃখ-দুর্দশাকে বড় করিয়া দেখার ফলেই দার্শনিকের চিন্তার সূত্রপাত হইয়াছিল, কিন্তু তাই বলিয়া উহাই দর্শনশাস্ত্রের শেষ কথা নহে। দুঃখ আছে, তাহার কারণ আছে, তাহা হইতে নিষ্কৃতি আছে, সে নিষ্কৃতিলাভের উপায়ও আছে, ভারতীয় দর্শন সবগুলিই স্বীকার করিয়াছে।[১০] কাজেই শেষ পর্যন্ত ইহা বলিতেই হইবে যে ভারতীয় দর্শন আশাবাদী (optimist)।[১১]

ভারতীয় দর্শন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে এক শাশ্বতী শৃংখলাকে (eternal moral order) স্বীকার করিয়াছে, তাহারই উপর একান্তভাবে নির্ভর করিয়াছে বলিয়াই প্রত্যেকটি ভারতীয় দর্শন মানুষকে আশার বাণী শুনাইতে পারিয়াছে। ঋগ্বেদের ঋষিরা এই শৃংখলাকেই বলিয়াছেন 'ঋত'[১২], ন্যায়-বৈশেষিকে ইহারই নাম দেওয়া হইয়াছে 'অদৃষ্ট', মীমাংসা দর্শনে ইহারই নামান্তর 'অপূর্ব', এবং সাধারণ ভাবে সকল দর্শনেই ইহা কর্মফলবাদ। এই শৃংখলাত্মিকা শক্তিই জীবের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করে, সৃষ্টপ্রপঞ্চের ব্যবস্থাপনারও ইহাই বিধাত্রী। কর্মবাদের মূল কথা হইল পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে। তাহাই আমাদের ইহজীবনের সুখ-দুঃখের কারণ। তাহাই ইহজন্মের দৈব। আর, ইহজন্মে কৃতকর্ম হইল পুরুষকার। তাহাই আবার হইবে পরজন্মের দৈব। ইহজীবনে সুকর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা জীব পরজন্মের জন্য অনুকূল দৈব সঞ্চিত করে, তাহার ফলে সে পরজন্মে দুঃখ-দুর্দশার হাত হইতেও নিষ্কৃতি পায়। অর্থাৎ, পুরুষকারের দ্বারা অনুকূল-দৈবের সৃষ্টি করা জীবের আয়ত্তাধীন এবং তাহার ফলেই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতিও তাহার আয়ত্তাধীন। কর্মফলবাদও জন্মান্তরবাদ স্বীকার করে বলিয়াই ভারতীয় দর্শন আশাবাদী হইতে পারিয়াছে।

প্রত্যেক দর্শনের মতে মোক্ষই জীবের চরম লক্ষ্য। 'মোক্ষ' অর্থে মুক্তি। এই মুক্তি বন্ধন হইতে। এই বন্ধন হইল জন্ম ও মৃত্যুর বন্ধন। ইহা জীবের অপরিহার্য।[১৩] এই অপরিহার্য বন্ধন হইতেও একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই জীবকে মুক্তি দিতে পারে। এই মুক্তিই হইল পূর্ণতা। জৈন, বৌদ্ধ, সাংখ্য ও বেদান্তের মতে ইহজীবনেই এই পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব। অজ্ঞান বন্ধনের কারণ, তত্ত্বজ্ঞান বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের উপায়। এই তত্ত্বজ্ঞান অনুভূতি ও বোধের মধ্য দিয়া না হইলে স্থায়ী হয় না, স্থায়ী না হইলে

৯। Thilly তাঁহার *History of Philosophy* (পৃঃ ৩) এবং Stace তাঁহার *A Critical History of Greek Philosophy* গ্রন্থে (পৃঃ ১৪) এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

১০। দ্রষ্টব্যঃ Radhakrishnan : *Introduction to Indian Philosophy*, Vol. I, pp. 49 & 50

১১। Palmer তাঁহার *Contemporary American Philosophy* নামক গ্রন্থে (Vol. I, p. 51) বলিয়াছেনঃ "Optimism seems to be more immoral than Pessimism, for Pessimism warns us of danger, while Optimism lulls into false security."

১২। ঋগ্বেদ সংহিতা ১. ২৩. ৫; ১. ২৪. ৯; ১. ১. ৮ ইত্যাদি।

১৩। তুলঃ জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ॥—গীতা।

তাহা মোক্ষেরও জনক হয় না। তর্ক ও যুক্তির সাহায্যে যাচাই করিয়া আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহা ক্ষণিক মাত্র। তাহাকে হৃদয়ে স্থায়ী করিতে হইলে সমগ্র চিত্ত-বৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া অনবরত তাহারই উপর মনসংযোগ করিয়া হৃদয়ে তাহার ধ্যান করিতে হইবে। তবেই সে জ্ঞান স্থায়ী হইবে, ফলপ্রসূ হইবে। বুদ্ধিনিষ্ঠ যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে জ্ঞান অর্জন করা যায়, আর ধ্যান-ধারণা-সংযমের দ্বারা তাহাকে বোধের পীঠভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়।[১৪] তত্ত্বের কথা জানা থাকিলেই ধর্মে প্রবৃত্তি আসে না।[১৫] তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই—তাহাকে চিরজাগ্রত করা চাই।

নাস্তিক দর্শন পরিচয়

চার্বাক দর্শন

ভারতীয় দর্শনে 'চার্বাক' শব্দের অর্থ 'জড়বাদী' (materialist)। অতীন্দ্রিয় সত্তাকে যাহারা স্বীকার করে না, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থনিচয়ই যাহাদের মতে সৃষ্টির প্রথম ও শেষ কথা তাহাদেরই জড়বাদী বলা হয়। 'চার্বাক' নামক ব্যক্তিবিশেষই জড়-বাদের প্রবর্তক, ইহা অনেকের মত। তাঁহার নাম হইতেই এই মতবাদের নাম 'চার্বাক দর্শন' হইয়াছে এবং যে কেহ জড়বাদের সমর্থক তাহাকেই 'চার্বাক' বলা হয়। মতান্তরে, জড়বাদের প্রবর্তক চার্বাকের মতবাদ ভোগাসক্ত সাধারণ মানুষের কাছে ভাল লাগিত বলিয়াই ঐরূপ নাম দেওয়া হইয়াছে (চারু = সুন্দর; বাক্ = বাক্য)। অনেকে বলেন, দেবগুরু বৃহস্পতি অসুরদের ধ্বংসসাধনের জন্য তাহাদের মধ্যে জড়বাদের প্রচার করেন। তত্ত্বকে বিস্মৃত হইয়া জড়ের উপাসনায় মত্ত হইয়াই শেষ পর্যন্ত অসুরেরা পরাজিত হয়।

ভারতবর্ষে জড়বাদকে ভিত্তি করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত কোনও দর্শন কোনদিন গড়িয়া উঠে নাই, অন্যান্য দর্শনের মত চার্বাক দর্শন কোনদিন সাধারণ্যে বহুল স্বীকৃতি ও সমর্থন লাভ করে নাই। বেদ, বৌদ্ধ সাহিত্য, মহাকাব্য ও সূত্র-সাহিত্যের কোনও কোনও অংশ, অনেকে মনে করে, জড়বাদের সমর্থন করিয়াছে এই মাত্র। প্রায় প্রত্যেকটি দর্শনই নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া প্রসঙ্গক্রমে চার্বাক-মতের উল্লেখ করিয়াছে ও তাহার নিরসন করিয়াছে। চার্বাক দর্শন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বহুলাংশে এই সকল আলোচনার উপরই প্রতিষ্ঠিত।

চার্বাক দর্শনের মতে প্রত্যক্ষই (perception) জ্ঞানের একমাত্র প্রমাণ। অনুমান (inference), শাস্ত্রবাক্য (scriptural testimony) প্রভৃতি হইতে কোনও জ্ঞান হয় না। চার্বাক দর্শন শ্রুতিবাক্যেরও প্রামাণ্য স্বীকার করে না। ইহার মতে অজ্ঞ জনসাধারণের বিশ্বাসের সুযোগ লইয়া ধূর্ত পুরোহিত-সম্প্রদায় নিজেদের জীবিকাসংস্থানের জন্য বেদে যাগযজ্ঞাদির বিধান দিয়াছে। প্রত্যক্ষকেই জ্ঞানের একমাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করার ফলে বস্তুই চার্বাক দর্শনের কাছে চরম সত্য। ঈশ্বর, অদৃষ্ট, স্বর্গ, আত্মা প্রভৃতির জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে হয় না বলিয়াই এইগুলিকে স্বীকার করা হয় নাই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তারূপে ঈশ্বরকেও স্বীকার করা হয় নাই। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতের সমন্বয়ে আপনা হইতেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। চেতন, অচেতন সমস্ত পদার্থই পঞ্চভূতের সমবায়ে গঠিত। পঞ্চভূত যখন কোনও বিশেষ ধরনে সংযুক্ত হয় তখনই পদার্থে চৈতন্যের

১৪। ইহাই যোগ দর্শনের মূল কথা—যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনেও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে।

১৫। তুলঃ জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ॥

সৃষ্টি হয়। অন্যান্য দর্শন যাহাকে 'আত্মা' বলে, এই দর্শনের মতে তাহা চেতন জড়দেহ ব্যতীত কিছু নহে। পঞ্চভূতের চৈতন্য না থাকিলেও তৎসমবায়ে সৃষ্ট জড়পদার্থের চৈতন্য স্বীকারে কোনও বাধা নাই। পান, সুপারি, খয়ের, চুন প্রভৃতির কোনও একটিকে পৃথকভাবে চর্বণ করিলে মুখ লাল হয় না বটে, কিন্তু সকলগুলি সমবেত হইলে রক্তবর্ণের সৃষ্টি হয়। স্বর্গ ও নরক বলিয়াও চার্বাক দর্শনের মতে কিছু নাই। স্বর্গের প্রলোভন ও নরকের ভয় দেখাইয়াই ধূর্ত পুরোহিতগণ জনসাধারণকে বেদোক্ত ব্যয়বহুল যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে বাধ্য করিয়াছে মাত্র। দুঃখ হইতে পরিপূর্ণ নিষ্কৃতিই হইল অন্যান্য দর্শনের মতে 'মোক্ষ'। চার্বাক দর্শনের মতে এরূপ মোক্ষ অসম্ভব। 'মোক্ষ' শব্দের অর্থ যদি দেহের বন্ধন হইতে আত্মার মুক্তি বোঝায় তবে সে মোক্ষের কথা চার্বাক দর্শনে অবান্তর, কারণ এই দর্শন আত্মাকে মানে না। আর 'মোক্ষ' অর্থে যদি এই জীবনেই সকল দুঃখের অবসান বুঝায়, তবে তাহাও অসম্ভব; কেননা, জড়দেহে সুখ-দুঃখের সহাবস্থান হইতে বাধ্য। মৃত্যু ছাড়া পরিপূর্ণ নিষ্কৃতি আর কিছুতেই নাই।[১৬] যজ্ঞে যে পশু নিহত হয়, শাস্ত্র বলে, সে পশু স্বর্গে যায়।[১৭] পুরোহিতরা যদি একথা বিশ্বাসই করেন তবে তাঁহাদের বৃদ্ধ পিতামাতাকে তাঁহারা যজ্ঞে বলি দেন না কেন? প্রেতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধে পিণ্ড প্রদত্ত হইলে সে পিণ্ড যদি প্রেতের ভোগ্য হয় তবে বিদেশে যাইবার সময় আমাদের পাথেয়ের প্রয়োজন হয় কেন? সুখই জীবের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। দেহ একবার ভস্মীভূত হইলে আর আসে না।[১৮]—ইত্যাদি যুক্তি দ্বারা চার্বাক দর্শন দেহকেই সর্বস্ব ধরিয়া তাহার মতবাদ প্রচার করিয়াছে।

জৈন দর্শন

জৈন দর্শনের মতে জৈন ধর্ম প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। জৈনরা বিশ্বাস করেন যে জৈন দর্শনের মতবাদ সুদূর অতীতকাল হইতে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ ২৪ জন তীর্থঙ্কর কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে শেষ তীর্থঙ্কর হইলেন বর্ধমান (নামান্তর, মহাবীর)। ইনি গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক।[১৯]

চার্বাক দর্শনের মত জৈন দর্শন প্রত্যক্ষকেই জ্ঞানের একমাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করে না। অনুমান ও আপ্তবাক্যকেও জ্ঞানের প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। চার্বাক দর্শন অনুমানকে জ্ঞানের প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করে নাই, কারণ অনুমানলব্ধ জ্ঞান অনেক সময় ভুল বলিয়া প্রমাণিত হয়। জৈন দর্শন বলে, মাত্র ঐ কারণেই জ্ঞানের প্রমাণ হিসাবে অনুমানের দাবিকে নস্যাৎ করিতে হইলে প্রত্যক্ষের দাবিও নস্যাৎ হইয়া পড়িবে, কারণ প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানও সময়ে সময়ে ভুল বলিয়া প্রমাণিত হয়। আমরা রজ্জু দেখিয়া যখন সর্প মনে করি, তখনও তাহা ভ্রমই। বস্তুতঃ, মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে অনুমানলব্ধ জ্ঞানের অসত্যতা দেখিয়া চার্বাক দর্শন যখন অনুমানকে জ্ঞানের প্রমাণ হিসাবে অস্বীকার

১৬। মরণমেবাপবর্গঃ—বৃহস্পতিসূত্র

১৭। তুলঃ ওষধ্যঃ পশবো বৃক্ষাস্তির্যঞ্চঃ পশুপক্ষিণঃ। যজ্ঞার্থং নিধনং প্রাপ্য প্রাপ্নুবন্ত্যুচ্ছ্রতীঃ পুনঃ ॥

১৮। পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে ॥
যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ॥

১৯। বর্ধমানের অব্যবহিত পূর্ববর্তী তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ—বর্ধমানেরও প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বের। প্রথম ২২ জন তীর্থঙ্করের সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য Mrs. Stevenson: *Heart of Jainism*, Chap. IV দ্রষ্টব্য।

করিয়াছে, তখনই অজ্ঞাতে তাহা অনুমানেরই আশ্রয় লইয়াছে। ইহাই জৈন দর্শনের মত।[২০] আর আপ্তবাক্যকে জ্ঞানের প্রমাণরূপে ইহা স্বীকৃতি দিয়াছে, কারণ জীবের সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়শক্তির দ্বারা অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়; সেখানে সর্বজ্ঞ মুক্তপুরুষগণের বাক্যই একমাত্র সম্বল।

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবাক্যকে সম্বল করিয়া জৈন দর্শন ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে তাহার চিন্তাধারাকে রূপ দিয়াছে। প্রত্যক্ষের দ্বারা দৃশ্য-বস্তুর (matter) জ্ঞান হয়। দৃশ্যবস্তুসমূহ কোনও স্থানে নিশ্চয়ই অবস্থান করে, সুতরাং স্থানকেও (space) স্বীকার করিতে হয়। অনুমানের দ্বারা হয় স্থানের জ্ঞান। আর বস্তুসমূহের যে পরিবর্তন[২১] হয় তাহার জন্য কালকে (time) স্বীকার করিতে হয়। কালের জ্ঞানও অনুমানলব্ধ। যে বিশেষ শক্তির বলে বস্তুসমূহের স্থিতি (rest) ও গতি (motion) সাধিত হইতেছে তাহাকেই জৈন দর্শনে যথাক্রমে 'ধর্ম' ও 'অধর্ম' বলা হইয়াছে।[২২] পঞ্চভূত, আকাশ, কাল, ধর্ম ও অধর্ম ছাড়াও চেতন দেহে আত্মার অস্তিত্ব জৈন দর্শন স্বীকার করিয়াছে।[২৩] জৈন দর্শনের মতে যতগুলি চেতন পদার্থ ততগুলি আত্মা। ধূলিকণাতেও জৈন দর্শন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে। তবে সকল আত্মার চৈতন্য সমান নহে, কিন্তু পূর্ণ সুখ, পূর্ণ শান্তি ও পূর্ণ চৈতন্য অর্জন করিবার শক্তি সকল আত্মাতেই আছে। মেঘ যেমন সূর্যের আলোককে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, কর্ম সেইরূপ আত্মার এই শক্তিকে ব্যাহত করে মাত্র। কর্মকে দূরে সরাইয়া রাখিতে পারিলে আত্মা বন্ধনমুক্ত হইয়া পূর্ণতালাভ করিতে পারে।

জৈন তীর্থঙ্করগণের জীবন প্রমাণ করে যে আত্মায় এই পূর্ণতাপ্রাপ্তি সম্ভব এবং তাঁহাদের উপদেশাবলীই পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথের নির্দেশ দেয়। তাঁহাদের উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ আস্থা, তাহার পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অনাসক্তি প্রভৃতি চারিত্রসমূহের[২৪] সম্যক্ পরিপালনই আত্মাকে পূর্ণতায় উপনীত করিয়া থাকে। সেই অবস্থাই মোক্ষ।

২০। **প্রমেয়-কমল-মার্তণ্ড** নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে চার্বাক দর্শনের মত বলিষ্ঠ-ভাবে খণ্ডিত হইয়াছে।

২১। বৌদ্ধ দর্শনের মতে কোনও পদার্থই স্থায়ী নহে, ক্ষণে ক্ষণে তাহা পরিবর্তিত হয় (ক্ষণিকবাদ); আবার বেদান্তের মতে পরিবর্তন মিথ্যা (নিত্যবাদ)। জৈন দর্শন এই দুই মতের কোনটিকেই স্বীকার করে না (**স্যাদ্বাদমঞ্জরী**, শ্লো. ২৬)। জৈন মতে যে বিভিন্ন প্রকৃতির পদার্থসমূহের সংযোগে বিশ্ব গঠিত; তাহাদের কতকগুলির গুণের পরিবর্তন আছে, কতকগুলির পরিবর্তন নাই। যে গুণগুলি স্থায়ী সেই অংশে বিশ্বও অপরিবর্তনীয়, যে গুণগুলির বিকৃতি ঘটে সেই অংশে বিশ্বেরও পরিবর্তন হয়। বৌদ্ধ দর্শনের ক্ষণিকবাদের নিরসন করিতে গিয়া জৈন দর্শন যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছে তাহার জন্য **সর্বদর্শন-সংগ্রহ** (জৈন দর্শন) ও **ষড়্‌দর্শন-সমুচ্চয়**, ৫২, গুণরত্নের টীকা দ্রষ্টব্য।

২২। যে সব পদার্থের গতি সম্ভব তাহাদিগকে বলা হয় 'এস', যাহাদের গতি সম্ভবই নয় তাহাদিগকে বলা হয় 'স্থাবর'।

২৩। **ষড়্-দর্শন-সমুচ্চয়ে** (৪৯) গুণরত্ন টীকায় এই মতের পক্ষে বিশদ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

২৪। সম্যগ্ দর্শন (right faith), সম্যগ্ জ্ঞান (right knowledge), সম্যক্ চারিত্র (right conduct)—এই তিনটিকে জৈন দর্শনে বলা হয় 'ত্রিরত্ন'। উমাস্বামী তাঁহার **তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রের** প্রথম সূত্রেই এই ত্রিরত্নের কথা বলিয়াছেন—সম্যগ্‌দর্শন-জ্ঞান-চারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ। এই তিনটিই মোক্ষমার্গ। সম্যগ্‌দর্শন সহজাতও হইতে পারে, আবার শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা ইহাকে আয়ত্তও করা চলিতে পারে (**তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র**, ১. ২-৩)। ন্যায়ে প্রবৃত্তি ও অন্যায় হইতে নিবৃত্তিই সম্যক্ চারিত্র (নেমিচন্দ্র, **দ্রব্যসংগ্রহ**, ৩৫)।

জৈন দর্শন ঈশ্বরকে স্বীকার করে না। তীর্থংকরগণই সেখানে ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়াছেন।

জীবে দয়া জৈন মতবাদের বৈশিষ্ট্য[২৫]। সকল মতের প্রতি শ্রদ্ধাও ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জৈন দার্শনিকগণ বিশ্বাস করিয়াছেন যে মানুষের জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি সীমিত এবং সেই কারণেই কাহারও পক্ষে কোনও কিছু সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা সম্ভব নহে।

বৌদ্ধ দর্শন

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের উপদেশাবলীকে[২৬] ভিত্তি করিয়াই বৌদ্ধ দর্শনের সৃষ্টি। ব্যাধি, শোক, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি দ্বারা মানুষকে নিত্য নিপীড়িত হইতে দেখিয়া বুদ্ধের মনে ইহার কারণ অন্বেষণের ইচ্ছা হয়। সমাধিমগ্ন অবস্থায় সুদীর্ঘকাল যাপন করার পর তাঁহার 'বোধি' বা 'প্রজ্ঞার' উন্মেষ হয়। নবলব্ধ প্রজ্ঞার আলোকে যে চারিটি সত্য তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইয়া উঠে তাহাই বৌদ্ধ দর্শনে 'চত্বারি আর্যসত্যানি' নামে প্রসিদ্ধ। এই চারিটি সত্য হইল—(ক) দুঃখ আছে, (খ) দুঃখের কারণ আছে, (গ) দুঃখের নিবৃত্তি আছে, (ঘ) দুঃখ হইতে নিবৃত্তি লাভের উপায়ও আছে।[২৭] প্রত্যেক দর্শনই দুঃখের অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়াছে সত্য, কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনের মতে দুঃখ হইল সর্বব্যাপক। যেখানে আপাতদৃষ্টিতে সুখের অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয়, সেখানেও বুদ্ধ গভীর অন্তর্দৃষ্টির বলে দুঃখ দেখিয়াছেন। এই দর্শনের মতে জন্মই হইল দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ, জন্মের কারণ হইল পার্থিব বিষয়ের প্রতি জীবের তৃষ্ণা এবং তৃষ্ণার কারণ হইল অজ্ঞান। সুতরাং একমাত্র জ্ঞানই জীবকে দুঃখ-দুর্দশার হাত হইতে বাঁচাইতে পারে। দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য বৌদ্ধ দর্শনে আটটি উপায়ের কথা বলা হইয়াছে। এইগুলিকে 'অষ্টাঙ্গিক-মার্গ' বলে।[২৮] ইহারা হইল—সম্যগ্‌দৃষ্টি (right views), সম্যক্‌সংকল্প (right determination), সম্যগ্‌বাক (right speech), সম্যক্‌কর্মান্ত (right conduct), সম্যগ্‌জীব (right livelihood), সম্যগ্‌ব্যায়াম (right effort), সম্যক্‌স্মৃতি (right mindfulness), সম্যক্‌-সমাধি (right concentration)। দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইলেই জীবের 'নির্বাণ' হয়। আত্মা বা ঈশ্বরকে বৌদ্ধ দর্শন স্বীকার করে নাই।

বুদ্ধদেব যে মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে দর্শনোচিত জটিলতা ছিল না। জীব যেখানে দুঃখে শোকে জর্জর, সেখানে দর্শনশাস্ত্রের কূট আলোচনায় কালক্ষেপ করাকে তিনি সময়ের অপব্যবহার বলিয়াই মনে করিতেন। জগৎ নিত্য বা অনিত্য, দেহ ও আত্মা একই কি না, ইহাদের পার্থক্য কি, পূর্ণজ্ঞান লাভের পর আবার জন্মগ্রহণ

২৫। জৈন দর্শনে প্রতিটি আত্মাই সমানভাবে পূর্ণতার অধিকারী। কেবল কর্মবশেই তাহার পূর্ণতালাভ ব্যাহত হয় মাত্র। অহিংসা মতবাদের মূল ভিত্তি হইল প্রতিটি আত্মার এই অধিকারসাম্যের স্বীকৃতির উপর। অনেক সমালোচক ইহার বিরূপ অর্থও করিয়াছেন। তুল: "The root idea of the doctrine of *ahimsa*......is the awe with which the savage regards life in all its forms."—Mackenzie : *Hindu Ethics*, p. 112

২৬। বিনয়পিটক, সুত্তপিটক ও অভিধম্মপিটক নামে তিনখানি গ্রন্থ আছে। ইহাদিগকে একসঙ্গে 'ত্রিপিটক' বলা হয়। ইহারা পালি ভাষায় রচিত। বলা হয়, বুদ্ধের উপদেশাবলী তাঁহার সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ যেমনভাবে বলিয়াছিলেন ইহাতে সেইগুলি তেমনিভাবেই সন্নিবেশিত হইয়াছে।

২৭। দুঃখ, দুঃখ-সমুদায়, দুঃখ-নিরোধ, দুঃখ-নিরোধ-মার্গ।

২৮। দীর্ঘ-নিকায়-সুত্ত—Warren, p. 372-74

করিতে হয় কি না—ইত্যাদি ধরনের দশটি প্রশ্নের বুদ্ধ কোনদিন কোনও উত্তর দেন নাই।[২৯] তাঁহার মতে যে লোক তীরবিদ্ধ হইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে আগে তাহার চিকিৎসা না করিয়া, তীর কোথা হইতে আসিল, কে ছুঁড়িল, তীরে বিষ মাখানো ছিল কি না ইত্যাদি প্রশ্ন লইয়া মাথা ঘামানো যেমন মূর্খতা, তেমনি জীব যখন দুঃখ-দুর্দশায় একান্ত কাতর তখন ঐ ধরনের প্রত্যক্ষ প্রমাণহীন জটিল বিষয়ের সম্বন্ধে মাথা ঘামানোও মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নহে।[৩০] এই জন্যই নির্বাণ লাভের পর প্রাপ্ত-নির্বাণের কি গতি হয় এই প্রশ্নেরও বুদ্ধ কোনও উত্তর দেন নাই। বুদ্ধের মৌন হইতে অনেকে মনে করেন নির্বাণ লাভের পর আত্মা আর থাকে না; কিন্তু এমনও মনে করা যাইতে পারে যে নির্বাণ লাভের পর আত্মার অবস্থা অবর্ণনীয় বলিয়াই বুদ্ধ ঐরূপ স্থলে নির্বাক ছিলেন।[৩১]

পরবর্তীকালে বুদ্ধের ভক্তগণ বুদ্ধের উপদেশাবলীর উপর ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতবাদের বিশাল বিশাল ইমারত গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। সেই বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তা-ধারার মধ্যে চারিটির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

(ক) **মাধ্যমিক** বা **শূন্যবাদ সম্প্রদায়**—ইহার মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা। ইহার পারমার্থিক (real) কোনও সত্তা নাই। ইহাই শূন্যবাদ (nihilism)। নাগার্জুন নামে দক্ষিণ ভারতের একজন ব্রাহ্মণ ইহার প্রবর্তক।[৩২]

(খ) **যোগাচার** বা **বিজ্ঞানবাদ সম্প্রদায়**—ইহার মতে মন (চিত্ত) ছাড়া আর সবই অসত্য।[৩৩]

(গ) **সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়**—ইহার মতে মন (চিত্ত) এবং তদতিরিক্ত সব কিছুই সত্য। সুত্তপিটককেই ইহা প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করে বলিয়াই এইরূপ নাম হইয়াছে।[৩৪]

(ঘ) **বৈভাষিক সম্প্রদায়**—সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের মত এই সম্প্রদায়ও স্বীকার করে যে মন এবং তদতিরিক্ত সব কিছুই সত্য। পার্থক্য এই যে ইহার মতে মনের অতিরিক্ত বাহ্যবস্তুনিচয়ের জ্ঞান প্রত্যক্ষলব্ধ, আর সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের মতে উহা অনুমানসাপেক্ষ। সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের মতবাদকে **বাহ্যানুমেয়বাদ** এবং বৈভাষিক সম্প্রদায়ের মতবাদকে **বাহ্যপ্রত্যক্ষবাদ** বলা যায়।[৩৫]

বৌদ্ধ ধর্ম দুইটি শাখায় বিভক্ত—(ক) হীনযান ও (খ) মহাযান। হীনযান সম্প্রদায়ের বিস্তার দক্ষিণ অঞ্চলে—সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ প্রভৃতি স্থানে। মহাযান সম্প্রদায়ের প্রসার উত্তরাঞ্চলে—তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে। বৌদ্ধ দর্শনের পূর্বোক্ত চারিটি শাখার মধ্যে প্রথম দুইটি (অর্থাৎ মাধ্যমিক ও যোগাচার শাখা) মহাযান ধর্মের অনুসারী, শেষ দুইটি (অর্থাৎ সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক শাখা) হীনযান ধর্মের অনুসারী।

২৯। Rhys Davids : *Dialogues of the Buddha* I, p. 187

৩০। মজ্‌ঝিম-নিকায় সুত্ত, ৬৩

৩১। Radhakrishnan : *The Teaching of Buddha by Speech and Silence—Hibbert Journal*, April, 1934

৩২। Sagen : *Systems of Buddhistic Thought* (Cal. Univ.), Chap. V. p. 187

৩৩। লঙ্কাবতার সূত্র, শান্তরক্ষিতের **তত্ত্বসংগ্রহ** এবং তাহার উপর কমলশীলের টীকা এই শাখার প্রামাণ্য গ্রন্থগুলির অন্যতম। বসুবন্ধু, আসঙ্গ, দিগ্‌নাগ হইলেন এই শাখার প্রধান সমর্থক; যোগাভ্যাস ও সদাচার পালনের দ্বারাই এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় এইরূপ নাম হইয়াছে।

৩৪। Sagen : *Systems of Buddhistic Thought*, p. 5

৩৫। Turner : *A Theory of Direct Realism*, p. 8

নির্বাণের উদ্দেশ্য কি? এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়াই বৌদ্ধগণ এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। হীনযান ধর্মাবলম্বিগণের মতে স্বীয় দুঃখ-নিবৃত্তির জন্যই নির্বাণ কাম্য। মহাযান ধর্মাবলম্বিগণের মতে নিজের দুঃখ দূর করাই নির্বাণ লাভের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, পরম প্রজ্ঞার অধিকারী হইয়া তাহার সাহায্যে জীবকুলের দুঃখ দূর করাই ইহার চরম উদ্দেশ্য। লোককল্যাণ বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান লক্ষ্য।[৩৬]

আস্তিক দর্শন পরিচয়

ন্যায়

বলিষ্ঠ যুক্তি ও তর্কবিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হইলেন মহর্ষি গৌতম। তাঁহার নামান্তর অক্ষপাদ, তাই ইহার আর এক নাম অক্ষপাদ দর্শন। ইহার মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ—চারিটি জ্ঞানের[৩৭] প্রমাণ। সত্যজ্ঞানের নাম 'প্রমেয়', ইহার বিষয় হইল আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, রাগাদি মানসিক বিকৃতি, প্রেত্যভাব বা পুনর্জন্ম, সুখ-দুঃখানুভূতি, দুঃখ, অপবর্গ। ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার বিষয়ের সংযোগে যে জ্ঞান জন্মে তাহাই প্রত্যক্ষ।[৩৮] ইহা দ্বিবিধ—বাহ্য (external) ও আন্তর (internal)। বহিরিন্দ্রিয়ের (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক) প্রত্যক্ষ বাহ্যপ্রত্যক্ষ, মনের প্রত্যক্ষ আন্তরপ্রত্যক্ষ। রূপজ্ঞান বাহ্যপ্রত্যক্ষ, সুখ-দুঃখানুভূতি আন্তরপ্রত্যক্ষ। কোনও বিশেষ লক্ষণের দ্বারা কোনও কিছুর জ্ঞান হইল অনুমান।[৩৯] কোথাও ধূম দেখিয়া সেখানে অগ্নির অবস্থান সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহা অনুমানলব্ধ। নাম ও বস্তুর সাদৃশ্যের উপর যে জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত তাহা উপমান-লব্ধ। আপ্তবাক্য, শিষ্টবাক্য, শাস্ত্রবাক্য প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়া আমাদের যে জ্ঞান তাহা শব্দলব্ধ।[৪০] হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিয়া জল হয়—এই জ্ঞান বৈজ্ঞানিকের বাক্যের উপর নির্ভর করিয়াই আমাদিগকে অর্জন করিতে হইয়াছে।

ন্যায় দর্শনের মতে আত্মা, শরীর ও মন হইতে পৃথক। ভূতসমূহের সমবায়ে শরীরের সৃষ্টি। মন সূক্ষ্ম, অবিভাজ্য ও অণু। মনের সাহায্যে আত্মার সুখ বা দুঃখের অনুভূতি হয়। এইজন্য মন অন্তরিন্দ্রিয় (internal sense-organ)। আত্মা নিজে সকল অনুভূতির অতীত, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিষয়ের সংস্পর্শে আসিলে আত্মায় অনুভূতির সৃষ্টি হয়। সুখ-দুঃখের পরিপূর্ণ নিবৃত্তি হইল 'অপবর্গ', একমাত্র তত্ত্ব-

---

৩৬। জাপানী লেখক Suzuki তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *Outlines of Mahayana Buddhism* (পৃঃ ১০)-এ হীনযান হইতে মহাযানের উৎকর্ষ সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন: "It (Mahayanism) is the Buddhism which, inspired by a progressive spirit, broadened its original scope, so far as it did not contradict the inner significance of the teachings of the Buddha, and which assimilated other religio-philosophical beliefs within itself, whenever it felt that, by so doing, people of more widely different characters and intellectual endowments could be saved."

৩৭। জ্ঞানের স্বরূপ ও শ্রেণীভেদ সম্বন্ধে S. C. Chatterjee: *The Nyaya Theory of Knowledge*, Ch. II & V দ্রষ্টব্য।

৩৮। ন্যায়-সূত্র ১. ১. ৪

৩৯। "Anumana (inference) is the process of ascertaining, not by perception or direct observation, but through the instrumentality or medium of a mark, that a thing possesses certain character."—Seal: *The Positive Sciences of the Ancient Hindus*, p. 250

৪০। ন্যায়-সূত্র, ১. ১. ৭

জ্ঞানের দ্বারা ইহাকে লাভ করিতে হয়। অপবর্গ নিরবচ্ছিন্ন সুখময় অবস্থাবিশেষ—এ ধারণা ভুল। সুখ-দুঃখ প্রভৃতি সকল প্রকার অনুভূতির পরিপূর্ণ বিরামই অপবর্গ।

যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে ন্যায় দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছে—ঈশ্বরকেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের চরম ও একমাত্র কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। তিনি ষড়ৈশ্বর্য-শালী, প্রযোজক-কর্তা, কর্মফলদাতা। পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল অনুসারে জীবগণ যাহাতে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে পারে সেইজন্যই ঈশ্বর এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবের মঙ্গলের জন্যই বিশ্বের সৃষ্টি—ঈশ্বরের স্বকীয় উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নহে। তাঁহার সদাজাগ্রত প্রেম ও শাসনে অবস্থান করিয়া সমস্ত জীবই একদিন না একদিন তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তি পাইবে, ইহাই ন্যায় দর্শনের মত।

বৈশেষিক

বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি কণাদ। তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন এবং ক্ষেত্র হইতে শস্যকণা সংগ্রহ করিয়া তাহা দ্বারাই জীবনধারণ করিতেন বলিয়া তাঁহার ঐরূপ নাম হইয়াছে। তাঁহার আর এক নাম উলূক। এই কারণে এই দর্শনের নামান্তর ঔলূকীয় দর্শন। কণাদ রচিত **বৈশেষিক সূত্র** ইহার প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ।

ন্যায় ও বৈশেষিকের মধ্যে অনেকাংশে সাদৃশ্য (**সমানতন্ত্রতা**) আছে। জীবের মুক্তি উভয়েরই লক্ষ্য। উভয়েই স্বীকার করে যে অজ্ঞান (ignorance) জীবের দুঃখের কারণ এবং তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষ লাভের একমাত্র উপায়। এই দুই দর্শনের মধ্যে পার্থক্য দুইটি ঃ—প্রথমতঃ, ন্যায় প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, জ্ঞানের এই চারিটি প্রমাণ স্বীকার করিয়াছে। বৈশেষিক প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই মুখ্যতঃ জ্ঞানের প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, উপমান ও শব্দকে ঐ দুইটিরই অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ন্যায় যেখানে ১৬টি পদার্থ স্বীকার করিয়াছে, সেখানে বৈশেষিক মাত্র ৭টি পদার্থ স্বীকার করিয়াছে—দ্রব্য (substance), গুণ (quality), কর্ম (action), সামান্য (generality), বিশেষ (particularity), সমবায় (relation of inherence) ও অভাব (non-existence)।[৪১] 'বিশেষ'-কে একটি স্বতন্ত্র পদার্থরূপে স্বীকার করিয়া তাহার উপর বিশদ আলোচনা করার জন্যই ইহার নাম হইয়াছে 'বৈশেষিক'। দ্রব্য আবার নয়টি—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, কাল (time), দিক (space), দেহী (soul), মন (mind)। ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ—এই চারিটি কতকগুলি অদৃশ্য ও অবিধ্বংসী অণুর সংযোগে গঠিত হয়। এই অণুগুলি অনাদি ও শাশ্বত। আকাশ, দিক এবং কাল শাশ্বত ও সর্বব্যাপী। মন সর্বব্যাপী নহে, কিন্তু অণুবৎ সূক্ষ্ম। মন অণু বলিয়াই একই সময়ে আমাদের একাধিক-অভিজ্ঞতা হয় না। মনের সাহায্যে জীবের আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞান মনের দ্বারা হয় বলিয়া ইহা আন্তরপ্রত্যক্ষ (internal perception)। অণুসমূহ পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছে, বিশ্লিষ্ট হইলেই আবার পৃথিবীর ধ্বংস হইবে। কিন্তু অণগুলি নিজেদের ইচ্ছামত সংশ্লিষ্ট বা বিশ্লিষ্ট হইতে পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই তাহাদের সংশ্লেষ (composition) বা বিশ্লেষ (decomposition) সংসাধিত হয়। জীবের অদৃষ্ট অনুসারেই আবার ঈশ্বর তাঁহার সৃজনপ্রক্রিয়া অবলম্বন করেন। বিশ্বস্রষ্টারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বৈশেষিক দর্শনে অনুমানলব্ধ।

৪১। দ্রব্যং গুণস্তথা কর্ম সামান্যং সবিশেষকম্।
সমবায়স্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্তিতাঃ ॥—ভাষাপরিচ্ছেদ

সাংখ্য

মহর্ষি কপিল সাংখ্য দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি ভারতীয় সাহিত্যের সর্বত্র সাংখ্যের চিন্তাধারার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহার প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ হইল কপিল রচিত **সাংখ্য-সূত্র**। এই গ্রন্থ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়ায় কপিল **সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র** নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার জন্য এই দর্শনের নামান্তর হইল 'সাংখ্য-প্রবচন'। 'সাংখ্য' শব্দের অর্থ হইল 'সম্যগ্‌জ্ঞান'। যে দর্শনে সম্যগ্‌জ্ঞানের কথা আলোচিত হইয়াছে বা যে দর্শন আমাদিগকে সম্যগ্‌জ্ঞান দিতে পারে তাঁহাই সাংখ্য দর্শন।

সৃষ্টির মূলে সাংখ্য দুইটি পারমার্থিকী সত্তা (ultimate reality) স্বীকার করে—পুরুষ ও প্রকৃতি। পরস্পরনিরপেক্ষ হইয়া এই দুইয়ের অবস্থান। প্রকৃতিই সৃষ্টির প্রধান কারণ।[৪২] প্রকৃতি জড়ধর্মী ও নিত্য পরিবর্তনশীল। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের সমন্বয়ে প্রকৃতি গঠিত। বস্তুতঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই (equilibrium) প্রকৃতি।[৪৩] গুণগুলিও প্রতিক্ষণে পরিবর্তনশীল। গুণগুলি যখন নিজেদের মধ্যেই নিজেরা পরিবর্তিত হয়, তখন তাহাকে বলে স্বরূপ-পরিণাম (change into the homogeneous); আর যে পরিবর্তনে তাহাদের একটি আর দুইটির উপর আধিপত্য করে তাহার নাম বিরূপ-পরিণাম (change into the heterogeneous)। বিরূপ-পরিণাম বস্তুবিশেষের সৃষ্টির কারণ, স্বরূপ-পরিণামে সৃষ্টির প্রলয় হইয়া থাকে।

পুরুষ (self) হইল শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র। ইহা চৈতন্যময়, জ্ঞাতা (subject of knowledge)—জ্ঞেয় (object of knowledge) নহে। চৈতন্য ইহার গুণ বা ধর্মমাত্র (attribute) নহে, পরন্তু ইহা চৈতন্যাত্মক (pure consciousness as such)। ইহার কোনও ক্রিয়া বা পরিবর্তন নাই। ইহা শাশ্বত, সর্বব্যাপক, নির্লিপ্ত। পুরুষ (self) কোনও কিছুর কারণও নহে, কোনও কিছুর কার্যও নহে।

জড়ত্ব প্রকৃতির ধর্ম, সুতরাং ইহা একাকী সৃষ্টির কারণ হইতে পারে না। আবার পুরুষ চৈতন্যাত্মক হইলেও নিষ্ক্রিয়, সুতরাং পুরুষও একাকী সৃষ্টির কারণ হইতে পারে না। প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগেই সৃষ্টির উন্মেষ। পুরুষ প্রকৃতির সহিত যুক্ত হইয়া প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় বিক্ষোভের সৃষ্টি করে, তাহাতেই প্রকৃতি সৃজনোন্মুখী হইয়া উঠে।[৪৪]

সাংখ্য-মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই তিনটি জ্ঞানের প্রমাণ। জীবনে দুঃখ-কষ্ট আছেই। সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে এড়াইয়া চলা যদি বা সম্ভব হয়, মৃত্যুর হাত হইতে জীবের নিষ্কৃতি নাই। অথচ, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখের হাত হইতে সব জীবই নিষ্কৃতি চায়। এই নিষ্কৃতিই সাংখ্য দর্শনে 'মুক্তি', 'অপবর্গ', 'পুরুষার্থ', 'কৈবল্য' প্রভৃতি নামে অভিহিত। অজ্ঞান বা অবিবেক (ignorance) দুঃখের মূল কারণ, তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞান দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের

৪২। এইজন্য সাংখ্য দর্শনে ইহাকে 'পরা-প্রকৃতি', 'মূলা-প্রকৃতি' ও 'প্রধান' বলা হইয়াছে।

৪৩। সত্ত্ব-রজ-স্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।

৪৪। প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয় ও মন, পঞ্চ তন্মাত্র (five subtle elements), উহা হইতে পঞ্চমহাভূত—প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ হইতে সৃজন-প্রক্রিয়ায় সাংখ্য দর্শন এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে স্বীকার করিয়াছে।

উপায়। এই জীবনেই বিবেকজ্ঞানের দ্বারা অপবর্গ লাভ করার নাম 'জীবন্মুক্তি', পরজীবনে পরলোকে অপবর্গ লাভ করার নাম 'বিদেহমুক্তি'।[৪৫]

সাংখ্য মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না, সৃষ্টির কারণরূপে ঈশ্বরকে স্বীকার করারও প্রয়োজন হয় না। তাহার জন্য প্রকৃতিকে স্বীকার করিলেই যথেষ্ট। ঈশ্বর নিত্য ও অপরিবর্তনশীল, তিনি জগতের স্রষ্টা বা কারণ হইতে পারেন না। তাঁহাকে সৃষ্টির কারণ বলিলে তাঁহারও পরিবর্তন স্বীকার করিতে হয়, যেহেতু কারণ (cause) স্বয়ং অপরিবর্তিত থাকিয়া কার্যের (effect) সৃষ্টি করিতে পারে না।

যোগ

মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার নামানুসারে এই দর্শনের আর এক নাম পাতঞ্জল দর্শন। পতঞ্জলি রচিত যোগসূত্র এই দর্শনশাখার প্রামাণ্য গ্রন্থ। সাংখ্য ও যোগ মোটামুটি প্রায় সকল বিষয়েই একমত। সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকেও যোগদর্শন স্বীকার করে। সাংখ্য যে বিবেকজ্ঞানকে মুক্তির কারণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, যোগদর্শনের মতে সেই বিবেকজ্ঞান একমাত্র যোগাভ্যাসের দ্বারাই লভ্য। ইহাই যোগদর্শনের বৈশিষ্ট্য। চিত্তের সকল প্রকার বৃত্তির নিরোধের নাম 'যোগ'।[৪৬] চিত্তবৃত্তিসমূহের (mental functions) পাঁচটি বিভিন্ন স্তর আছে অর্থাৎ পাঁচটি বিভিন্ন স্তরে থাকিয়া চিত্ত কার্য করে। ইহারা হইল—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র, নিরুদ্ধ। এই পাঁচটিকে বলা হয় 'চিত্তভূমি'। প্রথম তিনটি স্তরে যোগ সম্ভব নয়। কেবল একাগ্র ও নিরুদ্ধ ভূমিতেই যোগ সম্ভব হইয়া থাকে। একাগ্র ভূমিতে চিত্ত ধ্যেয় বস্তুতে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হইয়া থাকে, আর নিরুদ্ধভূমিতে চিত্ত সর্বপ্রকার ক্রিয়াশূন্য হয়, এমন কি তাহার চিন্তা করার শক্তি পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়। যোগ বা সমাধি দুই প্রকার—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যেয় বস্তুতে চিত্ত সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হয় এবং ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপজ্ঞান লাভ করে। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তে ধ্যেয় বস্তুর জ্ঞান পর্যন্ত হয় না। চিত্ত তখন সকল জ্ঞানের অতীত হইয়া পড়ে।

যোগের আটটি মার্গ আছে—ইহাদের নাম 'যোগাঙ্গ'। ইহারা হইল—যম (restraint), নিয়ম (ethical culture), আসন (posture), প্রাণায়াম (breath-control), প্রত্যাহার (withdrawal of senses), ধারণা (attention), ধ্যান (meditation), সমাধি (cóncentration)।[৪৭] সাংখ্য ঈশ্বরকে স্বীকার করে নাই, যোগ ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াছে। এই পার্থক্য বুঝাইবার জন্য সাংখ্যকে বলা হয় 'নিরীশ্বর-সাংখ্য', যোগকে বলা হয় 'সেশ্বর-সাংখ্য'।

৪৫। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে 'বিদেহমুক্তি'ই প্রকৃত অপবর্গ।

৪৬। যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ—পতঞ্জলি

৪৭। স্থানান্তরে যোগকে ষড়ঙ্গ বলা হইয়াছে। প্রত্যাহার, ধ্যান, প্রাণায়াম, ধারণা, তর্ক ও সমাধি—এই ছয়টিকেই যোগের অঙ্গ বলা হইয়াছে ঃ

প্রত্যাহারস্তথা ধ্যানং প্রাণায়ামোঽথ ধারণা।
তর্কশ্চৈব সমাধিশ্চ ষড়ঙ্গো যোগ উচ্যতে ॥

যম, নিয়ম, আসন যোগের মধ্যে পরিগণিত হইলেও ইহারা যোগের বাহ্যাঙ্গ। যম দ্বাদশটি—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অসঙ্গ, হ্রী, অসঞ্চয়, আস্তিক্য, ব্রহ্মচর্য, মৌন, স্থৈর্য, ক্ষমা, ভয়।

নিয়মও দ্বাদশটি—শৌচ, জপ, তপ, হোম, শ্রদ্ধা, আতিথ্য, সুরার্চন, তীর্থাটন, পরার্থেহা (পরের উপকারের ইচ্ছা), তুষ্টি, আচার্যসেবা।

তুল ঃ অহিংসা সত্যমস্তেয়মসঙ্গো হ্রীরসঞ্চয়ঃ।
আস্তিক্যং ব্রহ্মচর্যং চ মৌনং স্থৈর্যং ক্ষমা-ভয়ম্ ॥
তীর্থাটনং পরার্থেহা তুষ্টিরাচার্যসেবনম্।
এতে যমাঃ সনিয়মাঃ উভয়োর্দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥

যোগ দর্শনের মতে ঈশ্বরই একমাত্র ধ্যেয় ও জ্ঞেয়; তিনি অনাদি, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, নির্দোষ। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে সৃষ্টির উদ্ভব হয় এবং ঐ উভয়ের বিয়োগে (separation) সৃষ্টির লয় হয় সত্য; কিন্তু সংযোগ ও বিয়োগ পুরুষ বা প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম নহে। জীবের অদৃষ্ট অনুসারে ঈশ্বরই পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগসাধন করিয়া সৃষ্টি সম্পন্ন করেন, আবার তাহাদিগকে বিযুক্ত করিয়া সৃষ্টির লয়সাধন করেন।

মীমাংসা

মহর্ষি জৈমিনি প্রতিষ্ঠিত মীমাংসা দর্শন বেদের কর্মকাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদের কর্মকাণ্ডে যে সকল যাগ-যজ্ঞাদির বিধান দেওয়া হইয়াছে তাহার সমর্থন করাই ইহার উদ্দেশ্য। এইজন্য ইহার আর এক নাম 'কর্ম-মীমাংসা'। এই দর্শন বেদকে অনাদি, অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত বলিয়া মনে করে। বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠানই ইহার মতে 'ধর্ম', বেদনিষিদ্ধ কর্মাচরণ হইল 'অধর্ম'। ধর্মাচরণই জীবের কর্তব্য। কোনও ফলের কামনায় বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিলে চলিবে না, শুধু বেদে বিহিত হইয়াছে বলিয়াই তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এইরূপ মনোবৃত্তি লইয়া বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিলে জীবের কর্মবন্ধন ছিন্ন হয় এবং জীব মৃত্যুর পর মোক্ষ লাভ করে।

আত্মা অজ, নিত্য ও শাশ্বত। আত্মা যদি শাশ্বত ও নিত্য না হয় অর্থাৎ মৃত্যুর পর আত্মারও যদি বিনাশ হয় তবে বেদবিহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানজনিত যে স্বর্গের কথা বেদ ঘোষণা করিয়াছে তাহা অর্থহীন হইয়া পড়ে। চৈতন্য আত্মার ধর্ম নহে। আত্মা দেহকে আশ্রয় করিলে এবং তখন ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হইলে, আত্মায় চৈতন্যের সৃষ্টি হয়।

মীমাংসা দর্শনের প্রভাকর প্রতিষ্ঠিত যে শাখা তাহার মতে জ্ঞানের প্রমাণ (sources of knowledge) পাঁচটি—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ ও অর্থাপত্তি (postulation)। প্রথম চারিটিকে ন্যায় দর্শন স্বীকার করিয়াছে। আর কুমারিল ভট্ট প্রতিষ্ঠিত যে শাখা তাহা ঐ পাঁচটি প্রমাণ ছাড়াও আরও একটিকে স্বীকার করিয়াছে —অনুপলব্ধি (non-cognition)।

মীমাংসা দর্শন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, ঈশ্বর যে জগতের স্রষ্টা তাহাও স্বীকার করে না। জীবের কর্মফল অনুসারে পদার্থের সংযোগে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে মাত্র। কর্মফলই সৃষ্টির নিয়ামক।

বেদান্ত

বেদের কর্মকাণ্ডের উপর যেমন মীমাংসা গড়িয়া উঠিয়াছে, তেমনই বেদের জ্ঞান-কাণ্ডের উপর গড়িয়া উঠিয়াছে বেদান্ত দর্শন (নামান্তর, জ্ঞানমীমাংসা)। উপনিষদের শিক্ষাই বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি। বাদরায়ণ তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে উপনিষদের শিক্ষাবলীকে বিশেষ রূপ দেন। পরবর্তীকালে ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন টীকাও এই দর্শনের মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের উপর শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যাই ভারতীয় জীবনকে সর্বাধিক প্রভাবিত করিয়াছে।

প্রাণায়ামের সংজ্ঞা—সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং মনসা সহ।
ত্রিঃ পঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে॥
ধারণার সংজ্ঞা— মনঃ সংকল্পকং ধ্যাত্বা সংক্ষিপ্যাত্মনি বুদ্ধিমান্।
ধারয়িত্বা তথাত্মানং ধারণা পরিকীর্তিতা॥
তর্ক ও সমাধির সংজ্ঞা—আগমস্যাবিরোধেন ঊহনং তর্ক উচ্যতে।
যং লব্ধাহপ্যবমন্যেত সমাধিঃ পরিকীর্তিতঃ॥

ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের অণু-পরমাণুতে নিজেকেও পরিব্যাপ্ত করিয়াও অতিরিক্ত রহিলেন।[৪৮] ব্রহ্মাণ্ডে চেতন-অচেতন সব কিছুই সেই পুরুষ হইতে উদ্ভূত। বিভিন্ন নাম বা রূপযুক্ত সৃষ্ট প্রপঞ্চ বস্তুতঃ সেই একই ব্রহ্মের প্রকাশ।[৪৯] সেই ব্রহ্মই আত্মা; তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। শঙ্কর ঈশ্বরকেই একমাত্র সত্য বলিয়াছেন। তিনি এক এবং অবিকারী হইয়াও এই বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য সৃষ্টি সম্পন্ন করিয়াছেন। যে শক্তিবলে সেই এক ঈশ্বর বিচিত্র ও বিবিধ সৃষ্টি সম্পন্ন করেন তাহারই নাম 'মায়া'। এই সৃষ্টির বহুত্ব ও বৈচিত্র্য সত্য নহে, অন্ধকারে রজ্জু দেখিয়া তাহাতে যেমন আমাদের সর্পভ্রম হয়, সেইরূপ সৃষ্টির বহুত্ব ও বৈচিত্র্যও ভ্রমমাত্র। এই ভ্রম অজ্ঞানপ্রসূত। এই অজ্ঞানই 'অবিদ্যা'। এই সৃষ্টির দৃশ্যমান রূপে জীব যতক্ষণ বিশ্বাস করে ততক্ষণই সে ঈশ্বরকে স্রষ্টারূপে দেখে। কিন্তু যখন তাহার জ্ঞান হয় যে সৃষ্টি প্রাতিভাসিক মাত্র, ইহার প্রকৃত সত্তা নাই, তখন তাহার কাছে ঈশ্বরই সব ও একমাত্র, ইহা ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। যে গুণে যুক্ত হইয়া ঈশ্বর এই প্রাতিভাসিক বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই গুণযুক্ত ঈশ্বর শঙ্করের মতে 'সগুণব্রহ্ম'। আর জগৎকে মিথ্যা (illusion) বলিয়া মনে করিলে যে ঈশ্বর থাকেন তিনিই 'নির্গুণ ব্রহ্ম'।

অবিদ্যা দূরীভূত হইলেই নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান হয়। এইজন্য ইন্দ্রিয়সংযম, অনাসক্তি, জগতের অনিত্যতাবোধ এবং মোক্ষের জন্য উদগ্র কামনা প্রয়োজন। নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান হইলে জীব ও ব্রহ্মের কোনও ভেদ থাকে না। তখনই জীব বলিতে পারে 'সোঽহং' (আমিই ব্রহ্ম)।

৪৮। সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥
—ঋগ্বেদ সংহিতা, ১০. ৯০.১

৪৯। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

সংস্কৃত ভাষার ইতিহাস

ষোড়শ শতকের শেষের দিকে (১৫৮৩-১৫৮৮ খৃষ্টাব্দ) Filippo Sassetti নামে একজন বণিক প্রথম ঘোষণা করেন যে ইউরোপের কয়েকটি প্রধান ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার একটি সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি পাশ্চাত্ত্য জাতির অনুরাগ তখন পর্যন্ত তেমন ছিল না; তাই Filippo Sassetti-র ঐ ঘোষণার প্রতি বিশ্ববাসীর মনোযোগ তখন তত আকৃষ্ট হয় নাই। ইহার প্রায় দুইশত বৎসর পরে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে Sir William Jones তাঁহার স্মরণীয় ভাষণে বিশেষ জোর দিয়া প্রচার করিলেন যে গ্রীক ও লাটিনের সহিত সংস্কৃতের ধাতুগত এবং ব্যাকরণসম্মত এমন সাদৃশ্য আছে যাহা মোটেই উপেক্ষণীয় নহে এবং একজন ভাষাতত্ত্ববিদ স্বীকার না করিয়া পারিবেন না যে ইহারা সকলেই একটি সাধারণ ভাষা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।[১] প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং বিবুধমহলে একটি স্বতন্ত্র বিদ্যারূপে ভাষাতত্ত্বের আলোচনার সূত্রপাত হয়। গ্রীক, লাটিন, গথিক, কেল্‌টিক, সংস্কৃত, পারসিয়ান প্রভৃতি যে সব ভাষার মধ্যে পরস্পরের সহিত এইরূপ সাদৃশ্য দেখা গিয়াছিল, পণ্ডিতগণ সেইগুলিকে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করেন এবং উহার নাম দেন ইন্দো-ইউরোপীয় বা ইন্দো-জার্মানিক। তদবধি ভাষাতত্ত্বের আলোচনার পক্ষে এবং ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির জ্ঞানলাভের পক্ষে সংস্কৃত ভাষার আলোচনা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে।[২]

পৃথিবীর বেশীর ভাগ ভাষাই এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই ভাষাগোষ্ঠীকে নিম্নলিখিত দশটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—

১। আরিয়ান বা ইন্দো-ইরানীয়ান।

২। বল্‌টিক (লিথুয়ানিয়ান, লেটিস, ওল্‌ড্‌ প্রাসিয়ান্‌ (অধুনালুপ্ত) এবং

১। "The Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of wonderful structure, more perfect than Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either; yet bearing to both of them a stronger affinity both in the roots of verbs and the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident; so strong indeed that no philologer could examine them at all without believing them to have sprung from *some common source*, which perhaps no longer exists. There is a similar reason though not quite so forcible, for supposing that both the Gothic and the Celtick, though blended with a different idiom, had the same origin with the Sanskrit, and the Old Persian might be added to the same family."—Sir William Jones' *Address* to Royal Asiatic Society, Bengal in 1786.

২। "The discovery of the historical relationship of the members of the Indo-European family was a direct result of the discovery of the Sanskrit Language and literature by European scholars towards the close of the eighteenth century."—Burrow : *The Sanskrit Language*, p. 6.

স্লাভনিক (রাশিয়ান, পোলিশ, চেক, বুলগারিয়ান প্রভৃতি)। এক কথায় এই ভাষাগুলিকে বলটো-স্লাভনিক বলা হয়।

৩। আর্মেনিয়ান

৪। আলবেনিয়ান

৫। গ্রীক

৬। লাটিন (পর্তুগীজ, রুমানিয়ান, ইটালিয়ান, ফ্রেন্চ, স্প্যানিস প্রভৃতি ইহা হইতে উৎপন্ন)।

৭। কেলটিক

৮। জার্মানিক

৯। তোখারিয়ান

১০। হিটাইটি

ইন্দো-ইউরোপীয়তে 'শত' বুঝাইবার জন্য যে শব্দটি প্রচলিত ছিল তাহার প্রথম অক্ষরটি উপরোক্ত দশটি উপ-গোষ্ঠীর প্রথম চারিটিতে অনেকটা 'স'-এর মত উচ্চারণ এবং শেষ ছয়টিতে অনেকটা 'ক্'-এর মত উচ্চারণ গ্রহণ করিয়াছে। এই উচ্চারণ-বৈষম্যকে অবলম্বন করিয়া ঐ প্রথম চারিটি উপ-গোষ্ঠীকে Satem-group এবং শেষ ছয়টিকে Centum-group বলা হইয়া থাকে।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী পৃথিবীর কোন্ অংশে প্রথমে আবদ্ধ ছিল তাহা লইয়া আলোচনা হইয়াছে। এক সময়ে মনে করা হইত যে মধ্য এসিয়াই ছিল এই ভাষাগোষ্ঠীর আদি বাসভূমি। ঐ ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত অধিকাংশ ভাষাই ইউরোপে প্রচলিত বলিয়া এখন মনে করা হয় যে, ইউরোপই উহার প্রথম বাসভূমি। Burrow-এর মতে Rhine নদীর তীর হইতে মধ্য এবং দক্ষিণ রাশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডেই এই ভাষাগুলি প্রচলিত ছিল এবং তিনি অনুমান করেন যে ইন্দো-ইউরোপীয় হইতে ইন্দো-ইরানীয়ান গোষ্ঠী যে সময়ে পৃথক হইয়া পড়ে, সে সময়ে ঐ অঞ্চলে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী বহুদিন হইতেই অবস্থান করিতেছিল।[৩]

অন্ততঃ তিন হাজার বছর আগে উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে একদল মানুষ আসিয়া ভারতে প্রবেশ করে। তাহাদের ভাষাই বর্তমানে ভারতে প্রচলিত অধিকাংশ ভাষার পূর্বপুরুষ। সেই মানবগোষ্ঠীই 'আর্য' নামে পরিচিত।[৪] এই গোষ্ঠীরই এক অংশ মধ্য এসিয়ায় পড়িয়াছিলেন। কালক্রমে তাঁহারাই মধ্য এসিয়ার এক বিস্তৃত ভূখণ্ড এবং ইরানের এক অংশ অধিকার করিয়া লন। ইঁহাদের যে দলটি ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন তাহাদিগকে 'ইন্দো-আরিয়ান' এবং যে দলটি ইরানে অবস্থান করিতেছিলেন তাঁহাদিগকে 'ইরানীয়ান' বলা হইয়া থাকে। পরস্পরবিচ্ছিন্ন এই গোষ্ঠীদ্বয়কে সম্মিলিতভাবে 'আরিয়ান' বা 'ইন্দো-ইরানীয়ান' বলা হয়। উভয় গোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত সমস্ত ভাষা ও উপভাষাগুলিকে 'আর্য-ভাষা' বলা হয়। এতদ্ব্যতিরিক্ত সব 'ম্লেচ্ছ' ভাষা।

প্রাচীন আর্যজাতির মধ্যে প্রথম ভাঙন ধরে যখন ইন্দো-ইরানীয়ানগণ ইউরোপ

৩। Burrow: *The Sanskrit Language*, p. 11

৪। তুলঃ "Aryan, in scientific language, is utterly inapplicable to race. It means language and nothing but language; and if we speak of Aryan race at all, we should know that it means no more than X+Aryan speech."—Maxmuller: *Collected Works, New Impression*, 1898, Vol. X (The Home of the Aryans), p. 90

হইতে বাহির হইয়া আসেন। ইন্দো-ইরানীয়ানগণ ইউরোপ হইতে ঠিক কোন্ পথে এসিয়ায় প্রবেশ করেন সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। Hirt-এর মতে তাঁহারা ককেশাসের উপর দিয়া ইরান ও পরে সেখান হইতে পঞ্জাবে আসিয়া উপস্থিত হন। Meyer-এর মতে পামীর মালভূমির কোনও এক স্থান হইতে তাঁহারা পূর্বে পঞ্জাব ও পশ্চিমে মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। Oldengerg[৫] ও Keith[৬] Meyer-এর মতেরই সমর্থন করিয়াছেন।

ইরানীয়ান ভাষাগুলির সহিত ইন্দো-আরিয়ান ভাষাগুলির প্রচুর সাদৃশ্য আছে। ইন্দো-আরিয়ান ভাষাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হইল ঋগ্বেদের ভাষা, আর ইরানীয়ান ভাষাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হইল জেন্দ্-অবেস্তার ভাষা। অর্থাৎ, এই দুইটি হইল আর্য ভাষার দুইটি উপ-বিভাগের দুইটি প্রাচীনতম ভাষা। ম্লেচ্ছ ভাষা বলিতে যাহা বুঝি, তাহার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে প্রাচীন Hittite রাজ্যের রাজধানী Anatoliar অন্তর্গত Boghaz-Koi-তে প্রাপ্ত কতকগুলি ফলকে। খৃঃ পূঃ ১৯০০-১২০০ ইহাদের কাল বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন ইহা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় নাই।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে ইন্দো-আরিয়ান ভাষাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হইল ঋগ্বেদের ভাষা এবং ইরানীয়ান ভাষাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হইল জেন্দ্-অবেস্তার ভাষা। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে জেন্দ্-অবেস্তার যাহা প্রাচীনতম অংশ তাহাও ঋগ্বেদের পরে রচিত হইয়াছিল। এই দিক দিয়া আর্য জাতির প্রাচীনতম সাহিত্য হইল ঋগ্বেদ এবং ঋগ্বেদের ভাষাই হইল প্রাচীনতম আর্যভাষা। অবশ্য ভারতবর্ষে আর্যজাতি যেদিন প্রথমে প্রবেশ করে তাহার বহু পরে ঋগ্বেদ রচিত হইয়াছিল এবং এই দীর্ঘকালের মধ্যে আর্যগণের ভাষার নিশ্চয়ই কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। আর্যজাতির ভারত-প্রবেশের সময় হইতে ঋগ্বেদের রচনাকালের ব্যবধান যে কত তাহা সঠিক বলার উপায় না থাকিলেও ইহা ঠিক যে তাহা সামান্য নহে। ঋগ্বেদে এমন কোনও উক্তি নাই যাহা হইতে বুঝা যায় যে, ঋগ্বেদ রচনা করার সময় আর্যগণ তাঁহাদের আদি বাসভূমির কথা কিছুমাত্র মনে রাখিতে পারিয়াছিলেন; বরং তাহার বিপরীতই মনে হয়। ঋগ্বেদে আর্যগণ সপ্তসিন্ধুবিধৌত অঞ্চলকেই নিজেদের বাসভূমি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এইরূপ মনে করিলে কিছুমাত্র অন্যায় হয় না।[৭] যে কালিক ব্যবধান একটা জাতির স্মৃতি হইতে তাহার আদি বাসভূমির কথা সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিতে পারে, তাহা বড় কম হইবার কথা নয়। এই সময়ের মধ্যে একটি ভাষার বহু পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে। সে দিক দিয়া ভারতে প্রবেশের সময় আর্য ভাষার যে রূপ ছিল তাহার কোনও নিদর্শন আমাদের হাতে নাই। যখন বলা হয় যে ঋগ্বেদের ভাষাই আর্য ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন, তখন এইটুকুই বুঝিতে হইবে, ঋগ্বেদের আগে আর্য ভাষার কোন লিখিত রূপ আমাদের হস্তগত হয় নাই।

৫। *JRAS*, 1909 pp. 1095 *ff*.

৬। *Modi Memorial Volume*, 1930, pp. 81 *ff*.

৭। "There is no evidence to show that the Vedic Aryans were foreigners or that they migrated into India within traditional memory. Sufficient literary materials are available to indicate with some degree of certainty, that the Vedic Aryans themselves regarded Sapta-Sindhu as their original home."—*The History and Culture of the Indian People* (Bharatia Itihasa Samity), First Ed. Vol. I, pp. 215-6

ইন্দো-আরিয়ান ভাষাকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যায়—(ক) প্রাচীন, (খ) মধ্য ও (গ) পরবর্তী। প্রাচীন ইন্দো-আরিয়ান ভাষার উদাহরণ হইল সংস্কৃত৮। মধ্য-ইন্দো-আরিয়ানও তিনটি সুনির্দিষ্ট স্তরে বিভক্ত—(ক) পালি সাহিত্যের ভাষা, (খ) জৈন ধর্ম-সাহিত্যের ভাষা (প্রাকৃত) ও (গ) অপভ্রংশ। অপভ্রংশের পর বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার মধ্য দিয়া ইন্দো-আরিয়ান ভাষা পরবর্তী রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণগণ বরাবরই ধর্মশাস্ত্রের ভাষাকে এবং শিক্ষিত শ্রেণীর ভাষাকে সাধারণের কথ্যভাষা হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে শিক্ষিত শ্রেণীর ভাষা জনগণের কথ্যভাষা ছিল না। জনগণের ভাষা যে স্বতন্ত্র খাতে নিজস্বরূপে বহিয়া চলিয়াছিল তাহাই শেষ পর্যন্ত পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশে পরিণতি লাভ করে। জনগণের ভাষার এই রূপ-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঋগ্বেদের সংস্কৃত ভাষার রূপ-বিবর্তন হইতেছিল। পাণিনির ব্যাকরণ রচনার পরেই কেবল সংস্কৃত শৃঙ্খলিত হইয়া পড়ে এবং তাহার পর হইতে আর তাহার ধারায় পূর্বের মত রূপ-বিবর্তন সম্ভব হয় না।৯

বৈদিক সংস্কৃত হইতে পাণিনি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সংস্কৃতের পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের জন্যই সংস্কৃত ভাষাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—(১) Vedic ও (২) Classical. প্রকৃতপক্ষে সূত্র সাহিত্যেই বৈদিক ভাষার ধারা শেষ হইয়া যায় এবং তাহার পরেই ক্লাসিকাল সংস্কৃতের যুগ আরম্ভ হয়। এই দুইটি ভাষার যে বিপুল পার্থক্য তাহাতে দুইটিকে পৃথক বলিয়া মনে করিলে ভুল হয় না এবং এই পার্থক্য বুঝাইবার জন্য প্রথমটিকে 'বৈদিক' (Vedic) এবং দ্বিতীয়টিকে 'সংস্কৃত' (Sanskrit) নাম দেওয়াই সঙ্গত।

বৈদিক ভাষা ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য বিশেষ লক্ষণীয়। ড, ড়, ঢ, ঢ় এবং (কতকগুলি শব্দে) 'র'-স্থলে 'ল' সংস্কৃত ভাষায় আসিয়াছে। বৈদিক ভাষায় দুইটির বেশী পদের সমাস হইত না বলিলেই হয়। সংস্কৃতে সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার করার প্রতি একটি বিশেষ ঝোঁক দেখা গেল। সন্ধি সংস্কৃতের আর একটি নূতন উদ্ভাবন। বহু বৈদিক শব্দের সংস্কৃতে অর্থ-পরিবর্তন ঘটিয়াছে।১০ যে সকল ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দ বৈদিকে প্রচলিত ছিল, সংস্কৃতে তাহারা লুপ্ত হইয়া গেল।১১ বহু বৈদিক শব্দের অর্থ ভুল বুঝিবার জন্য সংস্কৃতে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।১২ বৈদিক ভাষায় উপসর্গের ব্যবহারে কোনও বিশেষ নিয়ম ছিল না। বৈদিকে উপসর্গ ধাতুর পরে বা ধাতু হইতে একাধিক পদের ব্যবধানেও প্রযুক্ত হইত। সংস্কৃতে তাহা ধাতুর অব্যবহিত পূর্বে ধাতুযুক্ত হইয়াই ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ইহা ছাড়া 'শব্দ'রূপে

৮। তুলঃ "The term Old Indo-Aryan is sometimes used as alternative to Sanskrit, but this is incorrect, since there were other dialects of Indo-Aryan in addition to those on which Sanskrit is founded. The term Old Indo-Aryan should be used for the whole body of Indo-Aryan during the early period, and Sanskrit is not co-extensive with this."—Burrow : *The Sanskrit Language*, p. 45

৯। পাণিনির ব্যাকরণকে মানিয়া চলা সত্ত্বেও কিছু কিছু পরিবর্তন সংস্কৃত ভাষায় আসিয়াছে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল স্বর বা Accentuation-এর লোপ। 'গণপাঠে'ও এমন অনেক শব্দ আছে যাহা পরে ক্রমশঃ দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে। লঙ্. লুঙ্. লিট্-এর সূক্ষ্ম পার্থক্যও পরবর্তীকালে ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

১০। বেদে 'বহ্নি' শব্দের অর্থ 'বহনকারী', সংস্কৃতে 'অগ্নি'।

১১। 'আপি' 'অৎক' 'অন্ধস্' প্রভৃতি

১২। বৈদিক ভাষায় 'ক্রতু' (চিন্তা, জ্ঞান); সংস্কৃতে 'ক্রতু' (যজ্ঞ)।

বিশেষ বিশেষ বিভক্তিতেও শব্দের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই সব পরিবর্তন ছাড়াও আরও একরকম পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইন্দো-আঁরিয়ানগণ ভারতবর্ষে আগমন করিবার পূর্বে ভারতবর্ষে যে ভাষাসমূহ প্রচলিত ছিল আর্যগণের ভাষা তাহাদের দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় মূর্ধণ্য বর্ণমালার উৎপত্তি এই প্রভাবেরই ফল। শব্দসম্ভারেও এই প্রভাব দেখা গিয়াছে। Munda এবং Dravida ভাষাগুলির দ্বারাই বিশেষ করিয়া সংস্কৃত প্রভাবিত হইয়াছে। অলাবু, কদলী, কার্পাস, মরীচ, লাঙ্গল, সর্ষপ প্রভৃতি শব্দ মুণ্ডা ভাষার নিকট সংস্কৃতের ঋণই সূচিত করে।[১৩] কাক, কালো, কুন্তল, অনল, অলস, কটু প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত গ্রহণ করিয়াছে দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর নিকট হইতে।

শক্তির পরীক্ষা না দিয়া সংস্কৃত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। মধ্য-ইন্দো-আরিয়ান ভাষাগুলির সহিত সংস্কৃতকে প্রথম দিকে প্রতিযোগিতা করিতে হইয়াছে—বিশেষ করিয়া পালি ও প্রাকৃত ভাষার সহিত। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই পালি ও প্রাকৃত ভাষা যুগপৎ কথ্যভাষারূপে এবং সাহিত্যের ভাষারূপে চলিতে থাকে। ঐ ধর্মের প্রচারকগণের প্রধান লক্ষ্য ছিল ধর্মের মর্মকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা, তাই জনসাধারণের ভাষার মাধ্যমে তাঁহারা যেমন ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন তেমনি ধর্মগ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন।

মৌর্য যুগে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বেশ কোণঠাসা হইয়া পড়িয়াছিল; তাহার সহিত ব্রাহ্মণ্য ভাষা সংস্কৃতও অনেকটা অপাংক্তেয় হইয়া আসিয়াছিল। অশোকও তাঁহার লিপিসমূহে সংস্কৃতকে আমল না দিয়া জনগণের ভাষাকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইভাবে প্রথম দিকে সংস্কৃতকে অবহেলিত হইয়াই টিঁকিয়া থাকিতে হইয়াছে। সংস্কৃতের অভ্যুদয় শুরু হয় যখন অশোকের মৃত্যুর মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর পরে শেষ মৌর্যরাজা বৃহদ্রথের ব্রাহ্মণ সেনাপতি[১৪] পুষ্যমিত্র স্বীয় প্রভুকে নিহত করিয়া রাজশক্তি অধিকার করেন। পুষ্যমিত্রের সহিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ভাষারও অভ্যুদয় হয়। অভ্যুদয়ের প্রথম দিকে প্রাকৃতের সহিত সংস্কৃত পাশাপাশি চলিয়াছিল এবং খোদিত লিপিতেও সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার করা হইয়াছিল।[১৫] প্রথম দিকে মধ্য-ইন্দো-আরিয়ান ভাষাগুলির মধ্যে সাদৃশ্য এত বেশী ছিল যে একটি জানিলে আর একটিকে

১৩। সুনীতিকুমার চ্যাটার্জী তাঁহার "Two New Indo-Aryan Etymologies" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে বাংলায় 'চাউল' শব্দটির মূল মুণ্ডা ভাষা হইতে আসিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ S. K. Chatterjee-র Non-Aryan Elements in Indo-Aryan (*Journal of the Greater India Society III* 42) প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

১৪। পুষ্যমিত্র (খৃঃ পূঃ ১৮৭-১৫১) নিজের বিজয়োৎসবকে স্মরণীয় করিবার জন্য দুইটি অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য ব্রাহ্মণগণের অভিনন্দনও লাভ করিয়াছিলেন। হরিবংশের একটি শ্লোকে পুষ্যমিত্রের কথা বলা হইয়াছে—

ঔদ্ভিজ্জো ভবিতা কশ্চিৎ সেনানী কাশ্যপো দ্বিজঃ।
অশ্বমেধং কলিযুগে পুনঃ প্রত্যাহরিষ্যতি॥—ভবিষ্যপর্ব, ২।৪০

দ্রষ্টব্য ঃ প্রবোধচন্দ্র সেন ঃ **ধর্মবিজয়ী অশোক**, পৃঃ ২৪

তুল ঃ "Though staunch adherents of orthodox Hinduism, Kings of the line of Pushyamitra do not appear to have been as intolerant as some writers represent them to be."—Raychoudhury : *Political History of Ancient India*, p. 389.

১৫। "The inscription of Rudradaman (A. D. 150) marks the victory of Sanskrit in one part of India. In the South Prakrit remained in use longer and was not finally ousted by Sanskrit until the 4th or 5th cent. A.D."—Burrow : *The Sanskrit Language*, p. 58

বুঝিতে অসুবিধা হইত না। অশোক এই কারণেই তাঁহার লিপিসমূহে মধ্য-ইন্দো-আরিয়ানের তিনটি ভাষাকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ স্থানীয় ভাষাগুলির মধ্যে পার্থক্য এত বেশী হইতে লাগিল যে সর্ব ভারতীয় ভাষারূপে সংস্কৃতকে গ্রহণ না করিয়া আর উপায় রহিল না।[১৬] বৌদ্ধগণ এই সময়ে সংস্কৃতকে সাহিত্যের ভাষারূপে অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণ করিয়াছেন। অশ্বঘোষের রচনাবলী তাহার নিদর্শন। ইহার পর হইতে মুসলমান আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষা ভারতে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

১৬। তুলঃ "Any literary language on the basis of a Vernacular repidly became obsolete. The traditional Prakrits in the later period were as artificial as Sanskrit and did not have the advantage of its universal appeal and utility. For such reasons alone Sanskrit was the only form of language which could serve as a national language in ancient India, whose cultural unity, far more influential and important than its political disunity, rendered such a language essential." —*Ibid*, p. 60

পরিশিষ্ট : দুই

পালি

ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকে সম্পূর্ণভাবে জানিতে হইলে যেরূপ সংস্কৃত গ্রন্থাদির জ্ঞান আবশ্যক সেইরূপ পালি ভাষায় লিখিত ত্রিপিটক প্রভৃতির জ্ঞানও প্রয়োজনীয়। পালি ভাষায় রচিত গ্রন্থসকল ভারতের ইতিহাসের অন্ধকারময় যুগের একটি আলোকপাতে অত্যন্ত সহকারী। এ বিষয়ে একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে—"To a student of the ancient history of India, the study of Pāli is as important as that of Sanskrit and the Prakrits and in a sense more important as furnishing reliable date of chronology."

পালি ভাষা বলিতে আমরা কি বুঝি ? মোটামুটি সহজ জবাব এই যে, যে ভাষায় ত্রিপিটক রচিত সেই ভাষাকেই আমরা পালি ভাষা বলিয়া জানি। পালি পদটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে এই শব্দটি প্রথমে বৌদ্ধ-শাস্ত্রের পংক্তি বা মূলশাস্ত্র ত্রিপিটককে বুঝাইত[১], পরে ক্রমে ক্রমে ত্রিপিটকের সহিত সম্বন্ধ, অর্থকথা ও তাহাদের সহিত সম্বন্ধ যে কোন গ্রন্থই পালি শব্দের দ্বারা অভিহিত হইত। পালি ভাষার অপর একটি নাম 'তন্তি ভাষা' (সং—তন্ত্রি বা তন্ত্রী—রজ্জু-সূত্র-যেমন-ব্রহ্মসূত্র)। ইহাকে আবার কখন কখন বলা হয় 'মাগধী নিরুক্তি'। ভগবান বুদ্ধ মগধের লোক বলিয়া তাঁহাকে মাগধ বলা হইত এবং তাঁহার কথিত ভাষা বলিয়া পালি ভাষাকে বলা হইত মাগধী।[২] ইহার অনুকূলে বুদ্ধদেবের নির্দেশস্বরূপ এই বাক্যটি উদ্ধৃত হইয়া থাকে—

'অনুজানামি ভিক্খবে সকায়নিরুত্তিয়া বুদ্ধবচনং পরিয়াপুনিতুং' (চুল্লবগ্‌গ ৫. ৩৩. ১. পৃঃ ১৩৯)।

ইহাতে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন যে প্রচারকার্যের সময় বুদ্ধদেবের 'সকানিরুত্তি' বা নিজ বচন ব্যবহার করা উচিত, কখন 'ছন্দস' অর্থাৎ সংস্কৃতে ইহার অনুবাদ বিধেয় নহে।

পালি একটি মিশ্রিত ভাষা এবং প্রাকৃতের প্রাচীনতম রূপ।[৩] এই ভাষাকে পাণিনির সংস্কৃত হইতে প্রত্যক্ষভাবে আগত বলা চলে না, কারণ ইহার মধ্যে এমন অনেক পদ আছে (স্থাচ্-র বদলে 'স্থান', 'তৈঃ'র বদলে 'তেহি') যাহাতে ইহার বৈদিক সংস্কৃতের সহিত যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। এই ভাষার বিবর্তনে চারিটি স্তর দেখিতে পাই :

১। পালিমত্তং ইধানীতং নত্থি অট্‌ঠ কথা ইধ—অর্থাৎ এখানে পংক্তি বা মূল আনীত হইয়াছে, অর্থকথা (ভাষ্য) আনীত হয় নাই।

২। 'সো চ ভগবা মাগধো মগধে ভবত্তা, সা চ ভাষা মাগধী; মাগধস্‌স তথাগতস্‌সায়ং ভাসাতি চ কত্বা সম্পচ্ছেন্তি পকতিপচ্চয় এঞ্‌এনো বিএঞ্ঞনো'।

৩। "Pāli is an archaic Prākrit." "This is now on the whole a consensus of opinion that Pāli bears the clear stamp of a 'Kuntsprache', i. e. it is a compromise of various dialects."—Geiger : *Pali Literature and Language*.

(১) গাথা (বা পদ্যাংশ); ইহার ভাষা অবিমিশ্র নহে। শুদ্ধ পালি নহে এরূপ অনেক পদ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) পিটকস্থ গদ্যের অংশ; ইহার রূপ অনেকটা শুদ্ধ পালি।

(৩) পিটকোত্তর যুগীয় গ্রন্থের (মিলিন্দ পঞ্হ) ভাষা। এই পর্যায়ে পালি ভাষা আরও ব্যাকরণগত শুদ্ধরূপ লাভ করিয়াছে।

(৪) আরও পরবর্তী কালের পদ্যের ভাষা—ইহার মধ্যেও মিশ্রিত রূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বতঃই প্রশ্ন উঠে, ভারতীয় কোন্ বিশেষ প্রদেশের ভাষা হইল পালি?—এবিষয়ে নানা মুনির নানা মত। Westergaurd ও Kuhn সাহেব পালিকে উজ্জয়িনীর ভাষা বলিয়াছেন, কারণ অশোকের Girnar শিলালিপির ভাষার সহিত ইহার বেশী সাদৃশ্য আছে এবং উজ্জয়িনীর ভাষাই মহিন্দের মাতৃভাষা ছিল বলিয়া বিশ্বাস। Oldenberg ইহাকে কলিঙ্গদেশের ভাষা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বক্তব্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন খণ্ডগিরি শিলালিপির ভাষার সহিত পালি ভাষার সাদৃশ্যের উপর।[৪] এই সমস্ত বিতণ্ডার আলোচনা করিয়া উপসংহারে Geiger সাহেব বলিয়াছেন যে পালি শুদ্ধ মাগধী নয়, কিন্তু মাগধীর উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত কোন কথ্য ভাষা এবং বুদ্ধদেব ইহা নিজে ব্যবহার করিতেন। তিনি বলেন—'I consider it wiser not to hastily reject the tradition altogether but rather to understand it to mean that Pāli was indeed no pure Māgadhi, but was yet a form of the popular speech which was used by Buddha himself. It would appear therefore that Pāli canon represents an effort to reflect the Buddhavacanam in its original form.'[৫] Dr. Keith তাঁহার 'Home of Pāli' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধে অতি সুন্দরভাবে সমস্ত সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—"To sum up the conclusion suggested by our deplorably scanty evidence, we may say that the Buddha's language cannot be definitely ascertained from the records, and it is only by conjecture that we can assert that it was of Kosalan rather than Magadhan type. Similarly it is purely a matter of speculation how far the Kosalan or Old Ardha Magadhi and the Magadhan or Māgadhī corresponded with the Ardha Māgadhī of the Jain texts as we have them and the Māgadhī of the grammarians. In the former case certainly and in the latter probably, we should allow for much dialect mixture in later forms.'[৬]

সিংহলী বৌদ্ধগণের মতে যে বৌদ্ধগ্রন্থ (বচন) তৃতীয় ধর্মাধিবেশনের সময় সম্পাদিত হইয়াছিল এবং যাহা মহিন্দ কর্তৃক সিংহলে প্রচারিত হইয়াছিল এবং বট্টগামনির সময় লিখিত আকার লাভ করিল তাহা আমাদের বর্তমানকালে পরিচিত 'ত্রিপিটক' গ্রন্থ। 'পিটক' শব্দের অর্থ আধার (Basket)। ট্রেন্‌কনার সাহেবের

৪। বিনয়পিটক: Vol I, London 1879, পৃঃ L.

৫। Geiger: *Pāli Literature and Language.*, পৃঃ ৫-৬, Introduction.

৬। *Buddhistic Studies.*, 1931. পৃঃ ৭৪৭ দ্রষ্টব্য।

মতে[৭] পিটক শব্দটির অর্থ পাত্র নহে, কিন্তু ভাবধারা (tradition)। তিনি বুঝাইতে চাহেন যে ঐ গ্রন্থরাজির মাধ্যমে গুরু-শিষ্যপরম্পরায় বুদ্ধনির্দেশিত ভাবধারাসকল প্রকাশিত হইয়াছে। মজ্ঝিমনিকায় গ্রন্থে[৮] 'পিটক সম্প্রদায়' পদের দ্বারা অনুরূপ অর্থই প্রকাশিত হইয়াছে। বুলার সাহেব[৯] কিন্তু পিটক পদটিকে মূল্যবান রত্নাদির আধার অর্থে বুঝাইতে চাহেন। তিপিটক পদের দ্বারা আমরা এই তিনটি পিটককে বুঝিয়া থাকি:

(ক) **বিনয়পিটক** অর্থাৎ ভিক্ষুসংঘের বিশিষ্ট ব্যবহারের নিয়মাবলী সম্পর্কিত গ্রন্থ। ইহাতে সংঘসংক্রান্ত সকল তথ্য, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের আচরণীয় ধর্মাদির বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

(খ) **সুত্তপিটক**—'সুত্ত' শব্দ সংস্কৃত 'সূত্র' পদের পর্যায়বাচক হইলেও সংস্কৃত সূত্রের ন্যায় স্বল্পাক্ষরযুক্ত সূত্রাদিকে না বুঝাইয়া সাধারণভাবে আলোচনা (Discourse, serman) অর্থকে প্রকাশিত করে। এই গ্রন্থে বিভিন্ন কালে বুদ্ধদেব কর্তৃক প্রচারিত দীর্ঘ ও নাতিদীর্ঘ উপদেশসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সুত্তপিটকে পাঁচটি নিকায়[১০] আছে।

(গ) **অভিধম্মপিটক**—অতি সূক্ষ্ম ধর্মের আলোচনা-সংবলিত গ্রন্থ। অভিধম্মপদের 'অভি'[১১] এই অংশটি অতিরেক বা শ্রেষ্ঠ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বুদ্ধঘোষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৌদ্ধস্বীকৃত ধর্ম ও পদার্থনিচয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বা আলোচনা ইহাতে রহিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের বা নীতিকথার মনস্তাত্ত্বিক আলোচনার প্রতি এই গ্রন্থে আলোকপাত করা হইয়াছে।

তিপিটকে[১২] ও অন্যত্র বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের ৯টি বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—(১) সুত্ত (সং—সূত্র—গদ্য উপদেশ), (২) গেয্য—গদ্য-পদ্য মিশ্রিত উপদেশ, (৩) বেয়্যাকরণ (সং—ব্যাকরণ) ব্যাখ্যা ও ভাষ্য, (৪) গাথা—পদ্য, (৫) উদান—নীতিকথা, (৬) ইতিবুত্তক—'ভগবান্ এইভাবে বলিয়াছেন' এইরূপ বাক্য দিয়া আরম্ভ করা নাতিদীর্ঘ ভাষণ, (৭) জাতক—বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনী, (৮) অব্ভুতধম্ম—চমকপ্রদ ঐন্দ্রজালিক কাহিনী, (৯) বেদল্ল—প্রশ্নোত্তর প্রকারে নীতিবাক্য। এইরূপ নব অঙ্গের বিভাগ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, যে সময়ে তিপিটক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল সেই সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীর বৌদ্ধ গ্রন্থ সমাজে প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত গ্রন্থগুলি ধর্মার্জনের উপায় হিসাবে পঠিত হইত। ভিক্ষুদের মধ্যে যাঁহারা সুত্তাদি পাঠে পারদর্শিতা লাভ করিতেন তাঁহাদের বলা হইত 'সুত্তন্তিক', আবার যাঁহারা অভিধম্মে পটু ছিলেন ও পঠন-পাঠনে বড় ছিলেন তাঁহারা 'ধম্মকথিক' নামে অভিহিত হইতেন, বিনয়পিটকে কৃতবিদ্যদের বলা হইত 'বিনয়ধর'। যাহাতে লোকে এই তিপিটককে মনে রাখিতে পারে সেইজন্য ঐগুলি বার বার পাঠ করা হইত এবং যাহাতে মুখস্থ হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা হইত। খ্যাতিমান্ ভিক্ষুদের সম্বন্ধে বলা হইত যে তাঁহারা—'বহুস্সুতা আগতাগমা ধম্মধরা বিনয়ধরা মাতিকাধরা' অর্থাৎ তাঁহারা ঐতিহ্যজ্ঞানযুক্ত ও ধম্ম, বিনয় ও মাতিকাতে নিপুণ। প্রচারিত ধর্মের বা বিনয়ের মধ্যে যাহা আছে তাহার সংক্ষিপ্ত সংস্করণই হইল 'মাতিকা'।

৭। J. P. T. S. 1908, p. 119f.

৮। ৯৫, পৃঃ ১৬৯,

৯। *Indian Studies.*, III. 2nd Ed., p. 86 ff.

১০। সুত্ত সকলের মহাসঙ্কলনকে নিকায় বলা হয়।

১১। সুমঙ্গলবিলাসিনী, পৃঃ ১৮; অথসালিনী, পৃঃ ২।

১২। মজ্ঝিমনিকায়, ২২.

অধ্যাপক ভিন্টারনিৎস্‌জ শিলালিপি ও স্তূপ চৈত্য বিহার প্রভৃতির অঙ্কন ও চিত্রাদি হইতে লব্ধ তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে খৃষ্ট-জন্মের দুই শত বৎসর পূর্বে পিটক বলিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থ ছিল ও তাহার নিকায় রূপ বিভাগ ছিল।[১৩]

বিনয়পিটক

বৌদ্ধগণ পালিগ্রন্থের মধ্যে বিনয়পিটককে শীর্ষে স্থান দান করেন। এই পিটকে নিম্নলিখিত অংশগুলি আছে—

১। সুত্তবিভঙ্গ—ইহার মধ্যে আবার দুইভাগঃ (ক) মহাবিভঙ্গ (খ) ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ।

২। খন্ধকা—ইহার মধ্যে আছেঃ (ক) মহাবগ্‌গ (খ) চুল্লবগ্‌গ।

৩। পরিবার বা পরিবার পাঠ।

বিনয়পিটকের সার হইল পাটিমোক্ষ। পাটিমোক্ষ শব্দটির অর্থ মোটামুটি হইল 'অবশ্য পালনীয় ধর্ম' ('that which should be made binding ; a promise to be redeemed.'); ভিক্ষুদের আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কতকগুলি বিধিনিষেধ ইহাতে আছে এবং ইহা লঙ্ঘিত হইলে তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্তের বন্দোবস্ত বিহিত আছে। ভগবান বুদ্ধের অবর্তমানেও ভিক্ষুসঙ্ঘ টিকিয়া থাকিতে পারিত কেবলমাত্র এইজন্য যে ভিক্ষুদের জন্য শাস্তা বিধান করিয়াছিলেন 'সিক্‌খাপদ' ও 'পাটিমোক্‌খ'। উত্তম ভিক্ষু সম্বন্ধে এই বিশেষণই প্রযুক্ত হইত যে তাহার জীবন —'পাটিমোক্‌খসংবরসংবুতো' অর্থাৎ পাটিমোক্ষের বিধিনিষেধ নিয়ন্ত্রিত। পাটি-মোক্ষের নিয়মগুলি অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে প্রতিমাসে পঠিত হইত এবং পাঠের পর ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রশ্ন করা হইত যে তাহাদের মধ্যে কেহ কোন অপরাধে লিপ্ত হইয়াছেন কিনা। বুদ্ধদেব বোধহয় তাঁহার পূর্ববর্তী অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে এই সুন্দর পদ্ধতিটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠানটির বিশিষ্ট নাম হইল 'উপোসথ' (সং—উপবসথ—উপবাস। স্মরণাতীত কাল হইতে ব্রাহ্মণগণ পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে উপবাস করিয়া যাগযজ্ঞ ধর্মকথাদির দ্বারা কাল যাপন করিতেন)।

পাটিমোক্‌খ গ্রন্থের মধ্যে আছে কতকগুলি অপরাধ বা বিধি লঙ্ঘনের পরিচয়, যাহা ভিক্ষুগণ কর্তৃক স্বীকার করিতে হইত এবং যাহার প্রায়শ্চিত্ত করা যাইত। ইহাতে ১০টি প্রকরণ আছে—১। পুচ্ছাবিস্‌সজ্জনং ২। নিদানং ৩। পারাজিকা ৪। সঙ্ঘাদিসেসা। ৫। অনিয়তাধম্মা। ৬। নিস্‌সগ্‌গিয়া পাচিত্তিয়া ধম্মা।

১৩। "From all this, it follows that some time before the 2nd Century B.C. there was already a collection of Buddhist texts, which was called 'Pitakas' and was divided into five 'Nikāyas' that these were 'Suttas' in which the 'Dhamma', the religion of Buddha, was preached, that some of these Suttas agreed with those contained in our Tipitaka, and that 'Jātakas' of exactly the same kind as those contained in the Tipitaka, already belonged to the stock of Buddhist literature—in short, that at some period prior to the 2nd Century B.C. probably as early as at the time of Asoka or a little later, there was a Buddhist canon which if not entirely identical with our Pāli canon, resembled it very closely."

—*History of Indian Literature*, Vol. II (1933). পৃঃ ১৭-১৮

৭। পাচিত্তিয়া ধম্মা। ৮। পটিদেসনীয়া ধম্মা। ৯। সেখিয়া ধম্মা ১০। অধিকরণসমথা ধম্মা। পাটিমোক্‌খের মধ্যে আছে ২২৭টি অনুচ্ছেদ; তিব্বতীয় গ্রন্থে কিন্তু ২৫৩, ও চীনদেশীয় গ্রন্থে ২৫০। অপরাধগুলিকে আবার সাধারণভাবে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—ভিক্ষুদের জন্য যাহা প্রযোজ্য তাহার নাম—ভিক্ষুপাটিমোক্‌খ এবং ভিক্ষুণীদের জন্য যাহা তাহার নাম ভিক্ষুণীপাটিমোক্‌খ।

সুত্তবিভঙ্গ পদের অর্থ সুত্তের (সং—সূত্র) ব্যাখ্যা। Rhys Davids সাহেব এই খণ্ডের পরিচয়দান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ—'tells us firstly how and when and why the particular rule in question came to be laid down. This historical introduction always closes with the words of the rule in full. Then follows a very ancient word for word commentary....The passages when made accessible to Western scholars, must be of the greatest interest to students of the history of law, as they are quite the oldest documents of that particular kind in the world.' পাটিমোক্‌খের প্রত্যেকটি সূত্রের ব্যাখ্যা সুত্তবিভঙ্গে আছে।

খন্ধকা (অনুচ্ছেদ—section)—ইহাতে আছে সঙ্ঘের গঠনপ্রণালী ও ভিক্ষুদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিবরণ। ইহা সুত্তবিভঙ্গ গ্রন্থেরই বিস্তৃততর অংশ। ইহার দুইটি অংশ—মহাবগ্‌গ ও চুল্লবগ্‌গ। মহাবগ্‌গের (বা বড় ভাগ) প্রথম পরিচ্ছেদে গৌতমের বোধিলাভ ও ধর্মপ্রচারের কাহিনী লিপিবন্ধ আছে অতি প্রাচীন অব্যাকরণ-সম্মত পালি ভাষায়। ইহার মধ্যে মুখ্যতঃ আছে সঙ্ঘের নিয়মাবলী, উপোসথ অনুষ্ঠানের বিবরণ, বর্ষাকালীন ভিক্ষুসঙ্ঘের অনুষ্ঠেয় কার্যনিচয় (পবারণা)। এই গ্রন্থে বিশেষ ভাবে আছে কতকগুলি রোগের উপশমকল্পে ঔষধের ব্যবস্থা। Rhys Davids সাহেব বলেন— 'We obtain quite incidentally, a very fair insight into a good deal of the medical lore current at that period in the valley of the Ganges.' এই গ্রন্থের মধ্যে আমরা একখানা ব্যাখ্যাগ্রন্থের উল্লেখ পাই, যে গ্রন্থখানার উপর সুত্তবিভঙ্গ গ্রন্থের ভিত্তি। মহাবগ্‌গ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে ইহার মধ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘের ক্রমিক ইতিহাস থাকিলেও বুদ্ধদেবের জীবন সম্পর্কিত কাহিনী অতি কম।

চুল্লবগ্‌গ—ইহা সংক্ষিপ্তাকার গ্রন্থ। ইহাতে আছে ১২টি খণ্ড। বুদ্ধ ও তাঁহার সঙ্ঘ সম্পর্কিত কাহিনী ইহাতে লিপিবন্ধ আছে। ইহার দশম খণ্ডে ভিক্ষুণীদের কর্তব্য বিষয়গুলি নিহিত আছে। একাদশ ও দ্বাদশ খণ্ডে যথাক্রমে রাজগৃহ ও বেসালীতে অনুষ্ঠিত প্রথম ও দ্বিতীয় বৌদ্ধধর্মাধিবেশন সম্পর্কীয় তথ্যাদি পাওয়া যায়। তবে সম্ভবতঃ এই অংশ প্রক্ষিপ্ত।

পরিবার—বিনয়পিটকের শেষ গ্রন্থ। ইহা বিনয় গ্রন্থের অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা বা নিবন্ধস্বরূপ এবং ইহাতে ১৯টি অধ্যায় আছে। ইহা একটু পরবর্তীকালের এবং মনে হয় ইহা কোন সিংহলীয় ভিক্ষুর কীর্তি। পরিবার পাঠের শেষের দিকে কতকগুলি অংশ আছে যাহার সম্বন্ধে Rhys Davids সাহেব বলেন—'It is a very interesting bit of evidence on early methods of educations.' ইহাতে আছে ১৯টি অংশ, ইহাতে আছে আলোচনা, পরিশিষ্ট, ব্যাখ্যা প্রভৃতি এবং ইহা অনেকটা বেদের অনুক্রমণী ও পরিশিষ্টের স্বরূপ। ইহার অনেকটাই প্রশ্নোত্তরস্বরূপে আছে এবং ইহাকে অভিধম্মপিটকের সহিত তুলনা করা চলে।

সুত্তপিটক

বিনয়পিটক যেমন বৌদ্ধসঙ্ঘের তথ্যাদি জানিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, সেইরূপ সুত্তপিটক বৌদ্ধ ধর্ম ও বুদ্ধের প্রাচীন শিষ্যাদি সম্পর্কে জানার পক্ষে নির্ভরযোগ্য উৎস। বর্ণনা, কথোপকথন প্রভৃতির মধ্য দিয়া এই সুত্তপিটক গ্রন্থ পালি সাহিত্যের কাব্যমূল্যের পরিচয় দান করে।

সুত্তপিটক পাঁচটি নিকায়ে (নিকায় শব্দের অর্থ সংকলন, collection) বিভক্ত—
১। দীঘনিকায় ২। মজ্ঝিমনিকায় ৩। সংযুত্তনিকায় ৪। অঙ্গুত্তরনিকায় ৫। খুদ্দকনিকায়।

ইহাদের মধ্যে পঞ্চমটির অর্থাৎ খুদ্দকনিকায়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত পনেরটি গ্রন্থ—
১। খুদ্দকপাঠ ২। ধম্মপদ ৩। উদান ৪। ইতিবুত্তক ৫। সুত্তনিপাত ৬। বিমানবত্থু ৭। পেতবত্থু ৮। থেরগাথা ৯। থেরীগাথা ১০। জাতক ১১। নিদ্দেস ১২। পটিসম্ভিদানমগ্গ ১৩। অপদান ১৪। বুদ্ধ বংস ১৫। চরিয়াপিটক।

প্রথম চারিটি নিকায়ের বিষয়বস্তু আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে, হয় ইহারা বুদ্ধদেবের বাণী (speeches) যাহাতে আছে কবে, কোথায় ও কখন ইহা তিনি প্রচার করিয়াছেন, নতুবা ইহারা ইতিহাস-সংবাদ শ্রেণীর (কথোপকথনস্বরূপ)। এই সব গ্রন্থ বেশির ভাগ গদ্যে লিখিত, তবে মাঝে মাঝে গাথাও দেখিতে পাওয়া যায়।

দীঘনিকায়—সুত্তপিটকের প্রথম গ্রন্থ। ইহাতে আছে অতি দীর্ঘ ৩৪টি সুত্ত। ইহাদের প্রকৃতিগত ভেদও আছে;—কতকগুলি কেবলমাত্র গদ্যে লিখিত, আবার কতকগুলি গদ্য ও গাথার সংমিশ্রণাত্মক রূপে। ইহার তিনটি অংশ—শীলখ্খন্ধ, মহাবগ্গ ও পাথেয় বা পাটিকবগ্গ। ইহার প্রথম খণ্ডের অধিকাংশ সুত্তের মধ্যে আমরা আলোচনা দেখি নীতি, শীল, সমাধি, বা প্রজ্ঞাবিষয়ক। বুদ্ধদেবের সমকালীন বা পূর্বকালীন ধর্মমত জানিবার পক্ষে 'ব্রহ্মজালসুত্ত' নামক প্রথম সুত্তটি অতি প্রয়োজনীয়। ইহাতে কমপক্ষে ৬২টি দার্শনিক মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। সামঞ্ঞফলসুত্ত ইহার দ্বিতীয় সুত্ত। বুদ্ধদেবের সমকালীন প্রাচীন ভারতীয় জীবন ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে এই সুত্তের অবদান অতুলনীয়। ইহার ১৬নং সুত্তের নাম মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত। এই সুত্ত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—'It is neither a dialogue nor a speech on one or more chief points of doctrine, but a continuous record of the latter part of Buddha's life, his last speeches and sayings and his death.' ইহার ষষ্ঠ অংশে আমরা দেখিতে পাই বুদ্ধদেবের জীবনাবসানের দৃশ্য। তথাগতের শেষ বাণী আমরা এখানে পাইয়া থাকি—'যে কোন সংস্কৃত পদার্থ (জন্য পদার্থ) ব্যয়শীল, অতএব অপ্রমাদের সহিত মুক্তির জন্য চেষ্টা করা উচিত—[বয়ধম্ম সংখারা অপ্পমাদেন সম্পাদেথাতি][১৪]

মজ্ঝিমনিকায়—ইহা সুত্তপিটকের দ্বিতীয় গ্রন্থ। ইহার নাম হইতেই বুঝা যায় যে এই গ্রন্থের সুত্তগুলি আকৃতিতে খুবই দীর্ঘ নয়। ইহার মধ্যে আছে ১৫০টি বাণী ও উপদেশ। দীঘনিকায়ের সুত্তগুলিতে যাহা আলোচিত হইয়াছে তদপেক্ষা অধিক বিষয়ের আলোচনা এই গ্রন্থের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। উপদেশগুলি এস্থলে প্রায়ই উপমাদি প্রয়োগের মাধ্যমে মনোরম হইয়া উঠিয়াছে। ডঃ বিমলা চরণ লাহা এই সুত্ত সম্পর্কে বলিয়াছেন—'The Suttas of this Nikāya throw light not

১৪। *Digha Nikaya* P. I. S. Vol. II. পৃঃ ১৫৬

only on the life of Buddhist monks but also on such subjects as Brāhmaṇa sacrifices, various forms of asceticism, the relation of the Buddha to the Jainas and the social and political conditions prevailing at the time.'[১৫]

মজ্ঝিমনিকায়ের প্রথম সুত্ত হইল মূলপরিয়ায় সুত্ত। বলা হয় যে এই সুত্তটি বৌদ্ধ ধর্মদেশনার মুখ্য (সব্বধম্ম মূল পরিয়ায়)। ইহার মধ্যে বুদ্ধদেব সমসাময়িক দার্শনিক মতসকল পর্যালোচনা করিয়া, স্বপ্রণীত ধর্মমতের সহিত ইহাদের ভেদ কোথায় তাহা দেখাইয়াছেন। এই সুত্তের মধ্যে আত্মবাদ আলোচিত হইয়াছে। নির্বাণ সম্বন্ধে একটি সুন্দর আলোচনা ইহাতে পাওয়া যায়। সময়ের দিক হইতে বিচার করিলে একটি সুত্ত ও অন্য সুত্তের মধ্যে ব্যবধান অনেক। মজ্ঝিমনিকায়ের কোন সুত্তে বুদ্ধদেবের পরিচয় পাই মানুষ হিসাবে, জনকল্যাণের জন্য উপদেশক হিসাবে, আবার ঐ গ্রন্থেরই অন্য সুত্তে তাঁহাকে দেখি যে তিনি অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার অধিকারী ও দেবোপম।

সংযুত্তনিকায়—সুত্তপিটকের তৃতীয় গ্রন্থের নাম সংযুত্তনিকায় (the collection of grouped Discourses)—সংযুত্ত শব্দের অর্থ শ্রেণী বা group ; ইহাতে আছে ৫৬ সুত্তের সংযুত্ত। মনস্তাত্ত্বিক, নীতিগত বা দার্শনিক ভিত্তির উপর এই গ্রন্থের সুত্তগুলি বর্গীকৃত হইয়াছে। বিষয় অনুসারে সুত্তের নামকরণ বা বিভাগ পুরাপুরিভাবে এখানে হয় নাই। এই ৫৬টি সংযুত্ত আবার ৫টি বগ্‌গে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে প্রথম বগ্‌গে নীতি ও বুদ্ধদেবের জীবন সম্পর্কীয় আলোচনাই মুখ্য, অন্যান্য বগ্‌গে কিন্তু দার্শনিকতার অংশই প্রধান। প্রথম বগ্‌গে আমরা কতকগুলি গাথার সহিত পরিচিত হই। এই গাথাগুলির কাব্যসম্পদ অনস্বীকার্য।

অঙ্গুত্তরনিকায়—সুত্তপিটকের চতুর্থ গ্রন্থ। ইহার অপর নাম 'একুত্তর' (সং—একোত্তর) নিকায়। এই গ্রন্থে উপদেশনিচয় (sermons) সংখ্যাগতভাবে সাজান হইয়াছে। ইহাতে ২৩০৮টি সুত্ত ১১টি নিপাতে সজ্জিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপে দেখান যাইতে পারে যে 'তিক নিপাতে' যাহাই বলা হইয়াছে তাহাই তিন সংখ্যাকে নির্ভর করিয়া—যেমন তিন রকমের ভিক্ষু (১। যাহাদের কোন আকাঙ্ক্ষা নাই ২। যাহাদের কিছু আকাঙ্ক্ষা আছে ৩। যাহারা সর্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষা হইতে মুক্ত)। প্রতিটি নিপাত আবার বিভিন্ন বগ্‌গে বিভক্ত।

এই গ্রন্থের সুত্তগুলি পর্যালোচনা করিয়া মনে হয় যে অন্যান্য নিকায়ের তুলনায় অঙ্গুত্তরনিকায়টি অর্বাচীন। ইহার মধ্যে বুদ্ধদেবের যে রূপের সহিত আমরা পরিচিত হই, তাহাতে তিনি দেবতা পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছেন। অশোকের ভাব্রু অনুশাসনে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে (ভগবান বুদ্ধ যাহাই বলিয়াছেন সেই সকলই সুভাষিত); দিব্যাবদানে যাহা বলা হইয়াছে (আকাশ স্বর্গ হইতে ভূপতিত হইতে পারে, সমুদ্র শুকাইয়া যাইতে পারে কিন্তু বুদ্ধ কখন অনৃত ভাষণ করিবেন না), সেই সুরই এই গ্রন্থে ধ্বনিত দেখিতে পাই।

Winternitz সাহেব তাই বলেন—'With this dogmatism the Aṅguttaranikāya is only a forerunner of the Abhidhammapiṭaka, for the texts of which it probably formed the foundation.'

চারিটি নিকায়ের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ সম্পর্কে বলিতে পারা যায় যে কতকগুলি সুত্ত একাধিক নিকায়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই কোন্ নিকায়ের মধ্যে ইহা আগে ছিল তাহা বলা অত্যন্ত কঠিন। দীঘনিকায়ের কতকগুলি সুত্ত দেখিয়া

১৫। *A History of Pali Literature*, Vol. I. পৃঃ ১১৬

মনে হয় যে কোন ক্ষুদ্রাকার সুত্তের উপর ভিত্তি করিয়া ইহারা দীর্ঘাবয়ব লাভ করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে 'মজ্ঝিমনিকায়ে'র সতিপট্ঠান সুত্তের দীর্ঘ সংস্করণই হইল দীঘনিকায়ের মহাসতিপট্ঠান সুত্ত। সুত্তগুলির মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে একই কথা বার বার উচ্চারিত হইয়াছে। ইহাদের আসল উদ্দেশ্য বোধ হয় ছিল বার বার উচ্চারণের মাধ্যমে স্মৃতিতে গ্রথিত করিয়া রাখা।[১৬] নিকায়গুলির আর একটি স্বরূপ বা প্রকৃতি হইল দীর্ঘ ভাষণের পাশাপাশি পরিমিত বাক্য ব্যবহারে উপদেশ দান। মনে হয় এই সমস্ত অংশই নিকায়গুলির প্রাচীন রূপ। ভাষা ও প্রয়োগের দিক হইতে বিচার করিলে নিকায়গুলির মধ্যে পরস্পর কোন ভেদ আছে বলিয়া মনে হয় না। Anesaki সাহেব অঙ্গুত্তরনিকায়কে অন্যান্য নিকায়ের সহিত তুলনায় একটু অর্বাচীন বলিয়া বিচার করিয়াছেন।[১৭] Franke ও Eliot[১৮] সাহেব দীঘনিকায়কে প্রাচীনতম বলিয়া মনে করেন। কিন্তু Winternitz সাহেব এই মতকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে—'There is even less foundation for assuming the Díghanikāya to be 'the earliest accessible source' of Buddhist writing.'

সাহিত্যিক মূল্যের দিক দিয়া আলোচনা করিলে আমরা দেখিব যে নিকায় চারিটি প্রায় একই উপাদানে গঠিত। ইহার মধ্যে আমরা পাই বুদ্ধদেব কি করিয়া কোন্ সূত্রে কোন ব্রাহ্মণ বা অন্য ধর্মীয় পণ্ডিতের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে উপমা প্রয়োগ বা কাহিনী বিন্যাসের মাধ্যমে নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ভারতীয় দার্শনিকদের আলোচনার রীতি অবলম্বন করিয়া তিনি পূর্বে বিরোধী পক্ষের মত স্থাপন করিয়া পরে যুক্তিতর্কের দ্বারা তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। অনেকে বুদ্ধের উপদেশাত্মক ভাষণকে গ্রীক দার্শনিক Plato-র ভাষণের সহিত তুলনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু Winternitz সাহেব এ বিষয়ে বলেন—'Even the best real dialogues in the Nikāyas will rarely remind us of the dialogues of Plato, but very often indeed of the dialogues of the Upaniṣads and the Itihāsa dialogues with which we became acquainted in the Mahābhārata.'

খুদ্দকনিকায়—সুত্তপিটকের পঞ্চম অংশ হইল খুদ্দকনিকায়। খুদ্দক শব্দটির সংস্কৃত প্রতিশব্দ হইল 'ক্ষুদ্রক'। তাহা হইলে ইহার অর্থ দাঁড়ায় ক্ষুদ্র গ্রন্থের সংকলন (collection of smaller pieces)। অনেক সময় ইহাকে অভিধম্মপিটকেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা বিভিন্ন বিষয়ের সংকলন (collection of miscellanies)। ইহার কতক অংশ প্রাচীন। আবার কতকগুলি অতি অর্বাচীন; পরে ক্রমশঃ ইহারা এই নিকায়ে সংযোজিত হইয়াছে। এই নিকায়ের প্রায় প্রতিটি অংশের সাহিত্যিক মূল্য অন্যান্য নিকায় অপেক্ষা অধিক। ইহা প্রধানতঃ পদ্যে লিখিত এবং বৌদ্ধ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য পদ্যাংশ এই নিকায়ের অন্তর্গত।

১৬। "The peculiarity of almost all these Suttas, which is so unpleasant to the Westerners, namely the repetitions, so frequent as to become nauseous, proves that they were originally intended only for oral presentation'—*History of Indian Literature*, Vol. II. পৃঃ ৬৮।

১৭। *Transactions of the Asiatic Society of Japan*, Vol. 35, 1908, Part II. পৃঃ ৮।

১৮। "Taken as a whole it is perhaps the most profound and impassioned of all the Nikayas and also the oldest."—Eliot I. পৃঃ ২৮৭

এই নিকায়ের একটি উল্লেখযোগ্য সূত্তের মধ্যে আমরা বৌদ্ধধর্মের ভাবী বিপদের কাহিনী অবগত হইয়া থাকি। তাহাতে বলা হইয়াছে যে ভবিষ্যতে ভিক্ষুগণ আর তথাগতের বাণী শ্রবণ ও অনুশীলন করিতে যত্নশীল হইবেন না; তাহারা কেবল মনোরম পদাবিন্যাসযুক্ত কথাদি পাঠে আত্মনিয়োগ করিবে। এই স্থানেই আমরা শূন্যতা সম্বন্ধে আলোচনা লক্ষ্য করি এবং এই শূন্যতাই পরবর্তীকালে মহাযানী বৌদ্ধদের প্রধান আলোচ্য দার্শনিক তথ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

বুদ্ধঘোষের মতে এই নিকায়ের যে পনেরটি বিভাগ আছে তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহা ছাড়াও বর্মা দেশের বৌদ্ধগণ আরও চারিখানি গ্রন্থকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করেন—১। মিলিন্দপঞ্‌হ, ২। সুত্তসংগহ, ৩। পেটকোপদেস, ৪। নেত্তি।[১৯]

ঐ পনেরখানি গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

খুদ্দকপাঠ—(ক্ষুদ্র পাঠ অর্থাৎ পাঠ করিবার জন্য ক্ষুদ্র গ্রন্থ)। ইহাতে নয়খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থের সঙ্কলন আছে এবং নবীন শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহার জ্ঞান একান্ত আবশ্যক। ইহার ব্যাখ্যা হইতে জানিতে পারা যায় যে এই গ্রন্থের প্রথম চারিটি অংশ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বলিয়া ইহার নাম খুদ্দকপাঠ হইয়াছে। গ্রন্থটি অতি সংক্ষিপ্ত এবং সুপরিচিত 'বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধর্মং সরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি' (অর্থাৎ আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ অর্থাৎ আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি) অংশটি ইহার আদিভূত। ইহার দ্বিতীয় গ্রন্থে আছে দশ শীলের কথা (the tenfold course)। তৃতীয় গ্রন্থে—শরীরের বত্রিশটি অংশের কথা; চতুর্থে—শিক্ষার্থীর প্রশ্নের কথা (the question of the novice); পঞ্চমে—মঙ্গলসুত্ত (অর্থাৎ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অবশ্যপাঠ্য গাথা-সমূহ); ষষ্ঠে—রতনসুত্ত। ইহার সাহিত্যিক মূল্য অনস্বীকার্য। তাই বলা হইয়াছে—"This sutta is one of the finest lyrics in early Pāli poetry, a charming hymn of praise of the Buddhist holy Triad, recited to ward off danger and secure prosperity." নয়টি সুত্তের মধ্যে প্রথম সাতটি এখনও সিংহলী বৌদ্ধদের 'পরিত্তা' বা 'পিরিত'[২০] অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

খুদ্দকপাঠের মধ্যে নিব্বাণের সম্পর্কে খুব বেশী আলোচনা নাই। রতনসুত্তে নিব্বাণের পরিবর্তে অমতং (অমৃতম্) ব্যবহৃত হইয়াছে (তে পত্তিপত্তা অমতং বিগয়হ)। মেত্তসুত্তে ইহাকে 'সন্তং পদং' (শান্তং পদং) বলা হইয়াছে—(করণীয়ং অত্থকুসলেন যং তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ...প্রভৃতি)।

মনে হয়, শিক্ষার্থীর প্রশ্ন অংশটি বিনয় হইতে গৃহীত। মঙ্গলসুত্ত, রতনসুত্ত ও করণীয় মেত্তসুত্ত খুদ্দকনিকায়ের সুত্তনিপাতের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

এই গ্রন্থের সঙ্কলনের কাল সম্পর্কে বলা হইয়াছে—'As regards the date

১৯। Mabel H. Bode: *Pali Literature of Burma*, Londn 1909, পৃঃ ৪।

শ্যামদেশীয় পালি পিটকের মধ্যে খুদ্দকনিকায়ের আটখানা গ্রন্থের নামই পাওয়া যায় না এবং ইহাতে মনে হয় খুদ্দকনিকায়ের প্রাচীন ও অর্বাচীন অংশ আছে এবং পূর্বে ও পরে ইহাতে একাধিক গ্রন্থের যোগ হইয়াছে। Winternitz-এর *History of Indian Literature*, Vol. II. পৃঃ ৭৭ দ্রষ্টব্য।

২০। 'পরিত্তা' শব্দের অর্থ ভূত-প্রেতাদি বিঘ্নকারকদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া। প্রতিটি মাঙ্গলিক কাজে বিশেষতঃ নবগৃহপ্রবেশাদি ব্যাপারে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

of the work, it appears to have been compiled even after the first commitment of the canon to writing in the 1st cen. B.C.'[২১]

ধম্মপদ—খুদ্দকনিকায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ হইল ধম্মপদ। 'ধম্মপদ' পদটির প্রকৃত কি অর্থ তাহা লইয়া পণ্ডিতগণ বিবাদ করিয়াছেন।[২২] তবে মনে হয় ইহা ধর্মসংক্রান্ত পদ বা পদ্যের সমষ্টি এই অর্থেই ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

বৌদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে এই গ্রন্থখানি সর্বাপেক্ষা অধিক সমাদৃত। সিংহলে এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ অভ্যাস না থাকিলে কাহাকেও উপসম্পদ-দান করা হয় না। কাজেই সেখানে এমন কোন ভিক্ষু নাই যিনি আদ্যন্ত এই গ্রন্থখানিকে মুখস্থ না বলিতে পারেন। বুদ্ধদেবের সুন্দর উপদেশগুলি পদ্যাকারে এই গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে আছে মোট ৪২৩টি পদ্য। ইহাদের মধ্যে ১০ হইতে ২০টি পদ্য লইয়া এক একটি বগ্‌গ (বর্গ—অধ্যায়) গঠিত করা হইয়াছে এবং ঐ বগ্‌গে সমভাবের পদ্যসকল অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। মনে হয় সম্পাদক গ্রন্থখানি সম্পাদনা করিবার সময় এইরূপ বাছিয়া বাছিয়া সমার্থক পদ্যাংশগুলিকে বর্গের অন্তর্গত করিয়াছেন। এইরূপ ২৬টি বগ্‌গে ধম্মপদ বিভক্ত। ধম্মপদের অনেকগুলি পদ্য পালি তিপিটকের অন্যত্র দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে মনে হয় সম্পাদক ঐ সকল তিপিটক হইতে তুলিয়া লইয়া অর্থানুসারে ধম্মপদের মধ্যে সাজাইয়া দিয়াছেন।[২৩] ইহার মধ্যে এমন অনেক পদ্য আছে যাহা ভাবে ও ভাষায় ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত পদ্যাংশের অনুরূপ। যেমন—

পুপ্‌ফানি হ এব পচিনন্তং ব্যাসত্তমনসং নরং।
সুত্তং গামং মহোঘোব মচ্চু আদায় গচ্ছতি॥

পুপ্‌ফবগ্‌গের এই শ্লোকটি মহাভারতের শান্তিপর্বের নিম্নোক্ত শ্লোকের অনুরূপ—

পুষ্পাণীব বিচিন্বন্তমন্যত্র গতমনসম্।
অনবাপ্তেষু কামেষু মৃত্যুরভ্যেতি মানবম্॥

ইহার দ্বিতীয় বগ্‌গে (অপ্পমাদবগ্‌গে) বলা হইয়াছে যে অপ্রমাদের ফলে মানব অমরত্ব লাভ করিতে পারে—

'অপ্পমাদো অমতং পদং পমাদো মচ্চুনো পদং।'

তৃতীয় অর্থাৎ চিত্তবগ্‌গে চিত্তের দমনীয়তার কথা বলা হইয়াছেঃ

'চিত্তং দন্তং সুখাবহং'

দশমে (দণ্ডবগ্‌গে) নিজের মত সকল প্রাণীকে দেখিবার কথা বলা হইয়াছে—

'অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয় ন ঘাতয়ে'।[২৪]

দ্বাদশ অধ্যায়ে অত্তবগ্‌গে যে বলা হইয়াছে, আত্মাই আত্মার প্রভু (অত্তা হি অত্তনো নাথো, কোহি নাথো পরো সিয়া?) তাহা গীতার বচনের অনুরূপ—

'আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥'

বিভিন্ন স্থল হইতে ধম্মপদের পদ্যগুলি আহৃত হইয়াছে, কিন্তু কোথাও আহরণ-কর্তার নামোল্লেখ পাওয়া যায় না। ছন্দের মধ্যে 'অনুষ্টুপ' আর 'ত্রিষ্টুপ' ব্যবহৃত

২১। B. C. Law: *A History of Pali Literature*, Vol. I, পৃঃ ১৯৯ দ্রষ্টব্য।

২২। ইহার নানা ব্যাখ্যা—'Footsteps of Religion', 'Path of Religion', 'Path of virtue', 'Sentences of religion'.

২৩। Rhys Davids--এর *J. R. A. S.* ১৯০০, ৫৫৯ পৃঃ, প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২৪। ইহার অনুরূপ শ্লোক আমরা হিতোপদেশে দেখিতে পাই—

প্রাণা যথাত্মনোভিষ্টা ভূতানামপি তে তথা।
আত্মৌপম্যেন ভূতেষু দয়াং কুর্বন্তি সাধবঃ॥

হইয়াছে। পদ্যগুলি সুখপাঠ্য ও নীতিবাক্যগুলি মধুর সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থের পাঁচটি সংস্করণ পাওয়া গিয়াছে। ১। পালি ভাষায় ২। প্রাকৃত ভাষায় ৩। মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় ৪। সংস্কৃত ভাষায় ৫। চীনা ভাষায়—Samuel Beal সাহেব ইহার অনুবাদ করিয়াছেন ইংরাজীতে।

উদান—খুদ্দক নিকায়ের তৃতীয় গ্রন্থ হইল উদান। ছোট ছোট সংক্ষিপ্ত ভাষণের ইহা সমষ্টি। ইহাতে বহু কাহিনী নিবন্ধ আছে। ইহা আটটি বগ্‌গ বা অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রতিটি বগ্‌গে ১০টি করিয়া সুত্ত আছে। এই উদানে বুদ্ধদেবের জীবনী বিষয়ক একাধিক বৃত্তান্ত রহিয়াছে যাহার সহিত বিনয়পিটক ও মহাপরিনিব্বাণ সুত্তের কথিত বৃত্তান্তের সাদৃশ্য আছে। অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে বুদ্ধদেবের বচন বলিয়া যাহা বর্ণিত তাহার কতটা অংশ নির্ভরযোগ্য। এ বিষয়ে Winternitz সাহেব বলেন—"We are safe, however, in granting that most of these short and beautiful utterances certainly bear the stamp of antiquity and that many of them are possibly the actual word of Buddha himself or of his most prominent disciples."[২৫] আটটি বগ্‌গের নাম হইল—১। বোধিবগ্‌গ ২। মুচলিন্দবগ্‌গ ৩। নন্দবগ্‌গ ৪। মেঘিয়বগ্‌গ ৫। সোনথেরস্‌সবগ্‌গ ৬। জচ্চন্ধবগ্‌গ ৭। চুলবগ্‌গ ৮। পাটলিগামিয়ো বগ্‌গ।

ইহার মধ্যে অষ্টম বগ্‌গের মধ্যে নির্বাণ সম্পর্কে বুদ্ধদেবের একটি সুন্দর ধর্ম-সম্বন্ধীয় ভাষণ আছে, উহা প্রণিধানযোগ্য।

ইতিবুত্তক—উদানের প্রায় অধিকাংশের মত ইতিবুত্তক গ্রন্থও গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণে লিখিত। ইহার প্রতিটি অনুচ্ছেদ 'বুদ্ধ এইভাবে বলিয়াছেন' এইরূপে শুরু। বর্ণনা প্রসঙ্গে সর্বদা গদ্যই ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু কোন ধর্ম বা নীতি সম্পর্কে যখনই কোন কথা বলা হইয়াছে তখনই পদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে, কখন আবার গদ্যের কথাই পদ্যে বর্ণিত হইয়াছে। মোটামুটি প্রতিটি অংশই সংক্ষিপ্ত, ভাষা সরল, সাবলীল এবং অতিরঞ্জনহীন। উপমা ও রূপকের প্রয়োগ ইহাতে ভালভাবেই দেখা যায়। এখানে দেখি দুর্গতকে দানকারী যে তাহাকে জলদাতা মেঘের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

গ্রন্থটি ১১২টি অনুচ্ছেদ (section) বিভক্ত। নিপাতগুলি আবার কতকগুলি বগ্‌গে বিভক্ত।

সুত্তনিপাত—খুদ্দকনিকায়ের পঞ্চম গ্রন্থ হইল সুত্তনিপাত (Section of Discourses)।[২৬] বৌদ্ধগ্রন্থ হিসাবে ইহার মূল্যের কথা অধ্যাপক Fausboll বলেন—"It is an important constitution to the right understanding of primitive Buddhism, for we see here a picture not of life in monastaries but of life of the hermits in its first stage. We have before us not the systematising of the later Buddhist Church but the first germs of a system, the fundamental ideas of which come out with sufficient clearness."

এই গ্রন্থে আছে পাঁচটি অনুচ্ছেদ। প্রথম চারিটিতে (উরগ বগ্‌গ, চূলবগ্‌গ, মহাবগ্‌গ, অঠ্‌ঠক বগ্‌গ) ৫৪টি ক্ষুদ্র গীতিধর্মী কবিতা। আর পঞ্চমটিতে দীর্ঘ

২৫। *Hist. of Ind. Lit.* Vol. II, পৃঃ ৮৫ দ্রষ্টব্য।

২৬। নিপাত শব্দটির অর্থ হইল বৃহত্তর রচনার ক্ষুদ্র অংশ। অঙ্গুত্তরনিকায়ের অংশগুলির নাম নিপাত। Neuman-র মতে 'fragment', Oldenburg-র মতে 'perhaps the isolated occasional speeches.'

১৬টি পদ্য আছে। অশোকের শিলালিপিতে পঠনীয় ও অনুবর্তনীয় অন্ততঃ ৩টি বিষয় এই সুত্তনিপাতের অন্তর্গত। ধম্মপদের পরেই বৌদ্ধগ্রন্থ হিসাবে কাব্যগ্রন্থরূপে সুত্তনিপাতের আদর।

কসিভরদ্বাজ সুত্তে আমরা দেখি পূর্বকালের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সম্বন্ধে সাধারণ জনগণের অভিমত। এখানে ব্রাহ্মণ কৃষক ভরদ্বাজ ভিক্ষুকে অলস জীবন যাপনের জন্য নিন্দা করিয়াছেন। ধনিয় সুত্তের মধ্যে দেখি একটি তুলনামূলক আলোচনা বিত্তশীল জনের বিত্ত ও ঐশ্বর্যের আনন্দ আর গৃহহীন বুদ্ধের নির্বাণাকাঙ্ক্ষার মধ্যে। নীতিমূলক কথোপকথন ছাড়াও সুত্তনিপাতের মধ্যে কতকগুলি আছে বর্ণনাত্মক। তিনটি এস্থলে উল্লেখযোগ্য—নালকসুত্ত, পব্বজ্জাসুত্ত ও পধানসুত্ত। ইহাদের মুখ্য বৈশিষ্ট্য কথোপকথন স্বভাব (coversational form)। এই গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীন ও অর্বাচীন অংশ আছে। এ সম্বন্ধে Winternitz সাহেব বলেন—

'At all events, the Suttanipāta, too, is a collection made up of earlier and later texts and is certainly not a unified work, even though a few of the poems included in the Suttanipāta, such as perhaps the 12 Suttas of the Uragavagga, may be the work of the same author.'

বিমানবত্থু ও পেতবত্থু (দেবগণের স্বর্গীয় আবাস-বিষয়ক কাহিনী ও ভূতের কাহিনী)—ইহারা যথাক্রমে খুদ্দকনিকায়ের ষষ্ঠ ও সপ্তম গ্রন্থ। ইহারা ত্রিপিটকে পরে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রের মধ্যে কর্মসম্বন্ধে যে সমস্ত নীতিগর্ভ কথা বা আলোচনা আছে তাহা এস্থলে অতি অসুন্দর পরিবেশে আলোচিত হইয়াছে। বিমানবত্থুতে মোগ্গল্লান কোন দেবতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে সে কি করিয়া স্বর্গে আরাম লাভ করিল, তাহার জবাবে সেই দেবতা কর্মবাদ সম্পর্কে ভাষণ দান করিবার এক সুযোগ লাভ করিলেন। Rhys Davids এই দুইখানা গ্রন্থের সম্পর্কে বলিয়াছেন—'The whole set of beliefs exemplified in these books is historically as being in all probability the source of a good deal of mediaevel Christian belief in heaven and hell. But the greater part of these books, composed according to a set pattern, is devoid of style and the collection is altogether of an evidently later date than the bulk of the books included in the Appendix.'[২৬]

পেতবত্থুর মধ্যে আছে ছোট পদ্যাংশ এবং ইহাতে জীবনোত্তর কালে অন্য জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে বৃত্তান্ত আছে। হিন্দুদের শ্রাদ্ধের বিধি যে ধারণাবশে উদ্ভূত পেতবত্থুর দান বিষয়ক কথার মধ্যেও অনুরূপ ভাবের পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। Winternitz সাহেব বলেন—'Even if we admit that the ideas of heaven and hell already existed in ancient Buddhism beside the ideal of Arhat and Nirvāna and that the conceptions of the Petas may be traced back, in part to very ancient popular superestitions, we cannot ascribe great antiquity to these poems."

২৬। *Buddhism, its History & Literature (American Lectures)*, পৃঃ ৭৭।

থেরং[27] ও থেরী[28] গাথা—পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ের পদ্য তত মনোগ্রাহী নয়। কিন্তু ইহারই পরবর্তী উল্লিখিত থের ও থেরী গাথা গ্রন্থ দুইখানি বৌদ্ধ ধর্মের অপূর্ব সৃষ্টি। ধর্মভাব ও কাব্যিক মূল্য মিশ্রিত হইয়া এই গ্রন্থ দুইটি ভারতীয় গীতিকাব্যে উচ্চকোটিত্ব দাবি করিতে পারে। 'These religious poems which in force and beauty are fit to rank with the best productions of Indian lyric poetry, from the hymns of the Ṛigveda to the lyrical poems of Kālidāsa and Amaru.' থের গাথার মধ্যে আছে ১০৭টি পদ্যাংশ ও ১২৭৯টি গাথা (stanzas), আর থেরী গাথায় আছে ৭৩টি পদ্যাংশ ও ৫২২টি গাথা। এই গ্রন্থদ্বয়ে আছে থের ও থেরীদের আত্মজীবনী এবং কি করিয়া কি অবস্থায় বুদ্ধদেবের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের কি বিশিষ্ট লাভ হইল তাহার বিবরণ। এ বিষয়ে সকলেই একমত যে এই গ্রন্থ একজন গ্রন্থকারের কৃতিত্ব নহে।[29] থেরী গাথার অনেকটাই ভিক্ষুণীদের দ্বারা রচিত। থের ও থেরী গাথার আপেক্ষিক সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে Mrs. Rhys Davids বলেন—'One has only to read the two collections consecutively in order to arrive at the conviction that, in the songs of the nuns, a personal note is very frequently struck which is foreign to those of the monks, that in the latter we hear more of inner experiences while in the former, we hear more frequently of external experiences, that in the monks' songs descriptions of nature predominate, while in those of the nuns pictures of life prevail.'

ধর্ম ও নীতির কথা উভয় গাথার মধ্যেই সমান। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ চিত্তের প্রশান্তির অধিক কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না, তবে তাঁহাদের আসল উদ্দেশ্য নির্বাণের স্বাদ গ্রহণ করা। সে যুগের সমাজজীবন, বিশেষতঃ, স্ত্রীলোকদের সমাজে স্থান হিসাবে থেরী গাথার অবদান অনস্বীকার্য। কাব্যের দিক দিয়া বিচার করিলে উপমাদি অলঙ্কারের প্রয়োগ, প্রকৃতি-প্রবণতা প্রভৃতি এই গ্রন্থদ্বয়ের মানকে অত্যন্ত উন্নীত করিয়াছে।

জাতক—বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মের ইতিহাস হইল জাতক। ইহাকে বলা হয় 'বোধি-সত্ত্ব কাহিনী'। বৌদ্ধশাস্ত্রে যে বোধি পাইবার জন্য উপযুক্ত ও যোগ্য তাহাকে বোধিসত্ত্ব বলা হয়। যে কাহিনীতে বোধিসত্ত্ব তাহার পূর্ববৃত্তান্তের কোন কার্যে অংশগ্রহণ করে, কখন বা নায়ক হিসাবে কখনও বা প্রতিনায়করূপে তাহাকেই জাতক আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। প্রতি জাতকের প্রারম্ভে আমরা দেখি এই এই সময় বোধিসত্ত্ব অমুক নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিল প্রভৃতি বাক্য। প্রতিটি জাতকের মধ্যে এই কয়টি অংশ থাকে—

২৭-২৮। থের শব্দটি সংস্কৃত স্থবির ও থেরী শব্দটি 'স্থবিরী' পদ হইতে আসিয়াছে। স্থবির শব্দের অর্থ বার্ধক্যের সূচক হইলেও থের পদটি কেবলমাত্র বৃদ্ধত্বকে বুঝায় না, ইহার সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত গুণকে দ্যোতিত করে যাহার ফলে অন্যের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা হয়। Rhys Davids বলেন—'Though Thera, fem. Theri—Sans.—Sthavira means old, the title was determined rather by those qualities which inspire reverence, than by age or seniority. There was neither an honorary office, nor privilege or duties of any kind in connection with this honorary title. *ERE*, Vol. 5. p. 252f.

২৯। Neuman বলিয়াছেন: "One man has left the impress of his mind on......the whole."

১। কাহিনীর প্রাক্‌কথন (Introductory story)—পচ্চুপ্পন্নবথু—ইহাতে আছে যে বুদ্ধদেব কখন এই জাতকটি সম্বন্ধে বলিলেন। ২। গদ্য বর্ণনাত্মক অংশ (Narrative)—অতীতবথু—এই অংশে বোধিসত্ত্বের পূর্ববর্তী কোন জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। ৩। গাথা—ইহার মধ্যে পূর্ব ও বর্তমান বৃত্তান্তের কথা পদ্যাকারে বর্ণিত আছে। ৪। বেয়্যাকরণ—ক্ষুদ্রাকার ভাষ্য—ইহাতে গাথাগুলির প্রতি-পদের প্রতিশব্দ যোগে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ৫। সংযোগ (সমোধান)—ইহা গদ্য-পদ্য মিশ্রিতাকারের—এই গ্রন্থের এই অংশে বোধিসত্ত্বের পূর্ব বৃত্তান্তের সহিত বর্তমান জন্ম-বৃত্তান্তের সমন্বয় করা হইয়াছে।

অধিকাংশ জাতকই গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণে রচিত। প্রাচীন ভারতে কাহিনী সব সময়ই গদ্য ও পদ্যের মাধ্যমে বিশিষ্ট ভঙ্গীতে রচিত হইত—তবে 'on the whole the Gāthās have a stronger claim to be regarded as canonical than have the prose portions of the Jātakas.' গাথার ভাষা গদ্যের ভাষা হইতে প্রাচীনতর। জাতকের মধ্যে অনেকগুলি কিন্তু তারিখের দিক হইতে অত্যন্ত প্রাচীনত্ব দাবি করিতে পারে। Winternitz সাহেব এই সম্বন্ধে বলেন—'..It can only be concluded that the position of the Jātaka book is probably no different from that of the Mahābhārata. Not only every single large section and every single narrative, but often also every single Gāthā will have to be tested independently as regards its age. Some of the Gāthās may possibly date back to the Vedic period others should perhaps be regarded as a priliminary stage of epic poetry.'

বিষয়বস্তুর দিক হইতে বিচার করিলে দেখিতে পাইব যে জাতকে আছে—কাহিনী (fable), পরীর গল্প (fairy-tale), অভিযানাত্মক কাহিনী, হাস্যরসাত্মক কাহিনী, নীতি-কথা ও ধর্মকাহিনী। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জাতকগুলি ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের সাহিত্যের ভান্ডারকে পূর্ণ করিতে সহায়তা করিয়াছে। কাজেই বিশ্বসাহিত্যে জাতকের অবদান অনস্বীকার্য। ভারতীয় ও অ-ভারতীয় কলা (art) জাতকের দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে। Winternitz সাহেব বলেন—'The Jātakas are of inestimable value, not only as regards literature and art, but also from the point of view of the history of civilization. Though they cannot serve as documents for the social conditions at the time of Buddha,—yet the narraters of the Jātaka book offered us a glimpse into the life of classes of Indian people of which other books of Indian literature only raely give us any information.'[৩০]

নিদ্দেশ (ব্যাখ্যা)—ইহা একটি ব্যাখ্যাত্মক গ্রন্থ। অঠ্‌ঠক বগ্‌গের ব্যাখ্যামূলক ইহাতে আছে মহানিদ্দেশ, আর আছে চুল্লনিদ্দেশ যাহা খগ্‌গবিসাণ সুত্ত পরায়ণের ক্ষুদ্রাবয়ব ব্যাখ্যা। সম্ভবতঃ অন্যান্য ব্যাখ্যা গ্রন্থের তুলনায় প্রাচীনত্ব আছে বলিয়াই এই গ্রন্থটি পিটকের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। এই নিদ্দেশগ্রন্থ হইতেই আমরা জানিতে পারি প্রাচীন ভারতে কি করিয়া গ্রন্থপাঠকালে তাহার ব্যাখ্যা করা হইত। কোন একটি পদের ব্যাখ্যাকল্পে একাধিক সংখ্যক প্রতিশব্দ প্রয়োগ করা হইত এবং

৩০। *Hist. of Ind. Literature,* Vol. II, পৃঃ ১৫৬।

অনুচ্ছেদের বার বার উচ্চারণ করা হইত। সম্ভবতঃ এই পদ্ধতি মুখস্থ রাখিবার জন্যই অবলম্বিত হইত। মনে হয়, এই সকল গ্রন্থই পরবর্তীকালে কোষগ্রন্থে (Dictionary) পর্যবসিত হইয়াছিল।

পটিসম্ভিধানমগ্গ (বিশ্লেষণাত্মক পথ—the path of analysis)—ইহাতে আছে তিনটি বিশাল ভাগ এবং ইহার প্রতিটির মধ্যে কোন কোন বৌদ্ধ নীতির সম্বন্ধে আলোচনা। উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখি যে ১।১-এর মধ্যে আলোচনা আছে ৭৩ রকম জ্ঞানের এবং ইহার মধ্যে আছে তথাগতের করুণা বিষয়ক আলোচনা। এই সমস্তগুলি প্রশ্ন ও উত্তর হিসাবে সজ্জিত আছে। কোন কোন অংশে সুত্তপিটকের গ্রন্থাদির মত আছে 'এবং মে সুতম্' (এরূপ আমি শুনিয়াছি)।

অপদান (অবদান)—এই শব্দটির অর্থ গৌরবজনক বা বীরত্বসূচক কার্য। Winternitz সাহেব এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ

"Whereas the Jātakas always describe a previous existence of the Buddha, Apadānas as a rule deal with that of a saint, an Arhat." অতএব এই গ্রন্থগুলিকে মুনিদের কাহিনী বলা চলে। এই গ্রন্থ পদ্যে রচিত এবং প্রথম অপদানটির নাম 'বুদ্ধাপদান'। ইহার পরে আমরা পাই 'থেরী অপদান'। এই অপদানগুলি 'খুদ্দকনিকায়'-এর অর্বাচীন অংশ।

বুদ্ধ বংস—ইহা 'খুদ্দকনিকায়'-এর ক্ষুদ্র অংশগুলির অন্যতম। গত পৃথিবীর দ্বাদশ কল্পে যে সমস্ত বুদ্ধ গৌতম বুদ্ধের পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহারই কাহিনী ইহার মধ্যে নিহিত আছে। 'উপক্রমণিকা'র পরে প্রতিটি বুদ্ধের কার্যাবলীর জন্য এক একটি অধ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। কোন্ বুদ্ধ কিভাবে ধর্ম চক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ ইহাতে বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ আছে।

"Moreover, it is replete with that Buddha-worship and Buddha deification, which is foreign to the earliest texts of the Tipiṭaka, but is at its height in the Buddhist Sanskrit literature, especially that of the Mahāyāna."

চরিয়া পিটক—ইহা 'খুদ্দনিকায়'-এর পঞ্চদশতম গ্রন্থ। প'য়ত্রিশটি জাতক পদ্যে ইহাতে সঙ্কলিত আছে। ইহাতে দেখান হইয়াছে যে পূর্ব জন্মাদিতে বোধিসত্ত্ব কি করিয়া দশ পারমিতা অর্জন করিয়াছিলেন। প্রতিটি কাহিনী বুদ্ধের মুখে বর্ণিত হইয়াছে। Winternitz সাহেব এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

"At all events the Cariyāpiṭaka, as we have it today is the work of an excellent monk who was anything but a poet, while among the authors of the Jātakas as we have them in the Jātaka book, there were, besides many a good monk and bad poet, a few distinguished poets also."

অভিধর্ম্মপিটক

অভিধম্ম পদটির অর্থ উচ্চকোটিক ধর্ম অর্থাৎ সূক্ষ্ম ধর্ম। অভিধর্ম্মপিটক ও সুত্তপিটকের মধ্যে ভেদ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে—'Indeed the only difference between the books of the Abhidhammapiṭaka and those of the Suttapiṭaka is that the former are more circumstantial, drier, more learned, in a word, more scholastic. Both treat of the same subject.' সংজ্ঞা নির্দেশ ও বর্গীকরণ (classification) অভিধম্মের মুখ্য

উদ্দেশ্য। সংজ্ঞা নির্দেশের ব্যাপারেও আবার কতকগুলি প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। বর্গীকরণের ব্যাপারে অবশ্য মনস্তাত্ত্বিক শৈলি অবলম্বিত হয়। Winternitz সাহেব বলেন—'As a rule, all this yields nothing but dogmatism, hardly ever is there a trace of any research which could be called scientific. The form of these works is mostly that of questions and answers, after the style of a catechism.'

অভিধম্মপিটকের আদি বা মূল আমরা পাই সুত্তপিটকের মধ্যে এবং এইগুলি সুত্তপিটকের মাতিকারই (list) পরিবর্ধিত সংস্করণ।

অভিধম্মপিটকের প্রথম খণ্ড (Book I) ধম্মসঙ্গণি (Compendium of Dhammas)- —ইহা ধম্মের সংজ্ঞা ও বর্গীকরণে পূর্ণ। ধম্ম সম্বন্ধে সমঞ্জসভাবে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। যে সমস্ত ভিক্ষু বা শিক্ষার্থী কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহাদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য এই গ্রন্থ প্রয়োজনীয়। সিংহল দেশে এই গ্রন্থটি বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পঠিত হয়। ধম্মসঙ্গণির সহিত একখানি প্রাচীন ব্যাখ্যা পুস্তক (commentary) পরে সংযোজিত করা হইয়াছে।

অভিধম্মপিটকের দ্বিতীয় খণ্ড (Book II) বিভঙ্গ (classification)—ইহা প্রথম খণ্ডেরই বিস্তৃতিমাত্র। প্রথম খণ্ডের জ্ঞানকে ইহা অপেক্ষা করে; অবশ্য আরও নূতন উপাদান ইহাতে নিবেশিত করা হইয়াছে। প্রথম অনুচ্ছেদে—বৌদ্ধ ধর্মের সার কথার আলোচনা। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ পর্যন্ত আলোচনা। তৃতীয় অনুচ্ছেদে—জ্ঞান বিধায়ক বস্তু, সম্বন্ধে আলোচনা ও চতুর্থে মানবীয় ও অ-মানবীয় জন্মবৃত্তান্তের বহু কাহিনী নিবন্ধ আছে।

পিটকের তৃতীয় খণ্ড—ধাতুকথা (Discourses on the Elements)—ইহা চতুর্দশ অধ্যায়যুক্ত প্রশ্নোত্তর রূপ মনস্তাত্ত্বিক উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা।

অভিধম্মপিটকের চতুর্থ খণ্ডের নাম পুগ্গলপঞ্ঞত্তি (Description of Human Individuals)। ইহা সুত্তপিটকের গ্রন্থাদির সহিত বিশেষ যোগসূত্রে আবদ্ধ। বিষয়বস্তুর দিক হইতে ইহা দীর্ঘনিকায়ের সঙ্গীতি সুত্ত হইতে বিভিন্ন নহে এবং এই গ্রন্থের ৩—৫ অনুচ্ছেদ অঙ্গুত্তরনিকায়ের মধ্যের বিষয়বস্তুর অনুরূপ। মধ্যে মধ্যে আমরা সুন্দর উপমা প্রয়োগ দেখিতে পাই।

অভিধম্মপিটকের পঞ্চম খণ্ডের নাম—কথাবত্থু (Subjects of Discourse)। এই গ্রন্থ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস হিসাবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং পিটকের মধ্যে একমাত্র গ্রন্থ যাহার গ্রন্থকর্তার নাম পাওয়া যায়। তৃতীয় ধর্মাধিবেশনের সময় অধিবেশনের সভাপতি মোগ্গলিপুত্ত তিস্স কর্তৃক ইহা রচিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে আছে ২৩ অনুচ্ছেদ (section), যাহার প্রত্যেকটির মধ্যে প্রশ্নোত্তরে বিভিন্ন প্রকার মিথ্যা মতবাদের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থকে খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীর বলিয়া বলা হইয়া থাকে এবং এই গ্রন্থের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে—'As far as the history of Buddhist schools and sects is concerned, the commentary on it, is only of value if taken in conjunction with the Chinese and Tibetan record of the schisms.

যমক—ইহা হইল অভিধম্মপিটকের ষষ্ঠ গ্রন্থ (The book of double questions)। ইহার এইরূপ নামের কারণ এই যে ইহাতে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দুইভাবে দেওয়া হইয়াছে। অভিধম্মের অন্যান্য গ্রন্থ পাঠের পরেও মনে যদি কোন রকম সন্দেহ বা শঙ্কা থাকে তাহা অপনোদনের জন্য এই গ্রন্থের অবতারণা।

অভিধম্মের শেষ গ্রন্থ হইল পঠ্ঠান পকরণ বা মহাপকরণ (the book of causal relationships)। ইহার প্রথম অংশ তিক পঠ্ঠান এবং দ্বিতীয় অংশ দুক পঠ্ঠান। বস্তুর ভিতর পারস্পরিক যে ২৪ রকম সম্বন্ধ থাকিতে পারে তাহা এস্থলে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। একমাত্র নির্বাণ ব্যতীত এই পৃথিবীতে এমন কোন পদার্থ নাই যাহা আলোচিত ২৪ প্রকার সম্পর্কে অন্যের সহিত সম্পর্কিত নহে। এই গ্রন্থের আলোচনাকে Mrs. Rhys Davids বলেন—'The one notable constructive contribution to knowledge in the Abhidhamma.'

অভিধর্ম্মপিটকের অস্তিত্ব ও স্থিতি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ একমতাবলম্বী নহেন। হীনযানী সৌত্রান্তিকগণ ইহার সম্বন্ধে বিরূপ ভাব পোষণ করেন। সর্বাস্তিবাদীদের নিজস্ব সংস্কৃতে অভিধর্মপিটক রহিয়াছে এবং এই সংস্কৃত অভিধর্মপিটক পালি অভিধম্ম হইতে ভিন্ন। বিনয়পিটকের প্রথম বৌদ্ধ ধর্মাধিবেশন সম্বন্ধে যে কাহিনী আছে তাহাতে বিনয় ও ধম্ম সম্বন্ধে উল্লেখ আছে, অভিধম্মের উল্লেখ নাই। বর্তমানে ব্রহ্মদেশে অভিধম্মের পঠন-পাঠন বেশ প্রচলিত আছে।

পিটক-বহির্ভূত পালি গ্রন্থ

পিটক-বহির্ভূত পালি গ্রন্থের অধিকাংশই সিংহলীয় ভিক্ষুদের রচনা। ইহার ব্যতিক্রম হইল—**মিলিন্দ পঞ্হ** (The Questions of Milinda)। এই গ্রন্থের উৎপত্তি আমরা দেখিতে পাই ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে। মিলিন্দ গ্রীকরাজ মিনাণ্ড্রোস ভিন্ন অন্য কেহ নহে। তাঁহার রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী। বৌদ্ধ-ভিক্ষু পণ্ডিত নাগসেনের সহিত গ্রীকরাজ মিনাণ্ড্রোসের সাক্ষাৎকার ঐতিহাসিক নাও হইতে পারে, কিন্তু এবিষয়ে সন্দেহ নাই যে এই গ্রন্থের রচনাকালে গ্রীকরাজের নাম জনগণের স্মৃতি হইতে মুছিয়া যায় নাই। পঞ্চম শতাব্দীর পালি গ্রন্থের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকারক বুদ্ধঘোষ মিলিন্দ পঞ্হ গ্রন্থকে পিটকের সমতুল স্থান দান করিয়াছেন।

৭টি অংশে গ্রন্থটি বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে প্রথম অংশের প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ খাঁটি, এমনকি তৃতীয় অংশের মধ্যে পরবর্তী অংশ সংযোজিত হইয়াছে। ৪-৭ অংশ পরে যোগ করা হইয়াছে এবং চীনদেশীয় অনুবাদে ইহা পাওয়া যায় না। প্রথম অংশ হইতে ৪-৭ অংশ স্বরূপতঃ বিভিন্ন। ৪র্থ অংশের অবতরণিকা (introduction) সম্পূর্ণ নবীন।

গ্রন্থখানিতে বৌদ্ধপণ্ডিত নাগসেনের সহিত গ্রীকরাজ মিনাণ্ড্রোসের প্রশ্নোত্তররূপে কথোপকথন অতি সুন্দরভাবে নিবেশিত হইয়াছে।

নেত্তিপকরণ (নেত্তি গন্ধ) [The book of guidence to the true religion]—এই গ্রন্থ প্রায় মিলিন্দ পঞ্হের ন্যায় প্রাচীন। ইহাই একমাত্র প্রাচীন গ্রন্থ যাহাতে বুদ্ধদেশিত ধর্মসমূহের একটা ধারাবাহিক আলোচনা পাওয়া যায়। বুদ্ধশিষ্য মহাকচ্চায়নকে ইহার প্রণেতা বলিয়া ধরা হয়। ইনিই আবার পেটকোপদেশ গ্রন্থের রচয়িতা।

নিদান কথা—বুদ্ধদেবের সংলগ্ন জীবনকথা। ইহাতে তিনটি অংশ।
১। দূরেনিদান—সুমেধ বুদ্ধ হইতে তুসিত দেবগণের আলয়ে জন্ম পর্যন্ত কাহিনী।
২। অবিদূরেনিদান—তুসিত লোক হইতে অবতরণ হইতে বোধিলাভ পর্যন্ত কাহিনী।
৩। সন্তিকেনিদান—বোধিলাভ হইতে আরম্ভ করিয়া অনাথ-পিণ্ডিকের বণিকদের দান পর্যন্ত কাহিনী। প্রথম অংশ প্রত্যক্ষভাবে বুদ্ধবংস ও চরিয়াপিটকের সহিত সংযুক্ত। ইহা গদ্য পদ্যের সংমিশ্রণে রচিত। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে Winternitz বলেন—

'At all events the Nidāna Kathā represents an earlier phase in the development of the Buddha legend than the Lalitavistara and similar Sanskrit works, even if the latter must be ascribed to an earlier time.'[৩১]

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বুদ্ধঘোষ। সিংহলের মহারাজ মহানামের রাজত্বকালে. তিনি বহু পরিশ্রমে ত্রিপিটকাদি অভ্যাস করিয়া (অনুরাধাপুরে) বুদ্ধের ধর্ম সম্বন্ধে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন তাহার নাম বিসুদ্ধিমগ্‌গ। কাহারও মতে তিনি প্রথম ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে গুরুর আদেশক্রমে সিংহলে গমন করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে টীকাকৃৎদের অগ্রগণ্য বলা হয়। তিনি নিজেই তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ১। বিসুদ্ধিমগ্‌গো, ২। সমন্তপাসাদিকা (বিনয়পিটকের টীকা), ৩। সুমঙ্গল বিলাসিনী (দীঘনিকায়ের টীকা), ৪। পপঞ্চসুদনী (মজ্ঝিমনিকায়ের টীকা), ৫। সারত্থপাকাসিনী (সংযুত্ত-নিকায়ের টীকা), ৬। মনোরথপুরণী (অঙ্গুত্তরনিকায়)।

গন্ধবংশে[৩২] পাটিমোখ্‌খের টীকা কঙ্খাবিতরণী ও অভিধম্মপিটকের সাতখানা গ্রন্থের টীকা পরমত্থকথা; খুদ্দকপাঠ, সুত্তনিপাত, জাতক ও অপদান গ্রন্থের টীকারও রচয়িতা বলিয়া বুদ্ধঘোষের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। অভিধম্মপিটকের টীকার রচয়িতা যে বুদ্ধঘোষ তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি 'ধম্মসঙ্গণি'র টীকা 'অত্থসালিনী' রচনা করিয়াছিলেন; আরও করিয়াছিলেন বিভঙ্গের টীকা সম্মোহবিনোদনী, পঠ্‌ঠান্‌পকরণের টীকা ও খুদ্দকপাঠ ও সুত্তনিপাতের টীকা যথাক্রমে কঙ্খাবিতরণী ও পরমত্থজোতিকা। তাঁহার এই টীকাগ্রন্থের মধ্যে সুন্দর সুন্দর উপমা ও কাহিনীর মাধ্যমে বক্তব্য বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থে তিনি বিসুদ্ধিমগ্‌গের কথা বারবার উল্লেখ করিয়াছেন। বিসুদ্ধি শব্দের একটি বিশেষ অর্থ এখানে গ্রহণ করা হইয়াছে, উহা হইল নিব্বাণ। বুদ্ধঘোষের দার্শনিক অবদান সম্পর্কে Winternitz সাহেবের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—'As far as the dogmatical and philosophical contents of the Visuddhi-Magga and the commentaries are concerned, it is surely an exaggeration to set Buddhaghosa up as a philosopher who cut out new paths and made an original contribution to Buddhistic philosophy.' He was a man of astonishing erudition and of most extensive reading, who to this day enjoys a well-merited reputation among the Buddhists of Ceylon, Burma and Siam, but it is going too far to call him "a great teacher of mankind". There is difference of opinion as to how far he is reliable in his commentaries as an expounder of the canonical texts. K. E. Neuman says on one occasion—"The moment the Buddhist *patres ecclesiae and doctors profoundi* try their hand at elucidating profound and obscure passages in the canon, they simply talk moonshine. Nevertheless, I believe that the same thing is true of Buddhaghosa as is true of other Indian commentator. We cannot follow them blindly

---

৩১। *Hist. of Indian Literature.* Vol. II. পৃঃ ১৮৯।
৩২। গন্ধবংশ *J. P. T. S.* 1886, পৃঃ ৫৯।

and yet on the other hand, we must admit that they do sometimes help us over difficulties and if we neglected them, we should be depriving ourselves of one of the means of explanation. I agree with Mrs. Rhys Davids when she says: Buddhaghosa's philology is doubtless crude, and he is apt to leave cruces unexplained, concerning which an occidental is most in the dark. Nevertheless, to me his work is not only highly suggestive, but also a mine of historic interest. To put it aside is to lose the historical perspective of the course of Buddhistic philosophy. Even if Buddhaghosa had no original contribution to make, we should yet be indebted to him for his faithful preservation of ancient traditions."

বুদ্ধঘোষের কিছুদিন পরে ধম্মপাল খুদ্দকনিকায়ের উপর টীকা রচনা করেন এবং ইহার নাম হইল পরমত্থদীপনী। উভয় টীকাকারের লেখার ভঙ্গী প্রায় একই প্রকারের।

দীপবংশ—যে সমস্ত কাহিনী তখনকার যুগে বিভিন্ন অবস্থায় বা পর্যায়ে প্রচলিত ছিল,—বিশেষতঃ অঠ্ঠকথায়—তাহার মহাকাব্যে রূপদান করা হইল দীপবংশ নামক গ্রন্থে (History of the Island)। গ্রন্থকারের কোন নাম পাওয়া যায় না; তবে ইহা খৃষ্টীয় ৪-৫ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল। ভাষার দিক হইতে বলা চলে যে সিংহলীগণ এই গ্রন্থ রচনাকাল পর্যন্তও পালিভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করিতে পারে নাই। মুখ্যতঃ, অনুরাধাপুরে রক্ষিত অঠ্ঠকথা হইতে গৃহীত উপাদান ইহাতে ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রায়শঃই দেখিতে পাই যে কবি এক বিষয় হইতে অসংলগ্ন ভাবে বিষয়ান্তরে প্রবেশ করিয়াছেন। কখন কখন মধ্যবর্তী স্থল অব্যাখ্যাত ও শূন্য রহিয়া গিয়াছে।

মহাবংশ—দীপবংশের ন্যায় বিপুলাকার এই মহাকাব্য পঞ্চম শতাব্দীতে কবি মহানাম কর্তৃক লিখিত। দীপবংশের তুলনায় এই গ্রন্থের কাব্যমূল্য অধিক। গ্রন্থের প্রারম্ভে কবি নিজেই বলিয়াছেন যে তাঁহার উদ্দেশ্য সুন্দর কাব্য সৃষ্টি করা। Geiger সাহেবের মতে—"The Mahāvamsa is a work of art, created by a man who well deserved to be called a poet and who mastered the frequently crude material, if not with genius, yet with taste and skill." উভয় কাব্যের মধ্যে উপাদান গ্রন্থনকৌশল প্রভৃতি ব্যাপারে সাদৃশ্য রহিয়াছে। তিন তিন বার বুদ্ধদেবের সিংহলে আগমনের কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। অশোক ও বিজয়সিংহের কাহিনীও এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত। অশোকের রাজত্বকালে 'দেবানং পিয়' তিস্‌স সিংহলে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা এই কাব্যে দেখিতে পাই। 'It may probably be assumed that Mahānāma took these materials which are missing in the Dīpavaṁśa from the old Aṭṭhakathās, principally from the Sīhalaṭṭhakathā-Mahāvaṁśa which was his chief source, even though he knew and used the Dīpavaṁśa as well.'

দীপবংশ বা মহাবংশ কোন গ্রন্থই ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসাবে খ্যাতি দাবি করিতে পারে না।

বোধিবংস বা মহাবোধিবংস (বোধিবৃক্ষের ইতিহাস)—গদ্য গ্রন্থ, উপতিস্স নামক ভিক্ষু কর্তৃক একাদশ শতাব্দীতে রচিত।

দাঠাবংস (বুদ্ধের দন্তসম্পর্কীয় কাহিনী)—পাঁচটি সর্গে বিভক্ত একটি মহাকাব্য সংস্কৃতানুগ পালি ভাষায় রচিত—ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ধর্ম্মকিত্তি কর্তৃক রচিত।

থূপবংস—(স্তূপের ইতিহাস) বাচিস্সর কর্তৃক সিংহলী ও পালি ভাষায় রচিত (ত্রয়োদশ শতাব্দীতে)।

বুদ্ধঘোষের সমসাময়িক ছিলেন বুদ্ধদত্ত। তিনি বুদ্ধবংসের উপর টীকা এবং অভিধম্ম ও বিনয়ের উপর অভিধম্মাবতার, রূপবিভাগ ও বিনয় বিভাগ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল অনাগতবংস (History of the Future Buddha), খুদ্দকশিক্খা (ধম্মসিরি রচিত); মূলশিক্খা (মহাসামি রচিত); ১১৪টি কবিতায় রচিত পঞ্চগতিদীপন (illumination of the Five paths), বুদ্ধপ্পিয় রচিত পজ্জমধু প্রভৃতি।

শুদ্ধ ও মিশ্রিত সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধ সাহিত্য

শুদ্ধ ও মিশ্রিত সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থের সংখ্যা কম নহে। এই সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে হীনযান ও মহাযান নামক বৌদ্ধসম্প্রদায় সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। থেরবাদী বৌদ্ধগণ, যাহাদের গ্রন্থ মূলতঃ পালি ভাষায় রচিত, তাহাদের নিকট নিজস্ব নির্বাণ লাভই ছিল নিতান্ত কাম্য। তাহারা অর্হত্ত্ব যে কামনা করিত তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ মতবাদের সঙ্কীর্ণতা লক্ষ্য করিয়া ইহাকে হীনযান (inadequate vessel) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা বলেন যে একক ব্যক্তির নির্বাণই কাম্য নহে বৃহত্তর সংখ্যক জনগণের দুঃখনিবৃত্তি ও নির্বাণ লাভ মুখ্য উদ্দেশ্য, তাঁহারা নিজেদের মহাযানী বলিয়া থাকেন (the great vessel)। অর্হত্ত্বের পরিবর্তে ইঁহারা বোধিসত্ত্বের আদর্শকে গ্রহণ করিয়াছেন। যে কোন মনুষ্য বোধিসত্ত্বরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অন্য লোকের হিত করিবার জন্য কামনা করিতে পারেন। এই দুইটি সম্প্রদায়ের দৃষ্টিগত ভেদ সম্পর্কে Winternitz সাহেব বলিয়াছেন—"Thus according to the teachings of the Mahāyāna even the householder in the midst of the family life, the merchant, the artisan, the king, nay, even the labourer can attain salvation by practising pity and friendliness to all beings and by faithful and devoted worship of the Buddha and the Bodhisattvas. The Lokottaravādins regarded the Buddhas not as ordinary men but as super-natural (lokottara) beings. In the Mahāyāna the Buddhas are from the outset nothing but divine beings and the entry into Nirvāna and sojourn on earth are simply sportive and a delusion. Furthermore, whilst the Hīnayāna already makes mention of a number of Buddhas, the Mahāyāna speaks of milliards of Buddhas. In addition, the Mahāyāna Buddhists worship as divine beings myriads of Bodhisattvas endowed with perfections (pāramitas) ....Even as this side was already prepared in the Hinayāna, but found its further deve-

lopment under influence of Hinduism, in the same way the philosophical side of the Māhāyana is merely an elaboration of the Hīnayāna doctrines under the influence of Brahmanical philosophy. Early Buddhism had explained the origin of suffering or the discords of existence by the Paticcasamuppāda i.e. the formula in which it is shown that all the elements of being originate only in mutual interdependence. The Hīnayāna derives from this formula the doctrine of Anattatā of the non-self i.e. the doctrine that there is no independent and permanent ego but merely a succession of corporal and psychical phenomena which change every moment. The Māhāyana derives from the same formula the doctrine of Śūnyatā i.e. the doctrine that 'all is void' (sarvaṁ Śūnyam) meaning 'devoid' of independent reality."[৩৩] একথা মনে করা ভুল হইবে যে বৌদ্ধ-সংস্কৃত গ্রন্থসকল মহাযানীয়; কতকগুলি হীনযানীয় গ্রন্থও শুদ্ধ ও মিশ্র সংস্কৃতে লিখিত।

মহাবস্তু

হীনযানী গ্রন্থের অন্যতম এই গ্রন্থটি বুদ্ধদেবের জীবনী লইয়া রচিত। Winternitz সাহেবের মতে 'Mahāvastu should rather be described as a labyrinth in which the thread of a connected narrative of the Buddha's life can only be discovered with some difficulty.' বহু প্রাচীন রীতিনীতির সহিত এই গ্রন্থ আমাদিগকে পরিচিত করাইয়া দেয়, 'It is more specially valuable as a treasure trove of Jatakas and other narratives.'

ললিতবিস্তর

মহাবস্তু নিজে হীনযানী গ্রন্থ হইলেও ইহার মধ্যে মহাযানী ভাবধারা বিদ্যমান। ললিতবিস্তর (বৈপুল্য সূত্র—discourse of great extent) মহাযানী ভাবে রচিত। শীর্ষনাম হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে ইহাতে আছে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ও লীলার কাহিনী। অন্যান্য পালি সুত্তের মত ইহার প্রথমে আছে, 'এবং মে সুতং' (অর্থাৎ এরূপ আমি শুনিয়াছি)। নিদানকথার শৈলী অবলম্বন করিয়া বুদ্ধদেবের অলৌকিক শক্তি ইহাতে বিস্তৃতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহা ২৭টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। ইহার বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে হীনযানী কোন গ্রন্থকে মহাযানী ভাবধারায় রূপায়িত করিয়া ইহা সৃষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থটির মধ্যে একাধিক গ্রন্থকারের কৃতিত্বের ছাপ আমরা দেখিতে পাই। ইহার কাল সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে যে জাভায় বোরোবুদুরের মন্দিরে যে শিল্পীরা কাজ করিয়াছিল (৮০০-৯০০ খৃঃ অঃ) তাহারা ললিতবিস্তর গ্রন্থের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিল।

অশ্বঘোষ

কালিদাসের পূর্ববর্তী কবিগণের মধ্যে অশ্বঘোষ অগ্রগণ্য। তাঁহার পাণ্ডিত্য সম্পর্কে তিব্বতীয়গণ ও বৌদ্ধগণ একমত। তাঁহাকে কণিষ্কের সমসাময়িক বলিয়া

৩৩। *Hist. of Ind. Literature*, Vol. II, পৃঃ ২৩১।

ধরা হয় (খৃঃ ২য় শতাব্দী)। তাঁহার রচিত বুদ্ধচরিত একখানি মহাকাব্য, বুদ্ধের জীবনীর উপর লিখিত। তাঁহার কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কে Winternitz বলেন—'He keeps himself far removed from such exaggerations as we find in the Lalitavistara. In contrast to the chaotic disorder in texts like the Mahāvastu and the Lalitavistara, we find in the Buddhacarita a well-planned artistic arrangement of the material. Not that he made any alterations in the traditions but he has the art of clothing the old familiar legends in a new poetical garment and of importing original expression to the well-known doctrines of the Buddhist Sutras. Aśvaghoṣa is always more of a poet than a monk, at least in the Buddhacarita.'[১]

সৌন্দরানন্দ কাব্য—ইহাও প্রথম শ্রেণীর কাব্য। বুদ্ধের জীবনের একটা ঘটনা ইহার মুখ্য উপজীব্য। বুদ্ধদেবের ভাই প্রেমিক নন্দকে তাহার মতের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করাই এই কাব্যের কাহিনী। কাব্যের শেষের দিকে অশ্বঘোষ বলিয়াছেন যে কাব্যের মাধ্যমে তিনি অবৌদ্ধদিগকে বৌদ্ধধর্মে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য এই গ্রন্থপ্রণয়নে উদ্যোগী হইয়াছেন।

বজ্রসূচী (The diamond needle)—ইহা অশ্বঘোষের রচিত কিনা তাহা ঠিক জানা যায় না। তবে ইহার গ্রন্থকর্তা হিসাবে অশ্বঘোষের নাম উল্লেখ করা হয়। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার সূক্ষ্ম বিচারের সাহায্যে ব্রাহ্মণদের মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। I-tsing বা তিব্বতীয় Tanjur-এ অশ্বঘোষের গ্রন্থগুলির মধ্যে বজ্রসূচীর নাম পাওয়া যায় না। চীনদেশীয় ত্রিপিটকের এক অনুবাদে এই গ্রন্থকে ধর্মকীর্তি কর্তৃক রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

একটি গীতি কাব্য (গণ্ডীস্তোত্র গাথা) অশ্বঘোষ কর্তৃক রচিত বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। A. Von Stail Holstein চীনভাষায় ইহার অনুবাদ দেখিয়া মূল সংস্কৃত অংশ উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার প্রকৃতি দেখিয়া কাব্যটি অশ্বঘোষের বলিয়া মনে হয়।

শারিপুত্র প্রকরণ নামক নাটকের যে কয়েকটি অংশ আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহা হইতে নাট্য রচনায় অশ্বঘোষের কৃতিত্বের পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। শারিপুত্র ও তাঁহার বন্ধু মৌদ্গল্যায়ন কি করিয়া বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইলেন তাহারই মনোজ্ঞ বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

চীনদেশীয় পণ্ডিতগণ সূত্রালঙ্কার নামক একখানি গ্রন্থও অশ্বঘোষ কর্তৃক রচিত বলিয়া ঘোষণা করেন, কিন্তু 'it was really written by Aśvaghoṣa's junior contemporary Kumārlāta and which in Sanskrit; bore the title Kalpānāmaṇḍitikā or Kalpanālamkṛtikā Hsüan T-sang-র মতানুসারে কুমারলাত সৌত্রান্তিক মতের প্রবর্তক এবং তাঁহার বাসস্থান ছিল তক্ষশীলা। তিব্বতীয় পণ্ডিতগণ আবার মাতৃচেত কর্তৃক রচিত কতকগুলি কবিতাকে অশ্বঘোষের রচনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

জাতকমালা (আর্যশূর)—ইহা প্রকৃতিতে কল্পনামণ্ডিতিকার ন্যায়। তিনি এই গ্রন্থে নূতন কোন কাহিনীর অবতারণা করেন নাই বরঞ্চ পুরাতন কাহিনীগুলিকে নূতন কাব্যরসে সঞ্জীবিত করিয়াছেন। ইহাতে আছে ৩৪টি জাতক 'and are intended

to illustrate the Pāramitās or perfection of a Bodhisattva'. অজন্তার গুহায় যে সমস্ত চিত্র আছে তাহাতে আর্যশূরের শ্লোক সংবলিত জাতকের অনেক কাহিনী রূপায়িত হইয়াছে।

পদ্যচূড়ামণি—ইহা বুদ্ধঘোষ কর্তৃক রচিত বুদ্ধচরিত শ্রেণীর একটি মহাকাব্য। এই বুদ্ধঘোষ প্রসিদ্ধ টীকাকার বুদ্ধঘোষ নহেন।

অবদান সাহিত্য

জাতকমালার অপর নাম বোধিসত্ত্বাবদানমালা। Winternitz সাহেব অবদান সম্বন্ধে বলেন যে—'The Avadāna texts also stand, so to speak, with one foot in the Hinayāna literature and the other in that of the Mahāyāna.' 'অবদান' শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ কার্য (noteworthy deed)। বৌদ্ধ সাহিত্যে ইহা নৈতিক বা ধর্মসম্বন্ধীয় বিশিষ্ট কীর্তিজনক কাজ। এই সমস্ত কাহিনীতে মুখ্যতঃ বলা হইয়াছে যে, যেমন কাজ করা হয় তাহার ফলও সেইরূপ। বৌদ্ধগণ বলেন যে এই সমস্ত কাহিনী মাত্র নহে,—'A regular Avadāna consists of a story of the present, a story of the past and a moral. If the hero of the story of the past is the Bodhisattva, this kind of Avādāna can also be called a Jātaka.'

অবদানশতক—অবদানগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। ইহা হীনযানীয় গ্রন্থ—'Though Buddha worship plays a prominent part in the legends, there is no trace of the Bodhisattva cult and of Mahāyānistic mythology.' অবদানশতকটি দশটি বর্গে (বগ্গে) বিভক্ত এবং ইহাদের প্রতিটি বর্গ বিশেষ একটি বিষয় লইয়া রচিত। ইহাদের প্রথম চারিটিতে আছে কি করিয়া কোন লোক কাজের দ্বারা বুদ্ধ বা প্রত্যেকবুদ্ধ হইতে পারে।

কর্মশতক—অবদানশতকের ন্যায় একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহার কেবল তিব্বতীয় অনুবাদ পাওয়া যায়।

দিব্যাবদান—বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বকে নমস্কার পূর্বক এই গ্রন্থ আরম্ভ হইলেও ইহা মূলতঃ হীনযানী পন্থীয়। ইহা অনেকটা অবদানশতকেরই অনুরূপ। ইহার রচনা-শৈলী সমঞ্জস নহে। কতকগুলি কাহিনী শুদ্ধ সরস গদ্য সংস্কৃতে রচিত, আবার কতকগুলির মধ্যে গাথার সংমিশ্রণ রহিয়াছে। কাহিনীর দিক হইতেও মৌলিকতা বেশী নাই, কারণ ইহার প্রতিটি কাহিনী আমরা অন্যত্র দেখিতে পাই। মনে হয় দিব্যাবদানের বর্তমানরূপ লাভ করিবার সময় বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন যুগের বলিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহার রচনাকাল আনুমানিক খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

এই প্রসঙ্গে কাশ্মীরীয় কবি ক্ষেমেন্দ্রের (১০৫২ খৃষ্টাব্দ) **অবদান কল্পলতা** উল্লেখযোগ্য। ইহাতে আছে সুন্দর কাব্য লেখার ভঙ্গীতে বর্ণিত ১০৭টি কাহিনী।

মহাযান সূত্র

এই পর্যন্ত সংস্কৃতে রচিত যে সমস্ত বৌদ্ধ গ্রন্থের সহিত আমরা পরিচিত হইয়াছি তাহা হীনযান ও মহাযানের মধ্যবর্তী পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে মহাযানীয় গ্রন্থের আলোচনা করা হইতেছে।

মহাযানীয়দের কোন নিজস্ব পিটক নাই। যে নয়খানা গ্রন্থকে বহু সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ করা হয় তাহারা 'বৈপুল্যসূত্র' নামে পরিচিত। ইহারা সকলেই মহাযানীয়

কিন্তু ইহাদের কোনটিকেই মহাযানীয়পিটক বলা চলে না। ইহারা হইল—অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, ললিতবিস্তর, লঙ্কাবতার, সুবর্ণপ্রভাস, গণ্ডব্যূহ, তথাগতগুহ্যক, সমাধিরাজ ও দশভূমীশ্বর।

সদ্ধর্মপুণ্ডরীক—মহাযানসূত্রের মধ্যে প্রধান ও বৈশিষ্ট্যযুক্ত হইল সদ্ধর্মপুণ্ডরীক (the Lotus of Good Religion), মহাযানী বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে পরিচিত হইতে হইলে এই গ্রন্থটি পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য। ইহার মধ্যে যে বুদ্ধের পরিচয় আমরা পাই তাহাতে তিনি দেবোপম। তিনি সদর্পে ঘোষণা করিয়াছেন—'আমিই জগতের পিতা' আমি স্বয়ম্ভূ এবং সর্বজগতের পরিপালক। জগতের সব ভূতের কল্যাণের জন্য তিনি নির্বাণগামী হইয়াছেন। এই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের জন্য পৃথক পৃথক কাল নির্ধারণ করা আবশ্যক বলিয়া এই গ্রন্থের সঠিক রচনাকাল নির্ণয় করা কঠিন। মূল গ্রন্থটি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে বলিয়া কথিত হইয়াছে; কারণ নাগার্জুন (২য় শতাব্দীর লোক) এই গ্রন্থ হইতে পংক্তি উল্লেখ করিয়াছেন।

অবলোকিতেশ্বর গুণকারণ্ডব্যূহ (the detailed description of the basket of the qualities of Avalokiteśvara)—ইহার সংক্ষিপ্ত নাম কারণ্ডব্যূহ। ইহার একটি সংস্করণ পদ্যে, অপরটি গদ্যে। উভয় সংস্করণেই মুখ্য দেবতা হইল অবলোকিতেশ্বর। তিনি হইলেন বোধিসত্ত্বের এক বিশিষ্ট রূপ 'Who refuses to assume Buddhahood until all beings are redeemed.' সর্বজীবের মুক্তি বিধান করাই অবলোকিতেশ্বরের কাজ। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে আমরা দেখিতে পাই কি করিয়া তিনি 'অবীচি' নামক নরকে প্রপীড়িত জনগণের উদ্ধারের জন্য অবতরণ করিয়াছেন। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর অমিতাভ বুদ্ধের অনুরূপ।

প্রজ্ঞাপারমিতা (The Mahāyāna sūtras of the Wisdom Perfection)—এই শ্রেণীর গ্রন্থে বোধিসত্ত্বের ছয়টি পারমিতার (perfection) কথা উল্লিখিত আছে, ইহাদের মধ্যে মুখ্য হইল প্রজ্ঞাপারমিতা। ইহার বৈশিষ্ট্য হইল শূন্যতা জ্ঞান অর্থাৎ জগতের যে পারমার্থিক সত্তা কিছু নাই সেই বিশ্বাস। শত-সাহস্রিকা প্রভৃতি অনেক প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতম অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা। ইহাতে ৩২টি অধ্যায় আছে। নাগার্জুন, বসুবন্ধু ও অসঙ্গ প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থের দীর্ঘ ভাষ্য ও টীকা রচনা করিয়াছেন। তাহা চীনদেশীয় ও তিব্বতীয় অনুবাদের মাধ্যমে আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

মহাব্যুৎপত্তি নামক বৌদ্ধ অভিধানে বুদ্ধাবতংসক নামে গ্রন্থ মহাযান গ্রন্থ হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে। চীন দেশীয় বিবরণে এইরূপ ৬টি বিভিন্ন অবতংস সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। যদিও সংস্কৃতে অবতংস গ্রন্থ পাওয়া যায় না, তবুও গণ্ডব্যূহ-মহাযান-সূত্র আমরা দেখিতে পাই। ইহা অবতংসকের চীনদেশীয় অনুবাদের অনুরূপ। গণ্ডব্যূহের আসল প্রতিপাদ্য হইল সুধন নামক যুবা বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর নির্দেশে জ্ঞানাহরণের জন্য দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া মঞ্জুশ্রীর অনুগ্রহে প্রজ্ঞা লাভ করিলেন। গণ্ডব্যূহ সূত্রের শেষের দিকে আমরা দেখি ভদ্রচরীপ্রণিধান গাথা (a prayer in 62 melodious Dodhaka stanzas)।

দশভূমক বা দশভূমিক সূত্র বা দশভূমিশ্বর—ইহাও অবতংসকের অংশবিশেষ। ইহার বক্তব্য হইল দশটি ভূমি (step) যাহার মাধ্যমে বুদ্ধত্ব লাভ করা যাইতে পারে। বোধিসত্ত্ব বজ্রগর্ভ এই গ্রন্থের বক্তা। মহাবস্তুর মধ্যে এই দশভূমক গ্রন্থের মূল বক্তব্য সূত্রাকারে পাওয়া যায় 'but in the Mahāyāna it is a principal feature

and the Daśabhūmaka is the most important work which treats of this doctrine.'

রত্নকূট (Heap of jewels)—অবতংসকের ন্যায় চীনদেশীয় ত্রিপিটক ও তিব্বতীয় কঞ্জুরের অংশভূত হইল রত্নকূট। ইহাতে আছে ৪৯টি সূত্র। চীন ও তিব্বতের গ্রন্থে 'কাশ্যপ পরিবর্ত' নামক অংশকে রত্নকূট গ্রন্থের ৪৩তম পরিচ্ছেদ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

লঙ্কাবতার সূত্র—শূন্যবাদেরই পরিবর্তিত রূপ যে বিজ্ঞানবাদ তাহার মুখ্য গ্রন্থ হইল লঙ্কাবতার সূত্র। ইহা বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন অংশের সঙ্কলন। গ্রন্থের শেষ অধ্যায়টি (সং—গাথকম্) পদ্যে রচিত, অথচ অন্যান্য অংশ গদ্যে লিখিত। দশম অধ্যায়ে বিজ্ঞানবাদের দার্শনিক রূপটি সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এই অধ্যায়েই আবার ব্যাস, কনাদ, কপিল প্রভৃতি ঋষিগণের নাম এবং মৌর্য, নন্দ, গুপ্তদের নাম পাইয়া থাকি। ঐতিহাসিক মূল্যের দিক দিয়া নামের উল্লেখ তত বৈশিষ্ট্য দাবি করিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। মৈত্রেয় নাথ, অসঙ্গ, মহাযান-শ্রদ্ধোৎপাদ প্রভৃতি গ্রন্থকার ও গ্রন্থ কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞানবাদের সহিত লঙ্কাবতারের বিজ্ঞানবাদ মিলিয়া যায়। Winternitz সাহেব বলেন—'At all events, from the point of view of the history of Indian philosophy from the 4th and the 6th cen. A.D. the importance of this work, which contains such numerous allusions to other systems of Philosophy, should not be undervalued.'

সমাধিরাজ সূত্র (the sutra about the king of Meditations or the Candrapradīpa-sutra, as it is called after the principal speaker.)—এই গ্রন্থে বুদ্ধদেব ও চন্দ্রপ্রদীপ রাজার মধ্যে যে আলোচনা হইয়াছে তাহার মাধ্যমে দেখান হইয়াছে কি করিয়া বিভিন্ন রূপ সমাধির মধ্য দিয়া চরম জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে।

সুবর্ণপ্রভাস (Splendour of Gold)—এই গ্রন্থের কতক অংশ দার্শনিক, কতক অংশ নীতিবাক্যপূর্ণ কিন্তু মুখ্যতঃ ইহাতে তান্ত্রিকতার রূপটি স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত। 'The Suvarna-prabhāsa enjoys a great reputation and is popular in all countries where Mahāyāna Buddhism prevails.'

মাধ্যমিককারিকা—নাগার্জুন কর্তৃক রচিত। ইহার প্রতিপাদ্য হইল সুসমঞ্জস ভাবে শূন্যবাদ শিক্ষা দেওয়া। ইহাতে ২৭টি অধ্যায়ে ৪০০টি কারিকা আছে। নাগার্জুন নিজে 'অকুতোভয়' নামক একটি টীকা রচনা করেন। ইহা সংস্কৃতে পাওয়া যায় না? কেবল ইহার তিব্বতীয় অনুবাদ আছে। বুদ্ধ পালিত ও ভাববিবেককৃত টীকাও তিব্বতীয় অনুবাদে পাওয়া যায়। চন্দ্রকীর্তি রচিত প্রসন্নপদা টীকাই বর্তমানে এই গ্রন্থের উপর একমাত্র সংস্কৃত টীকা। যুক্তিষষ্টিকা ও শূন্যতাসপ্ততি নামক আরও দুইখানি গ্রন্থে নাগার্জুন শূন্যতাতত্ত্বকে আরও বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার অন্য গ্রন্থের নাম বিগ্রহব্যাবর্তনী। সুহৃল্লেখ নামক গ্রন্থের কর্তৃত্ব তাঁহার উপর আরোপ করা হয়। প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রশাস্ত্র ও দশভূমি বিভাষা শাস্ত্রও তাঁহার রচিত টীকা, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

নাগার্জুনের পর খৃষ্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হইয়া-

ছিলেন নাগার্জুনের শিষ্য আর্যদেব। তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'চতুঃশতক'। ইহাতে আছে ৪০০টি কারিকা। চন্দ্রকীর্তি এই গ্রন্থের উপরও টীকা রচনা করেন। আর্যদেব তাঁহার গ্রন্থে যুক্তিতর্কের দ্বারা নাগার্জুনের মতবাদকে সমালোচকদের আলোচনা হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

বিজ্ঞানবাদী-অসঙ্গ—তিনি মৈত্রেয়নাথের শিষ্য। বিজ্ঞানবাদে বলা হইয়াছে যে বিজ্ঞানাতিরিক্ত কোন বস্তুর সত্তা নাই। যোগ অভ্যাসের দ্বারা বোধিকে লাভ করা যায়, ইহা এই মতবাদের প্রতিপাদ্য। ইহার অপর নাম যোগাচার। মৈত্রেয়নাথের গ্রন্থের নাম 'অভিসময়ালঙ্কার কারিকা'। মহাযানসূত্রালঙ্কারও তাঁহার রচনা। প্রবাদ অনুসারে যোগাচারভূমি শাস্ত্র মৈত্রেয়নাথ অসঙ্গকে উপদেশস্বরূপে দান করিয়াছিলেন। অভিধর্ম গ্রন্থের ন্যায় ইহা গদ্যে লিখিত। তিব্বতীয়গণ ইহাকে অসঙ্গের কীর্তি বলিয়া মনে করেন। যোগাচার-বিজ্ঞানবাদ মতের সমর্থক ও প্রবর্তক রূপে মৈত্রেয়নাথ অপেক্ষা অসঙ্গের নাম অধিক উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রচনা চীনদেশীয় অনুবাদের মাধ্যমে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাঁহার কাল খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী।

বসুবন্ধু—অসঙ্গের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। 'He combined great independence of thought with astonishing erudition'। তাঁহার প্রধান রচনা অভিধর্ম-কোষ। ৬০০টি কারিকায় ও গ্রন্থকারের নিজস্ব ভাষ্যে তিনি বৌদ্ধ সাহিত্যের বিভিন্ন দার্শনিক, নৈতিক প্রভৃতি দিকগুলি সুন্দরভাবে পর্যালোচনা করিয়াছেন। নবম অধ্যায়ে নৈরাত্ম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যদিও হীনযানী সর্বাস্তিত্ববাদের দিক হইতে অভিধর্মকোষ রচিত হইয়াছে, তবুও এই গ্রন্থ সকল বৌদ্ধ মতবাদের পক্ষেই প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত। 'We can learn far more from the Kośa with its commentary, about the dogmatics of the ancient Buddhist schools, than from any other work and it affords us a sidelight upon the debates between the Vaibhāṣikas and the Sautrāntikas. Moreover the work is rich in quotation from the earlier literature. In the 7th century the Abhidharmkoṣa was so widely read in India that in a description of a hermitage of Buddhist monks, Bāna says that the parrots explained the Koṣa to one another. This work gave rise to an extensive literature of commentaries and in China and Japan it is largely used as a text book. It is also the final authority when controversies regarding points of dogma arise.' বসুবন্ধু সাংখ্য মতবাদ খণ্ডনের জন্য পরমার্থসপ্ততি নামক ৭০টি শ্লোকাত্মক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি তাঁহার ভ্রাতা অসঙ্গ কর্তৃক মহাযানে দীক্ষিত হন। পরে সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, মহাপরিনির্বাণসূত্র, বজ্রচ্ছেদিকা প্রভৃতি মহাযান গ্রন্থের উপর টীকা প্রণয়ন করেন। এই সময়ে তিনি বিজ্ঞানবাদের সমর্থনে বিজ্ঞানাতিরিক্ত সমস্ত জাগতিক পদার্থের অনস্তিত্ব ঠিক প্রমাণ করিয়া বিংশতিকা ও ত্রিংশিকা রচনা করেন। তিব্বতীয় Buston-এ নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি বসুবন্ধুর রচনা বলিয়া বলা হইয়াছে—১। পঞ্চস্কন্ধ প্রকরণ। ২। ব্যাখ্যাযুক্তি। ৩। কর্মসিদ্ধি প্রকরণ। ৪। মৈত্রেয়র মহাযান-সূত্রালঙ্কারের উপর টীকা। শেষ জীবনে তিনি অমিতাভ বুদ্ধের ভক্ত হইয়া 'অপরিমিতায়ুসূত্রোপদেশ' রচনা করেন।

মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদ—এই গ্রন্থে মাধ্যমিক ও বিজ্ঞানবাদ মতবাদের সুন্দর সমন্বয়

করা হইয়াছে। ইহা অশ্বঘোষের রচিত বলিয়া বিশ্বাস। তবে সেই অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিতের প্রণেতা অশ্বঘোষ নহেন।

বুদ্ধপালিত ও ভাববিবেক নাগার্জুন ও আর্যদেবের সমগোত্রীয়। নাগার্জুন ও আর্যদেবের রচিত গ্রন্থের টীকা ইঁহারা রচনা করেন। ইঁহাদের মধ্যে বুদ্ধপালিত প্রাসঙ্গিক মতবাদ (the method of leading an opponent and absurdum) ও ভাববিবেক স্বতন্ত্র মতবাদ (which seeks to prove the correction of the Mādhyamika doctrines by means of independent arguments) প্রবর্তিত করেন।

শিক্ষাসমুচ্চয় (The sum total of the Doctrine)—শান্তিদেব রচিত। ইহাতে অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া গেলেও স্বকীয়ত্বের অভাব আছে। মহাযান শিক্ষার পক্ষে এই গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শান্তিদেবের অপর গ্রন্থের নাম বোধিচর্যাবতার। শান্তরক্ষিত ৮ম শতাব্দীর লোক। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের নাম তত্ত্বসংগ্রহ। তিনি বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ মত আলোচনা করিয়া পর্যুদস্ত করিয়াছেন। তিনি নাম উল্লেখ করিয়া কাহারও মত খণ্ডন করেন নাই, কিন্তু তাঁহার শিষ্য কমলশীলের ভাষ্য হইতে ঐ সকল দার্শনিকদের নাম আমরা পাইয়া থাকি।

বৌদ্ধধর্মের উপর উত্তরকালের লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একাদশ শতাব্দীর অদ্বয়বজ্র। তিনি মহাযান ও বজ্রযানের উপর নীতিমূলক একাধিক কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন।

মাহাত্ম্য, স্তোত্র, ধারণী ও তন্ত্র

মহাযান সূত্র ও পুরাণের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। একখানি বৌদ্ধ পুরাণ পাওয়া যায় তাহার নাম স্বয়ম্ভূপুরাণ। ইহার স্বরূপ মাহাত্ম্যের ন্যায়। নেপালে তীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কীর্তন ইহাতে আছে। রাজা হর্ষবর্ধন প্রভাতমাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে সুপ্রভাতস্তোত্র নামক ২৪টি পদ্যাংশ রচনা করিয়াছেন। দেবমাহাত্ম্য কীর্তনাত্মক গ্রন্থ হইল পরমার্থনামসঙ্গীতি। অনুরূপ উল্লেখযোগ্য হইল সপ্তবুদ্ধস্তোত্র, ভক্তিশতক।

মহাযান সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অংশ হইল ধারণী (protective spells)। ইহা অথর্ববেদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রজ্ঞাপারমিতার ক্ষুদ্র সংস্করণগুলি ধারণী হিসাবে ব্যবহৃত হইত।

মন্ত্রযান ও বজ্রযান মহাযানের শাখাবিশেষ। তাহাদের উভয়ের মধ্যে কোন বাঁধাধরা সীমারেখা নাই। উহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে অধ্যাপক Winternitz বলেন—'Mantrayāna is the 'vehicle' in which the mantras, words, and syllables of mysterious power are the chief means of attaining salvation. Vajrayāna is the vehicle which leads men to salvation not only by using Mantras but by means of all things which are denoted by the word Vajra.' বজ্র শব্দের বহু অর্থ আমরা জানিতে পারি—ইহা কখন হীরক (diamond), কখন ইন্দ্রের অস্ত্র, কখন বা পৈশাচিক শক্তির বিরুদ্ধে মুনিদের অস্ত্র, কখন বা 'শূন্য' বিজ্ঞান, কখন বা পুরুষাঙ্গ। শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে যে—'The Vajrayāna is a queer mixture of monistic philosophy, magic and erotics with a small admixture of Buddhist ideas.'

যেমন মন্ত্রযান ও বজ্রযানের মধ্যে কোন ভেদজ্ঞাপক সীমারেখা সম্ভব নহে সেইরূপ মহাযান সূত্র ও তন্ত্রের মধ্যেও কোন সীমারেখা নাই।

বৌদ্ধতন্ত্রগুলি চারিশ্রেণীভুক্ত—১। ক্রিয়াতন্ত্র (ইহার মধ্যে গৃহনির্মাণ, প্রতিমা নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়ক তথ্য আছে) ২। চর্যাতন্ত্র (যোগ বিষয়ক তথ্যে পূর্ণ)। ৩। যোগতন্ত্র (যোগাভ্যাস বিষয়ক তন্ত্র)। ৪। অনুত্তরযোগতন্ত্র (গূঢ় তথ্য সংবলিত—dealing with higher mysticism)। ইহাদের প্রথম শ্রেণীতে পড়ে আধিকর্মপ্রদীপ ও অষ্টমী ব্রতবিধান।

তান্ত্রিক সাহিত্যের মধ্যে আমরা 'সাধনা' (magic ritual) দেখিতে পাই। ইহা দ্বারা শিখিতে পারা যায় কি করিয়া জনগণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। চিত্রকর ও শিল্পগণ ঐ বর্ণনা অনুসরণ করিয়া প্রতিমা নির্মাণ করিত। সাধনার পূর্ণ তথ্যাদি সাধনমালা বা সাধনসমুচ্চয় (বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত) গ্রন্থে পাওয়া যায়। মঞ্জুশ্রীমূলকল্প বলিয়া যে গ্রন্থ পাওয়া যায় তাহাতে গ্রন্থটি মহাবৈপুল্য মহাযান সূত্র বলিয়া বর্ণিত হইলেও তান্ত্রিকতার ছাপ স্পষ্ট।

এই সমস্ত তান্ত্রিক গ্রন্থগুলির মধ্যে নৈতিক দিক দিয়া নিন্দনীয় বস্তুর সহিত আমরা পরিচিত হই—'The Vajrayâna teaches a monistic Philosophy. Just as Śiva and Pārvatī are one, Buddha and his Śakti, Tārâ or Bhagavatī or Prajnā-pāramitâ, are one. This unity is symbolised figuratively by the intimate embrace of the Gods and goddesses who, for the most part, are merely male and female personifications of abstract ideas. The sexual union, in which the man is regarded as the incarnation of Buddha and the woman as that Bhagavatī in reality serves the same symbolical purpose as those pictures in the cult.' আসাম ও বঙ্গদেশে প্রধানতঃ তান্ত্রিকতা বিশেষ পরিমাণে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। তান্ত্রিক গ্রন্থগুলির সংস্কৃত ভাষার রূপ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে—'The Sanskrit in which the Tantras are written, is as a rule, just as barbarous as their contents. Inferior as they may be from the literary point of view, they are nevertheless extremely important owing to their great popularity over a wide area and the great influence which they exerted over the spiritual life of Western India and of considerable portions of Asia.'

প্রাকৃত ও অপভ্রংশ

ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি

প্রাকৃত ভাষা

'প্রাকৃত' বলিতে সাধারণতঃ আমরা জনসাধারণের কথ্য ও বোধগম্য ভাষা বুঝিয়া থাকি। সুদূর বৈদিক যুগে এই ভাষাই হয়ত জনসাধারণের কথ্যভাষা ছিল এবং ইহারই পরিমার্জিত বা শিষ্ট প্রথম রূপ হইতেছে "বৈদিক সংস্কৃত" এবং তাহার পর "সংস্কৃত"। এই বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও একথা অনেকটা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে মহাবীর যখন জনসাধারণের কথ্য ভাষা "অর্ধমাগধী" প্রাকৃতে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন ('ভগবং চ ণং অদ্ধমাগহীএ ভাসাএ-ধম্মমাইকখই') তখন প্রাকৃত ভাষা কথ্যভাষারূপে প্রচলিত ছিল। "প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্, তত্র ভবম্, তত আগতং বা প্রাকৃতম্"—বলিয়া পরবর্তীকালে প্রাকৃতের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়, তাহা নিতান্তই বৈয়াকরণসম্মত—ঐতিহাসিকসম্মত নহে। 'প্রকৃতি' শব্দের 'সংস্কৃত' অর্থে প্রয়োগ কোন অভিধানে দৃষ্ট হয় না। সেইজন্য অনেকে বলেন—"প্রকৃত্যা স্বভাবেন সিদ্ধমিতি প্রাকৃতম্" বা 'প্রাকৃতজনানাং ভাষা প্রাকৃতম্"। এই শেষোক্ত ব্যুৎপত্তিদ্বয়ই প্রাকৃত ভাষার লক্ষণ হিসাবে গণ্য হইয়া আসিতেছে। রুদ্রট্ও এই শেষোক্ত মতেরই সমর্থক। তিনি কাব্যালঙ্কারের ২।১২ শ্লোকের টীকায় নিম্নলিখিত মত পোষণ করিয়াছেন—

"সকলজগজ্জন্তূনাং ব্যাকরণাদিভিরনাহিতসংস্কারঃ সহজো বচনব্যাপারঃ প্রকৃতিঃ। তত্র ভবং সৈব বা প্রাকৃতম্। 'আরিসবয়ণে সিদ্ধং দেবাণং অদ্ধমাগহা বাণী' ইত্যাদি-বচনাদ্ বা প্রাক্ পূর্বং কৃতং প্রাকৃতং বালমহিলাদিসুবোধং সকলভাষানিবন্ধনভূতং বচনমুচ্যতে। মেঘনির্মুক্তজলম্ ইবৈকস্বরূপং তদেব চ দেশবিশেষাৎ সংস্কারকরণাচ্চ সমাসাদিতং বিশেষং সৎ সংস্কৃতাদ্যুত্তরবিভেদান্ আপ্নোতি। অতএব শাস্ত্রকৃতা প্রাকৃত-মাদৌ নির্দিষ্টং তদনু সংস্কৃতাদীনি। পাণিন্যাদিব্যাকরণোদিতশব্দলক্ষণেন সংস্করণাৎ সংস্কৃতমুচ্যতে।"

আসল কথা এই যে, সংস্কৃত হইতে যাহা বিকৃত (সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত নহে) অথচ সর্বসাধারণের কথ্যভাষারূপে যাহা স্বীকৃত, তাহাই সেই প্রাচীন কালে 'প্রাকৃত' ভাষা বলিয়া বিবেচিত হইত। সুতরাং ব্যাপক অর্থে 'প্রাকৃত' শব্দটি 'মধ্যভারতীয় আর্য' ভাষাসমূহকে বুঝাইয়া থাকে। এই অর্থে উহা—মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধ-মাগধী, পৈশাচী, চুলিকাপৈশাচী, অপভ্রংশ, এমন কি পালি ভাষাকেও বুঝাইয়া থাকে। ইহা ছাড়া অশোকের অনুশাসনে উৎকীর্ণ ভাষা, খরোষ্ঠী প্রাকৃত, নীয়া প্রাকৃত, প্রাকৃত-ধম্মপদ প্রভৃতিও ব্যাপক দৃষ্টিতে প্রাকৃত ভাষা। Weber, Jacobi এবং Pischel প্রভৃতি প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন যে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে প্রদেশগতভাবে এইরূপ বহু প্রাকৃত ভাষা বিদ্যমান ছিল। এই সকল ভাষায় সাহিত্যের নিদর্শন মিলিলেও, পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ খুব অল্পই পাওয়া যায়। কথিত আছে, শ্বেতাম্বর জৈনদের 'আগমসাহিত্য' মূলতঃ অর্ধমাগধী ভাষাতে এবং দিগম্বর জৈনদের 'আগমসাহিত্য' শৌরসেনী ভাষাতে রচিত হইয়াছে। অধিকাংশ প্রাকৃতকাব্য মহারাষ্ট্রী-ভাষাতে রচিত। সংস্কৃত নাটকে মাগধীভাষার পরিচয় পাইয়া থাকি মাত্র। দিগম্বর জৈনদের পুরাণ-কাব্যাদি গ্রন্থ অধিকাংশই অপভ্রংশ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। কথিত

আছে, অধুনালুপ্ত গুণাঢ্যের বৃহৎকথা পৈশাচীভাষায় রচিত হইয়াছিল। অধ্যাপক Maurice Bloomfield[১] দেখাইয়াছেন যে অজিতপ্রভসূরির 'শান্তিনাথচরিত্রে'র দুইটি শ্লোক (৪।৮৩, ৮৪) পৈশাচী ভাষায় লিখিত হইয়াছে। উড়িষ্যাধিবাসী মার্কণ্ডেয় কবির 'প্রাকৃতসর্বস্বে' কেকয়পৈশাচী, ব্রাচড়, নাগর প্রভৃতি বহু প্রকার প্রাকৃত ভাষার নিদর্শন পাইয়া থাকি। কিন্তু এই সমস্ত ভাষায় একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল কিনা, সেই বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ অদ্যাপি পর্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই।

প্রাকৃত ভাষার বিভাগ

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে বহু প্রকার প্রাকৃত ভাষা বিদ্যমান ছিল। এই সমস্ত ভাষার নিদর্শন অশোকের অনুশাসনে, তৎপরে তাম্রপট্টে ও শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ প্রত্নলিপিতে ও জৈন আগমগ্রন্থে দৃষ্ট হয়। সুতরাং সর্বসাকল্যে ব্যাপকভাবে প্রাকৃত ভাষাকে নিম্নলিখিত বিভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) বৈয়াকরণগণ-উল্লিখিত ঃ—

মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী, পৈশাচী, চূলিকাপৈশাচী ও অপভ্রংশ। ইহা ছাড়া, মার্কণ্ডেয়ের "প্রাকৃতসর্বস্বে" আরও বহু প্রকার প্রাকৃত ভাষা দৃষ্ট হয়; যথা—প্রাচ্যা, আবন্তী, শাকারী, চাণ্ডালী, শাবরী, আভীরিকা, টাক্কী (?), (ঢক্কী), নাগর, ব্রাচড়, উপনাগর, কৈকেয়, পাঞ্চাল।

এই সকল ভাষার লক্ষণাবলী বররুচির প্রাকৃতপ্রকাশে, হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণে, মার্কণ্ডেয়ের প্রাকৃতসর্বস্বে দেওয়া আছে।

(খ) শিলালেখে উৎকীর্ণ ঃ—

অশোকানুশাসন, খরোষ্ঠী, নীয়া ও খোটান প্রাকৃত, প্রাকৃত ধম্মপদ প্রভৃতি।

(গ) সঙ্কর প্রাকৃত ঃ—

বৌদ্ধ সাহিত্যে এক জাতীয় প্রাকৃত ভাষা দৃষ্ট হয়, যাহার মধ্যে পালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃতের ছাপ আছে। এই জাতীয় ভাষার নাম সঙ্কর প্রাকৃত।

(ঘ) গাথা-প্রাকৃত ঃ—

এই গাথা-প্রাকৃতও বৌদ্ধ সাহিত্যে দৃষ্ট হয়। 'ললিত-বিস্তারা'দি গ্রন্থ ইহার অন্তর্ভুক্ত।

ইহা ছাড়া, কতকগুলি প্রাকৃতের নাম পাওয়া যায় মাত্র। যথা—পাশ্চাত্ত্যা, উদীচী, দাক্ষিণাত্যা, শ্রাবস্তী, বাহ্লীকী, রন্তিকা, পাণ্ড্র, কৌণ্ডল প্রভৃতি।

প্রাকৃত ভাষার স্থান

ভারতীয় কবিগণ প্রাকৃত ভাষার প্রশংসা বিভিন্নভাবে করিয়াছেন। নিম্নে কয়েকটির উল্লেখ করা গেল, ইহা হইতে বোঝা যাইবে যে প্রাচীন ভারতের কবিগণ কিভাবে প্রাকৃত ভাষার স্থান নির্দেশ করিয়াছেন—

(১) সাতবাহন তাঁহার গাথা সপ্তশতীতে বলিয়াছেন—

"অমিঅং পাউঅ-কব্বং পঢিউং সোউং অ জে ণ আণন্তি।
কামস্স তত্ততন্তিং কুণন্তি তে কহ° ণ লজ্জন্তি॥" (১।২)

অর্থাৎ, প্রাকৃতকাব্য অমৃতের ন্যায়, যাহারা পাঠ করিতে বা শুনিতে জানেন না, কামশাস্ত্রের তত্ত্বচিন্তা করিতে প্রবৃত্ত তাহারা কেন লজ্জিত হন না।

১। *JAOS*, Vol. 44, p. 169. Two Alleged stanzas in Paiśaci Prakrit.

(২) রাজশেখর তাঁহার কর্পূরমঞ্জরীতে বলিয়াছেন—

পরুসা সক্কয়বন্ধা পাউঅবন্ধো বি হোই সুউমারো।
পুরিস-মহিলাণং জেত্তিঅ-মিহন্তরং তেত্তিঅ-মিমাণং॥—নির্ণয় সাগর (১।৮)

অর্থাৎ, সংস্কৃত ভাষা পরুষ (কর্কশ) আর প্রাকৃত ভাষা সুকোমল। পুরুষ ও মহিলার মধ্যে যে প্রভেদ, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মধ্যে সেই প্রভেদ।

(৩) বাক্‌পতিরাজ তাঁহার গৌড়বহে বলিয়াছেন—

ণবমথ-দংসণং সংণিবেস-সিসিরাও বন্ধ-রিদ্ধীআ।
অবিরলমিণ মো আ-ভুবণ-বন্ধমিহ ণবর পয়ম্মি॥ (৯২)

অর্থাৎ,

নতুন বিষয়, সন্নিবেশসৌষ্ঠবে কোমল (অর্থাৎ মধুর), বন্ধনগুণে সমৃদ্ধ—এই সকল সৃষ্টিকাল হইতে কেবল প্রাকৃতেই পাওয়া যায়।

তিনি আরও বলিয়াছেন—

সয়লাও ইমং বায়া বিসন্তি এত্তো য ণেন্তি বায়াও।
এন্তি সমুদ্দংচিয় ণেন্তি সায়রাসোচ্চিয় জলাইং॥ (৯৩)

অর্থাৎ,

সকল ভাষাই প্রাকৃতে প্রবেশ করে এবং প্রাকৃত হইতেই আবার সকল ভাষার উৎপত্তি। যেমন, সকল জল সমুদ্রেই প্রবেশ করে, আবার সমুদ্র থেকেই তাহার উৎপত্তি হয়।

তিনি আরও বলিয়াছেন—

হরিস-বিসেসো বিয়সাবও য মউলাবও য অচ্ছীণ।
ইহ বহি-হুত্তো অন্তো-মুহো য হিয়অস্‌স বিপ্‌ফুরই॥ (৯৪)

অর্থাৎ,

প্রাকৃত ভাষা অধ্যয়নে হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব আনন্দ অনুভূত হয়; যাহার ফলে চক্ষুর্দ্বয় একবার প্রসারিত ও আর একবার মুদ্রিত হয়। আনন্দও একবার অভ্যন্তরে আর একবার বহির্ভাগে স্ফুরিত হয়।

(৪) বজ্জালগ্‌গে আছে—

ললিএ মহুরক্‌খরএ জুবঈজণবল্লহে সসিংগারে।
সন্তে পাইঅকব্বে কো সক্কই সক্কঅং পঢিউম্‌॥

অর্থাৎ,

ললিতমধুর অক্ষরযুক্ত, যুবতীজনের বল্লভস্বরূপ, শৃঙ্গারযুক্ত প্রাকৃতকাব্য থাকিতে, কে সংস্কৃত পড়িতে চায়!

(৫) মহেশ্বর সূরির পঞ্চমীমাহাত্ম্যে আছে—

গূঢ়থদেসিরহিয়ং সুললিয়বন্নেহিং বিরইয়ং রম্মং।
পাইয়কব্বং লোএ কস্‌স ন হিয়য়ং সুহাবেই?॥

অর্থাৎ,

গূঢ়ার্থ, দেশীশব্দরহিত, সুললিত পদদ্বারা রচিত এই রমণীয় প্রাকৃত কাব্য (পাঠ করিতে) কাহার চিত্ত না সুখে উল্লসিত হয়?

এইরূপে, ভূষণভট্টের পুত্র কুতূহলের লীলাবতীকথা, হরিভদ্রসূরির মল্লিনাথ-চরিত প্রভৃতি বহু গ্রন্থে প্রাকৃত ভাষায় প্রশংসা বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে অধিক উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন।

প্রাকৃত শিলালেখ-সাহিত্য

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ব্যাপক অর্থে 'প্রাকৃত' শব্দটি মধ্যভারতীয় আর্য ভাষা-সমূহকে বুঝাইয়া থাকে। এই মধ্যভারতীয় আর্য বা প্রাকৃত ভাষার তিনটি[২] সুস্পষ্ট স্তর দেখিতে পাই।

প্রথম স্তরের (আনুঃ খৃঃ পূঃ ৬০০—খৃঃ পূঃ ২০০ শতক) সাহিত্যের নিদর্শন পাই অশোকের অনুশাসনাবলীতে, খৃষ্টপূর্বাব্দ অন্যান্য প্রত্নলিপিতে এবং হীনযান মতাবলম্বী বৌদ্ধদের প্রাচীন পালি সাহিত্যে। অশোকের শিলালেখসমূহের ভাষাকে মোটামুটি তিন-ভাগে ভাগ করা যায়—(১) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের শাহ্বাজগড়ী এবং মান্সেহ্রা অনুশাসন, (২) দক্ষিণ-পশ্চিমের গির্নার অনুশাসন এবং (৩) প্রাচ্য অঞ্চলের কালসী, ধৌলী, জৌগড় ও অন্যান্য ক্ষুদ্র অনুশাসনাবলী। উত্তর-পশ্চিমের অনুশাসন ছাড়া আর সকলই ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ। অশোকের সমসাময়িক রামগড় পাহাড়ের যোগীমারা গুহালেখ (যাহাতে 'সুতনুকা'র উল্লেখ আছে) ক্ষুদ্র হইলেও সাহিত্যের ইতিহাসে সবিশেষ মূল্যবান্। এই খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকেই উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলায় মহাস্থান অঞ্চলের শিলালেখ, উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর ও বস্তীজেলার ব্রাহ্মী অক্ষরের শিলালেখ আজও সাহিত্যের দরবারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয়-প্রথম শতাব্দীর বেসনগরের গরুড়স্তম্ভলিপি, উদয়গিরি পাহাড়ের হাতীগুম্ফার দ্বারদেশে খারবেলের অনুশাসন, তক্ষশীলার শিলালেখ প্রভৃতি আজও প্রাকৃত সাহিত্যের নিদর্শন হিসাবে দাঁড়াইয়া আছে।

প্রাকৃতের **মধ্যস্তরের** (আনুঃ খৃঃ পূঃ ২০০—খৃঃ ৬০০) প্রথম উপস্তরের (খৃঃ পূঃ ২০০—খৃঃ ১০০) সাহিত্যের নিদর্শন পাই তক্ষশীলার কল্ওয়ান্ প্রত্নলিপিতে, খরোষ্ঠী ধম্মপদে ও অশ্বঘোষের নাটকে। অশ্বঘোষের নাটকে মাগধী, শৌরসেনী ও অর্ধমাগধীর প্রাচীনতম নিদর্শন পাই। মধ্য এশিয়ার খোটানে খরোষ্ঠী লিপিতে প্রাকৃত ভাষায় লেখা এই 'প্রাকৃত' ধম্মপদ প্রাকৃত সাহিত্যের একটি অভিনব আবিষ্কার। দ্বিতীয় উপস্তরের (আনুঃ খৃঃ ১০০-৩০০) প্রাকৃত সাহিত্যের নিদর্শন রহিয়াছে শক-কুষাণদের খরোষ্ঠী প্রত্নলিপিতে এবং চীনীয় ও তুর্কিস্তানের অন্তর্গত প্রাচীন শান্শান্ রাজ্যের নিয়া নামক স্থানে প্রাপ্ত 'নীয়া' প্রাকৃতে। মধ্যস্তরের তৃতীয় উপস্তর (আনুঃ খৃঃ ৩০০—৬০০) **সাহিত্যিক প্রাকৃত** এবং বৌদ্ধসংস্কৃতের দ্বারা পরিপুষ্ট।

তৃতীয় স্তরে (খৃঃ ৬০০-১০০০) অপভ্রংশ সাহিত্যের বিকাশ হয়। আসলে **অপভ্রংশ** শব্দটি খুব প্রাচীন। পাণিনি, কাত্যায়ন প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ "ভাষা" শব্দ প্রয়োগের দ্বারা এই অপভ্রংশ ভাষার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি সর্বপ্রথম "অপভ্রংশ" শব্দের প্রয়োগ করিলেন। তাঁহার মতে—

"একৈকস্য হি শব্দস্য বহবোপভ্রংশাঃ। তদ্যথা গৌরিত্যস্য শব্দস্য গাবী গোণী গোতা গোপোতালিকেত্যেবমাদয়োপভ্রংশাঃ॥" (মহাভাষ্য ১।১।১)

এই অপভ্রংশ শব্দের পর্যায়বাচক শব্দ হিসাবেই 'অপশব্দ', 'অপভ্রষ্ট', 'বিভ্রষ্ট' প্রভৃতি প্রয়োগ হইয়া আসিতেছে। আসল কথা এই যে, সংস্কৃত হইতে যাহা বিকৃত অথচ সর্বসাধারণের কথ্যভাষারূপে যাহা স্বীকৃত, তাহাই সেই প্রাচীনকালে অপভ্রংশ ভাষা বলিয়া বিবেচিত হইত। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে, ভামহ, দণ্ডী, রুদ্রট, রাজশেখর, ধনঞ্জয়, ভোজ প্রভৃতি আলঙ্কারিকদের গ্রন্থে অপভ্রংশ ভাষা সাহিত্য হিসাবে বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছে। কালিদাসের "বিক্রমোর্বশী" নাটকের চতুর্থ অঙ্কে অপভ্রংশ সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই।

২। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ODBL*, ১৯২৬, কলিকাতা; শ্রীসুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত (শেষ সংস্করণ) ১৯৬০।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সুদূর প্রাচীন কাল হইতেই ভাষার নিদর্শন পাওয়া গেলেও, **প্রাকৃত সাহিত্যের প্রথম এবং প্রাকৃত পরিচয় পাইয়া থাকি সাহিত্যিক প্রাকৃতে; অর্থাৎ মধ্যস্তরের তৃতীয় উপস্তর হইতে।** 'প্রাকৃত ভাষা' বলিতে এই সাহিত্যিক প্রাকৃতকেই বুঝাইয়া থাকে। যদিও ব্যাপক দৃষ্টিতে উহা সকল মধ্যভারতীয়-আর্যভাষা, তথাপি জৈনদের আগম সাহিত্যের ভাষা, নাটকের নারী ও নিম্নশ্রেণীর পাত্র-পাত্রীর ভাষা, গাথাসপ্তশতী, সেতুবন্ধ, গৌড়বধ প্রভৃতির ভাষাই প্রাকৃত নামে পরিচিত। প্রাকৃত বৈয়াকরণ-গণ, সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে, এই সাহিত্যিক প্রাকৃতেরই ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন এবং ইহাতে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী, পৈশাচী, চূলিকাপৈশাচী এবং অপভ্রংশ প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষার লক্ষণাবলী প্রদান করিয়াছেন। আসলে, এই সাহিত্যিক প্রাকৃত ঠিক কথ্যভাষা ছিল না; ইহা ছিল সংস্কৃতের আদর্শে গড়া একটি কৃত্রিম ভাষা। এই সাহিত্যিক প্রাকৃতই খৃষ্টাব্দ পঞ্চম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ[৩] শতক পর্যন্ত বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তারিত হইয়া সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতিযোগিতারূপে বিরাজমান ছিল।

ক. জৈন আগম সাহিত্য

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ প্রয়োজন যে প্রাকৃত সাহিত্য মূলতঃ জৈনসম্প্রদায় কর্তৃক পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত। জৈনেতর লোকেরা খুব অল্প গ্রন্থই প্রাকৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেইজন্যই জৈনদের ধর্ম বা আগম গ্রন্থেই প্রাকৃত সাহিত্যের প্রথম-পরিচয় পাইয়া থাকি। মহাবীর মুখ-নিঃসৃত বাণী তাঁহার শিষ্য ও গণধরগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ হওয়ার ফলে এই জৈন 'আগম সাহিত্যে'র উৎপত্তি হইয়াছে। জৈনগণ তাঁহাদের এই আগম সাহিত্যকে 'সিদ্ধান্ত' নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। এই আগম সাহিত্যের রচনাকাল সম্বন্ধে বহুবিধ মতভেদ থাকিলেও, ইহার রচনা যে খ্রীষ্টাব্দ পঞ্চম শতকের মধ্যে সমাপ্ত হইয়াছিল, সেই বিষয়ে সকলেই একমত।

জৈন আগম সাহিত্যের উৎপত্তি[৪]

শ্বেতাম্বর জৈনদের মতে শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের নির্বাণ লাভের (খৃঃ পূঃ ৫২৭ অব্দে) প্রায় দুই শতাব্দী পরে মগধাধিপতি মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে (খৃঃ পূঃ ৩১৮—১৭ অব্দে) মগধদেশে সে দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তাহাতে চতুর্দশ পূর্ববিদ্ স্থবির ভদ্রবাহুর অধিনায়কত্বে একদল জৈন সাধু দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অপর আর একদল মগধ দেশেই চতুর্দশ পূর্ববিদ্ স্থূলভদ্রের অধিনায়কত্বে রহিয়া গেলেন। দুর্ভিক্ষের শেষবর্ষে ভদ্রবাহুর অনুপস্থিতিতে স্থূলভদ্র পাটলিপুত্রনগরে এক সভা আহ্বান করেন।

৩। Montgomery Martin : *History of Eastern India*, 1838, Vol. II. P. 713ff.

৪। Winternitz : *History of Indian Literature*. Vol-II. 1933, Calcutta; Hoernle, A. F. R. *Uvasagadasao*, Vol. II 1888, Calcutta; Weber. *Indische Studien*, Vols. XVI and XVII. Dr. Klatt : *Historical Records of the Jainas*, I. A. Vol-XI. P. 245, Jacobi, S. B. E. XXII & XLV. Kalpasutra, Intro. P. 14. Journal of the German Oriental Society Vol-VII. Entstehung der S'vetāmbara and Digambara Sekten (Ibid, Journal Vol.-XXXVIII. pp, 1—42) : Bühler, on the authenticity of the Jain tradition, (Vienna Oriental Journal, Vol. I No. 3 and Vol. II. No. 2).

সেই সভায় 'চতুর্দশ পূর্ব' হইতে একাদশ অঙ্গ গ্রন্থ ও 'দৃষ্টিবাদ' রচিত হইল। দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইলে পর যখন ভদ্রবাহু দলসহ মগধে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন তিনি বস্ত্র পরিহিত মগধস্থিত দল এবং বিবস্ত্র কর্ণাটস্থিত দলের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য প্রত্যক্ষ করিলেন, এবং মগধস্থিত দলের মতবাদ ও আচার পদ্ধতি মহাবীর পন্থার প্রতিকূল বিবেচিত হওয়ায়, তাহা স্বীকার করিতে অসম্মত হইলেন। ফলে, 'শ্বেতাম্বর' ও 'দিগম্বর' সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইল। এইরূপে এই দুই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইলে পর, মহাবীরের নির্বাণ লাভের ৯৮০ (বা ৯৯৩) বৎসর গত হইলে (সম্ভবতঃ ৪৫৪ বা ৪৬৭ খৃঃ), যখন স্থূলভদ্র পরিকল্পিত শ্বেতাম্বর জৈনদের অঙ্গ গ্রন্থাদি বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইতেছিল, তখন গুজরাটের বলভী নগরীতে দেবর্ধিগণি ক্ষমাশ্রমণের নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার সভা আহূত হইল। 'দৃষ্টিবাদ' ইতিপূর্বেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং উহা বাদে অপরাপর অঙ্গ গ্রন্থসমূহের পুনর্বার সংস্কার করা হইল। সেই সংস্কৃত অঙ্গগ্রন্থাদিই বর্তমানকাল পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

শ্বেতাম্বর আগম গ্রন্থ[৫]

প্রাগুক্ত বিবরণ হইতে বোঝা যায় যে যদিও মূলতঃ উৎপত্তিস্থল এক, তথাপি শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর আগম গ্রন্থসমূহের মধ্যে একটু পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। শ্বেতাম্বর জৈনদের মতে দ্বাদশ অঙ্গগ্রন্থ 'দৃষ্টিবাদ' লুপ্ত, আর দিগম্বরেরা বলেন, 'দৃষ্টিবাদ' তাঁহাদের দ্বারা রক্ষিত এবং এই দিগম্বর সম্প্রদায় কর্তৃক রক্ষিত গ্রন্থই বর্তমানে 'দিগম্বর জৈনাগম' বলিয়া বিখ্যাত। সে যাহাই হউক, শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর গ্রন্থনিচয়ের সংমিশ্রণে জৈনদের আগমগ্রন্থ পরস্পরের পরিপূরক ও সম্পূরক হইয়াছে। সুতরাং 'দৃষ্টিবাদ' বাদে শ্বেতাম্বর জৈনদের আগম গ্রন্থের বর্তমান সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ। নিম্নে ইহাদের সংস্কৃত নাম দেওয়া হইল ঃ—

(ক) **একাদশ অঙ্গগ্রন্থ**—আচারাঙ্গসূত্র, সূত্রকৃতাঙ্গসূত্র, স্থানাঙ্গসূত্র, সমবায়াঙ্গসূত্র, ভগবতীব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তি, জ্ঞাতৃধর্মকথা, উপাসকদশাসূত্র, অন্তকৃদ্-দশাসূত্র, অনুত্তরৌপপাতিকদশাসূত্র, প্রশ্নব্যাকরণ ও বিপাকশ্রুত।

(খ) **দ্বাদশ উপাঙ্গ গ্রন্থ**—ঔপপাতিকদশাসূত্র, রাজপ্রাশ্নীয়, জীবাভিগম, প্রজ্ঞাপনাসূত্র, সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি, জম্বুদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি, চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি, নিরয়াবলী, কল্পাবতংসিকা, পুষ্পিকা, পুষ্পিচূলিকা ও বৃষ্ণিদশা।

(গ) **দশ প্রকীর্ণ গ্রন্থ**—চতুঃশরণ, আতুরপ্রত্যাখ্যান, ভক্তপরীক্ষা, সংস্তার, তন্দুলবৈতালিক, চন্দ্রাবিদ্যা, দেবেন্দ্রস্তব, গণিতবিদ্যা, মহাপ্রত্যাখ্যান ও বীরস্তব।

(ঘ) **ষট্ ছেদসূত্র**—নিশীথ, মহানিশীথ, ব্যবহার, আচারদশা বা দশাশ্রুত স্কন্ধ, কল্পসূত্র, জিতকল্প বা পঞ্চকল্প।

(ঙ) **চার মূলসূত্র**—উত্তরাধ্যয়নসূত্র, আবশ্যকসূত্র, দশবৈতালিকসূত্র বা ওঘনির্যুক্তি, পাক্ষিকসূত্র বা পিন্ডনির্যুক্তি।

(চ) **স্বয়ংপূর্ণ গ্রন্থদ্বয়**—নান্দীসূত্র ও অনুযোগদ্বার।

দিগম্বর আগম গ্রন্থ[৬]

দিগম্বর সম্প্রদায় উপরি-উক্ত অঙ্গগ্রন্থের নাম স্বীকার করেন, কিন্তু ঐ নামে যে অঙ্গগ্রন্থ বিদ্যমান, তাহা স্বীকার করেন না। পরন্তু তাঁহারা 'দৃষ্টিবাদে'র অস্তিত্বে

৫। Winternitz : *Hist. of Ind. Lit.* Vol. II. P. 428ff.

৬। অধ্যাপক শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাকৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ১৯৬০ কলিকাতা, পৃঃ ১-৩।

বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের মতে 'দৃষ্টিবাদ' পাঁচভাগে বিভক্ত ঃ—পরিকর্ম, সূত্র, প্রথমানুযোগ, পূর্বগত এবং চূর্ণিকা। ইহাদের মধ্যে 'পূর্বগত' ছাড়া অপর চারিটির বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। পূর্বগত আবার চৌদ্দটি উপবিভাগে বিভক্ত; যথা—উৎপাদপূর্ব, অগ্রায়ণীয়, বীর্যপ্রবাদ, অস্তি-নাস্তি-প্রবাদ, জ্ঞানপ্রবাদ, সত্যপ্রবাদ, আত্ম-প্রবাদ, কর্মপ্রবাদ, প্রত্যাখ্যান, বিদ্যানুবাদ, কল্যাণপ্রবাদ, প্রাণবায়, ক্রিয়াবিশাল এবং লোক-বিন্দুসার। এই সমস্ত বিষয়ের বিবরণ গুণধরাচার্যের কসায়পাহুড় প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়। এইগুলি ছাড়া অন্য যে সমস্ত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, সেইগুলি এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

গুণধরাচার্য কর্তৃক বিরচিত **'কসায়পাহুড়'** একটি দিগম্বর জৈনধর্মগ্রন্থ। ইহার রচনাকাল আনুমানিক খৃঃ প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে। এই গ্রন্থে ক্রোধাদিকষায়ের রাগদ্বেষাদিরূপে পরিণতি, তাহাদের প্রকৃতি, অবস্থান, অনুভাগ, প্রদেশগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আছে। এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম "পেজ্জদোসপাহুড়" (পেজ্জ ∠ প্রেয়স্ = রাগ; দোস ∠ দ্বেষ; এবং পাহুড় ∠ প্রাভৃত)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই গ্রন্থে ক্রোধাদি চারটি এবং হাস্যাদি নয়টি রাগদ্বেষাদির কথা বলা হইয়াছে বলিয়া, এই গ্রন্থের নাম রাখা হইয়াছে "পেজ্জদোসপাহুড়"। নবম শতাব্দীর বীরসেনাচার্য ইহার 'জয়ধবলা' নামে টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন এবং **যতিবৃষভাচার্য** চূর্ণিসূত্রের প্রণেতা। ইঁহার গ্রন্থখানিও 'জয়ধবলা' নামে বিখ্যাত।

পুষ্পদন্ত-ভূতবলি প্রণীত **'ষট্খণ্ডাগম'** আর একটি প্রাচীন দিগম্বর জৈন ধর্মগ্রন্থ। ইহা (জৈন) শৌরসেনী ভাষায় রচিত। মধ্যে মধ্যে অর্ধমাগধী ও মাগধী ভাষার প্রভাব দৃষ্ট হয়। ইহার রচনাকাল সম্ভবতঃ খৃঃ দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে। গ্রন্থখানি দর্শনবিষয়ক এবং কর্মপদ্ধতি দ্বারা প্রভাবান্বিত। ইহা ছয় খণ্ডে বিভক্ত ঃ—(১) জীবস্থান, (২) ক্ষুল্লকবন্ধ, (৩) বন্ধস্বামিত্ববিষয়, (৪) বেদনা, (৫) বর্গনা ও (৬) মহাবন্ধ। পুষ্পদন্ত প্রথম ১১৭টি সূত্র রচনা করে এবং তৎপরে ভূতবলি অবশিষ্টাংশ রচনা করেন। ইহাতে সর্বসাকল্যে ৬০০০ সূত্র দৃষ্ট হয়। বীরসেন কর্তৃক বিরচিত 'ধবলা' নামে ইহার একটি টীকা আছে। সেইজন্য গ্রন্থখানি 'ধবলা' নামেও বিখ্যাত।

ষট্খণ্ডাগমকে যে ছয়ভাগে ভাগ করা হয়; তাহার অন্তিমভাগের নাম **'মহাবন্ধ'**। সেই 'মহাবন্ধ' গ্রন্থ এইরূপ বিশাল যে কালক্রমে উহা ষট্খণ্ডাগম হইতে পৃথক হইয়া গেল এবং পৃথক গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইল। এই অংশের টীকাও পৃথক্। টীকার নাম 'মহাধবলা'। সেইজন্য টীকার নামানুসারে গ্রন্থখানিকে 'মহাধবলা' নামেও অভিহিত করা হয়। শ্রীভূতবলি আচার্য গ্রন্থের প্রণেতা। রচনাকাল আনুমানিক দ্বিতীয় শতক। গ্রন্থখানি জৈন শৌরসেনী ভাষায় লিখিত। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল জীবের বন্ধন। কিসে জীব বন্ধন দোষ হইতে মুক্তি পাইতে পারে এবং কত প্রকারের বন্ধন আছে ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা ইহাতে আছে।

শ্রীযতিবৃষভাচার্য কর্তৃক বিরচিত প্রাকৃতভাষায় লিখিত **'ত্রিলোকপ্রজ্ঞপ্তি'** আর একটি প্রাচীন দিগম্বর জৈন গ্রন্থ। ইহাতে ভূবিবরণ, বিশ্বনির্মাণ কৌশল বিষয়ক বহু তথ্যমূলক তত্ত্ব আছে। প্রসঙ্গক্রমে, ইহার মধ্যে জৈনদের পৌরাণিক কাহিনী কালনিরূপণ এবং বিভিন্ন মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। জম্বুদ্বীপ, ধাতকীখণ্ড-দ্বীপ, পুষ্করদ্বীপ প্রভৃতি বহুদ্বীপের এবং 'সুসমা-দুসমা' প্রভৃতি ছয় প্রকার ও ততোধিক জৈন কালচক্রের বিস্তৃত বিবরণ ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। এক কথায়, জৈন-শাস্ত্র ও তত্ত্ব উত্তমরূপে আয়ত্ত করিতে হইলে, গ্রন্থখানি পাঠ করা আবশ্যক। গ্রন্থখানি

মহাধিকার দ্বারা বিভক্ত। গ্রন্থখানি অতি প্রাচীন, কারণ 'ধবলানাম্নী' টীকায় ইহার উল্লেখ আছে।

দিগম্বর জৈনদের আগমগ্রন্থ বিশাল। কিন্তু এখন পর্যন্ত খুব বেশী মুদ্রিত হয় নাই। অধুনা বহু পন্ডিতদের দৃষ্টি এইদিকে পড়িয়াছে।

খ. জৈন আগম-বহির্ভূত সাহিত্য[৭]

নিজ্জুত্তি

জৈনগণ স্বীয় আগম গ্রন্থসমূহকে বোঝাইবার জন্য সেই সেই গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ব্যাখ্যাগ্রন্থই পরবর্তীকালে এক সাহিত্যে পরিণত হইল। সেই জাতীয় সাহিত্যের নাম 'নিজ্জুত্তি' (সং—নির্যুক্তি)। বেদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যেরূপ নিরুক্তের উৎপত্তি, সেইরূপ জৈনাগম সাহিত্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই জাতীয় নির্যুক্তি গ্রন্থের উৎপত্তি।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আগম গ্রন্থের রচনাকালেই বা কিছু পরে এই নির্যুক্তি গ্রন্থের আবির্ভাব। কারণ, আগমগ্রন্থের মধ্যেই দেখা যায়, দুইটি নির্যুক্তি গ্রন্থের উৎপত্তি—পিন্ডনির্যুক্তি এবং ওঘনির্যুক্তি। বর্তমানে কেবল শ্বেতাম্বর জৈন আগম গ্রন্থের নিম্নলিখিত নির্যুক্তি দৃষ্ট হয় ঃ—

(১) আচারাঙ্গসূত্রের, (২) সূত্রকৃতাঙ্গসূত্রের, (৩) সূর্যপ্রজ্ঞপ্তির, (৪) আবশ্যক-সূত্রের, (৫) উত্তরাধ্যয়নের, (৬) দশাশ্রুতস্কন্ধের, (৭) কল্পসূত্রের, (৮) দশবৈতালিক-সূত্রের, (৯) ব্যবহারসূত্রের, (১০) ঋষিবাসিষ্ঠসূত্রের নির্যুক্তি।

ভদ্রবাহুকে এই জাতীয় গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া ধরা হয়। নির্যুক্তিগ্রন্থসমূহ অর্যাছন্দে জৈন মহারাষ্ট্রী ভাষায় রচিত। আচার্যগণ এই জাতীয় নির্যুক্তি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। পরবর্তীকালে এই নিযুক্তিই বৃহৎ আকার প্রাপ্ত হইয়া চূর্ণী ও ভাষ্য গ্রন্থে পরিণত হইয়া, নতুন সাহিত্যের আকার ধারণ করিয়াছে। আবার তাহা হইতে টীকা, বৃত্তি, অবচূর্ণী ইত্যাদির উৎপত্তি হইয়াছে।

চুন্নী (চূর্ণি)

যেমন শ্বেতাম্বরদের নির্যুক্তি তেমনি দিগম্বরদের চূর্ণিসূত্র। দিগম্বরেরা তাঁহাদের আগম গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই চূর্ণির উৎপত্তি করিলেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। নির্যুক্তি হইল একটি কঠিন বা পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা, আর চূর্ণি হইল শব্দের এবং সূত্রের উভয়ের ব্যাখ্যা। নির্যুক্তি পদ্যাত্মক; আর চূর্ণি গদ্যাত্মক। চূর্ণিসূত্রকে অবলম্বন করিয়াই পরবর্তীকালে ভাষ্য, টীকা প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। বর্তমানে নিম্নলিখিত চূর্ণি দৃষ্ট হয়—

(১) গুণধর প্রণীত—কসায়পাহুড়চুন্নি, (২) শিবশর্মার কম্মপয়ডীচুন্নি (কর্মপ্রকৃতি চূর্ণি), (৩) শিবশর্মার শতকচূর্ণি (বা বন্ধশতকচূর্ণি), (৪) সিত্তরীচুন্নি (সপ্ততিকা-চূর্ণি)। ইহা ছাড়া, লঘুশতকচূর্ণি এবং বৃহচ্ছতকচূর্ণি প্রভৃতিও দৃষ্ট হয়। প্রসঙ্গত বলা আবশ্যক যে, শ্বেতাম্বর গ্রন্থেরও চূর্ণি দৃষ্ট হয়। যথা—নিশীথচূর্ণি, আবশ্যক-চূর্ণি, দশবৈতালিকচূর্ণি ইত্যাদি।

গ. প্রাকৃত রামায়ণ[৮]

যতদূর জানা যায়, প্রাকৃতকাব্য জগতে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ হইতেছে বিমলসূরিকৃত **'পউমচরিঅম্'** (পদ্মচরিতম্)। গ্রন্থখানি জৈন মহারাষ্ট্রী ভাষায়

৭। প্রাকৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, পৃঃ ৪-৫

৮। প্রাকৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, পৃঃ ৫-৬

আর্যাছন্দে রামায়ণের বিষয় অবলম্বনে লিখিত। লেখকের মতানুসারে গ্রন্থের রচনা-কাল মহাবীরের নির্বাণলাভের ৫৩০ বৎসর পরে (অর্থাৎ খৃঃ ৪ অব্দে)। ১১৮টি সর্গে কিঞ্চিৎ অধিক ৯০০০ শ্লোকে গ্রন্থকার পদ্মের (অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের) জীবনচরিত বর্ণনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে রামচন্দ্রের নাম রাখা হইয়াছে পদ্ম। ঐরূপে সীতা, হনুমান, সুগ্রীব প্রভৃতিরও নামাবলীর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। লেখক বহু ব্যাপারেই বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই। সমস্ত ঘটনার মধ্যেই একটা জৈনভাবের পরিচয় দিয়াছেন। বিমলসূরির এই গ্রন্থখানি পাঠে বিমল আনন্দ অনুভূত হয়। গ্রন্থখানিকে অনেকে 'জৈন রামায়ণ'ও বলিয়া থাকেন। মহাবীরের প্রধান শিষ্য গৌতম (গোয়ম) মহাবীরের উপদেশানুসারে এই কাব্যখানি শ্রেণিকদিগকে (সেণিয়) শুনাইয়াছেন। সুতরাং গোয়মই হইতেছেন প্রকৃতপক্ষে এই কাব্যের বক্তা।

স্বয়ম্ভূদেবের **'পউমচরিউ'** আর একটি প্রাকৃত রামায়ণ। ইহা অপভ্রংশ ভাষায় রচিত। ইহাতেও রামের অর্থাৎ পদ্মের কার্যাবলী বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির রচনাকাল ৬৭৭-৭৮৩ খৃঃ। এই গ্রন্থে ৫৬টি সন্ধি আছে।

পরবর্তীকালের 'ধাহিলের' (বা দাহিলের) **'পউমসিরীচরিউ'**ও এই শ্রেণীর কাব্য।

ঘ. প্রাকৃত মহাভারত[৯]

প্রাকৃত ভাষায় আর একটি মহাকাব্য হইতেছে, ধবলকবি কর্তৃক রচিত প্রাকৃত মহাভারত **'হরিবংশপুরাণ'**। গ্রন্থের রচনাকাল খৃষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দী। মহাভারতের কাহিনী সর্বাংশে অনুসৃত না হইলেও লেখক ইহাতে কৃষ্ণ ও বলরামের এবং কুরু ও পাণ্ডবদের ঘটনানিচয় সুন্দরভাবে রূপায়িত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে সকলকেই হয় জৈনধর্মে দীক্ষিত, না হয় জৈনভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাতে কৃষ্ণ ও বলরামের, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর বংশাবলীর একটা পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে ইহাও পাওয়া যায় যে পঞ্চপাণ্ডব সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিয়া নির্বাণ লাভ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি অপভ্রংশ ভাষায় রচিত।

ঙ. প্রাকৃত পুরাণ ও চরিতাবলী

যেমন রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনা অনুসরণে প্রাকৃত রামায়ণ ও মহাভারত লেখা হইয়াছিল; ঠিক তেমনি, পুরাণের পন্থা অনুসরণে 'প্রাকৃত পুরাণ' রচিত হইল; অর্থাৎ জৈন মহাপুরুষ বা তীর্থঙ্করদের জীবনী অবলম্বনে এই প্রাকৃত পুরাণের সৃষ্টি হইল। দিগম্বরেরা এই জাতীয় গ্রন্থকে পুরাণ বলেন, আর শ্বেতাম্বরেরা চরিতাবলী বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন। এই প্রাকৃত পুরাণের রচনা কাল খৃষ্টাব্দ অষ্টম শতক হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত।

সংস্কৃত সাহিত্যের পুরাণের সংজ্ঞা ইহাতে সম্পূর্ণভাবে না খাটিলেও, জৈনপুরাণের সংজ্ঞা একটু ভিন্ন ধরনের। তাহারা এই পুরাণকে মহাপুরাণ বলেন। মহাপুরাণ বলিবার কারণ হইল এই যে, যে সমস্ত জৈন মহাপুরুষ আছেন, তাঁহাদের জীবনাবলী ইহাতে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ তেষট্টি জন জৈন মহাপুরুষের জীবনী বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া এই জাতীয় গ্রন্থকে মহাপুরাণ বলা হয়। সেই তেষট্টি জন মহাপুরুষের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

(ক) ২৪ তীর্থঙ্কর—(১) ঋষভ বা বৃষভ; (২) অজিত; (৩) শংভব বা সংভব; (৪) অভিনন্দন; (৫) সুমতি; (৬) পদ্মপ্রভ; (৭) সুপার্শ্ব; (৮) চন্দ্রপ্রভ;

৯। প্রাকৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, পৃঃ ৫-৬

(৯) পুষ্পদন্ত বা সুবিধি; (১০) শীতল; (১১) শ্রেয়াংস; (১২) বাসুপূজ্য; (১৩) বিমল; (১৪) অনন্ত; (১৫) ধর্ম; (১৬) শান্তি; (১৭) কুন্থু; (১৮) অর; (১৯) মল্লি; (২০) সুব্রত; (২১) নমি; (২২) নেমি; (২৩) পার্শ্ব; (২৪) মহাবীর।

(খ) ১২ চক্রবর্তিন্—(১) ভরত; (২) সগর; (৩) মঘবন্; (৪) সনৎকুমার; (৫) শান্তি; (৬) কুন্থ; (৭) অর; (৮) সুভৌম বা সুভূম; (৯) পদ্ম; (১০) হরিষেণ; (১১) জয়সেন বা জয়; (১২) ব্রহ্মদত্ত।

(গ) ৯ বাসুদেব—(১) ত্রিপৃষ্ঠ; (২) দ্বিপৃষ্ঠ; (৩) স্বয়ংভূ; (৪) পুরুষোত্তম; (৫) পুরুষসিংহ; (৬) পুরুষপুণ্ডরীক; (৭) দত্ত; (৮) নারায়ণ; (৯) কৃষ্ণ।

(ঘ) ৯ বলদেব—(১) অচল; (২) বিজয়; (৩) ভদ্র; (৪) সুপ্রভ; (৫) সুদর্শন; (৬) আনন্দ; (৭) নন্দন; (৮) পদ্ম; (৯) রাম (বলরাম)।

(ঙ) ৯ প্রতি বাসুদেব—(১) অশ্বগ্রীব; (২) তারক; (৩) মেরক; (৪) মধু; (৫) নিশুম্ভ; (৬) বলি; (৭) প্রহ্লাদ; (৮) রাবণ; (৯) জরাসন্ধ বা মগধেশ্বর।

এই তেষট্টিজন মহাপুরুষের জীবনী যে গ্রন্থে একসঙ্গে বর্ণনা করা হইয়া থাকে. তাহাকে 'তিসট্টি লক্খণ-মহাপুরাণ' বা 'তিসট্টিসলাকাপুরিসচরিত' বলা হয়।

পুষ্পদন্তের **'মহাপুরাণ'** বা 'তিসট্টি-মহাপুরিসগুণালঙ্কার' একটি প্রাচীন দিগম্বর জৈন মহাপুরাণ। গ্রন্থখানি অপভ্রংশ ভাষায়, খৃষ্টীয় দশম শতকে রচিত। এই গ্রন্থে প্রাগুক্ত তেষট্টিজন মহাপুরুষের জীবনচরিত বর্ণনা করা হইয়াছে। উহা আদিপুরাণ ও উত্তরপুরাণ নামে দুইভাগে বিভক্ত। আদিপুরাণে ৩৭টি এবং উত্তরপুরাণে ৬৫টি অধ্যায় আছে।

শীলাচার্যের (৮৬৮ খৃঃ) 'মহাপুরুষ চরিতম্' আর একটি উৎকৃষ্ট প্রাকৃত পুরাণ। পরবর্তীকালে প্রাকৃত ভাষায় স্বতন্ত্রভাবে যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তন্মধ্যে—গুণচন্দ্রগণিন্ (১০৮২ খৃঃ)-এর 'মহাবীরচরিয়ম্', দেবেন্দ্রগণিনের (১০৮৫ খৃঃ) 'মহাবীরচরিয়ম', বর্ধমানের (১১০৩ খৃঃ) 'আদিনাথচরিতম্', দেবচন্দ্রের (১১০৩ খৃঃ) শান্তিনাথচরিতম্', শান্তিসূরির (১১০৪ খৃঃ) 'পৃথ্বীচন্দ্রচরিতম্', দেবভদ্রের (১১০৮ খৃঃ) 'পার্শ্বনাথচরিতম্', মলধারী হেমচন্দ্রের (১২শ খৃঃ) 'নেমিনাথচরিতম্', শ্রীচন্দ্রের (১১৩৫ খৃঃ) 'মুনিসুব্রতস্বামিচরিতম্', লক্ষ্মণগণিনের (১১৪৩ খৃঃ) 'সুপাসনাহচরিয়ম্', হরিভদ্রের (১১৫৯ খৃঃ) 'নেমিনাহচরিউ' (অপ), 'চন্দ্রপ্রভচরিত' ও 'মল্লিনাথচরিত' মাণিক্যচন্দ্র ও সাকলকীর্তির 'শান্তিনাথচরিত', সোমপ্রভাচার্যের (১২শ খৃঃ) 'সুমতিনাথচরিত', মুনিভদ্রের (১৩৫৯ খৃঃ) 'শান্তিনাথচরিত', রত্নশেখরের (১৩৭১ খৃঃ) 'শ্রীপালচরিতম্' প্রভৃতি প্রাকৃত পুরাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চ. পট্টাবলী ও থেরাবলী[১০]

পট্টাবলী (পত্রাবলী) বা থেরাবলী (স্থবিরাবলী) বংশ পরিচায়ক সাহিত্য। জৈন ধর্মগ্রন্থে যে সমস্ত আচার্য, তৎশিষ্য ও গণধরদের নামোল্লেখ আছে, তাঁদের পরিচয় পাওয়া যায় এই পট্টাবলী বা থেরাবলী সাহিত্যে। কয়জন আচার্যের কয়জন শিষ্য ও গণধর শিষ্য ছিল, কে পূর্বে বা পরে, তাহাদের মোটামুটি একটা পরিচয় পাওয়া যায়

১০। প্রাকৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, পৃঃ ৫

এই জাতীয় সাহিত্যে। এই সাহিত্যে প্রভৃত গ্রন্থ বিদ্যমান। তন্মধ্যে (১) কল্পসূত্তথেরাবলী, (২) নংদীসুত্ত পট্টাবলী, (৩) দুসমাকাল-সমণ-সঙ্ঘথয়ং, (৪) তপগচ্ছ পট্টাবলী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ছ. প্রাকৃত কাব্য

সংস্কৃত সাহিত্যের মত 'প্রাকৃত কাব্য'ও ভাবে-ভাষায়, ছন্দে-অলঙ্কারে ও ঘটনার পারিপাট্যে মহীয়ান্। ভাষার নিমিত্ত প্রবেশ সহজসাধ্য নয় বলিয়া, সাধারণ পাঠক ইহার রসগ্রহণ হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু ভাষা একবার আয়ত্তীকৃত হইলে, দেখা যাইবে যে, সংস্কৃত কাব্য হইতে ইহা কোন অংশে কম নহে। সংস্কৃত মহাকাব্যের যে সমস্ত লক্ষণ আছে, সেই সমস্ত লক্ষণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ইহাতে হয়ত সব সময় পাওয়া যায় না; কিন্তু এ কাব্য নতুনভাবে ভাবিত হইয়া এক নতুন রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছে। সংস্কৃত মহাকাব্যের ন্যায়, কোনও এক গ্রন্থ হইতে সাধারণতঃ ইহার ঘটনাসমূহ গ্রহণ করা হয় নাই বরং অনেক কল্পনাশক্তি এই প্রাকৃত কাব্য জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মূল কথা এই যে, প্রাকৃত কাব্য পাঠ করিলে যথার্থ আনন্দ পাইতে কোন অসুবিধা হয় না।

প্রাচীন প্রাকৃত কাব্যের অধিকাংশই বর্তমানে লুপ্ত; কোথাও কোথাও ইহার নামমাত্র পাওয়া যায়। লুপ্ত গ্রন্থের মধ্যে—ভদ্রবাহুর 'বসুদেববিজয়', পাদলিপ্তাচার্যের 'তরঙ্গবতী', সর্বসেনের 'হরিবিজয়', বাক্‌পতিরাজের 'মহুমহবিজয়', আনন্দবর্ধনের 'বিষমবাণলীলা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নিশীথচূর্ণি নামক গ্রন্থে লৌকিক কথাকাব্যের উদাহরণচ্ছলে নরবাহনদত্তকথা' কাব্যের উল্লেখ আছে এবং লোকোত্তর কথাকাব্যের জন্য 'মগধসেনা' ও 'তরঙ্গবতী'র উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। নন্দিতাঢ্যের 'গাথালক্ষণ'-নামক প্রাকৃত ছন্দোগ্রন্থের টীকাকার রত্নচন্দ্র, তাঁহার টীকায় 'রোহিণীচরিত', 'পুষ্পদন্তচরিত' এবং 'গাথাসহস্রশতপদালঙ্কার' নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত গ্রন্থই বর্তমানে লুপ্ত। লুপ্ত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে অধুনালুপ্ত গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'। গ্রন্থখানি পৈশাচী-প্রাকৃতে লেখা ছিল, বলা হয়। এই ভাষায় গ্রন্থখানির অস্তিত্ব না থাকিলেও ইহার সার আমরা পাইয়া থাকি সংস্কৃতে রচিত তিনটি গ্রন্থ হইতে—(১) বুদ্ধস্বামীর বৃহৎকথা-শ্লোক-সংগ্রহ, (২) ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথা-মঞ্জরী এবং (৩) সোমদেবের কথাসরিৎসাগর। প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, এমন একটা সময় ছিল, যখন সমস্ত মহাকাব্যাদিই (যথা রামায়ণ, মহাভারত) প্রাকৃত ভাষায় লেখা ছিল এবং তাহা হইতেই পরে সব সংস্কৃতে অনূদিত হয়। একথা কতখানি সত্য, তাহা বলা খুব শক্ত। কিন্তু ইহা হইতেই বোঝা যায় যে সুদূর প্রাচীনকাল হইতেই প্রাকৃত ভাষায় বহু কাব্যাদি লেখা হইতেছিল; যাহার কিছু কিছু বর্তমানে উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাকৃত ভাষায় মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য বা গীতিকাব্য, কোষকাব্য, ঐতিহাসিক কাব্য, ধর্মকথাকাব্য, কথানককাব্য, গদ্যকাব্য, চম্পূ, নাটক প্রভৃতি লেখা হইয়াছে।

প্রাকৃত মহাকাব্য

বর্তমানে প্রাপ্ত প্রাকৃত মহাকাব্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হইতেছে প্রবরসেনের (৫ম বা ৬ষ্ঠ খৃঃ) 'সেতুবন্ধ বা 'রাবণবহো' মহাকাব্য। পনেরটি আশ্বাসকে পূর্ণ এই মহাকাব্যে সীতার অন্বেষণ হইতে আরম্ভ করিয়া, সেতু-নির্মাণ পূর্বক রাবণের বধ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাই বেশ সুন্দররূপে রূপায়িত হইয়াছে। উপমা উৎপ্রেক্ষাদি অলঙ্কারে

পূর্ণ, বর্ণনার দ্বারা মহিমামণ্ডিত এই কাব্যের সহিত সংস্কৃত কাব্যের প্রভূত সাদৃশ্য আছে। বাণভট্ট যথার্থই বলিয়াছেন—

কীর্তিঃ প্রবরসেনস্য প্রয়াতা কুমুদোজ্জ্বলা।
সাগরস্য পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা॥ —হর্ষচরিত ১।১৪

অর্থাৎ (শ্রীরামচন্দ্রের) বানরসেনা যেমন সেতু (বন্ধনের) দ্বারা সাগরের পরপারে গিয়াছিল, সেইরূপ সেতুবন্ধ কাব্যের সাহায্যে প্রবরসেনের কুমুদোজ্জ্বলা কীর্তি সাগরের পরপারে পোঁছাইয়াছিল।

প্রাকৃত মহাকাব্যের আর একটি অনবদ্য অবদান বাক্‌পতিরাজের (৭৫০ খৃঃ) ঐতিহাসিক মহাকাব্য **'গউড়বহো'**। বাক্‌পতিরাজ কনৌজের রাজা যশোবর্মন্ দেবের সভাকবি ছিলেন। কাব্যের নাম হইতে অনুমান করা যায় যে যশোবর্মন্ দেবের হাতে গৌড়রাজের বধই—এই কাব্যের বিষয়বস্তু। কিন্তু কি কারণবশতঃ, এই যুদ্ধ সম্ভব হইয়াছিল, তাহা অসম্পূর্ণ এই গ্রন্থ হইতে জানিবার উপায় নাই। সাধারণ সংস্কৃত কাব্যের মতই কবি এই মহাকাব্যের প্রারম্ভে বিভিন্ন দেবদেবীর স্তবস্তুতি করিয়াছেন। তাহার পর অলঙ্কারবহুল আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় যশোবর্মনের বর্ণনা। কবি এই রাজাকে বিষ্ণুসদৃশ করিয়াছেন। তাহার পর রাজার দিগ্‌বিজয় যাত্রা। তাহার পরেই হঠাৎ কাব্যের পরিসমাপ্তি। এক কথায় বলিতে গেলে, এই কাব্যখানি শুধু রাজপ্রশস্তিমূলক রচনা, ইহাতে ঐতিহাসিক উপাদান নাই বলিলেই চলে। সম্ভবতঃ যশোবর্মনের সভার পণ্ডিতবর্গ কবিকে রাজার চরিত্র রচনায় অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

কোউহলের (কুতূহল) **লীলাবঈকহা** আর একখানি উৎকৃষ্ট রোমান্টিক মহাকাব্য। গ্রন্থখানি মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে, ৮০০ শত খৃষ্টাব্দে, ১৩৩৩ বা ১৩৩৪ শ্লোকে রচিত। গ্রন্থখানি কোন সর্গ, উচ্ছ্বাস বা অনুরূপ কোন বিভাগে বিভক্ত নহে। গ্রন্থশেষে গ্রন্থকার অনুষ্টুপ মতে শ্লোকের সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন। যথাঃ—

অট্‌ঠারহ-সয়-সংখা অণুট্‌ঠু-সংখাএ বিরইয়-পমাণা।
এস সমপ্পই এণ্হিং কহাত্তি লীলাবঈ নাম॥ ১৩৩৩॥

গ্রন্থকার নিজগ্রন্থে নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার পিতামহ, পিতা প্রভৃতির সম্বন্ধে একটু পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পিতামহ ছিলেন বহুলাদিত্য। তিনি বেদবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি তিনটি বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করেন এবং তৎসম্পাদনে ধর্ম, অর্থ ও কামের ফলভোগী হইয়াছিলেন। বহুলাদিত্যের পুত্র ভূষণভট্ট (বাণভট্টের পুত্র নহে) একজন পরম ধার্মিক লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার বংশের চন্দ্রস্বরূপ ছিলেন। সেই ভূষণভট্টের পুত্র আমাদের এই গ্রন্থকার কুতূহল (প্রাকৃতে কোউহল)। গ্রন্থকার নিজেকে বিনীতভাবে 'অসারমতি' (গাথা ১৮-২২) বলিয়াছেন।

নানা ঘটনা ও কাহিনীর মাধ্যমে সিংহলরাজ শীলামেঘের কন্যা লীলাবতীর সহিত প্রতিষ্ঠানপুরের রাজা সাতবাহনের পরিণয় কাহিনী এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে। লেখকের রচনাশৈলী সরল, সুন্দর ও আড়ম্বরবিহীন। তবে দীর্ঘ সমাস ও সন্ধির দ্বারা গ্রন্থখানি ভারাক্রান্ত। গ্রন্থখানি পাঠে যথার্থ আনন্দ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে তদানীন্তনকালের বহু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়।

পরবর্তীকালে এই 'লীলাবতী' নাম দিয়া বহু কাহিনী লেখা হইয়াছে। তন্মধ্যে জিনেশ্বরের (১০৩৮ খৃঃ) 'লীলাবতী' (অধুনালুপ্ত) প্রাকৃত ভাষায় লেখা একখানি লুপ্ত কাব্য। যে পর্যন্ত না জিনেশ্বরের গ্রন্থখানি আবিষ্কৃত হয়, সে পর্যন্ত বলা খুব শক্ত

যে এই দুই গ্রন্থকারের গ্রন্থের মধ্যে কোন সাদৃশ্য আছে কিনা। জিনেশ্বরের লীলাবতীর কাহিনী অবলম্বনে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জিনরত্ন ৮০০০ শ্লোকে সংস্কৃতে একটি 'লীলাবতীসার-মহাকাব্য' লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থের পুঁথি জেসলমেরুর ভাণ্ডারে দৃষ্ট হয়।

পুষ্পদন্তের (প্রাঃ—পুপ্‌ফয়ংত) **'জসহরচরিউ'** এবং **'নায়কুমারচরিউ'** অপভ্রংশ ভাষায় রচিত দুইটি কাব্য। কাব্য দুইটি ঘটনার পারিপাট্যে ও রচনার বলিষ্ঠতায় মনোরম। তিনি অপভ্রংশ ভাষায় আরও একটি বই লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম 'মহাপুরাণ'। তাঁহার লেখার মধ্যে একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

পুষ্পদন্ত একজন কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহার পিতার নাম কেশবভট্ট এবং মাতার নাম মুগ্ধাদেবী। তিনি প্রথমে শৈবধর্মাবলম্বী ছিলেন, পরে দিগম্বর জৈন হন। তিনি বিবিধ উপাধিতে বিভূষিত ছিলেন; যথা—অহিমাণমেরু, কব্বরয়ণায়র কব্বপিসল্ল, কব্বরক্‌খস, কইকুলতিলঅ, সরসইণিলয় ইত্যাদি। তিনি ক্ষীণাঙ্গ এবং কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। তাঁহার কোন স্ত্রী-পুত্রাদি ছিল বলিয়া মনে হয় না। মান্যখেটে যাইবার পূর্বে, তাঁহার জন্মস্থান কোথায় ছিল এবং কোথায়ই বা তিনি অধ্যয়নাদি করিয়াছিলেন, তাহা বলা খুব শক্ত। তবে এইকথা বলা যাইতে পারে যে, স্বদেশে অপদস্থ হওয়ায়, তিনি দেশ ত্যাগ করেন এবং মান্যখেটের প্রান্তে কোনও এক অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখান হইতে দুইজন লোক তাঁহাকে মান্যখেটের রাজার সমীপে লইয়া যায়। পরে সেখান হইতেই তাঁহার কাব্যপ্রতিভার স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হইতে থাকে।

পুষ্পদন্তের সময় লইয়া বহু বাদানুবাদ না হইলেও ঠিক কোন্ সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন, তাহা এক বাক্যে বলা সম্ভব নহে। তবে তাঁহার গ্রন্থে আলঙ্কারিক রুদ্রট প্রমুখ যে সব পূর্বাচার্যদের নাম তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে বলা যায় যে তিনি দশম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

পুষ্পদন্তের "জসহরচরিউ" চারটি সন্ধি বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত এবং গাথা ছন্দে রচিত। পুষ্পদন্ত এই কাব্যটিকে মহাকাব্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এইকথা তিনি প্রত্যেক সন্ধির শেষেই বলিয়াছেন—"ইয় জসহর-মহারায়-চরিএ মহামহল্লণগ্নকগ্নাহরণে মহাকই-পুপ্‌ফয়ংত-বিরইএ মহাকব্বে জসহররায়পট্টবংধো ণাম পঢমো সংধী পরিচ্ছেউ সমত্তো॥"

'জসহরচরিউ'-কাব্যে তিনি রাজা যশোধরের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন; আর 'ণায়কুমারচরিউ'-তে তিনি সুপ্রসিদ্ধ জৈন নাগকুমারের কাহিনীকে কাব্যরূপ প্রদান করিয়াছেন।

ধনপালের (১০ম শতক) **'ভবিস্‌সয়ত্তকহা'** একটি উচ্চশ্রেণীর রোমান্টিক মহাকাব্য। এই গ্রন্থে লেখক পঞ্চমীব্রতের অতুলনীয় মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। এই পঞ্চমীব্রত আষাঢ়, কার্তিক ও ফাল্গুন মাস ব্যাপিয়া চলিতে থাকে এবং পাঁচ বৎসর পালন করার পর পরিসমাপ্ত হয়। এই ব্রতপালনের ফলশ্রুতি হিসাবেই ভবিষ্যদত্তের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে, বৈমাত্রেয় ভাই-এর চক্রান্তকে ব্যর্থ করিয়া, কিরূপে তাহার স্ত্রীকে ফিরিয়া পান, তাহাই এই কাব্যের উপজীব্য বিষয়বস্তু। গ্রন্থখানি অপভ্রংশভাষায় রচিত।

বিভিন্ন জৈন আখ্যায়িকার মধ্যে ধার্মিক নায়ক বলিয়া বিবেচিত সুদর্শনের কাহিনী লইয়া নয়নন্দী (১০৪৪ খৃঃ) **'সুদর্শনচরিত'** (অপ) লিখিলেন। তাঁহার রচিত 'আরাধনা' নামে একটি আরাধনা কাব্যও আছে। কনকামর (১০৬৫ খৃঃ) মুনি কর্তৃক বিরচিত **'করকণ্ডচরিউ'** (অপ) আর একটি উৎকৃষ্ট কাব্য। ইহাতে জৈন সাধু করকণ্ডের

জীবনচরিত বিবৃত হইয়াছে। করকণ্ড জৈন ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক পূজিত ছিলেন।

জৈনাচার্য হেমচন্দ্রের (১০৮৮-১১৭২) **'কুমারপালচরিত'** আটসর্গে বিভক্ত নিজের 'সিদ্ধহৈমশব্দানুশাসনম্' নামক ব্যাকরণের প্রাকৃতাংশের দৃষ্টান্ত হিসাবে রচিত একটি উৎকৃষ্ট মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের প্রথম হইতে পঞ্চম সর্গ ও ষষ্ঠ সর্গের কিয়দংশ পর্যন্ত তিনি কুমারপালের রাজধানী অনহিল্লপুরের ঐশ্বর্য, জৈন মন্দিরের মহিমা ও সমৃদ্ধি, রাজার ও তাঁহার প্রজাবর্গের জৈনধর্মের প্রতি অনুরাগ, ভোগচর্চা ও বিলাস-কলার সাড়ম্বর বর্ণনা দিয়াছেন। ষষ্ঠ সর্গে কুমারপালের ও কোঙ্কনরাজ মল্লিকার্জুনের সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধের বর্ণনা আছে। শেষোক্ত রাজা এই যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। অন্তিম সর্গদ্বয়ে বিভিন্ন ধর্মোপদেশ ও ধর্মতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্যখানি সংস্কৃত ভট্টিকাব্যের সহিত তুলনীয়।

ধনেশ্বরের (১১ শতাব্দীর শেষার্ধ) **'সুরসুন্দরীচরিয়ম্'** প্রাকৃত মহাকাব্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। সিংহসেন (১৪৩৯ খৃঃ) 'মেহেসরচরিউ' (অপ) লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তিনি 'রৈধু' নামে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। এই রৈধুনামেই তিনি 'দহলক্খণজয়মাণ' ও 'জীবন্ধরচরিত' লিখিয়াছেন। পুষ্পদন্তের মহাপুরাণের ৯৯ সন্ধিতে এই জীবন্ধরের কাহিনী বিবৃত আছে। এই জীবন্ধরের আখ্যানকে অবলম্বন করিয়া জৈনসাহিত্যে প্রভূত কাব্য রচিত হইয়াছে। রামপাণিবাদের (১৮শ খৃঃ) 'কংসবহো' ও 'উসাণিরুদ্ধ' মহাকাব্যদ্বয় খুব উৎকৃষ্ট ও বর্ণনা মাহাত্ম্যে মহিমামণ্ডিত।

কোষ, ব্যঙ্গ, স্তোত্র ও ধর্মকথাকাব্য

প্রাকৃত ভাষায় বহু **'কোষ'** কাব্যও রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে হালের (১ম খৃঃ) 'গাথাসপ্তশতী', মুনিচন্দ্রের (১২শ খৃঃ) 'গাথাকোষ', জয়বল্লভের (১৩৩৬ খৃঃ) 'বজ্জালগ্গ' ও সময়সুন্দরের (১৬৩০ খৃঃ) 'গাথাসহস্রী' প্রভৃতি প্রধান ও উল্লেখযোগ্য। কোনও এক অজ্ঞাতনামা লেখক 'প্রাকৃতসূক্তরত্নমালা' সংকলন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

প্রাকৃত ভাষায় **ব্যঙ্গকাব্য** রচনা করিয়া যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে 'ধূর্তাখ্যান' রচয়িতা হরিভদ্রসূরি (৮ম শঃ) ও 'সন্দেশরাসক' রচয়িতা আব্দুল রহ্মানের নাম প্রসিদ্ধ।

জৈনগণ প্রাকৃত ভাষায় বহু **স্তোত্র ও নীতিমূলক** কাব্যও রচনা করিয়াছেন। ভদ্রবাহুর 'উবাসগ্গহর' স্তোত্র, মানতুঙ্গের (তৃতীয় শতক) 'ভয়হরস্তোত্র', নন্দিসেনের (৯ম শতকের পূর্বে) 'অজিয়সন্তিথয়', ধনপালের (৯৭২ খৃঃ) 'ঋষভপঞ্চাশিক', অভয়দেবের (১১শ খৃঃ) 'জয়তিহুয়ণ'—স্তোত্র, জিনবল্লভের (১১১০ খৃঃ) 'উল্লাসিক্কমথয়', বীরগণিন্-এর (১১১০ খৃঃ) 'অজিয়সন্তিথয়', ধর্মবর্ধনের (১২০০ খৃঃ) 'ষড়্ভাষানির্মিতপার্শ্ব জিনস্তবন', ধর্মঘোষের (১৩।১৪ শতকে) 'ইসিমণ্ডল' স্তোত্র, ধর্মদাসের 'উপএসমালা' ও জয়কীর্তির 'সীলোবএসমালা' প্রধান ও উল্লেখযোগ্য।

জৈন লেখকগণ ধর্মসম্বন্ধীয় উপাখ্যানাদি লইয়া বহু কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এইগুলিকে **ধর্মকথা** নামে অভিহিত করা হয়। পাদলিপ্তাচার্যের তরঙ্গবতীর ছায়া অবলম্বনে ১৬৪৩টি প্রাকৃত শ্লোকে লিখিত **তরঙ্গলোলা** এই শ্রেণীর একটি উৎকৃষ্ট কাব্য। গ্রন্থের রচনাকাল পঞ্চদশ শতক। ১২৯৬টি গাথা শ্লোকে রচিত কোনও এক অজ্ঞাতনামা কবির 'মলয়সুন্দরীকহা' ধর্মকথার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাহা ছাড়া, বিজয়-সিংহসূরির (৯১৮ খৃঃ) 'ভুবনসুন্দরীকহা', ২০০০ গাথায় ১০টি গল্পে মহেশ্বরসূরির

(১১শ খৃঃ) 'পঞ্চমীকহা', জিনহংসের (১৪৪০ বা ৪৫ খৃঃ) 'রয়ণসেহরণরবইকহা' এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য কাব্য।

নীতিমূলক কাব্য

হেমচন্দ্রের সমসাময়িক ও জিনবল্লভসূরির শিষ্য জিনদত্ত সূরি (১০৭৫ খৃঃ—১১৫৪ খৃষ্টাব্দ) অপভ্রংশ ভাষায় তিনখানি নীতিমূলক সঙ্গীতাত্মক কাব্য লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার আচার্য জিনবল্লভসূরির স্তুতিমাধুর্যে পরিপূর্ণ "চচ্চরী" একটি ৪৭ শ্লোকাত্মক গীতিকাব্য। ইহাতে বহু উপদেশ আছে। 'উপদেশরসায়নরাস' আর একটি নীতিমূলক কাব্য। ইহাতে ৮০টি শ্লোক আছে। জিনপালোপাধ্যায় এই দুইটি গ্রন্থেরই সংস্কৃতে টীকা লিখিয়াছেন। তাঁহার তৃতীয় গ্রন্থ হইল 'কালস্বরূপ-কুলকম্।' ইহাতেও ৩২টি শ্লোকে লেখক নীতিমূলক উপদেশ দিয়াছেন। সুর-প্রভোপাধ্যায় ইহার একটি সংস্কৃতে টীকা লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়া জিনদত্তসূরি 'গণধরসার্ধশতকম্' এবং 'সুগুরুপারতন্ত্র্যম্' নামে আরও দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

তাঁহার পর জিনদত্তের শিষ্য জিনরক্ষিত (১১১৩ খৃঃ) তাঁহার গুরুর উদ্দেশে 'জিনদত্তসূরিস্তুতি' নামে এক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহাতে মাত্র ১০টি শ্লোক আছে। এই গ্রন্থ হইতে আমরা জিনদত্তসূরির আচার্য পরম্পরার বিষয় কিছু জানিতে পারি।

ঐতিহাসিক কাব্য

বাক্‌পতিরাজের 'গৌড়বধ' কাব্যের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই কাব্য ছাড়া, প্রাকৃতে আরও ঐতিহাসিক কাব্য আছে। তন্মধ্যে জিনপ্রভসূরির **'তীর্থকল্প'** একখানি অর্ধ-ঐতিহাসিক গ্রন্থ। গ্রন্থখানিকে ভৌগোলিক গ্রন্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা 'বিবিধতীর্থকল্প' বা 'কল্প প্রদীপ' অথবা 'রাজপ্রসাদ' নামেও পরিচিত। ইহা ১৩২৬ খৃঃ—১৩৩১ খৃঃ মধ্যে রচিত বলিয়া মনে হয়। এই গ্রন্থে জৈন তীর্থস্থানের এবং সেই সমস্ত তীর্থস্থানের প্রতিষ্ঠাতাদের সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। গ্রন্থ-খানির যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে, যদিও ইহার মধ্যে প্রভূত পরিমাণে কাল্পনিক ঘটনার সমাবেশ দেখা যায়। যে সমস্ত রাজারা বিবিধ তীর্থ-স্থানের উদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বহু বিবরণ আছে। এই গ্রন্থখানি সংস্কৃত ও মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে লেখা। ইহাতে গদ্য ও পদ্য দুইই আছে। নিম্নে প্রাকৃত গল্পের নাম করা হইল ঃ—(১) রৈবতক গিরিকল্প সংক্ষেপ: (২) উজ্জয়ন্তমহাতীর্থকল্প (পদ্যে); (৩) রৈবতক গিরিকল্প; (৪) শ্রীপার্শ্বনাথ কল্প (পদ্যে); (৫) অহিচ্ছত্রানগরীকল্প; (৬) মথুরাপুরীকল্প; (৭) অশ্বাববোধতীর্থ-কল্প; (৮) কোশাম্বীনগরীকল্প; (৯) অযোধ্যানগরীকল্প; (১০) কলিকুণ্ড কুর্কুটেশ্বর কল্প; (১১) হস্তিনাপুর কল্প; (১২) সত্যপুরী তীর্থ কল্প; (১৩) মিথিলা তীর্থ-কল্প; (১৪) অপাপাবৃহৎকল্প; (১৫) কন্যানয়নীয়-মহাবীর-প্রতিমাকল্প; (১৬) কাম্পিল্য পুরতীর্থকল্প; (১৭) অণহিল পুরস্থিত অরিষ্টনেমিকল্প; (১৮) শঙ্খপুর পার্শ্বকল্প; (১৯) নাসিক্যপুর কল্প; (২০) হরিকঙ্খী-নগরস্থিত-পার্শ্বনাথকল্প; (২১) কপর্দিযক্ষকল্প; (২২) শুদ্ধদন্তীস্থিত-পার্শ্বনাথকল্প; (২৩) শ্রাবস্তীনগরী-কল্প; (২৪) মহাবীর গণধর কল্প; (২৫) কোকাবসতি পার্শ্বনাথকল্প; (২৬) কোটি শিলাতীর্থ কল্প; (২৭) সমবসরণ-রচনাকল্প (পদ্যে); (২৮) অষ্টাপদগিরিকল্প: (২৯) কন্যানর-মহাবীর-কল্প পরিশেষ; (৩০) চতুর্বিংশতি জিনকল্যানক কল্প (পদ্যে); (৩১) পঞ্চকল্যানকস্তবন (পদ্যে); (৩২) কোল্ল-পাক-মাণিক্য-দেব তীর্থকল্প; (৩৩) শ্রীপুর-অন্তরীক্ষ-পার্শ্বনাথ-কল্প; (৩৪) স্তম্ভনক-কল্প-শিলোঞ্ছ; (৩৫) ফলবর্ধি-পার্শ্বনাথকল্প; (৩৬) অম্বিকাদেবীকল্প।

ইহাতে সংস্কৃত ও প্রাকৃতে সর্বসাকল্যে ৬৩টি (গ্রন্থ সমাপ্তিকথনম্ সহ) গল্প আছে। তন্মধ্যে ৩৬টি গল্প প্রাকৃতে, গদ্য ও পদ্যে মিশ্রিত; অপরাপর গল্পগুলি সংস্কৃতে।

কথানক কাব্য[১১]

গল্প বলা ও শোনা মানুষের সহজাত। প্রাচীন ভারতের জৈনগণ এই ব্যাপারে বেশ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহারা গল্প, কাহিনী, উপাখ্যান যে কত লিপিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন সে বিষয়ে আর ইয়ত্তা নাই। কেবল যে সংস্কৃতেই সেইগুলি লিপিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে, প্রাকৃতেও বহু গল্প তাঁহারা শুনাইয়া গিয়াছেন। জৈনগণ তাঁহাদের আগমগ্রন্থের টীকা লিখিবার সময়েও বহু উপদেশমূলক কাহিনী লিপিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্তীকালে এইসব গল্পের সংকলন করিয়া বহু গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। এইগুলিকে প্রাচীন ভারতের 'লোক-সাহিত্য' বলা যাইতে পারে। এই 'লোক-সাহিত্য' সম্বন্ধে ভিন্টারনিৎস্ বলিয়াছেন—

"The Jaina monks and authors have always been tellers of tales far rather than historians. We have already seen that the commentaries to the sacred texts contain not only a mass of traditions and legends, but also numerous fairy-tales and stories, and moreover that the legendary poems, the Puranas and Caritas were often only a frame in which all manner of fairy-tales and stories were inserted. Now, in addition to all this, the Jainas have produced a vast fairy-tale literature, in prose and in verse, in Sanskrit, Prakrit and Apabhramsa. All these works, be they stories in plain prose or in simple verse or elaborate poems, novels or epics, are all essentially sermons. They are never intended for mere entertainment, but always serve the purpose of religious instruction and edification." (*Hist. of Ind. Lit.* Vol. II, p. 521)

'কালকাচার্যকথানক' একটি গদ্যপদ্যময় প্রাকৃত কথা-সাহিত্য। এই কাব্যখানি জৈনাচার্যগণ কল্পসূত্র পাঠের শেষে আবৃত্তি করিয়া থাকেন। রাজা কালক কিভাবে জৈনধর্মে দীক্ষিত হইয়া উঠিলেন—সেই কথা এই কাব্যে বলা হইয়াছে। এই কাব্যের রচয়িতা ও তাঁহার সময় সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

'কালকাচার্যকথানক' নামে আর একটি কাব্য আছে। তাহা ভাবদেব-সূরির লেখা ও ১০২টি প্রাকৃত গাথায় সম্পূর্ণ।

কেবল গল্প লিখিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই, গল্প সংকলনেও তাঁহারা মন দিয়াছিলেন। বহু গল্প, কাহিনী, উপাখ্যানাদি সংকলন করিয়া তাঁহারা ভারতীয় লোক-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই সমস্ত কথাকাব্যের মধ্যে শ্রীচন্দ্রের **কথাকোষ** উল্লেখযোগ্য ও প্রাচীন। শ্রীচন্দ্র দশম বা দ্বাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তিনি অপভ্রংশ ভাষায় ৫৩টি গল্প সংকলন করিয়া এই 'কথাকোষ' রচনা করিয়া গিয়াছেন।

তাহার পর সোমচন্দ্র **'কথামহোদধি'** লিখিয়াছিলেন ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে। ১৫৭টি গল্প তিনি সংকলন করিয়াছিলেন প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায়। হেমবিজয়ের (১৬০০ খৃঃ) **'কথারত্নাকর'** ২৫৮টি গল্পে লিখিত একটি বিরাট গ্রন্থ। গ্রন্থখানি মূলতঃ সংস্কৃতে

১১। Winternitz : *Hist. of Ind. Lit.* Vol. II. pp. 537ff.

লেখা হইলেও, ইহাতে মহারাষ্ট্রী, অপভ্রংশ, প্রাচীন হিন্দী ও গুজরাতী ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, আরও বহু গ্রন্থ আছে, যাহাতে অপূর্ব ও অদ্ভুত গল্পের সমাবেশ আছে। তাহাদের মধ্যে—বর্ধমান সূরির শিষ্য জিনেশ্বর সূরির কথাকোষ (২৩৯টি গাথায়), দেবভদ্রের (১১০১ খৃঃ) কথাকোষ, শুভশীলের কথাকোষ (অপ), সারঙ্গপুর নিবাসী হর্ষসিংঘগণির কথাকোষ (মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত আছে), বিনয়চন্দ্রের কথানককোষ (১৪০ গাথায়), দেবেন্দ্রগণির কথা-মণিকোষ ও কোনও এক অজ্ঞাতনামার কথার্ণব (২০৮ বা ২১৮ গাথায়), কথাবলী, কথাসমাস প্রভৃতি প্রধান ও উল্লেখযোগ্য। পরিশেষে ভিন্‌টারনিংস্‌-এর উক্তিতে এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিলাম—

"The mass of narratives and books of narratives among the Jainas is indeed vast. They are of great importance not only to the student of comparative fairy-tale lore, but also because, to a greater degree than other branches of literature, they allow us to catch a glimpse of the real life of the common people. Just as in the language of these narrative works there are frequent points of agreement with the vernaculars of the people, their subject-matter, too, gives a picture of the real life of the most varied classes of the people, not only the kings and priests, in a way which no other Indian literary works, especially the Brahman ones, do."

(*Hist. of Ind. Lit.* Vol. II, pp. 545-46)

গদ্যকাব্য ও চম্পূকাব্য

কেবল পদ্য রচনাতেই জৈনগণ সিদ্ধহস্ত ছিলেন না, গদ্য রচনাতেও তাঁহারা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে **বসুদেবহিণ্ডী** গদ্যে লেখা হয়। গ্রন্থের কর্তা সংঘদাস এবং ধর্মসেনগণিন্‌। গ্রন্থখানি খুব প্রাচীন; কারণ জিনভদ্র ক্ষমাশ্রমণ তাঁহার 'বিশেষণবতী' নামক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, হরিভদ্র এবং মলয়গিরি 'আবশ্যক নির্যুক্তি'র টীকা লিখিবার সময়ও এই গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছিলেন। পট্টাবলী অনুসারে জিনভদ্র ৭ম শতাব্দীর লোক। অতএব এই গ্রন্থখানি নিশ্চয়ই তৎপূর্বে লেখা হইয়াছিল।

গ্রন্থখানি ১০০ লম্বকে বিভক্ত। গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল অরিষ্টনেমীর সমসাময়িক 'বাসুদেব ও কৃষ্ণে'র জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করা। গ্রন্থে দুইটি ভাগ আছে। প্রথম ভাগে 'ধম্মিল্লহিণ্ডী' নামে একটি কাহিনী আছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে উত্তম কার্য করিলে এই জগতেই তাহার ভাল ফল ফলিয়া থাকে; এবং পরবর্তী ভাগে অন্য জগতের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

এই শ্রেণীর আরও দুইটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইতেছে হরিভদ্র সূরির 'সমরাইচ্চকহা' এবং সোমপ্রভাচার্যের (১২ শতক) 'কুমারপালপ্রতিবোধ'।

চম্পূজাতীয় কাব্যের মধ্যে উদ্যোতনের (৭৭৮ খৃঃ) 'কুবলয়মালাচম্পূ' প্রাকৃত সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

প্রাকৃত নাটক

সংস্কৃত নাটকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষাই বিদ্যমান। স্ত্রীলোক বাদে উচ্চশ্রেণীর পাত্রগণ সংস্কৃত বলেন, আর স্ত্রীলোকসহ নিম্নশ্রেণীর পাত্র-পাত্রিগণ প্রাকৃত ভাষা বলেন। কিন্তু প্রাকৃত নাটক তাদৃশ নহে। ইহাতে উচ্চ-নীচ স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে

সকলেই প্রাকৃত ভাষায় কথা বলেন। এই জাতীয় নাটককে 'সট্টক' বলে। সট্টক সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন—

"সট্টকং প্রাকৃতাশেষপাঠ্যং স্যাদপ্রবেশকম্।
ন চ বিষ্কম্ভকোঽপ্যত্র প্রচুরশ্চাদ্ভুতো রসঃ॥
অঙ্কা জবনিকাখ্যাঃ স্যুঃ স্যাদন্যন্নাটিকাসনম্॥
যথা কর্পূরমঞ্জরী॥ ৬।২৭৬।৭

অর্থাৎ, ইহাতে প্রাকৃত ভাষার আধিক্য দেখা যাইবে এবং প্রবেশক ও বিষ্কম্ভক থাকিবে না। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে অদ্ভুত রস থাকিবে এবং ইহার অঙ্কের নাম হইবে 'জবনিকান্তর'। আর সকল লক্ষণ নাটিকার ন্যায়।

সট্টকের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই সট্টকের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু প্রাচীন সট্টকের কোন নিদর্শন আমরা এখন পর্যন্ত পাই নাই। একমাত্র রাজশেখরই হইলেন প্রথম যিনি মধ্যযুগে লৈখিক প্রাকৃত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সট্টক লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহারই 'কর্পূরমঞ্জরী' আজ পর্যন্ত সট্টকের উদাহরণের কাজ চালাইয়া আসিতেছে। তাঁহার পরে আরও কয়েক জন লেখক সট্টক লিখিতে সাহসী হইয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহাদের নাম 'অজানা' হইয়া রহিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া ডাঃ এ. এন্. উপাধ্যে বলিয়াছেন—

"The Prakrit had assumed a static form by Rajasekhara's time ; and a play entirely in Prakrit was bound to be a rigorous task for average poets in subsequent centuries : it is only some poets of rare or erratic genius that were tempted to compose Sattaka. That would explain, to a certain extent why we have a small number of Sattakas of a late period."

(Intro. pp. 31-32. of *Chandralekha Sattaka.*)

সে যাহাই হোক, এখন পর্যন্ত যে সমস্ত সট্টক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা হইল ছয়। ইহাদের নাম কালানুসারে দেওয়া হইল। যথা—

(১) রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী ৯০০ খৃঃ। (২) নয়চন্দ্রের রম্ভামঞ্জরী ১৩৬৫-১৪৭৮ খৃঃ। (৩) রুদ্রদাসের চন্দ্রলেখা ১৬৬০ খৃঃ। (৪) মার্কণ্ডেয়ের বিলাসবতী ১৭শ খৃঃ। (৫) বিশ্বেশ্বরের শৃঙ্গারমঞ্জরী ১৮শ খৃঃ। (৬) ঘনশ্যামের আনন্দসুন্দরী ১৭০০-১৭৫০ খৃঃ।

জ. প্রাকৃত বৈজ্ঞানিক সাহিত্য

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দী হইতে ষোড়শ, এমনকি, অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাকৃত সাহিত্য নানাভাবে পুষ্ট হইয়া সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতিযোগীরূপে বিরাজমান ছিল। মহাবীরের মুখনিঃসৃত মধুরবাণী তাঁহার শিষ্য ও গণধরগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ হওয়ার ফলে 'জৈন সাহিত্যে'র উৎপত্তি হইল। তাহার পরেই 'নির্যুক্তি', 'চূর্ণি', 'অবচূর্ণি' প্রভৃতি ব্যাখ্যামূলক সাহিত্যের সৃষ্টি হইল। এই আগম ও আগম-বহির্ভূত সাহিত্য রচনা করিয়া জৈনগণ যে প্রজ্ঞা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন—তাহারই প্রভাব আসিয়া পড়িল পরবর্তী কালের কাব্য-সাহিত্য রচনায়। তাঁহাদের প্রতিভা ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িল প্রাকৃত রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদি রচনায়—ছড়াইয়া পড়িল মহাকাব্যে, খণ্ডকাব্যে, কোষকাব্যে, কথা ও কথানককাব্যে, গদ্য রচনায়, নাটক রচনায়। কেবল তাহাই নহে, এই প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে তাঁহারা একজাতীয় বৈজ্ঞানিক সাহিত্যও (Scientific Literature) রচনা করিয়াছিলেন। বর্তমানে প্রাকৃত ভাষা অনাদৃত

হইলেও, সেকালে তাহা ছিল না। তাই তাঁহারা ব্যাকরণ-অভিধান-ছন্দঃ, ধর্ম-অর্থ-কাম-দর্শন, আয়ুর্বেদ-ধনুর্বেদ, জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, এমনকি, ভূগোলসৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক শাস্ত্র (Cosmography) পর্যন্ত রচনা করিয়া প্রাকৃত সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে একটি বিশেষ আসন প্রদান করিয়াছেন।

প্রাকৃত ব্যাকরণ[১২]

ব্যাকরণ রচনায় প্রাকৃত সাহিত্যের একটু বিশেষত্ব লক্ষিত হইয়াছে। যদিও ইঁহারা 'প্রাকৃত ভাষা'র ব্যাকরণ লিখিতে বসিয়াছেন, তথাপি ইঁহারা সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কচ্চায়নের 'পালি ব্যাকরণ' যেরূপ পালি ভাষায় রচিত, এই প্রাকৃত ব্যাকরণ সেইরূপ নহে। সূত্র রচনায় ইঁহারা সংস্কৃতের পন্থাই অনুসরণ করিয়াছেন। প্রাকৃত ব্যাকরণ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

যতদূর জানা যায়, বররুচির **প্রাকৃত-প্রকাশই** সবচেয়ে প্রাচীন প্রাকৃত ব্যাকরণ। বররুচিকে কখনও কখনও কাত্যায়নও বলা হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ মনে করেন, কাত্যায়ন তাঁহার 'গোত্র' নাম।

তাঁহার ব্যাকরণ বারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম নয়টি মহারাষ্ট্রী ভাষার জন্য, দশম পৈশাচীক জন্য, একাদশ মাগধীর জন্য এবং দ্বাদশ শৌরসেনীর জন্য দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার ব্যাকরণের অনেক টীকা আছে। তন্মধ্যে ভামহের মনোরমা, কাত্যায়নের প্রাকৃতমঞ্জরী, বসন্তরাজের প্রাকৃতসঞ্জীবনী, সদানন্দের সুবোধিনী এবং রামপাণিবাদের টীকা প্রকাশিত হইয়াছে।

চণ্ডের **প্রাকৃতলক্ষণ** প্রাকৃত ভাষার আর একটি প্রাচীন ব্যাকরণ। ৯৯টি সূত্রকে চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া চণ্ড গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থ পাঠে মনে হয় যে, উহা অসমাপ্ত। অধ্যায়গুলির নাম যথাক্রমে বিভক্তিবিধান, স্বরবিধান, ব্যঞ্জনবিধান এবং (কাহারও মতে) ভাষান্তরবিধান। এই গ্রন্থের একটি ভাল সংস্করণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দ্বাদশ শতাব্দীতে হেমচন্দ্র প্রাকৃত ভাষার বিস্তৃত ব্যাকরণ লিখিয়া প্রাকৃত ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম **সিদ্ধহৈমশব্দানুশাসন**। গ্রন্থখানি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর ন্যায় আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। উহার প্রথম সাতটি সংস্কৃত ব্যাকরণের জন্য এবং অষ্টম অধ্যায় প্রাকৃত ব্যাকরণের জন্য। প্রত্যেক অধ্যায় ৪টি পাদে বিভক্ত। হেমচন্দ্রের এই প্রাকৃত ব্যাকরণে ১১১৯টি সূত্র আছে। ইহাতে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধ-মাগধী, পৈশাচী, চূলিকা-পৈশাচী এবং অপভ্রংশ ভাষার লক্ষণাবলীর বিস্তৃত বিবরণ আছে। উদয়সৌভাগ্যগণি বিরচিত প্রাকৃত প্রক্রিয়াবৃত্তি নামে এই অংশের একটি টীকা আছে।

হেমচন্দ্রের মত ক্রমদীশ্বরও তাঁহার সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের শেষাংশে **প্রাকৃত ভাষার** ব্যাকরণ লিখিয়া গিয়াছেন। কেবল যে প্রাকৃত ভাষায় ব্যাকরণই আছে, তাহা নহে, ছন্দঃ ও অলংকারেরও সমাবেশ দৃষ্ট হয়; অর্থাৎ তাঁহার এই অষ্টম অংশে—স্বরকার্য,

১২। Hoefer—De Prakrita dialecto libri duo, Berolini 1836; Lassen, C—Institutiones Linguae Pracriticae. Bonnae ad Rhenum, 1837 ; Delius, Nicolaus—Radices Pracriticae. Bonnae ad Rhenum, 1839 (A Supplement to Lassen's work). Pischel, R.—De Grammaticies Prakriticis, Vratislavirae, 1874 ; Jenaer Literaturzeitung, 1875, Grammatik Der Prakrit Sprachen, Strassburge, 1900 ; Luigia *Nitti-Dolci* Les Grammairiens Prakritis, Paris, 1938. Banerjee, Satya Ranjan—Sanskrit "Ardra" and it cognates in "Prakrit" in the Bulletin of the Philological Society of Calcutta Vol. I, No. 2. June, 1960, p. 30 ff.

হল্‌কার্য, সুবন্তকার্য, তিঙন্তকার্য, অপভ্রংশকার্য, ছন্দঃকার্য এবং অলংকারকার্য,—এই ৭টি ভাগ দৃষ্ট হয়। গ্রন্থকার স্বয়ং ইহার একটা বৃত্তি লিখিয়া গিয়াছেন। তাহা ছাড়া প্রাকৃতদীপিকা নামে চন্ডীদেব শর্মার একটা টীকাও আছে। ৪৮৫টি সূত্রে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ। ক্রমদীশ্বর ১২৫০-১৩০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন।

তথাকথিত বাল্মীকি সূত্রের উপর টীকা-টিপ্পনী সহ ত্রিবিক্রম[১৩] তাঁহার **প্রাকৃত ব্যাকরণ** লিখিয়াছেন। তিনি সূত্রগুলিকে বিষয় অনুসারে সাজাইয়া দিয়াছেন। কে এই বাল্মীকি—এর উত্তর দেওয়া খুব শক্ত। তাঁহার গ্রন্থে প্রধানতঃ তিনটি পরিচ্ছেদ আছে; আবার প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ ৪টি পাদে বিভক্ত। সুতরাং সর্বসাকল্যে ইহাতে ১২টি অধ্যায় আছে। ইহাতে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী, চূলিকা-পৈশাচী এবং অপভ্রংশ ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। ত্রিবিক্রম চতুর্দশ শতকে জীবিত ছিলেন।

সিংহরাজের **প্রাকৃতরূপাবতারের** সূত্রসমূহও বাল্মীকি সূত্র। তিনি ত্রিবিক্রমের পর চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে জীবিত ছিলেন।

লক্ষ্মীধরও বাল্মীকি সূত্রের উপর টীকা-টিপ্পনী দিয়া বিভিন্ন বিষয়ে বিষয়ীকৃত করিয়া তাঁহার **ষড়্‌ভাষাচন্দ্রিকা** লিখিয়া গিয়াছেন। তিনিও ইহাতে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী, চূলিকা-পৈশাচী এবং অপভ্রংশ ভাষার লক্ষণাবলীর আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ষোড়শ শতকে জীবিত ছিলেন।

অপ্পয়দীক্ষিতের **প্রাকৃতমণিদীপ** গ্রন্থখানির সূত্রসমূহের মূলও হইল বাল্মীকির সূত্র। আসলে এই চারিজন গ্রন্থকার বাল্মীকি সূত্রের উপর টীকা-টিপ্পনী দিয়া স্ব স্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ১৫৫৩-১৬২৬ খৃঃ পর্যন্ত অপ্পয়দীক্ষিত জীবিত ছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর উড়িষ্যাবাসী মার্কণ্ডেয় কবি একজন কবি ও বৈয়াকরণ। তাঁহার **প্রাকৃত-সর্বস্ব** ২০টি অধ্যায়ে বিভক্ত একটি বিস্তৃত প্রাকৃত ব্যাকরণ। এই গ্রন্থখানি পদ্যে লিখিত। সংস্কৃত ব্যাকরণে ইহার উদাহরণ মিলিলেও প্রাকৃত ব্যাকরণে এই প্রথম। গ্রন্থকার প্রাকৃত ভাষার বহু বিভাগ করিয়া তাহাদের লক্ষণাবলী আলোচনা করিয়াছেন। নিম্নে প্রাকৃত ভাষার বিভাগ দেওয়া গেল।

প্রাকৃত

ভাষা	বিভাষা	অপভ্রংশ	পৈশাচী
১. মহারাষ্ট্রী	১. শাকারী	১. নাগর	১. কেকয়
২. শৌরসেনী	২. চাণ্ডালী	২. ব্রাচড়	২. শৌরসেন
৩. মাগধী	৩. শাবরী	৩. উপনাগর	৩. পাঞ্চাল
৪. প্রাচ্যা	৪. আভীরিকা		
৫. আবন্তী	৫. টাক্কী (? ঢক্কী)		

এই ১৬টি ভাষার লক্ষণাবলী তিনি আলোচনা করিয়াছেন তাঁহার গ্রন্থে।

সপ্তদশ শতাব্দীর রামতর্কবাগীশের **প্রাকৃতকল্পতরু**ও একটি পদ্যাত্মক প্রাকৃত ব্যাকরণ। ইহাতে তিনটি শাখা আছে। প্রত্যেকটি শাখা আবার কয়েকটি স্তবকে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি স্বতক আবার কয়েকটি কুসুমে বিভক্ত। রামতর্কবাগীশও বহু প্রকার প্রাকৃতের উদাহরণ দিয়াছেন। মার্কণ্ডেয়ের সহিত এই ব্যাপারে তাঁহার প্রভূত সাদৃশ্য আছে।

১৩। T. Laddu—*Prolegomena Zu Trivikram's Prakrit Grammatik*, 1912.

শ্রুতসাগরের **ঔদার্যচিন্তামণিও** তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত, সাধারণ প্রাকৃতের লক্ষণাবলী সংবলিত একটি ছোট প্রাকৃত ব্যাকরণ। এই গ্রন্থে অনেক নূতন নূতন প্রাকৃত রূপের পরিচয় পাওয়া যায়।

পুরুষোত্তমের **প্রাকৃতানুশাসনও** একখানি প্রাকৃত ব্যাকরণ। সম্প্রতি ইহার কিছু অংশ প্রকাশিত হইয়াছে।

উপরে যে সব প্রাকৃত বৈয়াকরণদের নাম বলা হইল, তাহা ছাড়া আরও বহু প্রাকৃত বৈয়াকরণ আছেন, যাঁহাদের নাম কেবল গ্রন্থেই সীমাবদ্ধ। ইঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও গ্রন্থ এখন ছাপাও হইয়াছে। নিম্নে ইঁহাদের নাম দেওয়া হইল ঃ—

মার্কণ্ডেয় তাঁহার প্রাকৃত-সর্বস্বে ভরত, শাকল্য এবং কোহলের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেবল ভরতের নাট্যশাস্ত্রে (অধ্যায় ১৭) প্রাকৃতের লক্ষণাবলীর কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। অপর দুইজন সম্বন্ধে এখনও কিছু জানা যায় নাই। বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণেও (৩।৭) প্রাকৃত ভাষার[১৪] কিছু লক্ষণাবলী পাওয়া যায়।

রামতর্কবাগীশ তাঁহার গ্রন্থে বলিয়াছেন যে তিনি লঙ্কেশ্বরকৃত প্রাকৃতকামধেনু হইতে তাঁহার গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। গ্রন্থখানির কিছু অংশ এখন ছাপা হইয়াছে।

বেচারদাসজী জৈন গুজরাতী ভাষায় যে প্রাকৃত ব্যাকরণ লিখিয়াছেন তাহার ভূমিকায় কয়েকজন প্রাকৃত বৈয়াকরণ ও তৎপ্রণীত ব্যাকরণের নামোল্লেখ করিয়াছেন। যথা—(১) সমন্তভদ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণ, (২) নরচন্দ্রের প্রাকৃতপ্রবোধ, (৩) কৃষ্ণপণ্ডিত বা শেষকৃষ্ণের প্রাকৃতচন্দ্রিকা, (৪) বামনাচার্যের প্রাকৃতচন্দ্রিকা, (৫) নরসিংহের প্রাকৃতপ্রদীপিকা ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া ষড়্ভাষাচন্দ্রিকায় (১) চিন্নবোম্মভূপালের প্রাকৃতমণিদীপিকা ও (২) দুর্গণাচার্যের ষড়্ভাষারূপমালিকা প্রভৃতি প্রাকৃত গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।

আউফ্রেচ্ট্স্ কতকগুলি প্রাকৃত গ্রন্থের নাম করিয়াছেন। যথা—

(১) ষড়্ভাষাচন্দ্রিকা (২) ষড়্ভাষামঞ্জরী (৩) ষড়্ভাষাসুবন্তাদর্শ (৪) ষড়্ভাষাবার্তিক।

পিশেল তাঁহার গ্রন্থে (১) নাগোবার ষড়্ভাষাসুবন্তরূপাদর্শ ও (২) শুভচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া—(১) পুষ্পবননায়ের প্রাকৃত ব্যাকরণ, (২) ভোজের প্রাকৃত ব্যাকরণ, (৩) ষড়্ভাষাবিচার, (৪) প্রাকৃতরহস্য, (৫) প্রাকৃতকল্পলতিকা প্রভৃতি বহু প্রাকৃত ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।

স্বনামধন্য প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ পাশ্চাত্য পণ্ডিত গ্রীয়ারশন্ বহু স্থলেই সমগ্র প্রাকৃত বৈয়াকরণদের দুইটি শাখায় বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে—

"There were in India two schools of Prakrit Grammarians, belonging to the West and to the East respectively. For shortness, we may call the former the school of Valmiki, and the latter the school of Vararuci." (Sir Ashutosh Mukherjee

১৪। Text Reconstructed by Prof. Satyaranjan Banerjee, vide, The Characteristics of Prakrit in the Visnudharmottarapurāna in the Bulletin of the Philological Society of Calcutta. Vol. II, Gurupujānjali to Professor Suniti Kumar Chatterjee. 1961. p. 124 ff.

Silver Jubilee, Volume III. Part 2. 1925. The Eastern School of Prakrit Grammarians and Paisaci Prakrit).

ইহা ছাড়া অন্যত্রও তিনি বলিয়াছেন—"There was never one uniform School of Prakrit grammarians for the whole of India. There were certainly at least an Eastern and a Western School which had marked variations in their teachings. Each school had its own distinct line of descent. In each case, teacher succeeded teacher, inheriting the traditions of his predecessors, and each adding his contribution of new facts gathered from literature or from his own experience. But each school developed independently of the other, so that after the lapse of centuries the divergencies became wide." (p. 82 of the Memoirs of the Asiatic Society of Bengal. Vol. VIII, No. 2.)

আরও বহু স্থানে প্রসঙ্গতঃ তিনি এই দুইটি শাখার নামোল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু, কোথাও স্পষ্টতঃ তিনি ইহাদের পার্থক্য নির্ণয় করেন নাই। একটু অনুধাবন করিয়া আমরা বলিতে পারি যে ধ্বনিতত্ত্বে ও রূপতত্ত্বে এমন কতকগুলি উদাহরণ পাইয়া থাকি যাহা দেখিয়া হয়ত বলা যাইতে পারে যে অতীতে প্রাকৃত বৈয়াকরণদের মধ্যে দুইটি শাখার অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু কেবল পার্থক্য দেখিয়াই একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সংগত হইবে কিনা, তাহাও একবার বিবেচ্য। কারণ, ভাষার ক্রমগতির দিকে লক্ষ্য করিয়া, একথা বলা যাইতে পারে যে পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। সে যাহাই হউক, তাঁহার উক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা প্রাকৃত বৈয়াকরণদের যে দুইটি শাখায় বিভক্ত করিয়া থাকি তাহাদের মধ্যে প্রধানদের নাম নীচে দেওয়া হইল।

প্রাকৃত বৈয়াকরণ

প্রাচ্য শাখা (Eastern School)

১। বররুচির প্রাকৃতপ্রকাশ
২। ক্রমদীশ্বরের সংক্ষিপ্তসার প্রাকৃত ব্যাকরণ
৩। মার্কণ্ডেয়ের প্রাকৃতসর্বস্ব
৪। রামতর্কবাগীশের প্রাকৃতকল্পতরু
৫। লঙ্কেশ্বরের প্রাকৃতকামধেনু
৬। পুরুষোত্তমের প্রাকৃতানুশাসন।

পাশ্চাত্ত্য শাখা (Western School)

১। বাল্মীকির প্রাকৃতসূত্র
(ইহার অস্তিত্ব লইয়া মতদ্বৈধ আছে)
ইহার সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইলঃ
(ক) ত্রিবিক্রমের প্রাকৃত ব্যাকরণ
(খ) সিংহরাজের প্রাকৃতরূপাবতার
(গ) লক্ষ্মীধরের ষড়্ভাষাচন্দ্রিকা
(ঘ) অপ্পয়দীক্ষিতের প্রাকৃত মণিদীপা
২। হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণ
(নিজস্ব সূত্র ও বৃত্তি)

ভামহের বৃত্তি
(উভয় শাখার সেতুস্বরূপ)

প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক যে বিদ্বৎপ্রবর বারনেট্ সাহেবও[১৫] দক্ষিণ শাখার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চান। এই বিষয়ে যথোচিত প্রমাণের আবশ্যক আছে।

প্রাকৃত কোষ বা অভিধান

সংস্কৃতে কোষ বা অভিধানগ্রন্থ প্রচুর। প্রাকৃতে আমরা কেবল দুইটি গ্রন্থের পরিচয় পাই—ধনপালের পাইয়লচ্ছীনামমালা, আর হেমচন্দ্রের দেশীনামমালা। এই দুইটি গ্রন্থই বর্তমানে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও প্রাকৃত অভিধান ছিল বলিয়া অনুমান করিতে পারি। কারণ, হেমচন্দ্রের দেশীনামমালার টীকায় অনেক প্রাকৃত অভিধানকারীর নামোল্লেখ আছে।

ধনপালের 'পাইয়লচ্ছীনামমালা' আর্যা বা গাথা ছন্দে লিখিত একটি প্রাকৃত ভাষার অভিধান। সংস্কৃত ভাষায় যেমন অমরকোষ, প্রাকৃত ভাষায় পাইয়লচ্ছীও ঠিক সেইরূপ। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার পঠন-পাঠনের রেওয়াজ এত বিরল যে এই গ্রন্থের প্রচলন অত্যন্ত অল্প।

কেন এই গ্রন্থ লেখা হইল তাহার কারণ প্রসঙ্গে লেখক বলিয়াছেন যে—

"ধারানয়রীএ পরিট্ঠিএণ মগ্গে ঠিয়াএ অণবজ্জে।
কজ্জে কণিট্ঠবহিণীএ সুংদরীনামধিজ্জাএ॥" (২৭৭)

অর্থাৎ,

ধারা নগরীতে বাসকালীন, যেখানে পণ্ডিতগণ সুন্দর অনবদ্য মার্গে অবস্থান করেন, সেখানে আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর জন্য এই গ্রন্থ লেখা হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ধনপালের ভগ্নী সুন্দরী বা অবন্তীসুন্দরীর জন্য এই গ্রন্থ লেখা হইয়াছে।

গ্রন্থের রচনাকালও আমরা গ্রন্থকারের নিকট হইতে জানিতে পারি। তিনি লিখিয়াছেন—

"বিক্কম-কালস্স গএ অউণত্তীসুত্তরে সহস্সংমি।
মালব-নরিংদ-ধাডীএ লুডিএ মন্নখেডংমি॥ (২৭৬)

অর্থাৎ,

বিক্রমরাজত্বের এক হাজার ঊনত্রিশ বৎসর অতীত হইলে এবং মালবরাজ কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় মান্যখেট লুণ্ঠিত হইলে, (আমি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি)।

অতএব দেখা যাইতেছে যে ১০২৯ বিক্রমাব্দ=৯৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে ধনপাল এই-গ্রন্থ তাঁহার ভগিনীর জন্য লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায় যে, ধনপাল দশম শতাব্দীর শেষাংশে বা একাদশ শতাব্দীর পূর্বভাগে জীবিত ছিলেন।

'পাইয়লচ্ছী'তে ২৭৯টি আর্যা ছন্দে রচিত শ্লোক আছে। তাহাদের মধ্যে প্রথমটি মঙ্গলাচরণ এবং শেষের ৪টি আত্মপরিচায়ক। গ্রন্থখানি কোন অধ্যায় বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত নহে, কিন্তু তথাপি গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে ইহাতে ৪টি অনুচ্ছেদ আছে। প্রথমটি হইল ১—১৯ শ্লোক পর্যন্ত, দ্বিতীয়টি ২০—৯৪ শ্লোক পর্যন্ত, তৃতীয়টি ৯৫—২০২ শ্লোক পর্যন্ত এবং চতুর্থটি ২০৩—২৭৫ শ্লোক পর্যন্ত।

মেরুতুঙ্গ কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধচিন্তামণি নামক গ্রন্থে ধনপালের জীবনচরিত

১৫। *J. R. A. S.* 1921, P. 588

আছে। সেই গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, তাঁহার পিতার নাম সর্বদেব এবং তিনি বিস্মালায় (উজ্জয়িনী) বাস করিতেন। ইঁহারা কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ। ধনপালের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল, তাহার নাম শোভন। গৃহে মনোমালিন্যের জন্য ধনপাল ধারা নগরীতে বাস করিতে লাগিলেন।

এই গ্রন্থের রচনাশৈলীর কিছু নিদর্শন দেওয়া গেল—

"কমলাসণো সয়ংভূ পিয়ামহো চউমুহো য পরমিট্ঠী।
থেরো বিহী বিরিংচো পয়াবই কমলজোণী য॥ ২॥

এখানে ব্রহ্মার প্রতিশব্দ দিতেছেন—

"কমলাসনঃ স্বয়ম্ভূঃ পিতামহ-চতুর্মুখশ্চ পরমেষ্ঠিঃ।
স্থবিরো বিধির্বিরিঞ্চিঃ প্রজাপতিঃ কমলযোনিশ্চ॥

এইরূপ সর্বত্র।

ইহার পর হইল হেমচন্দ্রের **দেশীনামমালা**। তিনি (১০৮৮-১১৭২ খৃঃ) আর্যা বা গাথাছন্দে প্রাকৃত ভাষায় দেশী শব্দের সংগ্রহ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের অনেক নাম আছে। যথা—রত্নাবলী (প্রাঃ রচনাবলী হেমঃ দেশীঃ ৮।৭৭); বূলার বলেন 'দেশী-শব্দসংগ্রহ (হেমঃ দেশী ১।২; ৮।৭৭); পিশেল বলেন 'দেশীনামমালা'। কোন কোন হস্তলিখিত পুঁথিতে আছে দেশীশব্দসংগ্রহবৃত্তি। 'দেশীনামমালা' নামটাই সমধিক প্রচলিত।

দেশী শব্দ কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তর হেমচন্দ্র নিজেই দিয়াছেন। তাঁহার মতে—

"জে লক্খণে ণ সিদ্ধা ণ পসিদ্ধা সক্কয়াহিহাণেসু।
ণ য গউণ-লক্খণা-সত্তি-সংভবা তে ইহ নিবদ্ধা"॥ ১।৩॥

অর্থাৎ, যে সমস্ত শব্দ লক্ষণের দ্বারা সিদ্ধ নহে এবং যে সমস্ত শব্দ সংস্কৃতাভিধানেও প্রসিদ্ধ নহে এবং যেগুলি গৌণলক্ষণাশক্তির দ্বারা সম্ভব নহে, সেইগুলিকে এখানে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

ইহার পর হেমচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন যে সমস্ত দেশী শব্দ সংগ্রহ করা এক দুষ্কর ব্যাপার। কারণ, দেশে দেশে ইহার ভেদ দৃষ্ট হয়। সুতরাং যে সমস্ত শব্দ খুব প্রসিদ্ধ, কেবল সেইগুলিই তাহার গ্রন্থে স্থান পাইবে। সেইজন্য অতিব্যাপ্তি দোষ নিবারণের জন্য তিনি বলিয়াছেন—

"দেস-বিসেস-পসিদ্ধীই ভন্নমাণা অণংতয়া হুংতি।
তম্হা অণাই-পাইয়-পয়ট্ট-ভাসা-বিসেসসো দেসী"॥ ১।৪॥

দেশীনামমালায় ৭৮৩টি শ্লোক আছে এবং সেই প্রাকৃত শ্লোকের একটি সংস্কৃত টীকা দেওয়া আছে। এই টীকায় ও গ্রন্থে সর্বসাকল্যে ৩,৯৭৮টি দেশী শব্দ আছে। প্রত্যেকটি দেশী শব্দ দিয়া একটি প্রাকৃত গাথা শ্লোক আছে। এইটিই এই গ্রন্থের বিশেষত্ব। এই গাথা শ্লোকের সংখ্যাও ৭৮২। এই সমস্ত গাথা শ্লোক ভাবে ও ভাষায়, বর্ণনার লালিত্যে ও কোমলতায় জগতের অনেক সাহিত্যের সমকক্ষ হইতে পারে। নীচে ইহার একটু পরিচয় দিতেছি। মূল গ্রন্থে আছে—

"অয়ডোং ধংধু কূবে অণড-অণাডোবিণয়বরা জারে।
অবিণয়বঙ্গই অডয়া তহা অহব্বা অডয়ণা য"॥ ১।১৮॥

অর্থাৎ—'অযডো' এবং 'অংধংধু' মানে কূপ; অণডো, অণাডো এবং অবিণয়বরো মানে জার। অডয়া, অহব্বা, অডয়ণা মানে অসতী।

ইহার পর হেমচন্দ্র দেশী শব্দ দিয়া একটা শ্লোক রচনা করিয়াছেন; সেই শ্লোকটি এইরূপ—

"অডঅ! সুণাহিঅয়ডে! অণাড-অডয়ণাপঅ সরসি কালে।[১৬]
অংধংধুম্‌ অবিণয়বরাহস্বাট্‌ঠাণং তমিথ অণডো কিং॥" ১।১৫॥

অর্থাৎ—হে কূপের ন্যায়, সুন্দরনাভিবিশিষ্ট অসতি নারি! (তুমি) জার এবং অসতীদের প্রিয় কালে (অর্থাৎ সন্ধ্যার সময়ে) জারাসতীদের (মিলন) স্থান কূপের কাছে যাইতেছ, কেন? সেখানে কি কোন জার আছে?

এইভাবে প্রত্যেকটি দেশী শব্দের প্রয়োগ দেখাইয়াছেন হেমচন্দ্র তাঁহার দেশী-নামমালায়। গ্রন্থখানি আটটি বর্গে বিভক্ত এবং নিম্নলিখিতভাবে বিষয়ীকৃত।

বর্গ	আদিঅক্ষর	গাথাসংখ্যা
প্রথম বর্গ	স্বরবর্ণ	১৭৪
দ্বিতীয় বর্গ	ক-বর্গ	১১২
তৃতীয় বর্গ	চ-বর্গ	৬২
চতুর্থ বর্গ	ট-বর্গ	৫১
পঞ্চম বর্গ	ত-বর্গ	৬৩
ষষ্ঠ বর্গ	প-বর্গ	১৪৮
সপ্তম বর্গ	অন্তঃস্থ বর্ণ	৯৬
অষ্টম বর্গ	উষ্ম বর্ণ	৭৭
		৭৮৩

হেমচন্দ্র তাঁহার এই গ্রন্থে বহু অভিধানকারীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। যথা—গোপাল, দেবরাজ, দ্রোণ, ধনপাল, পাদলিপ্তাচার্য, রাহুলক, শাম্ভ, শীলাঙ্ক, সাতবাহন ইত্যাদি।

প্রাকৃত ছন্দঃশাস্ত্র

প্রাকৃত ছন্দোগ্রন্থ প্রভূত রচিত না হইলেও, ইহার ছন্দোরাশি বিশাল। বিশেষ করিয়া নব্যভারতীয় ছন্দের উৎপত্তি ব্যাপারে ইহার দান অনেক।

স্বয়ম্ভূ একজন প্রাচীন প্রাকৃতছন্দঃকার। হেমচন্দ্র এবং কবিদর্পণের টীকাকার ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি ৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম তিনটি অধ্যায়ে অক্ষরবৃত্ত পর্যন্ত ৬৩টি প্রাকৃত ছন্দের পরিচয় দেওয়া আছে; বাকী অংশটুকু অপভ্রংশ ছন্দ লইয়া লেখা হইয়াছে। অক্ষরবৃত্ত সম্বন্ধে স্বয়ম্ভূ যে সংজ্ঞা দিয়াছেন এবং তাহার যে ভাগ করিয়াছেন, সে সব বিরহাঙ্কের 'বৃত্তজাতি সমুচ্চয়ে' এবং হেমচন্দ্রের ছন্দোঽনুশাসনে অনুসৃত হইয়াছে। লেখকের মতে, এই জাতীয় ছন্দে প্রাকৃত গীতিকাব্য লেখা হইয়া থাকে। স্বয়ম্ভূ তাঁহার গ্রন্থে দণ্ডক, বেগবতী, উপকিতা, কেতুমতী, যববতী, শিখাখণ্ড, উদ্গতা, প্রকুপিত প্রভৃতি প্রাকৃত ছন্দের এবং উৎসাহ, দোহা, রড্ডা, সুন্দরী। হৃদয়িণী, ধবল, মঙ্গল, চতুষ্পদী, ষট্‌পদী, গাথা প্রভৃতি অপভ্রংশ ছন্দের বিবরণ দিয়াছেন। স্বয়ম্ভূ তাঁহার গ্রন্থে ৫৮ জন লেখকের নামোল্লেখ করিয়াছেন; তাহার মধ্যে ৪৮ জনের প্রাকৃত ছন্দের, আর অপর ১০ জনের অপভ্রংশছন্দের বর্ণনা-

১৬। Verse Reconstructed by Prof. Satya Ranjan Banerjee, Vide his article, A Note on the Remarks of Pischel on the Illustrative Gāthās of Hemacandra's Deśīnāmamālā (Proc, and Trans. AIOC, 18th Sess. Annamalainagar, 1958).

প্রসঙ্গে। গ্রন্থখানি **"স্বয়ম্ভূছন্দঃ"** নামেও বিখ্যাত। গ্রন্থকার অষ্টম বা নবম শতকে জীবিত ছিলেন বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন।

বিরহাঙ্কের বৃত্তজাতিসমুচ্চয় আর একটি প্রাকৃত ছন্দোগ্রন্থ। ইহাতে ছয়টি অধ্যায় আছে। তাহার মধ্যে প্রথম চারটি ও ষষ্ঠটি সম্পূর্ণ প্রাকৃত ভাষায় লেখা, পঞ্চমটি সংস্কৃত ভাষায়। কিছু কিছু সংস্কৃত ছন্দ সম্বন্ধে বলিলেও, গ্রন্থখানি আসলে প্রাকৃত ছন্দের। কেবল প্রাকৃত অংশের একটি টীকা আছে। গ্রন্থখানি ৯ম বা ১০ম শতকে বা তাহারও কিছু পূর্বে রচিত বলিয়া মনে হয়। এ গ্রন্থে পিঙ্গল (৪.১৩), ভুজগাধিপ (২.৮০৯, ৩.১২), বিষধর (১.২২; ২.৭) বৃদ্ধকবি (২.৮-৯; ৩.১২), সালাহণ (১.৮-৯) এবং হালের (৩.১২) নামোল্লেখ আছে। তিনি যে সব ছন্দের বিবরণ দিয়াছেন, তাহার উদাহরণসমূহ স্বরচিত। তিনি প্রাকৃত ছন্দকে প্রথমে মাত্রাবৃত্ত ও বর্ণবৃত্ত হিসাবে ভাগ করিয়াছেন। তাহার পরে, তাহাদের অন্তর্গত গীতি, স্কন্ধক, বিদারী, একক, ধ্রুবক প্রভৃতি ছন্দের আলোচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অপভ্রংশ ছন্দের মধ্যে অডিলা, উৎফুল্লক, ঢোসা, দুহা, রড্ডা প্রভৃতিরও আলোচনা করিয়াছেন।

নন্দিতাঢ্যের **'গাথালক্ষণ'** প্রাকৃত গাথা বিষয়ক একটি উৎকৃষ্ট ছন্দোগ্রন্থ। ইহাতে কেবল গাথারই লক্ষণ বলা হইয়াছে। এই প্রাকৃতগাথা ছন্দটি প্রাচীনতম বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থে ৯৬টি গাথাছন্দে রচিত শ্লোক আছে। এই ৯৬টি শ্লোকের মধ্যে ৪৯টি শ্লোক কেবল উদাহরণের জন্য দেওয়া হইয়াছে, বাকী শ্লোকগুলিতেই গাথার বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। গ্রন্থকারের মতে গাথা-লক্ষণ প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত—(১) পথ্যা, (২) বিপুলা এবং (৩) চপলা। প্রত্যেকটির আবার বিভিন্ন বিভাগ আছে। কাহারও মতে নন্দিতাঢ্য ৯ম—১১শ শতকের মধ্যে জীবিত ছিলেন, আবার কাহারও মতে তিনি খৃষ্টাব্দের প্রথম বা দ্বিতীয় শতকের দিকে ছিলেন।

হেমচন্দ্রের **'ছান্দোঽনুশাসন'** আর একটি উৎকৃষ্ট ছন্দোগ্রন্থ। এই গ্রন্থে হেমচন্দ্র বিস্তারিতভাবে প্রাকৃতছন্দের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ছন্দের সংজ্ঞা, তাহার শ্রেণীভেদ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রচলিত অপ্রচলিত সব রকম ছন্দেরই আলোচনা করিয়াছেন। প্রাকৃতপিঙ্গল যেমন কেবল অপভ্রংশ ছন্দের জন্য বিখ্যাত, হেমচন্দ্রের ছান্দোঽনুশাসন সেইরূপ নহে। ইহাতে প্রাকৃত (মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী ইত্যাদি) ও অপভ্রংশ উভয় ভাষার ছন্দেরই আলোচনা আছে।

এক অজ্ঞাতনামা কবির **'কবিদর্পণ'** আর একটি উৎকৃষ্ট প্রাকৃত ছন্দোগ্রন্থ। নন্দিসেনের অজিতশান্তিস্তব নামে এক গ্রন্থ আছে। সেই গ্রন্থের টীকাকার জিনপ্রভ সূরি তাঁহার টীকায় এই 'কবিদর্পণ' নামক ছন্দোগ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। জিনপ্রভ সূরি ১৩৬৫ সংবতে জীবিত ছিলেন। তাহাতে মনে হয়, গ্রন্থখানি অন্ততঃ তাহার কিছু পূর্বে লেখা এবং জিনপ্রভ সূরির সময়ে খুব খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। গ্রন্থকর্তা একজন জৈন; তিনি হেমচন্দ্রের ছান্দোঽনুশাসনের খোঁজ-খবর রাখিতেন।

গ্রন্থখানি ছয়টি উদ্দেশে বিভক্ত। ইহাতে ৫২টি প্রাকৃতছন্দের উল্লেখ ও লক্ষণ আছে এবং ৬৯টি উদাহরণ আছে। উদাহরণগুলি গ্রন্থকর্তা স্বয়ং নিজে দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ২৪টি সমবৃত্ত, ১৫টি অর্ধসমবৃত্ত এবং ১১টি আরও অন্য ধরনের নূতন ছন্দ যাহা সচরাচর অন্য প্রাকৃতছন্দো গ্রন্থে দেখা যায় না তাহারও আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে খুব বেশী প্রাকৃতছন্দের নামোল্লেখ করা হয় নাই। সম্ভবতঃ গ্রন্থকর্তা উপযোগিত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এইরূপ করিয়াছেন। অপভ্রংশ ছন্দেরও লক্ষণ ইহাতে আছে। গ্রন্থখানির যথেষ্ট পরিমাণে উপযোগিতা আছে।

এই কবিদর্পণ নামক গ্রন্থে "ছন্দঃকন্দলী" নামে আর একটি প্রাকৃতছন্দঃ গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।

'শ্রীপালচরিত্র' (সংবৎ ১৪২৮) এবং 'গুণস্থান-ক্রমারোহ' (সংবৎ ১৪৪৭) ব্যতীত রত্নশেখর সূরি অপভ্রংশ ভাষায় একটি ছন্দের বই লিখিয়াছিলেন। তাহার নাম **'ছন্দঃকোষ'**। বইখানি 'প্রাকৃত-পিঙ্গলে'র পূর্বের বলিয়া মনে হয়। রত্নশেখর সূরি চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে ছিলেন। রত্নশেখর সূরি বজ্রসেনের শিষ্য এবং নাগপুরীর তপাগচ্ছ বংশীয় হেমতিলক সূরির উত্তরাধিকারী। তিনি ১৩৭২ সংবতে জন্মগ্রহণ করেন।

ছন্দঃকোষ ৭৪টি শ্লোকে রচিত একটি ছোট গ্রন্থ। ইহাতে প্রথমে আশীর্বাদপূর্বক নমস্কারাদি করিবার পর 'অক্ষরগণ' এবং 'বর্ণবৃত্ত' লইয়া আলোচনা আছে। ইহাতে ষট্‌পদ, রাসাকুল, বিজয়ক, একাবলী, লঘুচতুষ্পদী, দ্বিপদী, চতুষ্পদী, খড্ডা, পজ্ঝটিকা, মালতি, অডিলা, মডিলা, আভাণক, কাব্য, রোডক, বস্তু প্রভৃতি সহ ৫৫টি অপভ্রংশ ছন্দের আলোচনা আছে।

পিঙ্গলাচার্যের **'প্রাকৃত-পিঙ্গল'** অপভ্রংশ ভাষায় রচিত একখানি উৎকৃষ্ট ও বিখ্যাত ছন্দোগ্রন্থ। ইহাতে 'মাত্রাবৃত্ত' ও 'বর্ণবৃত্ত' উভয়জাতীয় ছন্দেরই আলোচনা আছে। গ্রন্থকার চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে, রত্নশেখর সূরির পরে, বিদ্যমান ছিলেন। গ্রন্থকার সোদাহরণ যে সব ছন্দের আলোচনা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে মাত্রাবৃত্তে গাহা, বিগ্‌গাহা, উগ্‌গাহা, খংধা, দোহা, মোলা, খত্তা, ছপ্পঅ, কব্বলক্‌খণ, পজ্ঝটিকা, চউবোলা, রড্ডা, দোঅই (দ্বিপদী), সিখা, মালা, হার্কলি প্রভৃতি এবং বর্ণবৃত্তে—পংচাল, মংদর, বিজোহা, মালতী, মল্লিকা, মহালচ্ছী, রূপমালা, চংপকমালা, তোটক, বসংততিলআ, চামর, চচ্চরী প্রভৃতি প্রধান ও উল্লেখযোগ্য।

জৈনদর্শন

জৈনগণ প্রাকৃত ভাষায় স্বীয় ধর্মের দর্শন লিখিতে আরম্ভ করিলেন। আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে উপনিষদের সারগর্ভ বাণী যখন বৌদ্ধদের মধ্যে অনাস্থা স্থাপন করিল, তখন সৃষ্ট হইল বৌদ্ধদের 'শূন্যবাদ' বা 'নাস্তিবাদ'। কিন্তু ইহাতেও শেষ হয় নাই। জৈনগণ অস্তি ও নাস্তির মধ্যে আর একটি নূতন দর্শনের সৃষ্টি করিলেন, যাহাকে বলা হয় 'স্যাদ্বাদ'। এই দর্শন উভয় দর্শনের মধ্যপন্থা অবলম্বন করিল। এই দর্শনকেই ভিত্তি করিয়া জৈনগণ ন্যায়, তর্কশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। আবশ্যক নির্যুক্তিতে পাওয়া যায়, ভদ্রবাহু দশ বিভাগে বিভক্ত করিয়া ন্যায় শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং সূত্রকৃতাঙ্গনির্যুক্তিতে পাওয়া যায়, ভদ্রবাহু স্বয়ং 'স্যাদ্বাদ' শিক্ষা দিয়া লোকের মন জয় করিয়াছিলেন। জৈন মনীষীরা পদার্থ (দ্রব্য) বা পদার্থ-জ্ঞান, কালচক্র বা কালতত্ত্ব, সৃষ্টিপ্রকরণ, আত্মা, দেহ ও ইন্দ্রিয়বর্গ প্রভৃতির অপূর্ব ব্যাখ্যা প্রদানে তাঁহাদের প্রজ্ঞাশক্তির অপূর্ব পরিচয় দিয়াছেন।

মনীষী **কুন্দাচার্য** বা **এলাচার্য** জৈনসমাজে, বিশেষ করিয়া দিগম্বর জৈন সমাজে, একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তিনি জৈন দার্শনিকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য ও প্রধান। তিনি বিবিধ নামে বিভূষিত ছিলেন, যথা—পদ্মনন্দী, কুন্দকুন্দ (বা কোণ্ড-কুন্দ), বক্রগ্রীব, এলাচার্য এবং গৃধ্রপূচ্ছ। ইহার মধ্যে কুন্দকুন্দাচার্য বা এলাচার্য নামটিই সমধিক প্রচলিত। সম্ভবতঃ তিনি কুণ্ডপুরের অধিবাসী বলিয়া তাঁহাকে কুন্দ-কুন্দাচার্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

কুন্দকুন্দের জীবন বিচিত্রতায় পূর্ণ। এই সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী আছে। তাহার

মধ্যে দুইটি প্রধান। ভারতখণ্ডের দক্ষিণ দেশে পিদথনাড়ু জেলায় কুরুমরই নামে এক দেশ আছে। সেখানে করমণ্ড নামে এক ধনী বণিক তাহার পত্নী শ্রীমতীর সহিত বাস করিত। তাহাদের একটি গোপালক ছিল। সে একদিন বনের মধ্যে একটা বাক্স পাইল। তাহার মধ্যে আগম গ্রন্থ ছিল। সে সেইটিকে বাড়িতে আনিয়া একটা পবিত্র পাত্রে রাখিয়া প্রত্যহ পূজা করিত। একদিন তাহাদের বাড়িতে এক সাধু আসিলেন। গৃহস্বামী তাঁহাকে খাদ্য দিলেন, আর বালকটি তাঁহাকে ঐ আগমগ্রন্থগুলি দিল। সাধু সন্তুষ্ট হইয়া দুইজনকে আশীর্বাদ করিলেন। সেই গৃহস্বামীর কোন পুত্রসন্তান ছিল না এবং ঘটনাচক্রে সেই ছেলেটিও মারা গেল। ছেলেটি মারা যাইবার পর, গৃহস্বামীর একটি পুত্র হইল। সেই পুত্রেরই নাম রাখা হইল কুন্দকুন্দ। কুন্দকুন্দই বড় হইয়া প্রখর প্রজ্ঞা-শক্তির পরিচয় দিয়া বিখ্যাত দার্শনিক হইলেন।

আর একটি কাহিনী আছে যাহাতে বলা হইয়াছে যে মালবদেশে বারাপুর নামক নগরে কুমুদচন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রানীর নাম ছিল কুমুদচন্দ্রিকা। তাঁহারই রাজ্যে কুন্দশ্রেষ্ঠী নামে এক ধনী বণিক তাহার পত্নী কুন্দলতার সহিত বাস করিত। তাহাদের একটি ছেলে ছিল—তাহার নাম কুন্দকুন্দ। সেই বালক কুন্দকুন্দই পরিণত বয়সে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যলাভ করিয়া প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া প্রথিতযশা দার্শনিক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার কাহিনীর মতই তাঁহার সময় লইয়া বহু বাদানুবাদ আছে। কাহারও মতে খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে তিনি জীবিত ছিলেন, কাহারও মতে খৃষ্টাব্দ মধ্য ২য় শতকে, কাহারও মতে খৃঃ ১৬৫ অব্দে, কাহারও মতে খৃঃ ৫২৮ অব্দে তিনি জীবিত ছিলেন। বহু গবেষণার পর সর্বাধিক প্রচলিত মত হইল খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই তিনি জীবিত ছিলেন।

যতদূর জানা যায়, কুন্দকুন্দ সর্বসাকল্যে ৮৪টি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এইগুলিকে পাহুড় (প্রাভৃত) বলা হয়। যে সমস্ত গ্রন্থ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য লইয়া লেখা হয়, তাহাদিগকে পাহুড় গ্রন্থ বলা হয়। এই সম্পর্কে সময়সারের টীকাকার জয়সেনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—

"যথা কোঽপি দেবদত্তঃ রাজদর্শনার্থং কিঞ্চিৎ সারভূতং বস্তু রাজ্ঞে দদাতি তৎ প্রাভৃতং ভণ্যতে। তথা পরমাত্মারাধকপুরুষস্য নির্দোষি-পরমাত্ম-রাজ-দর্শনার্থম্ ইদমপি শাস্ত্রং প্রাভৃতম্ ॥"

আসলে, প্রাভৃত শব্দের অর্থ হইল 'অধিকার'। যেখানে একটা বিশেষ বিষয়ের আলোচনা করা হয়, সেখানে প্রাভৃত শব্দের প্রয়োগ করা হয়; যেমন, শ্বেতাম্বর গ্রন্থে 'জোণীপাহুড়', 'সিদ্ধ-পাহুড়' ইত্যাদির উল্লেখ আছে। মোটকথা হইল এই যে, কুন্দকুন্দ যে ৮৪টি গ্রন্থই লিখিয়াছিলেন এমন নাও হইতে পারে, (সব গ্রন্থের নাম আমরা এখনও পাই নাই) তবে হয়ত বহু 'পাহুড়' সঙ্কলন করিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক, তাঁহার লিখিত গ্রন্থের মধ্যে পঞ্চাস্তিকায়সার, প্রবচনসার, সময়সার, নিয়মসার ও ষট্প্রাভৃত প্রধান ও উল্লেখযোগ্য।

জৈনদের মধ্যে **নেমিচন্দ্র** একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তিনি আগমাদি সিদ্ধান্ত গ্রন্থে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'সিদ্ধান্তচক্রবর্তী' বলা হয়। তিনি দশম শতাব্দীর শেষে বা একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন। নেমিচন্দ্র চামুণ্ডারাজ কর্তৃক বিশেষভাবে সম্মানিত হইতেন। গঙ্গাবংশের রাজা মারসিংহ দ্বিতীয় (৯৭৪ খৃঃ মৃত) ও তৎপরে রাজমল্ল দ্বিতীয় (৯৭৪-৯৮৪ খৃঃ)-এর মন্ত্রী এবং অদ্বিতীয় যোদ্ধা ছিলেন 'চামুণ্ডারাজ'। তিনি জৈনমতাবলম্বী ছিলেন

এবং উত্তরকালে জৈনধর্ম প্রচারের জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। তিনিই মহীশূরের 'শ্রবণবেলগোলায়' ৯৮০ খৃঃ "গোম্মটেশ্বরের" মূর্তি স্থাপন করেন। উচ্চতার জন্য পৃথিবীর মধ্যে ইহা বিখ্যাত হইয়া আছে। তিনি 'চামুণ্ডারাজপুরাণ' নামে কান্নড় ভাষায় এক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থ ৯৭৮ খৃঃ লেখা। সেই গ্রন্থেই তিনি অজিতসেন এবং নেমিচন্দ্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই অজিতসেন এবং নেমিচন্দ্র উভয়েই চামুণ্ডারাজের আচার্য ছিলেন।

যতদূর জানা যায় নেমিচন্দ্র (১) দ্রব্যসংগ্রহ, (২) গোম্মটসার, (৩) লব্ধিসার, (৪) ক্ষপণসার এবং (৫) ত্রিলোকসার নামে পাঁচটি জৈন ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়া অমর হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে "গোম্মটসার" আয়তনে খুব বিশাল এবং দিগম্বর জৈনগণ কর্তৃক সমাদৃত। প্রত্যেকটি গ্রন্থই প্রাকৃত ভাষায় লেখা।

দ্রব্যসংগ্রহ (প্রাঃ দব্বসংগহো) ৫৮টি প্রাকৃত শ্লোকে লেখা একটি পদার্থবিষয়ক গ্রন্থ। ইহাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটিতে ছয়টি দ্রব্য (১—২৭), দ্বিতীয়টিতে নয়টি তত্ত্ব (২৮—৩৯) এবং শেষটিতে মোক্ষপ্রাপ্তি (৪০—৫৮) সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

দ্রব্য মূলতঃ দুইভাগে বিভক্ত ঃ—(১) জীব এবং (২) অজীব। অজীব আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত ঃ—(১) পুদ্গল, (২) ধর্ম, (৩) অধর্ম, (৪) আকাশ এবং (৫) কাল। ইহাদের মধ্যে—জীব, পুদ্গল, ধর্ম, অধর্ম এবং আকাশকে অস্তিকায় বলে। এই সকলই এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

'জীব ও অজীব' সহ নয়টি তত্ত্ব হইতেছে—আশ্রব, বন্ধন, সংবর, নির্জরা, মোক্ষ, পুণ্য এবং পাপ।

নেমিচন্দ্র-রচিত 'গোম্মটসার' একটি উৎকৃষ্ট এবং প্রধান দর্শনবিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থখানি 'পঞ্চ-সংগ্রহ' নামেও বিখ্যাত। চামুণ্ডারাজ গোম্মতেশ্বরের মূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'গোম্মটবায়' নামে পরিচিত হন। ইহা হইতেই গ্রন্থখানিও 'গোম্মটসার' নামে পরিচিত হইল। এই গ্রন্থে (১) বন্ধ, (২) বধ্যমান, (৩) বন্ধস্বামী, (৪) বন্ধহেতু এবং (৫) বন্ধভেদ—এই পাঁচটি বিষয়ের আলোচনা আছে বলিয়া ইহাকে 'পঞ্চসংগ্রহ'ও বলা হয়।

গ্রন্থখানি নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত ঃ—

গোম্মটসার (= ১৭০৫ শ্লোকের সমষ্টি)।

জীবকাণ্ড (=৭৩৩ শ্লোক) | কর্মকাণ্ড (= ৯৭২ শ্লোক)।

জীবকাণ্ড:

১ মার্গণা, ২ গুণস্থান, ৩ জীব, ৪ পর্যাপ্তি, ৫ প্রাণ, ৬ সংগ, ৭ উপযোগ।

কর্মকাণ্ড:

১ প্রকৃতি সমুৎকীর্তন। ২ বন্ধোদয়-সত্ত্ব। ৩ সত্ত্বস্থান-ভংগ ৪ ত্রিচূলিকা ৫ স্থান-সমুৎকীর্তন। ৬ প্রত্যয় ৭ ভাব চূলিকা। ৮ ত্রিকরণ চূলিকা। ৯ কর্মস্থিতি রচনা।

এই সমস্ত বিষয়ই বিস্তৃতভাবে এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। জীবের উৎপত্তি, অবস্থান ও তাহাদের বিভিন্ন ধারার বিকাশ, কর্ম, বন্ধন ও তাহা হইতে জীবের মুক্তি—এই সমস্ত বিষয়েরই আলোচনা এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। এককথায়, জৈনদর্শন ও তত্ত্ব জানিতে হইলে এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য।

'লব্ধিসার' গোম্মটসারেরই অংশবিশেষ। কোন্ পন্থা অবলম্বনে জীব শুদ্ধাচারবান্ মোক্ষ পুরুষ হইতে পারে, তাহারই বর্ণনা এই গ্রন্থে আছে। 'লব্ধি' শব্দের অর্থ হইল 'প্রাপ্তি'। উহা পাঁচ প্রকার, যথা—(১) ক্ষায়োপশমিক, (২) বিশুদ্ধি, (৩) দেশনা, (৪) প্রায়োগ্য এবং (৫) করণ। ইহাতে ৩৮০টি শ্লোক আছে।

নেমিচন্দ্রের 'ক্ষপণসার'ও গোম্মটসারের অংশবিশেষ। ইহাতে বন্ধ, কষায় লেশ্যা প্রভৃতি বিষয় লইয়া বহু আলোচনা আছে; এবং কিরূপে জীব এই সমস্ত হইতে মুক্তি পাইতে পারে, তাহারও পথ নির্দেশ করা হইয়াছে। 'ক্ষপণ' শব্দের অর্থ হইল 'ধ্বংস' বা 'বিনাশ'। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, 'ক্ষপণসার' কষায়াদি দোষের ধ্বংসের কথা লইয়া লেখা একখানি দার্শনিক গ্রন্থ। ইহাতে ২৭০টি শ্লোক আছে।

'ত্রিলোকসার' গ্রন্থখানি তিনটি লোকের (পৃথিবীর) বিষয় লইয়া লেখা। ইহা একটি ভূ-বিবরণ বিষয়ক গ্রন্থ।

শোনা যায়, নেমিচন্দ্র 'প্রতিষ্ঠানপাঠ' নামে আরও একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু এই সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

কুন্দকুন্দাচার্যের পর ভট্টকের স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিলেন প্রাকৃত ভাষায় লিখিত 'মূলাচার' ও 'ত্রিবর্ণাচার' গ্রন্থে। কার্ত্তিকের স্বামীর 'কার্ত্তিকেয়ানুপ্রেক্ষা' একটি উৎকৃষ্ট জৈনদর্শন। উমাস্বামিনের 'তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র' আর একটি উৎকৃষ্ট জৈনদর্শন। হরিভদ্রের 'দ্রব্যগুণ', 'শ্রাবকপ্রজ্ঞপ্তি', 'প্রশমরতিপ্রকরণ' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

জৈনগণ অন্যান্য বিষয়ে যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ধর্মশাস্ত্রে 'নবতত্তং' (জৈনধর্মোক্ত নয়টি তত্ত্বের আলোচনা), অর্থশাস্ত্রে 'অট্ঠকুলকং' ও গণিতে 'গণীবিজ্জা' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জ্যোতিষশাস্ত্র

জ্যোতিষশাস্ত্রের মধ্যে দুর্গদেবাচার্যের 'রিষ্টসমুচ্চয়' একখানি উৎকৃষ্ট ও উল্লেখযোগ্য জ্যোতিষ গ্রন্থ। গ্রন্থখানি ২৬১টি শ্লোকে জৈন শৌরসেনী প্রাকৃতে খৃঃ একাদশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল 'রিষ্ট' সম্বন্ধে আলোচনা ও তার ফলাফল। 'রিষ্ট' শব্দের মানে হইল 'অশুভ', 'অমঙ্গল'। গ্রহনক্ষত্রাদির দ্বারা মানুষের কি জাতীয় অশুভ ও অঘটন ঘটিতে পারে এবং কেমন করিয়া ও কেন মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এই সমস্তই এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। কোষকারেরা 'রিষ্ট' শব্দের নিম্নলিখিত অর্থ দিয়াছেন—

"রোগিণো মরণং যস্মাদবশ্যম্ভাবি লক্ষ্যতে।
তল্লক্ষণ মরিষ্টং স্যাদিষ্টমপ্যাভিধীয়তে॥"

দুর্গদেব একজন দিগম্বর জৈন এবং সংযমদেবের শিষ্য। তিনি উত্তরভারতে কুম্ভনগরে বাস করিতেন। তখন লক্ষ্মীনিবাস নামধারী কোন এক রাজা রাজত্ব করিতেন। দুর্গদেব বর্তমান গ্রন্থখানি ১০৮৯ সংবতে (১০৩২ খৃঃ) রচনা করেন।

দুর্গদেব প্রাকৃত ভাষায় আরও দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ঃ—(১) অর্ঘকাণ্ড ও (২) মন্ত্রমহোদধি। অর্ঘকাণ্ড জৈন শৌরসেনী প্রাকৃতে ১৪৯ শ্লোকে রচিত একখানি জ্যোতিষবিষয়ক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের রচয়িতা যে দুর্গদেব, সেকথা গ্রন্থকার প্রথমেই জানাইয়াছেন—

নমিঊণ বড্ঢমাণং সংযমদেবং নরেংদথুঅপাবং।
বোচ্ছামি অগ্ঘকংডং ভণিয়াণ হিয়ং পয়ত্তেণ॥ ১॥

বিরগুরু পরংপরাএ কমাগয়া এত্থ সয়লসত্থং।
লদ্ধূণ মণ্ডুঅলোএ নিদ্দিট্ঠং দুগ্গএবেণ ॥ ২ ॥

'মন্ত্রমহোদধি' গ্রন্থখানিও ৩৬ শ্লোকে প্রাকৃত ভাষায় রচিত। কিন্তু এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইহাও জ্যোতির্বিষয়ক বলিয়া মনে হয়।

ইহা ছাড়া 'চন্দপণ্ণত্তি', 'সূরপণ্ণত্তি', 'চন্দাবিজ্জা', 'অংগবিজ্জা' প্রভৃতিও জ্যোতিষ-শাস্ত্রান্তর্গত বিখ্যাত প্রাকৃত গ্রন্থ।

আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থের মধ্যে 'তন্দুলবেয়ালীসা'; ভৌগোলিক গ্রন্থের মধ্যে 'জম্বুদ্দীপসংঘয়ণী', 'সংঘয়ণীরয়ণং', 'লোকণাবসুত্ত', 'জম্বুদ্দীপপণ্ণত্তি', 'জম্বুদ্দীপ-পণ্ণত্তিসংগহো' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ও প্রধান। ভূ-বিবরণ বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যেও জৈনগণ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যতিবৃষভাচার্যের 'তিলোয়পণ্ণত্তি'র কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, নেমিচন্দ্রের 'তিলোয়সার', সিংহ সূরির 'লোকবিভাগ', ইন্দ্রবামদেবের 'ত্রৈলোক্যদীপিকা', শুভচন্দ্রের 'ত্রৈলোক্যপ্রজ্ঞপ্তি' প্রধান।

এইভাবে জৈনরা প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে বহু বিষয়ে বহুবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রাকৃত সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন।

পরিশেষে Winternitz-এর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থ পরিসমাপ্ত করিলাম—

"The Jainas have extended their activities beyond the sphere of their own religious literature to a far greater extent than the Buddhists have done, and they have memorable achievements in the secular sciences to their credit, in philosophy, grammar, lexicography, poetics, mathematics, astronomy and astrology, and even in the science of politics. .Thus we see that they occupy no mean position in the history of Indian literature and Indian thought."

(*Hist. of Ind. Lit.* Vol. II. pp. 594-95.)

ক. গ্রন্থকার-পরিচিতি

অপ্‌পদীক্ষিত—জয়দেব রচিত **চন্দ্রালোক** নামক গ্রন্থের টীকা হিসাবে **কুবলয়ানন্দকারিকা** রচনা করেন। কথিত আছে, রাজা বেঙ্কটাদ্রি তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া একটি বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলে অপ্‌পদীক্ষিত এই গ্রন্থ রচনা করেন।[১]

অভিনবগুপ্ত—পিতার নাম নৃসিংহগুপ্ত, মাতার নাম বিমলা, পিতামহের নাম বরাহগুপ্ত। তিনি শৈব ছিলেন এবং 'আচার্যপাদ' নামে পরিচিত ছিলেন। মাধবের শঙ্করবিজয় গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে অভিনবগুপ্ত শঙ্করাচার্য কর্তৃক তর্কে পরাজিত হন। আনন্দবর্ধন রচিত ধ্বন্যালোকের উপর অভিনবগুপ্ত 'লোচন' নামে যে টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, অলঙ্কার সাহিত্যের তাহা মূল্যবান সম্পদ। ভারতের নাট্যশাস্ত্রের **নাট্যলোচন** ও **অভিনবভারতী** নামে দুইখানি টীকাও তাঁহার রচিত।

আনন্দবর্ধন—কাশ্মীররাজ অবন্তীবর্মনের (৮৫৫-৮৪ খৃঃ) সভাকবি ছিলেন। ধ্বনিই কাব্যের প্রাণ—এই মতবাদের তিনিই জনক। **ধ্বন্যালোক** বা **কাব্যালোক** নামক তাঁহার রচিত গ্রন্থে এই ধ্বনিরই আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহার মতবাদ সকলেই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন।[২] দেবীশতক, অর্জুনচরিতমহাকাব্য, বিষমবাণলীলা ও হরবিজয় তাঁহার অন্যান্য রচনা।

উদ্‌ভট—ইনিও কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের সভাকবি ছিলেন এবং রাজসভায় সভাপতিরূপে প্রত্যহ এক লক্ষ দীনার বেতন পাইতেন। সেই সভায় মনোরথ, শঙ্খদত্ত, চটক, সন্ধিমান ও বামনও অবস্থান করিতেন।[৩] মনে হয়, রাজার অনুরোধেই উদ্‌ভট তাঁহার **কাব্যালঙ্কারসংগ্রহ্‌** রচনা করেন। ইহা ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে এক-চল্লিশটি অলঙ্কারের আলোচনা করা হইয়াছে।

উমাপতিধর—গৌড়রাজ লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহার রচিত **কৃষ্ণচরিত** কৃষ্ণের জীবনী অবলম্বন করিয়া রচিত। পারিজাত লইয়া ইন্দ্রের সহিত কৃষ্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধের বিষয় অবলম্বন করিয়া **পারিজাতাপহরণ** নামে নাটকও ইনি রচনা করিয়াছিলেন। জয়দেব নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, উমাপতিধর বাক্যকে পল্লবিত করিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন—বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ......। ইঁহার রচিত শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃতে পাওয়া যায়।

কবিরাজ—১২শ খৃষ্টাব্দে কাদম্ব-রাজবংশীয় নরপতি কামদেবের সভাকবি ছিলেন কবিরাজ। তাঁহার **পারিজাতহরণ** কাব্য কৃষ্ণ কর্তৃক পারিজাত হরণের উপাখ্যান

১। তুলঃ অমুং কুবলয়ানন্দমকরোদপ্‌পদীক্ষিতঃ।
নিয়োগাদ্বেঙ্কটপতের্নিরুপাধিকৃপানিধেঃ ॥

২। তুলঃ ধ্বনিনাতিগভীরেণ কাব্যতত্ত্বনিবেদিনা।
আনন্দবর্ধনঃ কস্য নাসীদানন্দবর্ধনঃ ॥
—জল্‌হণের সূক্তিমুক্তাবলীতে রাজশেখরের উক্তি

৩। তুলঃ বিদ্বান্‌ দীনারলক্ষেণ প্রত্যহং কৃতবেতনঃ।
ভট্টোঽভূদুদ্‌ভটস্তস্য ভূমিভর্তুঃ সভাপতিঃ ॥
মনোরথঃ শঙ্খদত্তশ্চটকঃ সন্ধিমাংস্তথা।
বভূবুঃ কবয়স্তস্য বামনাদ্যাশ্চ মন্ত্রিণঃ ॥
—রাজতরঙ্গিণী, ৪, ৪৯৫, ৪৯৭

অলঙ্কারে দশটি সর্গে রচিত। পিতা কীর্তিধারাজের অনুপ্রেরণায় জন্য তিনি এই কাব্য প্রণয়ন করেন। শ্লেষ প্রয়োগ ও বক্রোক্তি অলঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া রচিত তাঁহার আর একখানি কাব্য রাঘবপাণ্ডবীয় দ্ব্যর্থক রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীদ্বয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তিনি নিজেকে সুবন্ধু ও বাণের সহিত একাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।৪

কাত্যায়ন—নামান্তর বররুচি। পিতার নাম ছিল সোমদত্ত। জন্মস্থান কৌশাম্বী। পাটলীপুত্রে আচার্য উপবর্ষের নিকট শিক্ষালাভ করেন। পাণিনি ও ব্যাড়ি তাঁহার সতীর্থ। উপবর্ষের কন্যা উপকোশার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পাণিনির ব্যাকরণের বৃত্তি রচনা করিয়া তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন। পতঞ্জলি বররুচি রচিত কাব্যের কথা জানিতেন। Macdonell-এর মতে কাত্যায়নের আবির্ভাবকাল খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী।৫

কোহল—ভরতের একশত অন্তরঙ্গ শিষ্যের মধ্যে কোহল অন্যতম। রচনার উৎকর্ষের দিক দিয়া ভরতের পরেই কোহলের স্থান। কোহলের মূল গ্রন্থ পাওয়া যায় না, শুধু তালাধ্যায় নামক তাহার অংশবিশেষ পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্রে বলা আছে যে উত্তরতন্ত্র নামে একখানি গ্রন্থ কোহল রচনা করিবেন। ঐ গ্রন্থ কোহল আদৌ রচনা করিয়াছিলেন কিনা তাহা জানিবার উপায় নাই।

গণপতি শাস্ত্রী—পিতার নাম রামসুব্বা আয়ার। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। প্রথমে ত্রিবেন্দ্রাম সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং পরে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনা বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট হন। ভাসের নাটকগুলির আবিষ্কারক হিসাবে তাঁহার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। ভাসের নাটকগুলির উপর তিনি মূল্যবান টীকা রচনা করিয়াছেন এবং নিজে ঐগুলির সম্পাদনাও করিয়াছেন।

জিনসেন—হরিবংশপুরাণ ও আদিপুরাণ নামক দুইখানি গ্রন্থের রচয়িতা। প্রথমখানির রচনাকাল খৃঃ ৭৮৩। অনেকে মনে করেন, ঐ দুইখানি গ্রন্থের রচনাকালের ব্যবধান প্রায় ৫০ বৎসর এবং দুই জিনসেন এক ব্যক্তি নহেন। জিনসেন আদিপুরাণ সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার শিষ্য গুণভদ্র পরে 'উত্তরপুরাণ' নাম দিয়া উহা সম্পূর্ণ করেন।

দত্তিল—ভরতের অন্তরঙ্গ শিষ্যদের একজন। ইঁহার রচিত সঙ্গীতগ্রন্থের সর্বত্র ইনি ভরতের মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। দত্তিলের গ্রন্থের টীকার নাম প্রত্যগ্রপত্রক এবং উহা খুব জনপ্রিয়।

ধর্মাশোক—কাশ্মীরের গোনন্দ রাজবংশের রাজা শচীনরের অনন্তর তৃতীয় পুরুষ। কহ্লণ তাঁহার রাজতরঙ্গিণীতে (১.১০৪) বলিয়াছেন যে অশোক বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়া শান্তবৃজিন হইয়াছিলেন এবং শ্রীনগরকে ছিয়ানব্বই লক্ষ প্রাসাদের দ্বারা সুশোভিত করিয়াছিলেন। সদুক্তিকর্ণামৃতে (২.১-৫) তাঁহার রচিত শ্লোকের উল্লেখ আছে।

নান্যদেব—নামান্তর রাজনারায়ণ, ইনি তিরহুতের রাজা ছিলেন (১০৯৭-১১৪৭ খৃঃ) এবং বাংলার রাজা বিজয়সেনের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। ভবভূতির মালতী-

---

৪। মূল: সুবন্ধুর্বাণভট্টশ্চ কবিরাজ ইতি ত্রয়ঃ।
বক্রোক্তিমার্গনিপুণাশ্চতুর্থো বিদ্যতে ন বা॥

৫। দ্রষ্টব্য: Joyaswal: *Dates of Panini and Katyayana*, (I. A. XLVII pp. 112 & 138)

কাব্যের টীকা ব্যতীত ইনি কালিদাসের টীকা রচনা করিয়াছেন। ঐ টীকার নাম [illegible]।

পতঞ্জলি—পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর উপর রচিত **মহাভাষ্যের** রচয়িতা। অনেক স্থলে গোনর্দীয় নামেও তিনি পরিচিত। যোগসূত্র নামক আর একখানি গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবেও ইঁহাকে অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন। তাঁহার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে সঠিক নির্ণয় হয় নাই। রাজতরঙ্গিণী হইতে জানা যায় যে কাশ্মীররাজ অভিমন্যুর রাজত্বকালে কাশ্মীরে মহাভাষ্যের পঠন-পাঠন প্রভৃতি বিলুপ্তি লাভ করিয়াছিল। অনুমান করা হয় যে, খৃঃ পূঃ ১ম বা খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী তাঁহার আবির্ভাবকাল।

পাণিনি—**অষ্টাধ্যায়ী** নামক ব্যাকরণের রচয়িতা। চার হাজার সূত্র এবং আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত অষ্টাধ্যায়ী। পাণিনিকে সূত্র-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। বর্তমান আটকের নিকটস্থ শালাতুর গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান এবং ইঁহার মাতার নাম দাক্ষী। একটি কিংবদন্তীর কথা হইতেছে যে পাণিনি সিংহ কর্তৃক নিহত হন। পাণিনি, ব্যাড়ি ও কাত্যায়ন পাটলিপুত্রের আচার্য উপবর্ষের শিষ্য ছিলেন। আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৫ম শতক পাণিনির আবির্ভাবকাল।

বল্লভাচার্য—তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ (১৪৭৯-১৫৩১ খৃঃ)। ভাগবতের **সুবোধিনী** টীকাকার। ইঁহার সম্প্রদায়ের সকলেই কৃষ্ণকেই পরব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন।

বিদ্যাপতি—মৈথিলীর কবি বিদ্যাপতি সংস্কৃতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দ ইঁহার কাল। ইঁহার রচিত দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী নামক দুর্গাপূজাতে আজও সমাদৃত এবং এখনও পুঁথিরূপে বর্তমান আছে। মিথিলা-রাজ শিবসিংহের (১৪০০ খৃঃ) পৃষ্ঠপোষকতায় ইহা রচিত হয়। উক্ত মিথিলার বুদ্ধিমতী পুত্রবধূর উৎসাহে বিদ্যাপতি **লিখনাবলী** নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। রচিত অন্যান্য **ভূ-পরিক্রমা** ও **পুরুষপরীক্ষা**। গ্রন্থখানি [illegible] ও [illegible]। শিশুদিগের শিক্ষার জন্য পঞ্চতন্ত্রের অনুকরণে রচিত কতকগুলি গল্পের সমষ্টি।

বিদ্যারণ্য—বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। বিজয়নগরের রাজা বুক্ক ও হরিহর ইঁহার শিষ্য ছিলেন এবং ইঁহার দ্বারা সায়ণাচার্য ঐ রাজ্যের সেনাপতি ও মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যারণ্যের নামান্তর মাধবাচার্য এবং তিনি সায়ণাচার্যের ভ্রাতা। ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

বিশ্বনাথ—কলিঙ্গ নিবাসী ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখরের পুত্র। ইঁহার রচিত গ্রন্থ সাহিত্যদর্পণ[৬] দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। বিশ্বনাথের পিতামহ নারায়ণ কলিঙ্গরাজের সভার [illegible] এক কবিকে বিচারে পরাজিত করেন। স্বয়ংও বিশ্বনাথ রাজা [illegible] নরসিংহের সভাকবি ছিলেন।

বামন—কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের (৭৭৯-৮১৩ খৃঃ) সভাকবি ছিলেন বামন। পরে রাষ্ট্রকূটরাজ [illegible] (৮১৩-৮১৫ খৃঃ) সভাতেও তিনি সভাকবি ছিলেন। রীতিই কাব্যের প্রাণ—এই মতবাদের পোষকতা করিয়া তিনি পাঁচটি অধ্যায়ে **কাব্যালঙ্কারসূত্র** রচনা করেন। কাদম্বরী, উত্তররামচরিত, শিশুপালবধ প্রভৃতি হইতে বামন তাঁহার গ্রন্থে বহু অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ভামহ—ভামহ রচিত **কাব্যালঙ্কার** অলংকার শাস্ত্রের প্রাচীন গ্রন্থ। ভামহের পিতার নাম রক্রিল গোমিন্। ভামহ নিজে বলিয়াছেন যে সুজনগণের [illegible]

৬। দশ অধ্যায়ে রচিত।

জন্য সংকবিগণের কাব্যসমূহ আলোচনা করিয়া তিনি কাব্যালঙ্কার রচনা করিয়াছিলেন।[৭] গ্রন্থারম্ভে ভামহ 'সার্ব-সর্বজ্ঞ'-কে প্রণতি জানাইয়াছেন বলিয়া অনেকে মনে করেন তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। দণ্ডী কতকগুলি মতের বিরোধী মত পোষণ করিয়াছেন এবং সেগুলি ভামহের মত; সুতরাং দণ্ডীকে ভামহের পরবর্তী ধরা হয়।[৮] ভট্টি ভামহেরও পরবর্তী। ৭ম খৃষ্টাব্দ যদি দণ্ডীর আবির্ভাবকাল হয়, তবে ভামহকে ৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দে ফেলা চলে।

মম্মটভট্ট[৯]—কাশ্মীর জন্মস্থান হইলেও মম্মটভট্ট বারাণসীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। একটি কাহিনী অনুসারে তিনি বৈয়াকরণ কৈয়ট এবং বেদভাষ্যকার উবটের ভ্রাতা ছিলেন। মম্মট তাঁহার **কাব্যপ্রকাশ** নামক গ্রন্থে মহারাজ ভোজের মহত্ত্ব ও বদান্যতার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত কাব্যপ্রকাশ দশটি উল্লাসে রচিত এবং 'আকর' নামে পরিচিত। অলঙ্কার, কাব্যের দোষ ও গুণ প্রভৃতি ইহাতে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। অনেকে মনে করেন, কাব্যপ্রকাশ মম্মট ও অল্লট উভয়েরই রচিত; পরিকর-অলঙ্কার পর্যন্ত মম্মট রচনা করিয়াছেন এবং পরবর্তী অংশ অল্লটের রচনা। অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে কাব্যপ্রকাশ অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। এই গ্রন্থের সর্বপ্রথম টীকাকার মাণিক্যচন্দ্র (১১৫৯ খৃষ্টাব্দ)। মম্মটের আবির্ভাবকাল ১১শ খৃষ্টাব্দ।

মাধ্বাচার্য—১১৯৪ খৃষ্টাব্দে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে মাধ্বাচার্যের জন্ম হয়। তাঁহার মাতার নাম বেদবল্লী। মাধ্বাচার্যের পূর্ব নাম ছিল বাসুদেব। মাত্র ২৫ বৎসর বয়সেই তিনি সর্বশাস্ত্রে অগাধ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং 'পূর্ণপ্রজ্ঞ' নামে বিখ্যাত হন। এই সময়ে অচ্যুতপ্রকাশের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করেন এবং আনন্দতীর্থ নাম গ্রহণ করেন। অদ্বৈতবাদের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। ১২৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহাবসান হয়। মোট ৩৭খানি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছেন।

মাতৃগুপ্ত—১২শ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে ইঁহার কাল। কল্হণ রাজতরঙ্গিণীতে (৩.১২৯—২২৯) কবি মাতৃগুপ্তের বিবরণ এবং কাশ্মীররাজ বিক্রমাদিত্য হর্ষবর্ধনের সহিত তাঁহার প্রীতির সম্পর্কের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। মেণ্ঠ মাতৃগুপ্তকে তাঁহার হয়গ্রীববধ কাব্য শুনাইয়া প্রশংসা পাইয়াছিলেন। মাতৃগুপ্ত রচিত নাট্যশাস্ত্রের টীকার কথাও জানা যায়।

মাঙ্খ—১২শ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর দেশীয় কবি মাঙ্খ তাঁহার **শ্রীকণ্ঠচরিত** রচনা করেন। শিব কর্তৃক ত্রিপুরাসুরের নিধনকাহিনীই এই কাব্যে ২৫টি সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। মাঙ্খ রুয্যক-এর শিষ্য ছিলেন এবং রুয্যক তাঁহার অলঙ্কারসর্বস্ব নামক গ্রন্থে শ্রীকণ্ঠ-চরিতের উল্লেখ করিয়াছেন।

মেরুতুঙ্গ—প্রবন্ধচিন্তামণি গ্রন্থের রচয়িতা। রচনাকাল খৃঃ ১৩০৬। গ্রন্থটি পাঁচটি অংশে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অংশ আবার কতকগুলি গর্ভাংশে বিভক্ত। প্রতি গর্ভাংশে একটি করিয়া গল্প আছে। প্রত্যেক গল্পই কোন-না-কোন রাজা বা ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে

৭। তুলঃ অবলোক্য মতানি সংকবীনাং অবগম্য স্বধিয়া চ কাব্যলক্ষ্ম।
সুজনাবগমায় ভামহেন গ্রথিতং রক্তিলগোমিসুনুনেদম্॥ ৬.৬৬

৮। দ্রষ্টব্যঃ S. K. De: *A note on Avantisundari Katha in relation to Bhamaha and Dandin*—*IHQ*, III, p. 395.

৯। মম্মটের মতে দোষবর্জিত ও গুণযুক্ত রচনাই কাব্য—তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণা-বনলঙ্কৃতী পুনঃ ক্বাপি। কিংবদন্তী আছে স্বয়ং মহেশ্বর বলিয়াছেন যে গৃহে গৃহে কাব্য-প্রকাশের টীকা থাকা সত্ত্বেও কাব্যপ্রকাশ দুর্বোধ্য হইয়া রহিয়াছে—কাব্যপ্রকাশস্য কৃতা গৃহে গৃহে টীকা তথাপ্যেষ তথৈব দুর্গমঃ।

লইয়া রচিত। প্রথম গল্পটি বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে। শেষের দিকে লক্ষ্মণসেন, উমাপতি, ভর্তৃহরি সম্বন্ধেও গল্পের অবতারণা করা হইয়াছে।

মিত্রমিশ্র—পঞ্চগৌড় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও বীরমিত্রোদয়-রচয়িতা। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবন অবলম্বন করিয়া ইনি **আনন্দকন্দচম্পূ** রচনা করিয়াছেন। রাজা বীরসিংহদেব (১৬০৫-২৭ খৃঃ) ইঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

রামানুজ—১০১৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীপেরুম্বুদুরে রামানুজ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্বনাম ছিল লক্ষ্মণ এবং পরে লক্ষ্মণমুনি নামে তিনি পরিচিত হইয়াছিলেন। কাঞ্চী-নিবাসী যাদবপ্রকাশের তিনি শিষ্য ছিলেন। পরবর্তীকালে বেদান্ত ধর্মে দীক্ষিত হইয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ব্যাসসূত্রের টীকা, গীতাভাষ্য ও বেদান্তের উপরে তিনখানি গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। তাঁহার রচিত ব্যাসসূত্রের টীকাই 'শ্রী-ভাষ্য' নামে পরিচিত। ১১৩৭ খৃষ্টাব্দে ১২৮ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহাবসান হয়।

রাহুলক—ভরতের নাট্যশাস্ত্রের উপর একজন টীকাকার। খৃঃ পূর্ব চতুর্থ শতকেরও আগে ইঁহার আবির্ভাবকাল। অভিনবগুপ্ত ইঁহাকে শাক্যাচার্য বলিয়াছেন এবং ইঁহার সমালোচনা অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণ করেন নাই। রাহুলক বৌদ্ধ ছিলেন।

শার্ঙ্গদেব—খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে অতি সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতগ্রন্থ **সঙ্গীতরত্নাকর** রচনা করেন। সমস্ত প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞ আচার্যগণের মত ইহা হইতে জানা গেলেও শার্ঙ্গদেব এক স্বতন্ত্র ভঙ্গীতে বিষয়ের অবতারণা ও আলোচনা করিয়াছেন। রাজদরবারে উচ্চ-পদে নিযুক্ত থাকিয়াও তিনি যে সঙ্গীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এই গ্রন্থই তাহার প্রমাণ। গ্রন্থখানি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। সিংহভূপাল, কেশব, কল্লিনাথ, হংসভূপাল প্রভৃতি অনেকে এই গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছেন।

শুভঙ্কর—**সঙ্গীত দামোদর** গ্রন্থের রচয়িতা। সাত অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থে নৃত্য ও গীত সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। খৃষ্টাব্দ পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দী ইহার রচনাকাল বলিয়া অনুমিত হয়। নারদীয়শিক্ষার উপর শুভঙ্কর একখানি টীকাও রচনা করিয়াছেন।

শ্রীহর্ষ—হীর ও মামল্লদেবীর পুত্র শ্রীহর্ষের রচিত **নৈষধচরিত** বা **নৈষধীয়** কাব্য-সাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। সম্ভবতঃ ১২শ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে কনৌজাধিপতি জয়চন্দ্রের সময়ে শ্রীহর্ষ এই কাব্যখানি প্রণয়ন করেন। **খণ্ডনখণ্ডখাদ্য** নামে তাঁহার আরও একখানি গ্রন্থ আছে। তাহাতে শ্রীহর্ষ বেদান্ত দর্শনের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। নৈষধচরিত মহাভারতোক্ত রাজা নলের কাহিনী লইয়া রচিত। মাঘ ও ভারবির রচনা অপেক্ষাও এক সময়ে নৈষধচরিত অধিক প্রশংসাভাজন হইয়াছিল। বাইশটি সর্গে নৈষধচরিত পাওয়া যায়।

সিদ্ধসেন দিবাকর—ন্যায়াবতার গ্রন্থের রচয়িতা এবং প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে ইঁহার আবির্ভাবকাল। তিনি নিজে জৈন ছিলেন এবং জৈনগণের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল। হরিভদ্র সূরি, জিনসেন প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতা রাজা বিক্রমাদিত্যের পুরোহিত ছিলেন। ইহা হইতে স্বর্গত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় মনে করেন যে ইনিই বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের ক্ষপণক। তাঁহার সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। একবার তিনি গুরুর সম্মুখে দর্পভরে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে সমস্ত প্রাকৃত সাহিত্যকে তিনি সংস্কৃতে রূপান্তরিত করিবেন। এই দম্ভোক্তির জন্য গুরু তাঁহাকে দ্বাদশ বৎসরের জন্য মৌন অবলম্বন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করার আদেশ দেন। সিদ্ধসেন এই সময়ে ভ্রমণ করিতে করিতে এক-বার উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হন এবং মহাকালীর মন্দিরে অবস্থান করেন। সেখানে

শিবের মূর্তিকে প্রণাম না করায় মন্দিরের পুরোহিতেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং রাজা বিক্রমাদিত্যকে খবর দেন। বিক্রমাদিত্য আসিয়া শিবের মূর্তির সম্মুখে প্রণত হইতে সিদ্ধসেনকে বাধ্য করেন। সিদ্ধসেন রাজাজ্ঞা পালন করিবার কালে স্বরচিত **কল্যাণমন্দির** স্তোত্র পাঠ করিতে থাকেন এবং দেখিতে দেখিতে দ্বিধাবিভক্ত শিবমূর্তির মধ্য হইতে জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তির আবির্ভাব হয়। এই ঘটনার পরে নরপতি ও অনেকে জৈনধর্ম গ্রহণ করেন। জিনসেন আদিপুরাণে সিদ্ধসেন সম্বন্ধে নিম্নানুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :—

প্রবাদিকরিযূথানাং কেসরী নয়কেসরী।
সিদ্ধসেনকবির্জীয়াৎ বিকল্পনখরাঙ্কুরঃ॥

সিদ্ধসেনের সমসাময়িক কবি ও নৈয়ায়িক সমন্তভদ্রের নামও উল্লেখযোগ্য। তিনিও জৈন ছিলেন। জনশ্রুতি এই যে, তিনি কাঞ্চীর অধিবাসী ছিলেন এবং শক্তিমান যোগীও ছিলেন। উদরের ব্যাধি নিরাময়ের জন্য তিনি দেশভ্রমণে বহির্গত হন এবং ঘুরিতে ঘুরিতে বারাণসীতে উপস্থিত হন। এইখানে শিবমূর্তির মধ্য হইতে পার্শ্বনাথের মূর্তির আবির্ভাবের যে কিংবদন্তী সিদ্ধসেন সম্বন্ধে প্রচলিত, সমন্তভদ্র সম্বন্ধেও সেই একই কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এই কারণে অনেকে মনে করেন যে, সিদ্ধসেন ও সমন্তভদ্র একই ব্যক্তি। কিন্তু জিনসেন আদিপুরাণে পৃথকভাবে সমন্তভদ্রের উল্লেখ করিয়াছেন—

নমঃ সমন্তভদ্রায় মহতে কবিবেধসে। যদ্বচোবজ্রপাতেন নির্ভিন্নাঃ কুমতাদ্রয়ঃ।
কবিনাং গমকানাং চ বাদীনাং বাগ্মিনামপি। যশঃ সামন্তভদ্রীয়ং মূর্ধ্নি চূড়ামণীয়তে॥

থ. গ্রন্থ-পরিচিতি

অদ্‌ভুত রামায়ণ—এই গ্রন্থখানি বাল্মীকির রচিত বলিয়া মনে করা হয়। ইহাতে সাতাশটি সর্গ আছে। সীতার সম্বন্ধে কতকগুলি কাহিনী এবং সীতার প্রকৃতি বিশ্লেষণই ইহার মুখ্য বিষয়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে সীতা শতমস্তকযুক্ত এক রাবণকে বধ করিয়াছিলেন যাহাকে রামচন্দ্রও পরাজিত করিতে পারেন নাই। গ্রন্থের অপর নাম 'অদ্‌ভুতোত্তররামায়ণ'।

অধ্যাত্ম রামায়ণ—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অংশবিশেষ। সাত খণ্ডে বিভক্ত। ইহা শিব ও উমার মধ্যে কথোপকথনের আকারে রচিত। রামচন্দ্র পরব্রহ্মের প্রকাশ এবং সীতা স্বয়ং লক্ষ্মী ইহাই ইহার প্রতিপাদ্য। দুইটি অধ্যায় বিশেষভাবে আদৃত হইয়া থাকে। প্রথম অধ্যায়ে রামের হৃদয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সপ্তম খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ের নাম 'রাম-গীতা'। সকল কর্ম হইতে উপরত হইয়া ঈশ্বরের ধ্যান করার সার্থকতা এখানে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অনর্ঘরাঘব—মুরারি এই সপ্তাঙ্ক নাটকখানির রচয়িতা। রত্নাকরের হরবিজয় গ্রন্থে মুরারির উল্লেখ আছে। রত্নাকর ছিলেন কাশ্মীররাজ অবন্তীবর্মার (৮৫৫-৮৪ খৃঃ) সভাকবি। মুরারির আবির্ভাবকাল ৮ম খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ কিংবা ৯ম খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগ। রামায়ণের কাহিনীই অনর্ঘরাঘবের বিষয়বস্তু। মুরারির রচনাশৈলী ও উপমার ব্যবহার উচ্চ প্রশংসা পাইয়াছে।[১] লক্ষ্মণ সূরি (১৮৫৯-১৯১৯ খৃঃ) ও নবচন্দ্র সূরি (১২৩২ খৃঃ) রচিত অনর্ঘরাঘবের টীকাও পাওয়া যায়।

অবদানকল্পলতা—বৌদ্ধ সাহিত্যের অবদান সাহিত্যের মধ্যে ইহা প্রাচীনতম গ্রন্থ। খৃঃ ৩য় শতকে চীনাভাষায় ইহার অনুবাদ করা হয়। ইহা ক্ষেমেন্দ্রের রচিত এবং ইহার শেষ আখ্যানটি ক্ষেমেন্দ্রের পুত্র সোমেন্দ্র ইহাতে সংযোজিত করিয়াছেন।

অভিনয় দর্পণ—নন্দিকেশ্বর বিরচিত অভিনয় সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। অভিনয়কালে অভিনেতা কোন্ পদ্ধতি অনুসারে অঙ্গভঙ্গী করিবেন সে বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা তেরটি খণ্ডে বিভক্ত এবং খুব সম্ভব নন্দিকেশ্বরের রচিত 'ভারতার্ণব' গ্রন্থের অংশবিশেষ।

উজ্জ্বলনীলমণি—রূপগোস্বামী (খৃঃ ১৪৯০—১৫৬৩) বিরচিত। ইনি গৌড়রাজ হোসেন শাহের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং নিজে পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ইঁহার সমস্ত রচনাই ভক্তিরসাত্মক। উজ্জ্বলনীলমণি অলঙ্কারশাস্ত্রের গ্রন্থ। ইহাতে নায়ক-নায়িকার শ্রেণীবিভাগ, তাহাদের অনুরাগের ক্রমবিকাশ ও অবস্থান্তর ইত্যাদি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং উদাহরণস্বরূপ যে সকল শ্লোক দেওয়া হইয়াছে তাহার সবগুলিই কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া রচিত। জীবগোস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ইহার দুইখানি টীকা রচনা করিয়াছেন।

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়—সংগ্রহগ্রন্থের মধ্যে প্রাচীনতম বলা যাইতে পারে। গ্রন্থকারের নাম জানা যায় না, তবে যে সকল কবির উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে ময়ূর, বাক্‌পতিরাজ এবং রাজশেখরই সর্বাপেক্ষা পরবর্তীকালের। অনুমান করা হয় খৃষ্টাব্দ দশম শতকের পূর্বে সংগ্রহ সমাপ্ত হইয়াছিল। F. W. Thomas ইহার একখানি মূল্যবান ভূমিকা লিখিয়াছেন।

১। তুলঃ ভবভূতিমনাদৃত্য নির্বাণমতিনা ময়া।
মুরারিপদচিন্তায়ামিদমাধীয়তে মনঃ ॥—শার্ঙ্গধরপদ্ধতি

কাব্যমীমাংসা[২]—সাহিত্য-ধারার ও সাহিত্য সমালোচনার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। অনেকে মনে করেন 'কবিরহস্য' নামক একখানি বিপুলায়তন লুপ্ত গ্রন্থের ইহা অংশবিশেষ। ইহা রাজশেখরের রচিত। ১০ম খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে রাজশেখর রাজা মহীপালের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রন্থখানি রচনা করেন।

কাব্যাদর্শ—ইহা দণ্ডী বিরচিত অলঙ্কারের গ্রন্থ। ইহা চারিটি সর্গে বিভক্ত এবং ঐগুলিতে যথাক্রমে মার্গ, শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার ও দোষের আলোচনা করা হইয়াছে। রচনারীতিই কাব্যের বৈশিষ্ট্য—এই মতবাদী সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ কাব্যাদর্শ। ইহাতে গৌড়ী ও বৈদর্ভী, এই উভয় রীতির আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে দণ্ডী 'সেতুবন্ধ' ও 'কলা-পরিচ্ছেদ' নামক দুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

কীচকবধম্—মহাভারতের বিরাটপর্বে বর্ণিত দ্রৌপদীর উপর বিরাট-মন্ত্রী কীচকের অত্যাচারের বিষয়কে অবলম্বন করিয়া রচিত একখানি যমক কাব্য। কবির নাম নীতিবর্মা। কাব্যাদর্শের টীকাকার প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ 'আশী' দ্বারা মঙ্গলাচরণ আবদ্ধ হইয়াছে এমন কাব্যের উদাহরণদান প্রসঙ্গে এইখানির উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয় উদাহরণ সহজলভ্য নহে। বাঙালী পণ্ডিতগণের নিকট কাব্যখানি আদৃত হইয়াছে এবং জনার্দন সেন নামক একজন ইহার একখানি টীকাও প্রণয়ন করিয়াছেন। ভোজ তাঁহার শৃঙ্গার-প্রকাশে কাব্যখানির উল্লেখ করিয়াছেন। মনে হয় খৃষ্টাব্দ অষ্টম শতক ইহার রচনাকাল।

কৃষ্ণকর্ণামৃত—রচয়িতার নাম কৃষ্ণলীলাশুক। ইনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ইনি বিল্বমঙ্গল নাম গ্রহণ করেন এবং ত্রিচুরে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মঠের অধ্যক্ষগণও বিল্বমঙ্গল নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন (IHQ. VII 334)। বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস যে ইনি প্রথমে কাশীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল মাধবানল। দ্বিতীয় জন্মে ইনিই কবি বিল্হন, তৃতীয় জীবনে ইনি কবি বিল্বমঙ্গল এবং শেষে ইনিই গীতগোবিন্দের কবি জয়দেব।

ভোজের সরস্বতী কণ্ঠাভরণের উপর ইঁহার রচিত একটি টীকা আছে। তাঁহার রচনায় তিনি জৈন কবি হেমচন্দ্রেরও উল্লেখ করিয়াছেন। **কৃষ্ণকর্ণামৃতই** তাঁহাকে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি দান করিয়াছে। দ্বাদশ তরঙ্গে বিভক্ত এই লিরিক কাব্য কৃষ্ণের জীবনী অবলম্বন করিয়া রচিত।

নাট্যশাস্ত্র—ভরত রচিত 'নাট্যশাস্ত্র' নৃত্য ও গীত সম্বন্ধে প্রাচীনতম গ্রন্থ। ঐন্দ্রব্যাকরণ ও যাস্কের নিরুক্ত হইতেও ইহাতে উদ্ধৃতি দেখা যায়। গ্রন্থের প্রাচীনত্বের জন্য ভরতকে ভরতমুনিও বলা হয়। বৃদ্ধ-ভরত নামেও তিনি প্রসিদ্ধ। অভিনয়-রীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভরত গ্রন্থটিকে চারি খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছেন—সাত্ত্বিক, আঙ্গিক, বাচিক, আহর্য। অভিনয়-কলার গৌরব ও প্রাচীনত্ব, মঞ্চের গঠন-কৌশল, আকার প্রভৃতির বিশদ আলোচনা ইহাতে করা হইয়াছে। S. K. De-র মতে বিভিন্ন যুগে এই গ্রন্থখানির রূপ পরিবর্তিত হইয়াছে এবং ইহার বর্তমান রূপ ৮ম খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হইয়াছে। গণপতি শাস্ত্রীর মতে নাট্যশাস্ত্র ভাসেরও পরবর্তীকালে রচিত। সাধারণতঃ খৃঃ পূঃ ২য় শতক হইতে খৃষ্টাব্দ ২য় শতকের মধ্যে ইহার রচনাকাল অনুমান করা হয়।[৩] কালিদাস বিক্রমোর্বশীতে ভরতকে 'মুনি' আখ্যা দিয়াছেন, সুতরাং ভরত নিঃসংশয়ে কালিদাসের বহু পূর্ববর্তী।

২। Keith কাব্যমীমাংসার বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন—*Sanskrit Literature*, p. 385

৩। দ্রষ্টব্যঃ S. K. De: *Sanskrit Poetics*

পৃথিরাজবিজয়—দ্বাদশ শতকে আজমীররাজ পৃথিরাজের জীবনী অবলম্বন করিয়া চাঁদকবি ইহা রচনা করিয়াছিলেন। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে পৃথিরাজ সুলতান সাহাবুদ্দিন ঘোরীকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই বিজয়কে উপলক্ষ করিয়া এই কাব্য রচিত হইতে থাকে। পরে পৃথিরাজ যখন সাহাবুদ্দিন ঘোরীর সহিত যুদ্ধে নিহত হন তখন ইহার রচনা পরিত্যক্ত হয়। গ্রন্থের অসম্পূর্ণতার উহাই কারণ।

প্রবোধচন্দ্রোদয়—রচয়িতা কৃষ্ণমিশ্র শঙ্করের অনুবর্তী ও অদ্বৈত মতের একজন বিশিষ্ট প্রচারক ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার একজন শিষ্যকে দর্শন-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন করিবার জন্যই কৃষ্ণমিশ্র এই রূপক নাটকখানি রচনা করেন। ভ্রম, পাপ, ব্যসন, ধর্ম, যুক্তি প্রভৃতিকে নাটকীয় চরিত্ররূপে গ্রহণ করিয়া ইহা রচিত হইয়াছে। নাটকের প্রস্তাবনা হইতে জানা যায় যে কৃষ্ণমিশ্রের সুহৃৎ রাজা কীর্তিবর্মা কর্তৃক চেদিরাজ কর্ণের পরাজয়কে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্যই এই নাটক রচিত হইয়াছিল। দুইখানি লিপি হইতে কীর্তিবর্মার আবির্ভাবকাল ১১শ খৃষ্টাব্দের শেষার্ধ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

প্রসন্নরাঘব—রামায়ণের আখ্যানভাগ অবলম্বনে রচিত সাত অঙ্কের নাটক, কবির নাম জয়দেব। তিনি উত্তর ভারতের অধিবাসী এবং শিবের উপাসক। তাঁহার আর দুইটি উল্লেখযোগ্য রচনা হইল **সীতাবিহার** ও **চন্দ্রালোক**। প্রসন্নরাঘবে জয়দেব ভাস, কালিদাস, ময়ূর ও বাণের প্রশংসা করিয়াছেন। জল্হন সূক্তিমুক্তাবলীতে (খৃঃ ১২৪৭) প্রসন্নরাঘবের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। একজন নৈয়ায়িক জয়দেবের নামও পাওয়া যায়। তিনি 'পক্ষধর' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং গঙ্গেশের তত্ত্বচিন্তামণির উপর টীকাও প্রণয়ন করিয়াছেন। অনেকে মনে করেন প্রসন্নরাঘব রচয়িতা জয়দেব ও পক্ষধর-জয়দেব অভিন্ন।

বিদগ্ধমুখমণ্ডনম্—জৈনকবি ধর্মদাস বিরচিত প্রহেলিকা বা সমস্যা জাতীয় কতকগুলি শ্লোকের সঙ্কলন। ইহা চারি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং চিত্রকাব্যের অন্তর্গত।

বেণীসংহার—মহাভারতে সভাপর্বে বর্ণিত দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও ভীমের প্রতিজ্ঞার বিষয়কে অবলম্বন করিয়া ছয় অঙ্কে রচিত নাটক। রচয়িতার নাম ভট্টনারায়ণ। কিংবদন্তী বলে যে গৌড়রাজ আদিশূরের (৭ম খৃঃ) আমন্ত্রণে কনৌজ হইতে বাংলাদেশে যে ব্রাহ্মণগণ আসিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদেরই একজন। নিশানারায়ণ ও মৃগরাজ নামেও তাঁহার পরিচয় ছিল।

বৃহদ্দেশী—মতঙ্গ মুনি বিরচিত ছয় অধ্যায়যুক্ত গ্রন্থ। দেশী সঙ্গীত, শ্রুতি, স্বর ইহার আলোচ্য। সঙ্গীত সম্বন্ধে ভরতের সহিত মতভেদ আছে এবং অভিনবগুপ্ত শার্ঙ্গধর প্রভৃতি সকলেই 'মতঙ্গমত' নামক বিশিষ্ট মতেরও উল্লেখ করিয়াছেন। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের সময় হইতে বৃহদ্দেশীয় রচনাকালের ব্যবধান খুব বেশী হইবে না।

ভরতটীকা—ভরতের নাট্যশাস্ত্রের প্রাচীনতম টীকা। টীকাকারের নাম জানা যায় না, তবে তিনি শ্রীপাদের শিষ্য ছিলেন এইটুকু বলিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত অনেক ক্ষেত্রে এই টীকার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মহানাটক—কিংবদন্তী আছে যে স্বয়ং হনুমান ইহার রচয়িতা। বহুদিন ইহা লুপ্ত ছিল, পরে ধারা-নরপতি ভোজের সময় উহা আবিষ্কৃত হয়। কথিত আছে যে মহানাটক প্রচলিত থাকিলে স্বরচিত রামায়ণের আদর হইবে না ভাবিয়া বাল্মীকি মহানাটক সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। **হনুমন্নাটক** নামেও ইহা পরিচিত। সম্ভবতঃ ইহার রচনাকাল হইল ১০ম খৃষ্টাব্দ।

ললিতবিস্তার—এই গ্রন্থখানি ১ম খৃষ্টাব্দে রচিত। মোটামুটিভাবে বুদ্ধের জীবনীই ইহার বিষয়বস্তু এবং এই দিক দিয়া জাতক ও অবদান-সাহিত্যের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। বুদ্ধের প্রামাণ্য জীবনী হিসাবেও ইহাকে গ্রহণ করা চলে না, আবার সাহিত্য হিসাবেও ইহা উচ্চস্তরের নহে।

সূক্তিমুক্তাবলী—জল্হণের রচিত। জল্হণের পুরা নাম অরোহক ভগদত্ত জল্হণদেব। পিতার নাম লক্ষ্মীদেব। পিতা ও পুত্র উভয়েই যাদবনরপতি কৃষ্ণের সভাকবি ছিলেন। জল্হণের আদেশক্রমে ভানু পণ্ডিত বা ভাস্কর সূক্তিমুক্তাবলী রচনা করেন। ইহার প্রথমে কয়েকটি শ্লোকে জল্হণের বংশ পরিচয় দেওয়া আছে। ইহার রচনাকাল ১২৫৭ খৃষ্টাব্দ।

হরিচরিতকাব্য—ত্রয়োদশ সর্গে রচিত মহাকাব্য। রচয়িতার নাম চতুর্ভুজ। বাংলার রাজধানী গৌড়ের নিকটবর্তী রামকেলি নামক কোনও গ্রামে কবি ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে ইহা রচনা করেন। এই অঞ্চল তখন খোজা ও হাবসীগণের অধীনে ছিল। ইঁহার পুত্রের নাম কমলাকর।

পরিশিষ্ট : পাঁচ

গ্রন্থপঞ্জী

Apte	*Date of Kalidasa*
Banerjee Sastri	*Asura India*
Balfour	*Cyclopaedia of India*
Belvalkar	*Systems of Sanskrit Grammar*
Bloomfield	*Hymns of the Atharvaveda*
Burrow, T.	*The Sanskrit Language*
Chatterjee, A. C.	*Kalidasa : His poetry and Mind*
Chatterjee, S. C.	*The Nyaya Theory of Knowledge*
Dubrauil, C. J.	*Ancient History of the Deccan*
Devadhar, C. R.	*Bhasa-Nataka-Cakra, Or Plays Ascribed to Bhasa*
De, S. K.	*Sanskrit Poetics*
Das Gupta, S. N. & De, S. K.	*History of Sanskrit Literature*
Diskalkar, D. B.	*Selections from Sanskrit Inscriptions*
Fleet	*Carnatic Dynasties*
Ghate	*Lectures on Rigveda*
Goldstucker	*Inspired Writings of Hinduism*
Griswold	*Religion of the Rig Veda*
Haug	*Aitareya Brahmana*
Hertel	*History of the Beast Fable in India*
Huxley, Aldous	*Ends and Means*
Iyer, C. V. K.	*Sankaracaryya*
Joyaswal	*Dates of Panini and Katyayana*
Kaegi	*Life in Ancient India*
Krishnamachariar, M.	*History of Classical Sanskrit Literature*
Keith	*Sanskrit Drama*
"	*History of Sanskrit Literature*
Macdonell	*Sanskrit Literature*
"	*History of Sanskrit Literature*
Mackenzie	*Hindu Ethics*
Majumdar, R. C. (Ed.)	*History and Culture of the Indian People*
Maxmuller	*India: What Can It Teach Us*
"	*Ancient History of Sanskrit Literature*
"	*Gifford Lectures on Physical Religion*
"	*Heritage of India*
"	*Collected Works (New Impression), Vol. X*
Mehendale, K. C.	*Date of Sudraka's Mrcchakatika*
Muir	*Original Sanskrit Texts (OST)*
Palmer	*Contemporary American Philosophy*
Pargiter	*Ancient Indian Historical Tradition*

Radhakrishnan	*The Hindu View of Life*
"	*Introduction to Indian Philosophy*
Rhys Davids	*Dialogues of the Buddha*
Raychoudhury	*Political History of Ancient India*
Sastri, Haraprasad	*Kalidasa: His Home*
Stace	*A Critical History of Greek Philosophy*
Stevenson	*Heart of Jainism*
Sagen	*Systems of Buddhistic Thought*
Seal	*The Positive Sciences of the Ancient Hindus*
Smith	*History of India*
Suryanarayan Rao, T.	*Bhavabhuti and His Masterly Genius*
Suryanarayan Sastri, M.	*Life of Sanskrit Poets*
Suzuki	*Outlines of Mahayana Buddhism*
Thilly	*History of Philosophy*
Turner	*A History of Direct Realism*
Vaidya, C. V.	*Riddle of the Ramayana*
Williams Monier	*Hinduism*
"	*The Indian Wisdom*
Wilson	*Rigveda*
Winternitz	*Some Problems of Indian Literature*
"	*History of Indian Literature*
ভট্টাচার্য, বিধুশেখর	উপনিষদ (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ)

Indian Antiquary (*IA*)
Indian Culture
Indian Historical Quarterly (*IHQ*)
Journal of the Asiatic Society of Bengal (*JASB*)
Do (Bombay Branch), (*JBRAS*)
Journal of the Royal Asiatic Society (*JRAS*)
Journal of the Greater India Society
Modi Memorial Volume
Our Heritage (Bulletin of the Govt. Sanskrit College, Calcutta).

সাঙ্কেতিক অক্ষরের অর্থ

অ. শ্রৌ. সূ = আশ্বলায়ন শ্রৌত সূত্র

ঋ. স. = ঋগ্বেদ সংহিতা

ছা. উ. = ছান্দোগ্য উপনিষদ্

তৈ. ব্রা. = তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ

বা. স. = বাজসনেয় সংহিতা

বৃ. উ. = বৃহদারণ্যক উপনিষদ্

বৃ. দে = বৃহদ্দেবতা

শ. ব্রা. = শতপথ ব্রাহ্মণ

...্যাদয়ের বই : প্রবন্ধ ও চিরায়ত সাহিত্য

এশিয়ার সাহিত্য	২৮·০০	নিখিল সেন
বিদ্যাসাগর	১১·০০	গোলাম মুরশিদ সম্পাদিত
ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম	১৯·০০	সুপ্রকাশ রায়
ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস : প্রথম খণ্ড	২০·০০	সুপ্রকাশ রায়
শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র	১২·০০	মোহিতলাল মজুমদার
কবি শ্রীমধুসূদন [৪র্থ সংস্করণ]	[যন্ত্রস্থ]	মোহিতলাল মজুমদার
সাহিত্য-বিচার	৮·৫০	মোহিতলাল মজুমদার
বাংলার নবযুগ	৮·০০	মোহিতলাল মজুমদার
সাহিত্য-বিতান [৪র্থ সংস্করণ]	[যন্ত্রস্থ]	মোহিতলাল মজুমদার
বঙ্কিম-বরণ	৬·৫০	মোহিতলাল মজুমদার
বিপ্লবের সন্ধানে	১৩·০০	নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য [১৮১৮-১৯৬০]	১০·০০	খগেন্দ্রনাথ মিত্র
পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর	৮·০০	ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
স্কুল ও কলেজের গ্রন্থাগার পরিচালনা	৩·৭৫	রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
ভারত মহিলা	৩·৮০	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
নাট্যতত্ত্বমীমাংসা	১৩·০০	ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য
রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন	১০·০০	ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য
অলিম্পিকের ইতিকথা	২৫·০০	শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত
চিত্রদর্শন	২৫·০০	কানাই সামন্ত
ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ : প্রথম খণ্ড	১০·০০	নেপাল মজুমদার
বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র	৬·০০	সংকলন
সাহিত্য ও সমাজ মানস	৬·০০	নারায়ণ চৌধুরী
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	৩·৫০	অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়
বাংলা দেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা	৪·৫০	কপিল ভট্টাচার্য
বক্তব্য	৫·০০	ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
স্তালিন যুগ [অনুবাদ]	৩·২৫	আনা লুইস্ স্ট্রং
লেখকদের প্রেম	৩·০০	ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯
অফিস : ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯